জ্ঞান ও কর্ম্ম

শতাব্দী সংস্করণ

আচার্য্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. এল.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৫

মূল্য—ছয় টাকা

শতাব্দী সংস্করণের ভূমিকা

১৮৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে আচার্য্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম হয়। একশত বৎসর পরে এই দিনে বাঙলাদেশের নানাস্থানে ও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও তাঁহার স্মরণে জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমিতি আচার্য্য গুরুদাসের 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' গ্রন্থটির একটি শতাব্দী সংস্করণ প্রকাশ করা স্থির করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন।

'জ্ঞান ও কর্ম্ম' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। সে সংস্করণের গ্রন্থ এখন দুর্লভ। জনসাধারণ ইহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ বাঙলাসাহিত্যে 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' গ্রন্থটির একটি বিশেষ স্থান আছে। তত্ত্বপিপাসু দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়া জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিবার একটি সুসঙ্গত চেষ্টার পরিচয় আমরা ইহাতে পাই। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীই ইহার বিশেষত্ব।

আমাদের দেশে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে ও হয়; কিন্তু আলোচনার তুলনায় দার্শনিক গ্রন্থের সংখ্যা খুব কম। বোধ করি, বাঙালী দর্শনের তত ভক্ত নয় বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় 'জ্ঞান ও কর্ম্মে'র সহিত Locke-এর *Essay on Human Understanding*-এর তুলনা করিয়াছিলেন। পাঠক দেখিবেন সে তুলনা নিরর্থক নহে।

জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিয়া একটি জীবনদর্শন রচনা করা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস 'জ্ঞান ও কর্ম্মে'র আলোচনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেকে 'জ্ঞান ও কর্ম্মে'র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসু পাঠকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

অনিবার্য্য নানা কারণে গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে বহু বিলম্ব হইয়া গেল। তাহার জন্য সম্পাদক মার্জনা ভিক্ষা করিতেছেন। এই উপলক্ষে জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমিতির তরফ হইতে সম্পাদক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছেন। সেই উৎসব সমিতির দুই কর্ণধার, ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও গৌরীমোহন মিত্র উভয়েই আজ পরলোকে। আজ যখন তাঁহাদের বাঞ্ছিত আরব্ধ কর্ম্ম শেষ হইল তখন তাঁহাদের কথা মনে পড়িতেছে। 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহাদের আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে।

দিল্লী
২৩ জুলাই, ১৯৫৪

শ্রীঅনাথনাথ বসু
সম্পাদক

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মনে যে সকল কথার উদয় হইয়াছিল তাহার কতকগুলি কিঞ্চিৎ শ্রেণিবদ্ধ করিয়া এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম। তাহার অধিকাংশই পুরাতন কথা, তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটি নূতন কথা থাকিতে পারে, এবং কোন কোন স্থলে পুরাতন কথাও একটু নূতন আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পুরাতন কথা এই ভাবিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, তাহা জনসমাজে কথায় পরিগৃহীত হইলেও এখনও ততদূর কার্য্যে পরিণত হয় নাই, অতএব তাহার পুনরুক্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে।

এই গ্রন্থোক্ত অনেকগুলি কথা লইয়া মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু সে সকল কথা মানবজীবনের উদ্দেশ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ, ও তাহার তত্ত্বনির্ণয় অতীব বাঞ্ছনীয়। এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক তাহার আলোচনা হইলে সেই তত্ত্বনির্ণয়ের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়।

এ পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রতিপাদ্য বিষয়সকল প্রয়োজনীয় হইলেও প্রায়ই যেরূপ নীরস, তাহাতে গ্রন্থের ভাষা সরস হইলেই ভাল হইত। কিন্তু সরস হওয়া পরের কথা, সর্ব্বত্র সরল হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বাঙ্গালায় দর্শনবিজ্ঞান-বিষয়ক প্রচলিত পরিভাষার অভাবই সেই সন্দেহের কারণ। অথচ আবার যে সংস্কৃত ভাষা জগতে উচ্চ ও সূক্ষ্ম পরমার্থ চিন্তার অসামান্য সহায়তা করিয়াছে, তাহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা বঙ্গভাষা যে আমাদের কেবল নিশ্চিন্ত অবসরকালের কাব্যামোদদায়িনী নর্ম্মসখী হইবার যোগ্যা, কিন্তু গভীর চিন্তার সময়ে তত্ত্বনির্ণয়ে আনুকূল্যবিধায়িনী সঙ্গিনী হইবার অযোগ্যা, একথাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সেই বঙ্গভাষায় আমার বক্তব্য বিষয়গুলি বিশদভাবে ব্যক্ত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। সে যত্ন যদি কোথাও নিষ্ফল হইয়া থাকে তাহা আমার দোষে, বঙ্গভাষার দোষে নহে।

এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনে ভ্রমসংশোধনের, এবং ইহার স্থানে স্থানে ভাষার বিশদতা ও বিশুদ্ধতা সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, ও তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইতি।

নারিকেলডাঙ্গা,
১৭ই পৌষ, ১৩১৬ সাল

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে স্থানে স্থানে ভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইতি।

নারিকেলডাঙ্গা,
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত জীবনী

উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন মনীষী বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সাধনার দ্বারা ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, পুণ্যশ্লোক আচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহাদের অবদান বাঙালী চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। এই মহাপুরুষগণের মধ্যে আচার্য গুরুদাস একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষে যে নবজাগরণের (renaissance) সূত্রপাত হয়, প্রাচীন ও নবীন যুগের সেই সন্ধিক্ষণে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে একাধারে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বৈশিষ্ট্য মিলিত হইয়া এমন এক বিচিত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার তুলনা মেলা ভার। বস্তুতঃ এই মিলনই আচার্য গুরুদাসের চরিত্রে বিশেষত্ব দান করিয়াছিল।

আজি হইতে শতাধিক বৎসর পূর্বে ১৮৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার উপকণ্ঠে নারিকেলডাঙ্গায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে গুরুদাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচারপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার মাতা সোনামণি দেবী প্রাচীন অধ্যাপক বংশের কন্যা ছিলেন।

গুরুদাস শৈশবেই পিতৃহীন হন। তখন তাঁহার লালনপালন ও শিক্ষার ভার তাঁহার মাতাই গ্রহণ করেন। মাতার চরিত্রের প্রভাবে গুরুদাসের জীবন গড়িয়া ওঠে। গুরুদাস-জননীর চরিত্রে প্রাচীন সংস্কারের প্রতি নিষ্ঠা ও উদারতার মিলন ঘটিয়াছিল। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের কন্যা হইয়াও তিনি পুত্রকে নব্যশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি অপরিসীম স্নেহশীলা ছিলেন; কিন্তু সন্তানকে সংযম ও শাসনের ভিতর দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে ভোলেন নাই। গুরুদাসের চরিত্রে আমরা যে শুচিতা ও নিষ্ঠা, যে বিনয়-নম্র দৃঢ়তা দেখিতে পাই তাহা তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন।

গুরুদাস বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় দেন। বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সকল পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম হইয়াছিলেন। ১৮৬২ সালে এফ. এ., ১৮৬৪ সালে বি. এ., ১৮৬৫ সালে এম. এ. এবং ১৮৬৬ সালে আইন, এই সব কয়টি পরীক্ষাতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। গুরুদাস সারা জীবন ধরিয়া জ্ঞান-চর্চা করিয়া গিয়াছেন; এমন কি যখন তিনি হাইকোর্টে আইনের ব্যবসায়ে খুব ব্যস্ত আছেন তখনও তাঁহার জ্ঞান-চর্চা ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারই অবসরে তিনি ডি. এল. পরীক্ষা দিয়াছেন।

তাঁহার ছাত্রজীবন শেষ হইতে না হইতেই কর্মজীবন আরম্ভ হয়। বি. এ. পাশ করার পর এম. এ. পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে অঙ্ক-শাস্ত্র ও ইংরেজির

অধ্যাপনা করেন। আইন পাশ করার পর ১৮৬৬ সালে তিনি বহরমপুরে অধ্যাপনার কাজ লইয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দেন। ওকালতিতে অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর যশ হইল এবং অর্থও প্রচুর আসিতে লাগিল। তাহা সত্বেও মাতার আদেশে ১৮৭২ সালে তাঁহাকে বহরমপুর ছাড়িয়া পৈত্রিক বাসভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে ভাগ্যান্বেষণে রত হইতে হইল। সেখানে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেন এবং তাঁহার যথেষ্ট আয় হইতে লাগিল।

১৮৭৮ সালে গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ঠাকুর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং বিবাহ ও স্ত্রীধন বিষয়ে হিন্দু আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ১৮৭৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। গুরুদাস কিছুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভারও সভ্য ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভাতে তাঁহার চেষ্টাতেই কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

১৮৮৮ সালে গুরুদাস হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। ন্যায়নিষ্ঠ এবং নির্ভীক বিচারপতি হিসাবে তিনি সর্বলোকের নিকট আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। পনের বৎসর জজিয়তির পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাহার কারণ স্বাস্থ্য বা অন্য কিছু নহে, তাঁহার মনে হইয়াছিল তিনি ত অনেক দিন এইসব করিলেন, এখন অন্যে আসিয়া এই পদ গ্রহণ করুক।

১৮৯০ সালে গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন। ইহার পূর্বে কোন ভারতবাসীই এই পদ পান নাই। পরপর দুই বার তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন এবং তিন বৎসর বিশেষ খ্যাতির সহিত এই গুরুভার দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার বিশেষ আদর ছিল না; গুরুদাসের চেষ্টায় সেখানে বাংলাভাষার প্রতি আদর ও সম্মান-প্রদর্শনের সূত্রপাত হয়। তিনি যে বীজ বপন করিয়া যান, স্যর আশুতোষের সযত্ন জলসেচনে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া এক বিরাট্ মহীরুহে পরিণত হইয়া গুরুদাস ও আশুতোষের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

জ্ঞানতপস্বী গুরুদাস আজীবন দেশের সকল প্রকার শিক্ষা-প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার যোগের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৯০৬ সালে যখন জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন হইল তখনও তাঁহাকে এই আন্দোলনের পুরোভাগে আমরা দেখিতে পাই। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ-প্রতিষ্ঠায় গুরুদাসের কৃতিত্ব কম নহে। গুরুদাস এই প্রতিষ্ঠানটিকে বড় ভালবাসিতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, বিজ্ঞানসভা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

এইরূপ নানা কর্মের মধ্যেও গুরুদাস সাহিত্য-সাধনা এবং গ্রন্থ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থটিতে আমরা গুরুদাসের জীবন-দর্শনের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই।

১৯১৮ সালে ২রা ডিসেম্বর ৭৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় গঙ্গাতীরে গুরুদাসের মৃত্যু হয়।

১৯৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী বাংলাদেশের নানাস্থানে ও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও আচার্য গুরুদাসের জন্মদিনের স্মরণে মহাসমারোহে গুরুদাস-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে কলিকাতায় সভা, কীর্তনাদি ব্যতীত একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। বঙ্গবাসী সাগ্রহে এই উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আচার্য গুরুদাসের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

গুরুদাসের জীবনের সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসু পাঠক আচার্য গুরুদাসের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা গুরুদাস-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *Sir Gooroodass Centenary Commemoration* নামক গ্রন্থে পাইবেন। কিন্তু শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি কর্মচেষ্টার মধ্যেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে না। গুরুদাস ছিলেন যুগমানব; তাঁহার জীবনে প্রাচীন ও নবীনের যে সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহার ভিত্তি ছিল এই দেশেরই প্রাচীন সংস্কৃতি। আগামী কালে নূতন ও পুরাতনের মিলন যে একভাবে কল্যাণপথে হইতে পারিত, তাহার ইঙ্গিত তাঁহার জীবনে আমরা পাইয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের এই শিক্ষা জাতি হিসাবে আমরা গ্রহণ করিব কি না তাহা আজিকার এই যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম ভাগ

জ্ঞান

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞাতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞেয়

তৃতীয় অধ্যায়

অন্তর্জগৎ

বিষয় | পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

বহির্জগৎ

পঞ্চম অধ্যায়

জ্ঞানের সীমা

বিষয় পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞানলাভের উপায়

বিষয় পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় ভাগ

কর্ম্ম

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়

কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না—কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্ত্তব্যতার লক্ষণ

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম

২। পুত্রকন্যার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম

সপ্তম অধ্যায়

কর্ম্মের উদ্দেশ্য

জ্ঞান ও কর্ম্ম

ভূমিকা

সকল বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা, এবং নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা, মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আমরা বাহিরে যে বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাই ও অন্তরে যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাব অনুভব করি, তদ্দ্বারা সেই তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা নিরন্তর উত্তেজিত হইতেছে। এবং আমাদের অভাব ও অপূর্ণতা এত অধিক যে, সেই উন্নতির চেষ্টা হইতে আমরা ক্ষণমাত্রও ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আপন আপন মনকে জিজ্ঞাসা করিলে, এবং পরস্পরের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেই, এ কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও উন্নতিকামনা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা আমাদিগকে জ্ঞানার্জ্জনে প্রণোদিত করে, এবং উন্নতির চেষ্টা আমাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করে। জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্মানুষ্ঠানই মানবজীবনের প্রধান কার্য্য।

জ্ঞানার্জ্জন ও কর্ম্মানুষ্ঠান মানব জীবনের প্রধান কার্য্য।

জ্ঞান ও কর্ম্ম অসম্বদ্ধ নহে, ইহারা পরস্পরাপেক্ষী। অধিকাংশস্থলেই, জ্ঞানার্জ্জনজন্য নানাবিধ কর্ম্মের প্রয়োজন, এবং কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য নানাবিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক। তবে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের হ্রাস হয় এ কথা এই অর্থে সত্য যে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে অনেক কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হয়, ও অনেক কর্ম্ম সহজে সম্পন্ন হয়।

জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরাপেক্ষী।

জ্ঞানের লক্ষ্য তত্ত্ব বা সত্য। কর্ম্মের লক্ষ্য ন্যায় বা নীতি। যে স্থলে যাহার উপলব্ধি হওয়া উচিত তাহা না হইয়া আমাদের অনেক সময়ে রজ্জুতে সর্পদর্শনবৎ ভ্রম হয়। সেই ভ্রম নিরাকরণপূর্ব্বক সত্যের উপলব্ধি জ্ঞানের লক্ষ্য। এবং যে স্থলে যে কর্ম্ম করা উচিত তাহা না করিয়া আমরা অনেক সময়ে বর্ত্তমান ক্ষণিক দুঃখ এড়াইবার ও ক্ষণিক সুখ পাইবার জন্য ভাবী স্থায়ী মঙ্গলকর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অমঙ্গলকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। সেই অন্যায় প্রবৃত্তি দমনপূর্ব্বক সুনীতি অবলম্বনে অভ্যাস কর্ম্মের লক্ষ্য। এই স্থানে ইহাও বলা উচিত যে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই চরম লক্ষ্য পরমার্থ লাভ।

জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য, কর্ম্মের লক্ষ্য নীতি।

জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। সেই আলোচনার বিষয়গুলি কি কি তাহা এস্থলে বলা কর্ত্তব্য। জ্ঞানের সম্পূর্ণ আলোচনা করিতে গেলে, বিশ্বের সমস্ত বিষয়ের ও মানবপ্রণীত সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়। সেই বৃহৎ দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ আমার অভিপ্রেত

জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়।

নহে, সাধ্যও নহে। তবে জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, অন্তর্জ্জগৎ, বহির্জ্জগৎ, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানলাভের উপায়, ও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য, এই কয়েকটি বিষয়ের কিছু কিছু বলা আবশ্যক। অতএব এই গ্রন্থের প্রথমভাগে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে—

১। জ্ঞাতা,
২। জ্ঞেয়,
৩। অন্তর্জ্জগৎ,
৪। বহির্জ্জগৎ,
৫। জ্ঞানের সীমা,
৬। জ্ঞানলাভের উপায়,
৭। জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য,

এই সাতটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত অবস্থাভেদে ও স্থলভেদে মনুষ্যের নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম অসংখ্যপ্রকার। তৎসমুদয়ের আলোচনা এ গ্রন্থে অসম্ভব ও অসাধ্য। তবে কর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না—কার্য্যকারণসম্বন্ধ কিরূপ, কর্ত্তব্যতার লক্ষণ, পারিবারিকনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, সামাজিকনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, ও কর্ম্মের উদ্দেশ্য, এই কয়েকটি বিষয়-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন। অতএব এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে—

১। কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না—কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ,
২। কর্ত্তব্যতার লক্ষণ,
৩। পারিবারিকনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম,
৪। সামাজিকনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম,
৫। রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম,
৬। ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম,
৭। কর্ম্মের উদ্দেশ্য,

এই সাতটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা হইবে।

আলোচনার প্রণালী

এক্ষণে আলোচনার প্রণালীসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

যুক্তিমূলক, শাস্ত্রমূলক, বা উভয়মূলক, হইতে পারে। তন্মধ্যে যুক্তিমূলক প্রণালীই এস্থলে উপযোগী।

এই গ্রন্থের বিষয়সকলের আলোচনা যুক্তিমূলক, শাস্ত্রমূলক বা যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয়মূলক, এই ত্রিবিধ প্রণালীতে হইতে পারে। তন্মধ্যে যুক্তিমূলক আলোচনাই এ স্থলে বিশেষ উপযোগী। কারণ, প্রথমতঃ, কোন কথা স্বীকার করিতে হইলে লোকে যুক্তি দ্বারা তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করে, এবং যতক্ষণ তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হয় ততক্ষণ তৎসম্বন্ধে সন্দেহ দূর হয় না। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে গেলেও, যখন শাস্ত্র

নানাবিধ, এবং অনেক বিষয়ে নানা শাস্ত্রের ও নানা মুনির নানা মত, তখন কোন্ শাস্ত্রের ও কোন্ মুনির মত অবলম্বনীয় তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত যুক্তিই একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রমূলক আলোচনাতেও যুক্তির সাহায্য গ্রহণ ও বিরুদ্ধ যুক্তি খণ্ডন করা প্রয়োজন। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থল। এবং তৃতীয়তঃ, যদিও কোন্ শাস্ত্র অবলম্বনীয় তাহা যুক্তিদ্বারা স্থির করিয়া সেই শাস্ত্রানুসারে আলোচনা চলিতে পারে, এবং ঐ আলোচনা যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়মূলক বলা যাইতে পারে, কিন্তু কোন্ শাস্ত্র কোন্ স্থলে প্রকৃত পক্ষে অবলম্বনীয় এ সম্বন্ধে এতই মতভেদ যে এই গ্রন্থে যুক্তিমূলক আলোচনাই শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হয়। তবে স্থল-বিশেষে যুক্তির পোষকতায় শাস্ত্রের বা সুধীগণের মতের উপর নির্ভর করা যাইবে। যথা, যে স্থলে কোন কথা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির নিকট কিরূপ প্রতীয়মান হইয়াছে ইহাই আলোচ্য বিষয়, সেরূপ স্থলে শাস্ত্রের বা সুধীগণের মত অবশ্য নির্ভরযোগ্য।

যাঁহারা কোন শাস্ত্র ঈশ্বরের বা ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তির উক্তি, সুতরাং অভ্রান্ত, বলিয়া মানেন, তাঁহারা সেই শাস্ত্র যুক্তি অপেক্ষা অবশ্যই বড় বলিবেন, এবং কোন যুক্তি সেই শাস্ত্রের সহিত সঙ্গত না হইলে সে যুক্তি ভ্রান্ত বলিবেন। ইহা যুক্তিমূলক আলোচনার একটি অনিবার্য্য অসুবিধা বটে। কিন্তু যাঁহারা কোন শাস্ত্রই অভ্রান্ত মনে করেন না, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রমূলক আলোচনারও ঐরূপ অসুবিধা। এবং যখন শেষোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বর্ত্তমান কালে সম্ভবতঃ অধিক, তখন যুক্তিমূলক আলোচনাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে উপযোগী। বিশেষতঃ যুক্তিমূলক আলোচনার দোষগুণবিচার সকলেই অসঙ্কুচিতভাবে করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রমূলক আলোচনার দোষগুণবিচার সে ভাবে করা চলে না, ইহাও যুক্তিমূলক আলোচনার পক্ষে একটি অনুকূল তর্ক।

যুক্তিমূলক আলোচনায় অনেক স্থলে উপমা উদাহরণাদি দ্বারা আলোচ্য বিষয় বিবৃত করিতে হয়। কিন্তু উপমা উদাহরণাদি প্রায়ই বহির্জ্জগতের বিষয় হইতে সংগৃহীত। সুতরাং অন্তর্জ্জগতের বিষয়ে তাহার প্রয়োগ উচিত কি না এ সন্দেহ অবশ্যই হইতে পারে, এবং ঐরূপ স্থলে তাহার প্রয়োগ অতি সতর্কতার সহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

আলোচনা সংক্ষেপে হইবে।

আলোচনার প্রণালীসম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। এই গ্রন্থে যাহা কিছু আলোচিত হইবে তাহা যথাসাধ্য সংক্ষেপে বিবৃত হইবে। যদিও কোন কোন স্থলে একটু বাহুল্য বলিলে বিশদরূপে বলা হয়, কিন্তু লোকের সময় এত অল্প যে অধিক কথা পড়িবার কি শুনিবার অবকাশ অনেকেরই থাকে না। এবং বাগাড়ম্বরও অনেক স্থলে বিড়ম্বনামাত্র বলিয়া বোধ হয়। বরং স্বল্প কথায় যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে লোকের প্রবৃত্তি

হইতে পারে, এবং তাহাতে বাগ্‌জালজড়িত জটিলতার ও শব্দঘটিত ভ্রমের সম্ভাবনা অল্প।

আলোচনার ভাষা।

আলোচনার ভাষাসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই ভূমিকা শেষ করা যাইবে।

যখন ভাষার উদ্দেশ্য বক্তব্য বিষয় বিশদরূপে ব্যক্ত করা, তখন যেরূপ ভাষায় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সহজে ও শীঘ্র পাঠকের বোধগম্য হয় সেইরূপ ভাষাতেই গ্রন্থ লিখিত হওয়া উচিত। গ্রন্থের ভাষাসম্বন্ধে ইহাই সাধারণ ও স্থূল নিয়ম। কিন্তু সহজে অর্থাৎ অনায়াসে বোধগম্য হওয়া, এবং শীঘ্র অর্থাৎ অল্প সময়ে বোধগম্য হওয়া, এই দুইটি অনেক স্থলে ভাষার পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণ। কারণ, সহজে বোধগম্য করিতে হইলে আলোচ্য বিষয় বাহুল্যে বিবৃত করিতে হয় ও তাহা পাঠ করিতে বিলম্ব হয়, এবং শীঘ্র বোধগম্য করিতে হইলে আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে হয় ও তাহা সহজে বুঝা যায় না। এই উভয় গুণের সামঞ্জস্যসাধন ও নানার্থবোধক শব্দের অর্থসম্বন্ধে সংশয়নিরাকরণ-জন্য দর্শনবিজ্ঞানাদিবিষয়ক গ্রন্থে পরিভাষার প্রয়োজন। আলোচ্যবিষয়-বোধক কতকগুলি শব্দ যাহা গ্রন্থে বারংবার প্রয়োগ করা আবশ্যক, তাহা কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইবে প্রথমে একবার বলিয়া দিয়া, পরে বিনা ব্যাখ্যায় যতবার ইচ্ছা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এবং তদ্দ্বারা গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত অথচ সহজে বোধগম্য হয়, ও অর্থসম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না।

পরিভাষাসম্বন্ধে স্মরণীয় কথা।

পরিভাষা প্রয়োগবিষয়ে কয়েকটি কথা মনে রাখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, পরিভাষাপ্রয়োগ যত অল্প হয় ততই ভাল। কারণ, যদিও পারিভাষিক শব্দের অর্থসম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না, এবং তাহার প্রয়োগদ্বারা গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হয়, তথাপি যখন শব্দের পারিভাষিক অর্থে ও সামান্য অর্থে কিঞ্চিৎ ইতরবিশেষ থাকে, ও সেই ইতরবিশেষ মনে রাখা আয়াসসাধ্য, তখন অতিরিক্ত পরিভাষাপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্যই কষ্টকর হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিভাষা এরূপ হওয়া উচিত যে কোন শব্দের পারিভাষিক অর্থ তাহার সামান্য অর্থ হইতে নিতান্ত বিভিন্ন না হয়। কারণ যদিও পারিভাষিক অর্থ একবার বলিয়া দিলে তৎসম্বন্ধে সংশয় না থাকিতে পারে, তথাপি যখন প্রত্যেক শব্দ পঠিত বা উচ্চারিত হইবামাত্র তাহার সামান্য অর্থই প্রথমে মনে উদিত হওয়া সম্ভাবনীয়, তখন সেই অর্থ তাহার পারিভাষিক অর্থ হইতে নিতান্ত বিভিন্ন হইলে, প্রথমে মনে উদিত অর্থ হইতে শেষোক্ত অর্থ সহজে আইসে না, বরং প্রথমে উদিত অর্থকে একেবারে অপসারিত করিয়া তবে পারিভাষিক অর্থ মনে স্থান পায়। তাহাতে সময় ও আয়াস লাগে, এবং প্রকৃত অর্থবোধ সুখসাধ্য হয় না।

তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষায় যে অর্থে ব্যবহৃত তাহা হইতে ভিন্ন অর্থে বঙ্গভাষায় সেই শব্দ ব্যবহৃত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে, এবং তাহা হইলে অনেক অসুবিধা

ঘটে। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথাটি পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। 'বিজ্ঞান' শব্দ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞান বুঝায়, কিন্তু বাঙ্গালায় বিশেষ জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্র এই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে 'মনোবিজ্ঞান' শব্দ বাঙ্গালায় মনস্তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র বুঝায়, এবং সেই নিয়মে 'আত্মবিজ্ঞান' আত্ম-তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র বুঝাইবে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় 'আত্মবিজ্ঞান'-শব্দ ভিন্ন অর্থ-বোধক। বেদান্তদর্শনে শঙ্করভাষ্যের প্রারম্ভ দ্রষ্টব্য। তবে যেখানে কোন সংস্কৃত শব্দ বঙ্গভাষায় সংস্কৃত অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, সেখানে সে শব্দ পরিত্যাগ করা বা সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে।

প্রথম ভাগ

জ্ঞান

উপক্রমণিকা

'জ্ঞান' শব্দ জ্ঞাত হওয়ার অবস্থা ও জ্ঞাত হইবার শক্তি এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা, আমি জানিতেছি আমি চিন্তিত, এস্থলে এই জানার অবস্থাকে জ্ঞান বলা যায়, এবং যে শক্তিদ্বারা তাহা জানিতেছি সেই শক্তিকেও জ্ঞান বলা যায়। জ্ঞান শব্দের এই দুইটি অর্থ বিভিন্ন কিন্তু সংস্পৃষ্ট। আমার জানার অবস্থা আমার জানিবার শক্তির ক্রিয়ার ফল মাত্র। জানিবার শক্তিকে বুদ্ধিও বলা যায়।

'জ্ঞান' জানার অবস্থা ও জানিবার শক্তি উভয় অর্থ বোধক।

জ্ঞান কি তাহা বলিতে গেলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই উভয়েরই কথা আইসে, কারণ এই উভয়ের মিলনই জ্ঞান।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের মিলনই জ্ঞান। এই কথার ও এইরূপ অনেক কথার প্রমাণ কেবল অন্তর্দৃষ্টি।

এই কথার এবং জ্ঞানসম্বন্ধীয় আর আর অনেক কথার প্রমাণ কেবল অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা ও অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসাদ্বারাই পাওয়া যায়।

অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা জানিতেছি আমার কর্ণকুহরে একটি শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। এই জ্ঞানের জ্ঞাতা আমি, জ্ঞেয় কর্ণকুহরে ধ্বনিত শব্দ, ও আমি ও সেই ধ্বনিত শব্দের মিলনই তৎশব্দের জ্ঞান। এবং আমি যদি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক থাকি, অর্থাৎ আমাতে ও সেই শব্দেতে মিলন না হয়, তাহা হইলে আমার সেই শব্দ-জ্ঞান হয় না।

আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা চেতন জীব। অচেতনের জ্ঞান হইতে পারে কি না আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার "চেতন ও অচেতনের উত্তর"[১] নামক গ্রন্থে যে সকল আশ্চর্য্য তত্ত্বের কথা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে আমরা যাহাকে অচেতন বলি তাহা একেবারে অচেতন নহে।

জ্ঞেয় জ্ঞাতার অন্তর্জগতের বা বহির্জগতের বিষয়। অতএব জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের আলোচনার পরেই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। তদনন্তর সেই অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের বিষয় কতদূর ও কি উপায়ে জানা যাইতে পারে, এবং জানিলেই বা ফল কি, অর্থাৎ জ্ঞানের সীমা কতদূর, জ্ঞান-

এ গ্রন্থের প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয়।

---

১ *Response in the Living and Non-Living.*

লাভের উপায় কি, ও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য কি, এই সকল কথারও কিঞ্চিৎ আলোচনা এই গ্রন্থের প্রথমভাগে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অতএব উক্ত সাতটি বিষয় ভূমিকায় প্রদর্শিত পরম্পরাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে বিবৃত করা যাইবে।

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞাতা

যে জানিতেছে সেই জ্ঞাতা। আমি ও আমার ন্যায় জীব জ্ঞাতা।

যে জানিতেছে অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হইতেছে সেই জ্ঞাতা।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমি আপনাকেই জ্ঞাতা বলিয়া জানিতেছি, এবং পরোক্ষে আমার ন্যায় অন্য জীবকেও জ্ঞাতা বলিয়া অনুমান করি।

আমি যে নিজ জ্ঞানের জ্ঞাতা ইহা অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা দেখিতেছি। এবং যখন দেখিতেছি বহির্জগতের কোন বিষয় দেখিয়া আমি যেরূপ কার্য্য করি, আমার ন্যায় অন্য জীবগণও ঠিক সেইরূপ কার্য্য করে, অর্থাৎ আমি যেমন কোন ভয়ানক বস্তু দেখিলে তাহা পরিত্যাগ করি, ও কোন প্রীতিকর বস্তু দেখিলে যেমন তাহার নিকটে আকৃষ্ট হই, আমার ন্যায় অন্যান্য জীবও তত্তদ্রূপ বস্তু দেখিলে ঠিক সেইরূপ আচরণ করে, তখন সঙ্গতরূপে অনুমান করিতে পারি যে, ঐ ঐ বস্তু দৃষ্টে আমার যেরূপ জ্ঞান জন্মে, আমার তুল্য অপর জীবগণেরও সেইরূপ জ্ঞান জন্মে, এবং আমি যেমন আমার জ্ঞানের জ্ঞাতা, তাহারাও সেইরূপ তাহাদের জ্ঞানের জ্ঞাতা।

আমি কে, কিরূপ? অন্যান্য জীবই বা কে, কিরূপ?

এক্ষণে দুইটি প্রশ্ন উঠিতেছে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি? এবং আমার ন্যায় অন্যান্য জীবই বা কে ও তাহাদের স্বরূপ কি?

এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর প্রথমোক্ত প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করিতেছে, কারণ আমি যেরূপ, অপর জ্ঞাতারাও সম্ভবতঃ সেইরূপ। অতএব প্রথমোক্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি, তাহারই অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট হইবে।

প্রথমোক্ত প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক।

'আমি কে, আমার স্বরূপ কি?' এই প্রশ্ন আপাততঃ অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কেন-না আমি আমাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানি, আত্মজ্ঞান অন্য-প্রমাণসাপেক্ষ নহে। আমি কে, আমার স্বরূপ কি, এ বিষয়ের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, কোন প্রমাণদ্বারা উপলভ্য নহে।

সত্য বটে আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "আত্মাই প্রমাণাদি ব্যবহারের আশ্রয়, সুতরাং আত্মা প্রমাণাদি ব্যবহারের পূর্ব্বেই সিদ্ধ।"[১] এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডেকার্টও বলিয়াছেন, "আমি ভাবিতেছি অতএব আমি আছি"[২] অর্থাৎ আমার প্রমাণ আমি। কিন্তু এ সকল কথা সত্য হইলেও 'আমি কে, আমার স্বরূপ কি?' এ প্রশ্ন অনাবশ্যক নহে। কারণ, যদিও আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ এবং

---

১ "आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयत्वात् प्रागेव प्रमाणादिव्यवहारात् सिध्यति ।"
২ অধ্যায় ৩ পাদ ৭ সূত্রের ভাষ্য।

২ *"Cogito ergo sum."*

উক্ত প্রশ্নের উত্তর বাহিরের কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই প্রাপ্য, তথাপি সেই অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞানচর্চায় অভ্যস্ত না হইলে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, ইহার বিশেষ তত্ত্ব উপলব্ধি হয় না, ও সেইজন্য আত্মার স্বরূপনির্ণয়ে লোকের এত মতভেদ। কেহ বলেন, আমার সচেতন দেহই আমি ও আমার স্বরূপ। কেহ বলেন, আমার আত্মাই আমি ও সেই আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, এবং দেহ আমার বন্ধন ও পিঞ্জর মাত্র। আবার যাঁহারা আত্মাকেই আমি অর্থাৎ জ্ঞাতা বলেন, তাঁহারাও একমত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন, আত্মাসকল পরস্পর পৃথক্, ও আর এক সম্প্রদায় বলেন, এই ভেদজ্ঞান বা অহংজ্ঞান অধ্যাস, অবিদ্যা, বা ভ্রমমূলক, ও প্রকৃতার্থে আত্মা ও ব্রহ্ম একই। আত্মজ্ঞানবিষয়ে এইরূপ নানা মতভেদই 'আমি কে, আমার স্বরূপ কি ?' এই প্রশ্নের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে যখন এতই মতভেদ তখন আমি কে, আমার স্বরূপ কি, ইহা অজ্ঞেয়, এবং ইহা জানিবার নিমিত্ত সময় নষ্ট না করিয়া, সহজে জ্ঞেয় যে সকল বিষয় আছে তাহা জানিবার নিমিত্ত সময় ব্যয় করিলে উপকার হয়। কিন্তু এ কথা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আমি অর্থাৎ জ্ঞাতা কে ও তাহার স্বরূপ কি, ইহা না জানিয়া ও জানিবার চেষ্টা না করিয়া, জ্ঞানের ও জ্ঞেয় পদার্থের আলোচনা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। জ্ঞান জ্ঞাতার অবস্থান্তর। জ্ঞাতার স্বরূপ অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে জানা না থাকিলে, তল্লব্ধ জ্ঞান ও তৎকর্ত্তৃক জ্ঞেয় পদার্থের আলোচনা যে ভ্রান্ত ও বৃথা নহে এ কথা কে বলিতে পারে ? আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের দোষবশতঃ আমি যদি বস্তুর প্রকৃত বর্ণ বা আকার দেখিতে না পাই তাহা হইলে আমার চক্ষু-দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ভ্রান্ত, ও তাহা বিনা সংশোধনে গ্রহণযোগ্য নহে। অতএব জ্ঞাতার স্বরূপনির্ণয় যথাসাধ্য আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ততঃ যতক্ষণ না ইহা স্থির হয় যে, জ্ঞাতার পক্ষে যদিও অন্য বিষয় জ্ঞেয়, তাহার আত্মস্বরূপ অজ্ঞেয়, ততক্ষণ আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা হইতে কখনই বিরত থাকা যায় না। জ্ঞাতাই যে আপনার প্রথম ও প্রধান জ্ঞেয় কেহই সহজে এ কথা অস্বীকার করিতে পারে না।

বহির্জগতের বৈচিত্র্য আমাদের চিত্তকে এতই আকর্ষণ করে, ও বহির্জগতের পদার্থের উপর আমাদের দৈহিক সুখ এতই নির্ভর করে যে, বাহ্য জগৎ লইয়াই আমাদের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের অস্থায়িত্ব ও সেই সুখের অনিত্যতা যখন যখন মনে পড়িয়াছে তখনই মানব আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে। আমাদের উপনিষদাদি শাস্ত্রে এই ব্যাকুলতার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুর উপাখ্যান[১] ও নারদসনৎকুমার-সংবাদ[২] এবং বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান[৩] দ্রষ্টব্য।

---

[১] ছান্দোগ্য, ৬ষ্ঠ অধ্যায়। [২] ছান্দোগ্য, ৭ম অধ্যায়। [৩] বৃহদারণ্যক, ২য় অধ্যায়।

গ্রীস দেশের সুধীগণও আত্মার স্বরূপনির্ণয়ের নিমিত্ত বিশেষ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। প্লেটোর "ফিডো" নামক গ্রন্থ এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর অগ্রে আপনাকে জিজ্ঞাস্য, পরে অন্যের দ্বারা পরীক্ষণীয়।

জ্ঞাতা অর্থাৎ আমি কে, ও জ্ঞাতার অর্থাৎ আমার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর অগ্রে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য, আর যে উত্তর পাওয়া যায় তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষার নিমিত্ত পরে যুক্তির সহিত, এবং আমি ভিন্ন অন্যের বাক্য ও কার্য্যের সহিত, তাহা মিলাইয়া লওয়া আবশ্যক।

এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে এস্থলে আনুষঙ্গিকরূপে দুই একটি কথা বলা কর্তব্য। সকল জ্ঞানই যখন আত্মাতে অবভাসিত হয়, এবং আত্মাই যখন সকল জ্ঞানের সাক্ষী, তখন অন্তর্দ্দৃষ্টিদ্বারা আত্মাতে যাহা দেখিতে পাই তাহার আর পরীক্ষা কি, এবং আত্মা যে সাক্ষ্য প্রদান করে তৎপ্রতি সন্দেহ করিতে গেলে সন্দেহের প্রতিও সন্দেহ হয়, এ আপত্তি সহজেই উঠিতে পারে। কিন্তু ইহার খণ্ডনও সহজ। অশিক্ষিত চক্ষু যেমন বহির্জগতের বস্তুর আকার প্রকার সর্ব্বত্র ঠিক দেখিতে পায় না, অনভ্যস্ত অন্তর্দ্দৃষ্টিও তেমনই আত্মাতে অবভাসিত জ্ঞানের যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারে না। এবং বহির্জগতের সাক্ষী যেমন মিথ্যাবাদী না হইলেও ভ্রমবশতঃ অযথা কথা বলিতে পারে, আত্মাও সেইরূপ অন্তর্জগতের বিষয়সম্বন্ধে একমাত্র বিশ্বস্ত সাক্ষী হইলেও অনবধানতাবশতঃ অযথা সাক্ষ্য দিতে পারে। অতএব আত্মার উত্তরের যাথার্থ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক।

উক্ত প্রশ্নের প্রতি আত্মার উত্তর, আমি দেহ নহে, দেহী।

এক্ষণে দেখা যাউক, আমি কে? আত্মা এই প্রশ্নের কি উত্তর দেয়। প্রথমতঃ বোধ হইবে আত্মা বলিতেছে, এই সচেতন দেহই আমি। কিন্তু একটু ভবিয়া দেখিলেই এ উত্তর ঠিক কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিবে, কারণ আত্মাই পরক্ষণে বলিতেছে, এ দেহ আমার, সুতরাং আমি এ দেহ নহে কিন্তু এ দেহের অধিকারী। অন্তর্দ্দৃষ্টিদ্বারা আরও দেখিতে পাই, আত্মা দেহকে শাসন করিবার চেষ্টা করে, সুতরাং এ দেহ আত্মা অর্থাৎ আমি ভিন্ন অন্য পদার্থ, এবং যদিও আত্মার বাহ্য জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ দেহের উপর নির্ভর করে, ও বাহ্য-জগৎবিষয়ক সমস্ত জ্ঞান দেহের সাহায্যেই পাওয়া যায়, এবং চিন্তার কার্য্যেও দেহের অবস্থান্তর ঘটে, ও দেহের অবস্থান্তর ঘটিলে চিন্তা-কার্য্যের ব্যতিক্রম হয়, তথাপি আত্মার অস্তিত্বের জন্য দেহের সহিত সংযোগ প্রয়োজন নাই।

এ উত্তরের সত্যতাসম্বন্ধে সংশয়।

আত্মার এই উক্তি প্রকৃত কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক, কারণ ইহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অনেকে বলিতে পারেন যে, স্পন্দনাদি বাহ্যক্রিয়া যেমন জীবিত দেহের লক্ষণ, চিন্তনাদি আন্তরিক ক্রিয়াও তেমনই জীবিত দেহের লক্ষণ, ও তাহার প্রমাণ এই যে, বিবেক প্রভৃতি যে শক্তিগুলিকে আত্মার চৈতন্যময় শক্তি বলা যায়, তাহাদেরও দেহের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ বিকাশ, ও দেহের ক্ষয়ের সহিত ক্রমশঃ হ্রাস হয়। আর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের দিকে মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলেও এই কথা প্রতীয়মান হয়, কারণ আমরা দেখিতে পাই, যে জাতীয় জীবের দেহ

অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় যে-পরিমাণে বিকাশ-প্রাপ্ত, সেই জাতীয় জীবের চৈতন্যও সেই পরিমাণে বিকশিত। এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহা বলা যাইতে পারে, দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব আত্মা ও আত্মজ্ঞান এই জীবিত দেহের লক্ষণ মাত্র।

সেই সংশয়ের নিরাস।

এই সংশয় ছেদ করা নিতান্ত অনায়াসসাধ্য নহে। ইহার নিরাসার্থে যে সকল যুক্তি ও তর্ক আছে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

স্পন্দনাদি যে সকল ক্রিয়া বা গুণ সজীব দেহের আছে তাহা সজীব জড়ের লক্ষণ। তাহা চিন্তনাদি ক্রিয়া বা গুণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। স্পন্দনাদি ক্রিয়ায় স্পন্দিতের আত্মজ্ঞান থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। চিন্তনাদিবিষয়ে চিন্তিতের নিশ্চিতই আত্মজ্ঞান আছে। সুতরাং জড়ের সংযোগ বা অবস্থান্তর দ্বারা আত্মজ্ঞানপ্রভৃতি চৈতন্যময় গুণের বা ক্রিয়ার উদ্ভাবন হওয়া অনুমান করিতে পারা যায় না। অদ্বৈতবাদী হইতে গেলে, জড়শব্দের সাধারণতঃ যে অর্থে প্রয়োগ হয়, সে অর্থে জড়বাদী হওয়া চলে না, অর্থাৎ এক মূল কারণ হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি মানিতে হইলে, সেই একক জড় বলিয়া মানা যায় না। যদি বলা যায় জড়ে চৈতন্য অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টির আদিকারণ আর কেবল জড় হইল না, তাহা চৈতন্যময় জড় বলিয়া মানিতে হইল। যুক্তিদ্বারা অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে চৈতন্যময় ব্রহ্মই জগৎ, এই বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদই গ্রহণযোগ্য। সমগ্র জগৎ এক আদিকারণসম্ভূত বলিয়া মানিতে হইলে, সেই মূলকারণ অবশ্যই চৈতন্যময় বলিতে হইবে, কেন-না মূলকারণে চৈতন্য না থাকিলে জগতে চৈতন্য কোথা হইতে আসিবে, যুক্তি এই কথা বলে। এবং যাহাকে আমরা জড়পদার্থ মনে করি, তাহা শক্তির কেন্দ্রসমষ্টি, বিজ্ঞান এই কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এতদ্ব্যতীত জড়ের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞাতার জ্ঞান। এতদ্দ্বারা এমত বলিতেছি না যে, জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে জড়ের অস্তিত্ব নাই। তবে এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, জড় ও চৈতন্যের সম্বন্ধ যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি এই সিদ্ধান্ত অপেক্ষা চৈতন্য হইতে জড়ের সৃষ্টি এ অনুমান অধিকতর সঙ্গত।

দেহের বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় যে বলা হইয়াছে, সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে, কিয়দ্দূর মাত্র সত্য। দেহের পূর্ণবিকাশের সঙ্গে বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ সর্ব্বত্র দেখা যায় না, আবার দেহের অপূর্ণতা বা হ্রাস সত্ত্বেও অনেক স্থলে বুদ্ধির কোন অংশে অভাব লক্ষিত হয় না, এবং কোন স্থলেই অহংজ্ঞানের অণুমাত্র অভাব ঘটে না। তবে দেহের অপূর্ণতা বা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব সর্ব্বত্র ঘটে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে দেহই সেই জ্ঞানলাভের উপায়।

ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের চৈতন্যের তারতম্য যে তাহাদের মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তাহারও কারণ এই যে,

তাহাদের চৈতন্যের পরিচয় কেবল তাহাদের বাহ্যজগতের কার্য্য দ্বারা পাওয়া যায়, এবং সেই সকল কার্য্য তাহাদের বহির্জ্জগৎবিষয়ক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা অবশ্যই সীমাবদ্ধ।

দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব যে বলা হইয়াছে সে কথা অনেক দূর সত্য, তবে তদ্বিরুদ্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, নিদ্রিত অবস্থায় দেহ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও আত্মা বিলুপ্ত হয় না।

এইস্থলে আর একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। দেহ ও দেহের সমস্ত শক্তি সীমাবদ্ধ ও অন্তবিশিষ্ট, কিন্তু আত্মা সীমাবদ্ধ হইতে চাহে না। আত্মা চিন্তাদি ক্রিয়াতে দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের মাঝে ঝাঁপ দিতে চাহে। যদিও অনন্তকে আয়ত্ত করিতে পারে না, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারে না। ইহা অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। পরন্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ দেহাদি বহির্জ্জগৎবিষয়ক জ্ঞান, জ্ঞাতা কয়েকটি ন্যায়ের অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীন করিয়া লয়, এবং সে নিয়মগুলি দেহ বা বহির্জ্জগৎ হইতে কোনমতেই পাওয়া যায় না। যথা,—কোন পদার্থের এককালে একস্থানে ভাব ও অভাব হইতে পারে না, অর্থাৎ কোন পদার্থ এককালে ও একস্থানে থাকিতে ও না থাকিতে পারে না, এ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, ইহার কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না, এবং এ নিয়ম বহির্জ্জগৎ হইতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, বহির্জ্জগতে আমরা এক বস্তুর একদা সদ্ভাব ও অভাব কখনও দেখিতে পাই না ও তাহাতেই এ নিয়মের উৎপত্তি। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। ষট্পদ অশ্ব বা চতুষ্পদ পক্ষী আমরা কখনও দেখি নাই বলিয়া ঐ ঐ রূপ জীব থাকা যে অনুমান করিতে পারি না এ কথা বলা যায় না। কিন্তু কোন পদার্থের একদা ভাব ও অভাব কখনও অনুমান করা যায় না। এ নিয়ম দেহের ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ নহে, ইহা জ্ঞাতা আপনা হইতে যোগায়। এই সকল কারণে উপলব্ধি হয় যে, জ্ঞাতা বা আত্মা সীমাবদ্ধ দেহ হইতে উদ্ভূত নহে, অনন্ত চৈতন্য হইতে উৎপন্ন।

অতএব আমি অর্থাৎ আত্মা দেহ নহে, দেহাতিরিক্ত পদার্থ, এই উত্তর ঠিক নহে ও পরীক্ষাদ্বারা অপ্রমাণ হইল, এ কথা কখনই বলা যায় না, বরং তদ্বিপরীত সিদ্ধান্তেই যুক্তিদ্বারা উপনীত হইতে হয়।

আত্মার স্বরূপ, উৎপত্তি, ও স্থিতি, জ্ঞানগম্য না হইলেও বিশ্বাসগম্য।

আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কোথা হইতে আসিল ও কোথায় যাইবে, অর্থাৎ দেহ গঠিত হইবার পূর্ব্বে কোথায় ছিল এবং দেহ বিনাশের পর কোথায় থাকিবে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর কি অন্তরে কি বাহিরে কোন স্থানেই স্পষ্টরূপে জ্ঞানের সীমার মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ এই সকল প্রশ্নের উত্তরলাভ জ্ঞানচর্চ্চার একটি চরম উদ্দেশ্য, এবং জ্ঞাতাও অন্তর্দৃষ্টির অবসর পাইলেই সেই উত্তর লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল। জ্ঞাতা অন্য পদার্থের স্বরূপ যতদূর জানিতে পারে নিজের স্বরূপ ততদূর জানিতে পারে না, ইহা বিশ্বের একটি বিচিত্র প্রহেলিকা। কি প্রকারে আত্মজ্ঞানের প্রথম উদয় হয় তাহা কাহারও নিজের মনে থাকে না,

এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহা জানা যায় না, কারণ আত্মজ্ঞানের প্রথম উদয়কালে কাহারও বাক্‌শক্তি জন্মে না। কিন্তু উক্ত প্রশ্নসকলের উত্তর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞানগম্য না হইলেও, জ্ঞাতা তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। উত্তরলাভের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, এবং পরোক্ষে বা প্রকারান্তরে যুক্তিদ্বারা যে উত্তর পাওয়া যায় তাহা জ্ঞানের সীমার অন্তর্গত না হইলেও বিশ্বাসের সীমার বহির্গত নহে।

জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রভেদ।

আনুষঙ্গিকরূপে এইস্থলে জ্ঞান ও **বিশ্বাস** সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা জ্ঞানের আয়ত্ত নহে অথচ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ আয়ত্ত, অর্থাৎ যাহার স্বরূপ আমরা জ্ঞানের দ্বারা অনুমান করিতে পারি না, কিন্তু যাহার অস্তিত্ব বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। যথা, অনন্তকাল আমরা জ্ঞানের আয়ত্ত করিতে পারি না, অথচ কালের আদি বা অন্ত আছে মনে করিতে পারি না, এবং কাল অনন্ত ইহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না।

বিশ্বাস এক প্রকার অস্ফুটজ্ঞান বলিলেও বলা যায়। যাহা জানি তাহা বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি, ও তাহার অন্ততঃ কতকগুলি লক্ষণ বুঝিতে পারি। কিন্তু যাহা জানি না কেবল বিশ্বাস করি, অনেক স্থলে তাহা বুঝিতে পারি না, তাহার লক্ষণসম্বন্ধে কেবল 'নেতি নেতি', এরূপ নহে, এরূপ নহে, এইমাত্র বলিতে পারি, তবে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।

বিশ্বাসের মূল সকল স্থলে সমান নহে। অনেক স্থলে বিশ্বাস অমূলক বা কুসংস্কারমূলক ও পরিহার্য্য, আবার অনেক স্থলে তাহা সমূলক বা সুযুক্তিমূলক ও অপরিহার্য্য।

বিশ্বাস শব্দটি জ্ঞাতার পরোক্ষে প্রাপ্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপ্রাপ্ত জ্ঞানকেও বুঝায়। বলা বাহুল্য, উপরে উহা ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

আত্মা ব্রহ্মের অংশ।

আত্মার স্বরূপের যদিও জ্ঞান দ্বারা ঠিক উপলব্ধি হয় না, কিন্তু আত্মা যে জগতের চৈতন্যময় আদিকারণের অর্থাৎ ব্রহ্মের অংশ বা শক্তি, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

আত্মা ব্রহ্মের অংশ বা শক্তি এই যে কথা বলা হইল, তাহার অর্থ স্থির করিলেই সেই হেতুনির্দ্দেশ আপনা হইতে হইবে। অখণ্ড সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের অংশ বা শক্তি পৃথগ্‌ভাবে কিরূপে থাকিবে, এ সংশয় সহজেই উথিত হইতে পারে, এবং তাহা দূর করা আবশ্যক। এই সংশয় সম্বন্ধে বেদান্তভাষ্যের প্রারম্ভে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, অহংজ্ঞান ও আত্মার ব্রহ্ম হইতে পার্থক্য বোধ অধ্যাস বা অবিদ্যামূলক এবং প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি হইবে। পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, আত্মা ও অনাত্মা, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। যতদিন তাহা না জন্মে ততদিন সেই অধ্যাস বা অপূর্ণ জ্ঞান অতিক্রম করা অসাধ্য, এবং শঙ্করাচার্য্যও অধ্যাসকে অনাদি, অনন্ত ও নৈসর্গিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাস বা অপূর্ণ

জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমাবিষয়ক অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। সম্প্রতি এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড ব্রহ্ম নিজের অনন্ত শক্তিপ্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন আত্মারূপে অভিব্যক্ত হওয়া অনুমান করা আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানের পক্ষে অসঙ্গত নহে, এবং আত্মার সৃষ্টি কিরূপে হইল ভাবিতে গেলে এই অনুমানই অপূর্ণ জ্ঞানের অনন্যগতি।

আত্মার উৎপত্তি ও স্থিতির কাল-সম্বন্ধে নানা মত।

আত্মার উৎপত্তি ও স্থিতি, অর্থাৎ ব্রহ্মের পৃথগ্‌ভাবে আত্মারূপে অভিব্যক্তি ও স্থিতি, কোন্ সময় হইতে ও কতকালের নিমিত্ত, এ বিষয়ে নানা মত আছে।

কেহ বলেন দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার উৎপত্তি, দেহের স্থিতি যতদিন আত্মারও স্থিতি ততদিন, এবং দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার লয়। প্রাচ্য চার্ব্বাক্‌দিগের ও পাশ্চাত্য জড়বাদীদিগের এই মত। আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ, ও দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার লোপ হইতে হইবে এইরূপ অনুমান যে ঠিক নহে ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

কেহ বলেন, বর্ত্তমান দেহের উৎপত্তির বহু পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে আত্মা আছে ও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছে, এবং বর্ত্তমান দেহনাশের পরও ভিন্ন ভিন্ন দেহে আত্মা অবস্থিতি করিবে, এবং যাহার শুভাশুভ কর্ম্মফল ক্ষয় হইবে সেই আত্মা মুক্তিলাভ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হইবে। জন্মান্তরবাদীদিগের এই মত। ইহার অনুকূল যুক্তি এই যে, মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সকল জীবই সুখী না হইয়া কেহ সুখী কেহ দুঃখী যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ জীবের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, এবং প্রথম জন্মের কর্ম্মফল কেন অশুভ হইল ইহার উত্তর দিতে পারা যায় না, অতএব জীবের পূর্ব্বজন্ম অসংখ্য ও অনাদিকালব্যাপী বলিয়া মানিতে হয়। কিন্তু এ যুক্তির বিরুদ্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বজন্ম থাকিলে পরজন্মে তাহার কিছুই মনে থাকিবে না, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। এবং সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক ক্রমশঃ সুপথগামী হইয়া জীব পরিণামে অনন্তকাল সুখ পাইবে, একথা মানিলে, সেই অনন্তকালের সুখের সঙ্গে তুলনায় ইহকালের অল্প দিনের দুঃখ কিছুই নহে। আর তাহার কারণ নির্দ্দেশ নিমিত্ত অসংখ্য অথচ একেবারে বিস্মৃত পূর্ব্বজন্ম অনুমান করা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত। তবে এই স্থানে একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। যদিও আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ এবং যদিও পূর্ব্বজন্মবাদের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও তর্ক আছে, তথাপি দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাতে অনেক দোষগুণ দেহের প্রকৃতি অনুসারে বর্ত্তে, এবং আমাদের দেহের প্রকৃতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের দেহের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং আত্মার পূর্ব্বজন্ম না থাকিলেও, এবং আত্মা জন্মান্তরের কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ না হইলেও, অতীতের সহিত আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং আত্মাকে প্রকারান্তরে পূর্ব্বপুরুষদিগের কর্ম্মফলের ভাগী হইতে হয়।

কেহ আবার বলেন আত্মার উৎপত্তি বর্ত্তমান দেহের সঙ্গে সঙ্গে, ও অবস্থিতি অনন্তকালের নিমিত্ত, এবং এই এক জন্মের কর্ম্মফলদ্বারা সেই অনন্তকালের

শুভাশুভ নির্ণীত হয়। খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই মত। কিন্তু এই অল্প-কালস্থায়ী ইহজীবনের কর্ম্মফল জীবের অনন্তকালের সুখদুঃখের কারণ কি প্রকারে সঙ্গতরূপে হইতে পারে, ইহা যুক্তি দ্বারা স্থির করা যায় না।

কাহারও মতে আত্মার উৎপত্তি, অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে আত্মার পৃথগ্‌ভাবে উৎপত্তি, দেহের সঙ্গে সঙ্গে, স্থিতি অনন্তকালের নিমিত্ত, গতি মধ্যে মধ্যে অবনতির দিকে হইলেও শেষে উন্নতিমার্গে, এবং পরিণাম ব্রহ্মে পুনর্ম্মিলন। অন্যান্য মত অপেক্ষা এই মতই যুক্তির সহিত অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

জ্ঞাতার স্বরূপ ও উৎপত্তিনির্ণয় দুরূহ হইলেও জ্ঞাতার শক্তি বা ক্রিয়া-নির্ণয় সহজ।

জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ ও উৎপত্তিনির্ণয় আমাদিগের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পক্ষে অতি দুরূহ, এবং অজ্ঞেয়বাদীদের মতে আমাদের জ্ঞানের অতীত। কিন্তু জ্ঞাতার শক্তি বা ক্রিয়া নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং অন্তর্দৃষ্টি সেই নির্ণয়-কার্য্যের প্রধান উপায়। তবে আবশ্যকমত অন্তর্দৃষ্টির ফল অন্যান্য প্রমাণদ্বারা পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত।

আত্মার ক্রিয়া ত্রিবিধ—জানা, অনুভব করা, ও কার্য্য করা।

জ্ঞাতার শক্তি বা ক্রিয়া নানাবিধ। তাহা শ্রেণিবদ্ধ করিতে হইলে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে—জানা, **অনুভব** করা, ও চেষ্টা করা বা **কার্য্য করা**। কোন বিষয়ের তত্ত্ব বা সত্যতা আমরা জানিতে চাহি, তাহা সুখকর কি দুঃখকর ইহা আমরা অনুভব করি, এবং কোন বিষয় জানা ও তদানুষঙ্গিক সুখদুঃখ অনুভব করা হইলে কি করিব এই চেষ্টা করি।

তত্ত্ব জানিবার উপায় অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় এবং স্মৃতি, কল্পনা ও অনুমান।

অন্তর্জগতের তত্ত্ব জানিবার উপায় অন্তরিন্দ্রিয় বা মন, বহির্জগতের তত্ত্ব জানিবার উপায় চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়। এতদ্ভিন্ন **স্মৃতি, কল্পনা**, ও **অনুমান** দ্বারা আত্মা নানাবিধ তত্ত্ব জানিতে পারে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে 'অন্তর্জগৎ' ও 'বহির্জগৎ' ও 'জ্ঞানলাভের উপায়' শীর্ষক অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

অনুভব জ্ঞাতার সুখদুঃখ জানা।

সুখদুঃখ অনুভব করাও একপ্রকার জানা, অর্থাৎ নিজের সেই মুহূর্ত্তের অবস্থা জানা। তবে অন্যপ্রকার জানার সহিত প্রভেদ এই যে এস্থলে জানিবার বিষয় কোন তত্ত্ব বা সত্য নহে, জ্ঞাতার নিজের সুখ বা দুঃখ বা অন্যরূপ অবস্থান্তর, এবং এই জানা অনুভব নামে অভিহিত হইল। কিন্তু অনুভব ও জ্ঞানবিভাগের বিষয় এবং 'অন্তর্জগৎ' নামক অধ্যায়ে, এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা হইবে।

চেষ্টা বা কার্য্য জ্ঞাতার ক্রিয়া, তাহা কর্ম্ম-বিভাগের বিষয়।

চেষ্টা বা কার্য্য কর্ম্মবিভাগের বিষয়। 'কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না' এই অধ্যায়ে ইহার আলোচনা হইবে। ইহা জ্ঞাতা বা আত্মার ত্রিবিধ ক্রিয়ার মধ্যে একটি, এই নিমিত্ত এস্থলে ইহার উল্লেখ হইল। এবং এইখানে বলা কর্ত্তব্য যে আত্মার স্বরূপের সহিত চেষ্টা বা কার্য্য করিবার শক্তির সম্বন্ধ অতি বিচিত্র। আত্মার জ্ঞানের বা অনুভূতির মুখ্য কারণ জ্ঞাত বা অনুভূত বিষয়, কিন্তু আত্মার চেষ্টার বা কার্য্যের মুখ্য কারণ আত্মা স্বয়ং বলিয়াই আপাততঃ প্রতীত হয়। আবার কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে দেখা যায় আত্মার এই কর্ত্তৃত্বপ্রতীতি ভ্রমমূলক, ফলিতার্থে আত্মার কোন কার্য্যেই স্বতন্ত্রতা নাই, সকল কার্য্যই তৎকালীন সন্নিহিত বহির্জগতের অবস্থা ও উদ্যত অন্তরের প্রবৃত্তিদ্বারা

নিরূপিত হয়, এবং সেই বহির্জগতের অবস্থা ও অন্তরের প্রবৃত্তি আমার অধীন নহে, কার্য্যকারণ পরম্পরাক্রমে নিয়োজিত হয়। এই স্থলে—

> "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
> অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"
>
> (প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম্ম চলে।
> অহঙ্কারমুগ্ধ আত্মা আমি কর্ত্তা বলে॥)

গীতার[১] এই উক্তি মনে পড়ে।

আত্মার স্বতন্ত্রতাবোধ ব্রহ্মের স্বতন্ত্রতার অস্ফুটবিকাশ।

আত্মা কর্ম্মক্ষেত্রে উদাসীন কি কর্ম্মে লিপ্ত, এবং কর্ম্মে লিপ্ত হইলে আত্মার স্বতন্ত্রতা আছে কি না, এই সকল কথা লইয়া অনেক মতভেদ আছে, তাহার উল্লেখ পরে হইবে। এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, আত্মা দেহাবচ্ছিন্ন অপূর্ণ অবস্থায় স্বতন্ত্র নহে, প্রকৃতিপরতন্ত্র। কিন্তু আত্মা জগতের আদিকারণ সেই ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপের অংশ, অতএব অপূর্ণ অবস্থাতেও সেই আদিকারণের স্বতন্ত্রতা আপনাতে অস্ফুটভাবে অনুভব করে। ইহাই বোধ হয় আত্মার স্বতন্ত্রতাবাদ ও অস্বতন্ত্রতাবাদের স্থূল মীমাংসা। আত্মার স্বতন্ত্রতাবিষয়ক অস্ফুটজ্ঞান ও কার্য্যকারণবিষয়ক অলঙ্ঘ্য নিয়মের সহিত সেই জ্ঞানের বিরোধ, এই বিচিত্র রহস্যের মর্ম্ম বুঝিবার নিমিত্ত উপরে যাহা বলা হইল তদ্ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

স্বার্থ ত্যাগে আনন্দ আত্মার ও ব্রহ্মের একত্বের প্রমাণ।

জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মা দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় অপূর্ণ জ্ঞানে অধ্যাস বা ভ্রমবশতঃ অহঙ্কারবিশিষ্ট ও স্বতন্ত্রতাবিহীন। দেহবন্ধনমুক্ত ও পূর্ণজ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে আত্মা অহংবুদ্ধিপরিত্যক্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত একত্ব এবং স্বাধীনতা ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে, এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এবং এই কথার প্রমাণ-স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের 'আমিত্ব' অর্থাৎ আত্মার ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান, ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সঙ্কীর্ণতা, যত কমিতে থাকে, ও প্রকৃত জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা নিজের ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িয়া পরকে আপন বলিতে ও স্বার্থ-বিসর্জ্জন দিতে যত শিখে, ততই আত্মার স্বাধীনতা ও আনন্দ ও জগতের প্রকৃত মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে। দেহরক্ষার অনুরোধে সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ দেহীর পক্ষে সম্ভবপর নহে, কিন্তু পরার্থ উদ্দেশে স্বার্থের পরিমাণ খর্ব্ব করা সকলেরই সাধ্য, এবং যিনি যতদূর তাহা করিতে পারেন তিনিই ততদূর নিজের ও জগতের মঙ্গলসাধনে সমর্থ।

---

[১] গীতা ৩.২৭।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞেয়

যাহা জানা যায় বা জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয় তাহাই জ্ঞেয়।

জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মা যাহা জানিতে পারে বা জানিতে চাহে তাহাই জ্ঞেয়।

কেহ কেহ বলেন আত্মা যাহা জানিতে পারে কেবল তাহাকেই জ্ঞেয় বলা উচিত, এবং আত্মা যাহা জানিতে চাহে কিন্তু যাহা আত্মার জানিবার শক্তি নাই তাহাকে অজ্ঞেয় বলা কর্ত্তব্য। একথা আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে প্রথমে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইবে। কারণ যাহা জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয় তাহা জানিবার শক্তি না থাকিলেও জানিবার যোগ্য নহে বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত, যাহা জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহার স্বরূপ জানিতে না পারিলেও, তাহার অস্তিত্ব জানা গিয়াছে, অথবা তাহার থাকা না থাকার ফলাফল বিচার করা যাইতে পারে। সুতরাং তাহাকে একেবারে অজ্ঞেয় বলা যায় না।

অপূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় পৃথক্।

অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞাতার পূর্ণজ্ঞান জন্মিলে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য থাকিতে পারে না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সেই পূর্ণজ্ঞান না জন্মে সে পর্য্যন্ত জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য থাকিবে। তবে জ্ঞাতাই আপনার প্রথম ও প্রধান জ্ঞেয়।

জ্ঞেয় দ্বিবিধ— আত্মা ও অনাত্মা।

জ্ঞেয় পদার্থ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—আত্মা ও অনাত্মা, বা অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ। উভয়েরই পৃথক্ আলোচনা পরে হইবে। এ অধ্যায়ে উভয়ের সম্বন্ধে একত্র যাহা বলা যাইতে পারে তাহাই বিবেচ্য।

জ্ঞেয়ত্ব পদার্থের অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে।

জ্ঞেয়ত্ব পদার্থের একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু ইহা অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে। সকল পদার্থই ব্রহ্মের অর্থাৎ চৈতন্যময় স্রষ্টার জ্ঞেয়, কিন্তু এরূপ অনেক পদাথ থাকিতে পারে যাহা অন্য কোন জ্ঞাতার জ্ঞেয় নহে। এবং অন্য কোন জ্ঞাতা না থাকিলেও সে সকল পদার্থ থাকিতে পারিত। এরূপ অসংখ্য পদার্থ থাকিতে পারে যাহার বিষয় আমি কিছুই জানি না, এবং যাহার সম্বন্ধে একেবারে জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত জানিবার আকাঙ্ক্ষাও কখন হয় না। এবং যে-সকল পদার্থের বিষয় আমি জানি, তাহারাও যে আমি না থাকিলে থাকিতে পারিত না এ কথা বলা যায় না। আমি না থাকিলেও জগৎ থাকিতে পারিত। তবে আমি যে জগৎ দেখিতেছি, অর্থাৎ জগৎকে আমি যেরূপ দেখিতেছি, আমি না থাকিলে তাহা থাকিত কি না, ভিন্ন কথা, ও সে কথার আলোচনা পরে হইতেছে।

কিন্তু ইহা অতি আশ্চর্য্য লক্ষণ।

জ্ঞেয়ত্ব পদার্থের অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে, কিন্তু ইহা একটি অতি আশ্চর্য্য লক্ষণ। আমা হইতে পৃথক্ পদার্থের অস্তিত্ব ও গুণ আমি জানিতেছি, ইহা ভাবিয়া দেখিলে অতি বিচিত্র ব্যাপার। একথা সহজেই বলা যাইতে পারে, কোন পদার্থ আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ পাইলে আমাতে তাহার অস্তিত্বজ্ঞান জন্মে, এবং যে যে ইন্দ্রিয় যে যে গুণজ্ঞাপক, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগে পদার্থের তত্তদ্‌গুণের জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এ কথাগুলি বলা যত সহজ, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হওয়া তত সহজ নহে। প্রথমতঃ, কোন পদার্থের সহিত আমার ইন্দ্রিয়ের সংযোগ কিরূপ, দ্বিতীয়তঃ, আমার ইন্দ্রিয়ের সহিত আমার সংযোগ কিরূপ, এবং তৃতীয়তঃ, এই সংযোগদ্বয়ের ফল পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞান আমাতেই বা উদ্ভাবিত হয় কিরূপে, ইহা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয়, কি জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতা, অর্থাৎ আমা হইতে জগৎ, কি জগৎ হইতে আমি?

উপরে বলা হইয়াছে, পূর্ণজ্ঞানের পক্ষে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক, অপূর্ণজ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় পৃথক্। এবং জ্ঞাতা না থাকিলেও পদার্থ থাকিতে পারে, তবে আমি না থাকিলে আমি যে জগৎ দেখিতেছি জগৎ ঠিক সেইরূপ ধারণ করিত কি না ইহা আলোচনার যোগ্য। সেই আলোচনার বিষয়টি প্রকারান্তরে এই প্রশ্নে পরিণত হয়—জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় পদার্থের উৎপত্তি, কি জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতার উৎপত্তি? অর্থাৎ আমা হইতে জগৎ, কি জগৎ হইতে আমি?

প্রথমে মনে হইতে পারে উপরি উক্ত প্রশ্নটি নিষ্কর্ম্মা বিষয়বুদ্ধিবিহীন নৈয়ায়িকের 'তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল?' এই প্রশ্নের ন্যায় হাস্যাস্পদ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে উহাতে তরল হাস্যরস অপেক্ষা প্রগাঢ়তর রহস্য সন্নিহিত আছে।

বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদমতে—

'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'

'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা আত্মা ব্রহ্ম এক' এবং আত্মার ভ্রম বা অধ্যাসবশতঃ এই জগৎ তাহার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি[১] বাদীরা বলেন, এই অনাদি অনন্ত জগৎই সত্য এবং আত্মা বা আমি তাহা হইতে ক্রমবিকাশদ্বারা উদ্ভাবিত হইতেছে। এক মতে আত্মাই মূল এবং জগৎকে আত্মা নিজের ভ্রমবশতঃ আপন সম্মুখে প্রতীয়মান করিতেছে। অপর মতে জগতই মূল এবং জগতের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি-প্রবাহে অসংখ্য জীব জলবিম্বস্বরূপ উদিত ও কিয়ৎকাল ক্রীড়াকরতঃ বিলীন হইতেছে।

অভিব্যক্তিবাদ কতদূর সঙ্গত

জগৎ চৈতন্যময় ব্রহ্মের বিকাশ, এবং জড় চৈতন্যশক্তির রূপান্তর বলিয়া যদি মানা যায়, তাহা হইলে নীহারিকার পরমাণুপুঞ্জে এবং জগতের প্রত্যেক

[১] ইংরাজি ভাষায় Evolution শব্দ।

পরমাণুতে চৈতন্যশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে আছে, একথা বলিতে কোন বাধা থাকে না, এবং জগতের অভিব্যক্তিদ্বারা আত্মার উৎপত্তি, এ কথাও স্বীকার করা যাইতে পারে। ফলতঃ, এভাবে লইলে অভিব্যক্তি কেবল সৃষ্টির প্রক্রিয়া মাত্র বুঝায়, তদ্ভিন্ন জড় হইতে ক্রমশঃ চৈতন্যের উৎপত্তি বুঝায় না। জড় হইতে ক্রমবিকাশদ্বারা চৈতন্যের উৎপত্তি, এবং দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার নাশ, এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর আপত্তি আছে তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় অর্থাৎ আত্মা হইতে জগতের সৃষ্টি, এ মত কতদূর যুক্তিসঙ্গত।

জগৎবিষয়ক জ্ঞান ভ্রান্ত কি প্রকৃত?

জ্ঞাতার পক্ষে নিজের জ্ঞানই জ্ঞেয় পদার্থের অর্থাৎ প্রতীয়মান জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ, ও তাহার স্বরূপের নির্ণায়ক। জগতে আমাদের জ্ঞানাতিরিক্ত অনেক পদার্থ থাকিতে পারে, এবং জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জগৎকে যেরূপ দেখিতেছি তাহা হইতে বিভিন্ন হইতে পারে। তবে আমার পক্ষে জগৎকে আত্মা বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়দ্বারা যেরূপ দেখিতেছে ও ভাবিতেছে জগৎ অবশ্যই সেইরূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সেই প্রতীত রূপ ভ্রান্তিমূলক কি জগতের প্রকৃত স্বরূপ ইহাই জিজ্ঞাস্য।

আমার পরিজ্ঞাত রূপই যে জ্ঞেয় পদার্থের প্রকৃত রূপ, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে না, কেন-না অনেক স্থলে ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, আমি পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইলে অন্যে যাহা শুক্লবর্ণ দেখিবে, আমি তাহা পীতবর্ণ দেখিব, এবং আমার চক্ষুকর্ণ তীক্ষ্ণশক্তিবিশিষ্ট না হইলে, অন্যে যাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইবে, আমি তাহা দেখিতে ও শুনিতে পাইব না। কিন্তু, যদিও বিশেষ বিশেষ স্থলে এরূপ ঘটে, সামান্যতঃ ইহা কি বলা যাইতে পারে যে জগতের যাহা কিছু আমরা জানি তাহা সমস্তই ভ্রান্তিমূলক? যদিও অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মতে জগৎ মিথ্যা ও অধ্যাসমূলক, কিন্তু স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই সেই অধ্যাসকে অনাদি অনন্ত ও নৈসর্গিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগৎকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে তাহা বোধ হয় এই অর্থে যে, জগৎ অনিত্য ও আমাদের বর্ত্তমান দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থার সুখদুঃখ যাহা জগতের উপর নির্ভর করে তাহাও অনিত্য, এবং ব্রহ্মই নিত্য, ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভই আমাদের চরম ও নিত্য সুখের উপায়। কিন্তু জগৎসম্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহা সমস্তই ভ্রান্তিমূলক বলিতে গেলে, চৈতন্যময় ব্রহ্মের সৃষ্টির ক্রিয়া বিড়ম্বনামাত্র এই কথা বলিতে হয়, এবং একথা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব যদিও আমাদের অপূর্ণজ্ঞানে জগতের পূর্ণস্বরূপ আমরা জানিতে পারি না, জগৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সেই অপূর্ণতাদোষ ও ব্যক্তিগত রোগাদিজনিতদোষ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দোষে দূষিত বা একেবারে ভ্রান্তিমূলক নহে, এই মতই যুক্তিসঙ্গত। তবে প্রত্যেক স্থলেই জগৎসম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক। এবং ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে উক্ত অপূর্ণতাদোষ বড় সামান্য দোষ নহে, এবং তাহা হইতে অশেষবিধ

তাহা অপূর্ণতাদোষবিশিষ্ট বটে কিন্তু একেবারে ভ্রান্ত নহে।

তবে অপূর্ণতাদোষ নানা ভ্রমের মূল হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত, আকাশ-মণ্ডল ও পরমাণু।

ভ্রম জন্মিতে পারে। ইহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। আমরা আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারকা, ছায়াপথ, নীহারিকাদি যে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল দেখিতে পাই, তাহাদের অবস্থিতি ও স্থাননির্দ্দেশসম্বন্ধীয় নিয়ম নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত অনেক জ্যোতির্ব্বিৎ প্রয়াস পাইয়াছেন, ও অনেকে ইহাও মনে করিতে পারেন এ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, এবং জ্যোতিষ্কগণ শূন্যে যে ভাবে আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন শৃঙ্খলা লক্ষিত হয় না। কিন্তু একটু ভাবিলেই বুঝা যায় যে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ। যদিও বহুদূরস্থ তারকা দেখিতে পাই, কিন্তু অনন্তের সঙ্গে তুলনায় তাহা অধিক দূর নহে, এবং জগতের যতদূর আমরা দেখিতে পাই তাহা যদিও অতি বিস্তীর্ণ, কিন্তু অনন্ত জগতের তাহা অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র, আর যদি আমাদের দর্শনশক্তির পূর্ণতা বা অধিকতর ব্যাপ্তি থাকিত, এবং আমরা সমস্ত জগৎ অথবা জগতের যেটুকু দেখিতে পাই তদপেক্ষা অধিক অংশ দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে ইহা অসম্ভব নহে যে, আকাশ আমাদের চক্ষে ভিন্ন রূপ ধারণ করিত। যেখানে কিছু নাই বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে অসংখ্য তারকা লক্ষিত হইত, এবং জ্যোতিষ্কগণ যেরূপ বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, তদপেক্ষা অধিক-তর শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইত। জ্ঞাতার দর্শনেন্দ্রিয়ের এক প্রকার অপূর্ণতার অর্থাৎ অদূরদৃষ্টির ফলে জ্ঞেয় পদার্থের এইরূপ অপূর্ণ বিকাশ। দৃষ্টির আর একপ্রকার অপূর্ণতাজন্য, অর্থাৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবজন্য, জ্ঞেয় পদার্থের আর এক প্রকার অপূর্ণ বিকাশ ঘটে। জড়পদার্থের আভ্যন্তরিক গঠন কিরূপ, তাহা পরমাণুসমষ্টি কি শক্তিকেন্দ্রসমষ্টি, পরমাণুর গঠনই বা কিরূপ, এই সকল প্রশ্নের উত্তর পূর্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির অনায়াসলভ্য হইত, কিন্তু সেরূপ দৃষ্টিশক্তির অভাবে জ্ঞেয় জড়পদার্থের স্বরূপসম্বন্ধে কতই ভ্রান্তিমূলক কল্পনা হইতেছে, এবং বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কতই অনিশ্চিত আলোচনা করিতেছেন।[১]

জ্ঞাতার অপূর্ণতার জন্য জ্ঞেয় অপূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক জ্ঞাতার অন্য কোন দোষগুণ জ্ঞেয়কে স্পর্শ করে কি না। এ স্থলে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ দোষগুণের (যথা, কাহারও চক্ষুকর্ণের বিশেষ দোষ-গুণের) কথা হইতেছে না, জ্ঞাতার সাধারণ দোষগুণের কথা বিবেচ্য।

জ্ঞেয় জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়মাধীন।

প্রথমতঃ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জ্ঞেয় জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়মাধীন। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান যে নিয়মাধীন, কোন জ্ঞেয় বিষয় তদ্বিপরীত ভাব ধারণ করিতে পারে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকদিগের মতে[২] আমাদের জ্ঞানের নিয়ম তিনটি—

১ম। স্বরূপ নিয়ম—যে যাহা সে তাহা। যথা—মনুষ্য মনুষ্যই বটে।

---

[১] Karl Pearson's *Grammar of Science*, Ch. VII দ্রষ্টব্য।

[২] Bain's *Logic*, Part I, p. 16 দ্রষ্টব্য।

২য়। বৈপরীত্য নিয়ম—কোন পদার্থ একদা দুই বিপরীত রূপ হইতে পারে না। যথা—কোন পদার্থ একদা শুক্ল ও অশুক্ল হইতে পারে না।

৩য়। বিকল্প প্রতিষেধ নিয়ম—কোন কথা ও তাহার বিপরীত উভয়ই সত্য বা উভয়ই মিথ্যা হইতে পারে না, একটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা হইবেই হইবে। যথা—'ক শুক্ল' ও 'ক শুক্ল নহে' ইহার মধ্যে একটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা হইবেই হইবে।

দেশ ও কাল কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে, তাহা জ্ঞেয় বিষয়।

দেশ ও কাল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়মমাত্র কি ইহারা জ্ঞেয় বিষয়, এই কথা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্টের মতে দেশ ও কাল জ্ঞেয় পদার্থ নহে, কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম পদার্থে আরোপিত।[১] হার্বার্ট স্পেন্সরের মতে দেশ ও কাল জ্ঞেয় বিষয়, জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে।[২]

যাঁহাদের মতে দেশ ও কাল জ্ঞেয় পদার্থ নহে, কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম মাত্র, তাঁহারা স্বমত সমর্থনার্থে এইরূপ তর্ক করেন—দেশ ও কাল জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না, কেন-না তাহা হইলে বহির্জগতের পদার্থের জ্ঞান হইতে দেশ ও কালের জ্ঞান ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইত, কিন্তু তাহা না হইয়া প্রথম হইতেই, বহির্জগতের কোন বিষয়ই আমরা দেশকাল-অনবচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারি না। অতএব দেশকালের জ্ঞান বাহির হইতে প্রাপ্ত নহে, অন্তর হইতে উদ্ভূত। এ তর্ক সঙ্গত বটে, কিন্তু ইহাদ্বারা একথা সপ্রমাণ হয় না যে দেশকাল জ্ঞেয় পদার্থ নহে, কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম, এবং আমাদের ন্যায় জ্ঞাতা না থাকিলে দেশকাল থাকিত না। বরং দেশকাল-অনবচ্ছিন্ন বিষয় আমরা চিন্তা করিতে পারি না, ইহাদ্বারা এই কথা সপ্রমাণ হয় যে দেশকাল স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞেয়, এবং অপরাপর জ্ঞেয় পদার্থ অপেক্ষা ইহাদের অস্তিত্ব অধিকতর নিশ্চিত। যে দেশ ও কাল অনবচ্ছিন্ন কোন বিষয় আছে ইহা মনে করা যায় না, এবং যাহার অভাব মনেও ভাবা যায় না, সেই দেশ ও কাল জ্ঞাতার বাহিরে নাই এবং জ্ঞাতাকর্তৃক জ্ঞেয় পদার্থে আরোপিত হয়, এ কথা বলিতে গেলে, জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মার সাক্ষ্যবাক্যের সত্যতা সন্দেহ করিতে হয়, এবং তাহা করিতে হইলে সেই সন্দেহের প্রতিও সন্দেহ হয়।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ও জ্ঞেয় বিষয়।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লইয়াও উক্তরূপ মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধও আত্মার সাক্ষ্যবাক্যে জ্ঞেয় বিষয় বলিতে হইবে, কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে। কারণ ও কার্য্যের পারম্পর্য্য মাত্রই লক্ষিত হয়, তদ্ভিন্ন কারণ কিরূপে কার্য্য উৎপন্ন করে সে প্রক্রিয়া আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু

---

১ Kant's *Critique of Pure Reason*, Max Müller's Translation, Vol. II, pp. 20, 27.

২ H. Spencer's *First Principles*, Pt. I, Ch. III.

কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কেবল পারম্পর্য্য নহে, অন্যরূপ সম্বন্ধও আছে, ইহা না মনে করিয়া থাকা যায় না।

পূর্ণ জ্ঞানে দশদিক্ এক, ত্রিকাল এক, ও কার্য্যকারণ এক বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সে একত্ব অপূর্ণ জ্ঞানের জ্ঞেয় নহে। তবে তাই বলিয়া অপূর্ণ জ্ঞানের জ্ঞেয় একেবারে ভ্রান্তিমূলক বলা যায় না।

দেশ, কাল ও কারণ এই তিন জ্ঞেয় আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতার বিলক্ষণ প্রমাণ দেয়। দেশ, কাল ও কারণপরম্পরার শেষ আছে ইহা আমরা মনে অনুমান করিতে পারি না, অথচ ইহাদের অনন্ত পূর্ণতা মনে ধারণ করিতেও পারি না। ইহার বাহিরে আর দেশ নাই, এই কালের পর আর কাল নাই, এই কারণের আর কারণ নাই, ইহা কখনই বলিতে পারা যায় না, বলিলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। অথচ ইহাদের অনন্ত পূর্ণতাও জ্ঞানের আয়ত্ত করিতে পারি না। এই স্থলে বিশ্বাসই আমাদের অবলম্বন, এবং যিনি অনন্ত-দেশব্যাপী, অনন্তকালস্থায়ী, সকল কারণের আদিকারণ, ও জড়চৈতন্যময় সমস্ত জগৎ যাঁহার বিরাট্‌মূর্ত্তি, সেই ব্রহ্ম আমাদের চরম ও পরম জ্ঞেয়, এই বিশ্বাসই আমাদের জ্ঞানপিপাসানিবৃত্তির একমাত্র উপায়।

জ্ঞেয়সম্বন্ধে আর দুইটি কথা আছে যাহা অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ উভয়েরই সহিত সংস্রব রাখে। একটি **ত্রিগুণতত্ত্ব**, অপরটি জ্ঞেয় বা পদার্থের **প্রকার-নির্ণয়**।

ত্রিগুণতত্ত্ব।

ত্রিগুণতত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ, এই তিন গুণের আলোচনা বা উল্লেখ পাশ্চাত্যদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি এই ত্রিগুণাত্মিকা এবং এই গুণত্রয়ের বৈষম্যদ্বারা জগতের সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে।[১] আবার বেদান্তদর্শনে এই কথার প্রতিবাদস্থলে এই গুণত্রয়ের উল্লেখ আছে।[২] সে সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। তবে যুক্তি-অনুসারে দেখিতে গেলে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ, এই ত্রিগুণকে ক্রিয়া, জ্ঞান, ও অজ্ঞানবোধক গুণ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে, অথবা সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, জগতের এই ত্রিবিধ কার্য্যের কারণরূপ শক্তির গুণ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দুই অর্থ নিতান্ত অসম্বদ্ধও নহে। রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি, ও তমোগুণে বিনাশ, তিন গুণে জগতের এই তিন কার্য্য সাধিত হয়, ইহাই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সৃষ্টি একটি ক্রিয়া। যাহা সৃষ্ট হইল তাহা পূর্ব্বে অপ্রকটিত ছিল, পরে প্রকটিত হইল, অতএব তাহার স্থিতি, জ্ঞানের আলোকে তাহার অবস্থান। এবং বিনাশ পুনরায় অপ্রকটিত হওয়া, অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন হওয়া। সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, প্রায় সকল জ্ঞেয় পদার্থেরই অবস্থার এই তিন ক্রম, এবং রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ, গুণত্রয় সেই

---

১ সাংখ্যদর্শন, ১।৬১।

২ শাঙ্করভাষ্য, ১।৪।৮-১০।

ক্রমজ্ঞাপক। এই তিন গুণের কিঞ্চিৎ আভাস আর্য্যশাস্ত্রে প্রথমে ছান্দোগ্য উপনিষদে[১] এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে[২] পাওয়া যায়। উক্ত উপনিষদ্দ্বয়ে লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ[৩] বলিয়া যে তিনরূপের উল্লেখ আছে তাহাই রজঃ সত্ত্ব তমঃ গুণত্রয়। এবং ভাবিয়া দেখিলে জানা যায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার বা সূর্য্য উদিত হইবার প্রথম অবস্থায় বর্ণ লোহিত, পরে পূর্ণ-প্রজ্বলিত বা উদিত হইলে বর্ণ শুক্ল, ও শেষে নির্ব্বাপিত বা অস্তমিত হইলে বর্ণ কৃষ্ণ।

জ্ঞেয় বা পদার্থের প্রকারনির্ণয়।

জ্ঞেয় বা পদার্থের প্রকারনির্ণয়ার্থে সকল দেশেরই দার্শনিকেরা প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রাচীনন্যায়ে মহর্ষি গোতম ষোড়শ পদার্থের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা জ্ঞেয় পদার্থের প্রকারভেদ নহে, তাহা ন্যায়দর্শনের ষোলটি বিষয় মাত্র।

মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, এবং সমবায়, পদার্থের এই ছয়টি প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নব্যন্যায়ের মতে পদার্থের প্রকার উক্ত ছয় ও অভাব লইয়া সাতটি।[৪]

গ্রীসদেশীয় দার্শনিক আরিষ্টটলের মতে পদার্থের প্রকার দশটি, এবং সেই প্রকারকে তিনি 'ক্যাটিগরি' নামে অভিহিত করিয়াছেন।[৫] সেই দশটি প্রকারের মধ্যে দেশ ও কাল বাদে বাকি আটটি ন্যায়ের সাতটির মধ্যে আনা যায়।

জর্ম্মান দার্শনিক কান্টের মতে আরিষ্টটলের প্রকারভেদ যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাঁহার মতে বহির্জগতের জ্ঞেয় পদার্থের মূলপ্রকারভেদ জ্ঞাতার অন্তর্জগতে যে স্বতঃসিদ্ধ মূলপ্রকারভেদের নিয়ম আছে তাহারই অনুগামী হওয়া আবশ্যক, এবং তদনুসারে সেই প্রকার চতুর্ব্বিধ—(১) পরিমাণ (এক, অনেক, সমগ্র), (২) গুণ (সত্তা, অসত্তা, অপূর্ণ সত্তা), (৩) সম্বন্ধ (সমবায়, কার্য্যকারণ, সাপেক্ষতা), (৪) ভাব (সম্ভব, অসম্ভব, অস্তি, নাস্তি, নির্ব্বিকল্প, সবিকল্প)।[৬]

স্থূলভাবে দেখিতে গেলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সম্বন্ধ, ও অভাব, জ্ঞেয় পদার্থের এই পাঁচটি প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদি প্রথমতঃ এই পাঁচের

---

১ ষষ্ঠ অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড।

২ ৪র্থ অধ্যায়, ৫।

৩ "अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां"।

৪ द्रव्यं गुणास्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकं ।
समवायस्तथाभावः पदार्थाः सप्त कीर्त्तिताः ॥

৫ Aristotle's *Organon*, Categories, Ch. IV.

৬ *Critique of Pure Reason*, Max Müller's Trans., Vol. II, p. 71.

কোনটি অপরের মধ্যে না আইসে, এবং দ্বিতীয়তঃ সকল জ্ঞেয় পদার্থ বা বিষয়ই এই পাঁচের কোন একটির মধ্যে অবশ্যই আইসে, অর্থাৎ যদি এই পাঁচটি পরস্পর পৃথক্ ও সমস্ত বিষয়ব্যাপক হয়, তাহা হইলেই এই বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। দেখা যাউক তাহা হয় কি না।

দ্রব্যে গুণ থাকে, কিন্তু দ্রব্য গুণ নহে, গুণও দ্রব্য নহে। ঘট বৃহৎ হইতে পারে, কিন্তু ঘট এই দ্রব্য এবং বৃহৎ এই গুণ পরস্পর ভিন্ন। কর্ম্ম দ্রব্যদ্বারা বা দ্রব্যের গুণদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্ম দ্রব্য নহে, গুণও নহে। বৃহৎ ঘট পড়িয়া গেল, এস্থলে পড়িয়া যাওয়া কার্য্য ঘট ও বৃহৎ উভয় হইতেই পৃথক্। বৃহৎ ঘটের উপর ক্ষুদ্র ঘট, এ স্থলে উপরনিম্ন এই সম্বন্ধ ঘটদ্বয় ও তাহাদের গুণ ও কর্ম্ম হইতে ভিন্ন। এখানে ঘট নাই, এস্থলে ঘটের অভাব ঘট বা তাহার গুণ বা কর্ম্ম বা সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন। অতএব উপরের প্রথম কথাটি ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

এক্ষণে দ্বিতীয় কথাটি ঠিক কি না, অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ বা বিষয়মাত্রই উক্ত পাঁচ প্রকারের কোন একটির মধ্যে আইসে কি না, দেখা আবশ্যক। এ পরীক্ষা তত সহজ নহে, কারণ সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থ বা বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। বহির্জ্জগতের পদার্থ বা বিষয়সকল যে উক্ত পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত, তাহা অনায়াসেই দেখা যায়। তবে দেশ ও কাল তদ্রূপ বটে কি না এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। দেশ ও কাল কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম না হইয়া যদি জ্ঞেয় বিষয় হয়, তবে তাহা দ্রব্যমধ্যে গণ্য হইবে। যদি দেশ ও কাল কেবল জ্ঞানের নিয়ম অর্থাৎ অন্তর্জ্জগতের বিষয় হয়, তবে তাহার কথা পরে বলা যাইতেছে। শক্তিকে দ্রব্য ও গুণ উভয়ভাবেই লওয়া যাইতে পারে। যদি দ্রব্যে সন্নিহিত বলিয়া ভাবা যায় তাহা হইলে শক্তি গুণ, এবং যদি দ্রব্য হইতে পৃথগ্‌ভাবে দেখা যায়, তবে শক্তি দ্রব্যমধ্যে গণ্য। অন্তর্জ্জগতের বিষয়মধ্যে স্মৃতি, কল্পনা, বা অনুমানদ্বারা লব্ধ বিষয়সকল তাহাদের বহির্জ্জগতের প্রতিকৃতি যদ্‌যৎপ্রকারের অন্তর্গত তত্তৎপ্রকারান্তর্গত। যথা, স্মৃত বন্ধুর মূর্ত্তি দ্রব্য, কল্পিত রজতগিরির শুক্লবর্ণ গুণ, ইত্যাদি। অন্তর্জ্জগতে অনুভূত সুখদুঃখাদি, যাহার প্রতিকৃতি বহির্জ্জগতে নাই, তাহাও দ্রব্য বলিয়া গণ্য, অন্ততঃ দ্রব্য শব্দ এই অর্থে লওয়া যাইতেছে। চিন্তাচেষ্টাদি অন্তর্জ্জগতের ক্রিয়া কর্ম্মের মধ্যে আসিবে। আত্মা ও বুদ্ধি, দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা যায়। এতদ্‌ভিন্ন কতকগুলি পদার্থ বা বিষয় আছে যাহা বহির্জ্জগতের কি অন্তর্জ্জগতের তৎসম্বন্ধে সংশয় হইতে পারে, যথা, জাতি। সকল গো এবং অশ্ব বহির্জ্জগতে আছে, গোজাতি এবং অশ্বজাতি বহির্জ্জগতে আছে কি না তাহা কেবল জ্ঞাতার অনুমিতি মাত্র, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে যদিও 'গো' 'অশ্ব' শব্দ বহির্জ্জগতে আছে বলিতে হইবে, কেন-না তত্তৎ শব্দ বহির্জ্জগতে লিখিত ও উচ্চারিত হয়, কিন্তু গোজাতি অশ্বজাতি, বিশেষ বিশেষ গো ও অশ্ব ছাড়া পৃথগ্‌ভাবে জ্ঞাতার জ্ঞানে ভিন্ন বহির্জ্জগতে আছে বলা সহজ নহে। প্রত্যেক গরুতে গোজাতির সমস্ত লক্ষণ, ও প্রত্যেক

অশ্বে অশ্বজাতির সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান, কিন্তু গোজাতি বা অশ্বজাতি বিশেষ গো বা বিশেষ অশ্ব হইতে পৃথক্‌রূপে বহির্জগতে দেখা যায় না। এভাবে ভাবিতে গেলে, গোত্ব, অশ্বত্ব বহির্জগতে প্রত্যেক গো ও প্রত্যেক অশ্বের গুণ, এবং গোজাতি ও অশ্বজাতি অন্তর্জগতে দ্রব্য বলিয়া গণ্য। এই হিসাবে অনুমিত নিয়মও দ্রব্যমধ্যে গণ্য। এবং দেশ ও কাল জ্ঞানের নিয়ম হইলে তাহারাও দ্রব্যমধ্যে গণ্য।

এক্ষণে একথা বলা যাইতে পারে, বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের সকল বিষয়ই উক্ত পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্তর্জ্জগৎ

জ্ঞেয়সম্বন্ধে সাধারণতঃ কয়েকটি কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। জ্ঞেয় পদার্থ যে দুই ভাগে বিভক্ত, সেই ভাগদ্বয় অর্থাৎ অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এই অধ্যায়ে ও ইহার পরের অধ্যায়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা হইবে। তন্মধ্যে অন্তর্জ্জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর, অতএব তাহারই কথা অগ্রে বলা যাইবে।

অন্তর্জ্জগৎ প্রত্যেক জ্ঞাতারই ভিন্ন।

অন্তর্জ্জগৎ প্রত্যেক জ্ঞাতারই বিভিন্ন। আমার যাহা অন্তর্জ্জগৎ অন্য জ্ঞাতার পক্ষে তাহা বহির্জ্জগৎ, এবং অন্যের অন্তর্জ্জগৎ আমার পক্ষে বহির্জ্জগৎ। অন্তর্জ্জগৎবিষয়ক জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা লভ্য, এবং সুবিধার জন্য সেই জ্ঞান সংজ্ঞা নামে অভিহিত হইবে।

অন্তর্জ্জগৎ-বিষয়ক জ্ঞানের নাম সংজ্ঞা।

আমার অন্তরে কি হইতেছে তৎপ্রতি মন দিলেই তাহা আমি জানিতে পারি। জাগ্রৎ অবস্থার প্রতিমুহূর্ত্তের কথাই জানা যায়। নিদ্রিত অবস্থারও অনেক কথা তদবস্থাতেই স্বপ্নরূপে জানিতে পারি এবং জাগ্রত হইলেও মনে থাকে। তবে আমার গাঢ় সুষুপ্তিকালীন আমার অন্তর্জ্জগতের কোন কথার তৎকালেও সংজ্ঞা থাকে না, পরে জাগ্রৎ হইলেও তাহার কিছু স্মরণ থাকে না।

এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে অন্য বিষয়ের সংজ্ঞা থাকে না এ নিয়ম হিতকর।

অন্তরের কি বাহিরের কোন বিষয়ে মন একান্ত নিবিষ্ট থাকিলে তৎকালে অপর কোন বিষয়ের সংজ্ঞা থাকে না। ইহা সংজ্ঞার একটি সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম আমাদের পক্ষে পরম হিতকর। এই নিয়ম আছে বলিয়াই অন্তর্জ্জগতের, ও আমাদের জ্ঞানের সীমান্তর্গত বহির্জ্জগতের, বিষয়দ্বারা প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলেও বিচলিত না হইয়া আমরা বাঞ্ছিত বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিতে পারি। এই নিয়ম আছে বলিয়াই বর্ত্তমান ক্ষণিক সুখদুঃখ তুচ্ছ করিয়া স্থায়ী দুঃখ নিবারণের ও স্থায়ী সুখলাভের নিমিত্ত আমরা চেষ্টা করিতে পারি। এই নিয়ম-প্রভাবেই জ্ঞানীরা শ্রমজনিত ক্লেশ অনুভব না করিয়া দুরূহ শাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করিতে পারেন। এই নিয়মপ্রভাবেই কর্ম্মীরা সুখের প্রলোভনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কঠোর কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হয়েন। এবং এই নিয়মপ্রভাবেই যোগ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ সাধ্য, ও যোগীরা বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন। কিন্তু একবিষয়ে মনোনিবেশের নিয়ম যেমন শুভকর, এই নিয়মে অভ্যস্ত হওয়া তেমনই আয়াসসাধ্য। অতএব যত ত্বরায় একাগ্রতার সহিত মনোনিবেশ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করা যায় ততই ভাল।

সংজ্ঞার বাহিরেও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত।

এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যদিও একবিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত থাকিলে অন্য কোন বিষয়ের সংজ্ঞা হয় না, তথাপি আত্মা বিষয়ান্তরের যে সকল প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয় তাহা একেবারে নিষ্ফল যায় না, এবং শরীরের বা মনের অবস্থা বিশেষে সেই আপাততঃ অপরিজ্ঞাত বিষয় যে সংজ্ঞার সীমার বাহিরেও পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, অন্যমনস্ক থাকা প্রযুক্ত যদিও কোন সময়ে কোন বিষয় দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হওয়া সত্ত্বেও তাহা দেখিলাম বা শুনিলাম বলিয়া সংজ্ঞা হয় নাই, তথাপি শরীরের উৎকট পীড়ার অবস্থায় বা মনের উৎকট চিন্তার অবস্থায় তত্তদ্বিষয় দেখা বা শুনা গিয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে, এরূপ বিশ্বস্ত বৃত্তান্ত অনেকেই শুনিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, জ্ঞাতার সংজ্ঞার সীমার বাহিরেও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত আছে।

প্রথমে আত্মজ্ঞান ও আত্মা-অনাত্মার ভেদজ্ঞান জন্মে।

অন্তর্জগতের বিষয়মধ্যে প্রথমেই আত্মজ্ঞান ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান জন্মে। শিশুর মনে কি হয় যদিও ঠিক বলা যায় না, যতদূর আমরা বুঝিতে পারি তাহাতে বোধ হয় প্রথম সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞান জন্মে, এবং আত্মজ্ঞান সংজ্ঞার নামান্তর বলিলেও বলা যায়।

পরে অন্তরের শক্তি বা ক্রিয়া ও বাহিরের বস্তু ও বিষয়সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে।

পরে ক্রমশঃ অন্তরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা ক্রিয়া ও বাহিরের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও বিষয়সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। এবং বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেই ঘাত-প্রতিঘাত বুঝিবার নিমিত্ত এই অন্তর্জগৎশীর্ষক অধ্যায়েই বহির্জগতের দুই একটি কথার অবতারণা আবশ্যক।

এই স্থানে প্রথমেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, অন্তরের যে সকল শক্তি বা ক্রিয়ার কথা বলা হইল তাহা কাহার শক্তি বা ক্রিয়া ?

অন্তর্জগতের ক্রিয়াদি কাহার—আত্মার।

জড়বাদীরা বলেন, তাহা দেহের অর্থাৎ সজীব দেহের ক্রিয়া। চৈতন্যবাদীরা একমত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন, তাহা মনের বা অহঙ্কারের ক্রিয়া, এবং কেহ বলেন তাহা আত্মার ক্রিয়া। জড়বাদের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি আছে জ্ঞাতাশীর্ষক অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ হইয়াছে। প্রথমোক্ত শ্রেণির চৈতন্যবাদীদের মতে আত্মা নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়, এবং অন্তর্জগতের যে কিছু ক্রিয়া তাহা মনের অথবা অহঙ্কারের। আত্মা দেহবন্ধনমুক্ত ও পূর্ণ-জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে কি ভাব ধারণ করিবে তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু দেহাবচ্ছিন্ন ও অপূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্ট আত্মার সহিত মন বা অহঙ্কারের পার্থক্যের কোন প্রমাণ অন্তর্জগতের একমাত্র সাক্ষী আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে পাওয়া যায় না। অতএব অন্তর্জগতের ক্রিয়াদি আত্মার বলিয়াই পরিগণিত হইবে।[১]

বহির্জগৎ সংস্রবে অন্তর্জগতের ক্রিয়ার অগ্রেই ইন্দ্রিয়স্ফুরণ।

বহির্জগতের সংস্রবে অন্তর্জগতে যে সকল ক্রিয়া হয় তাহার অগ্রেই ইন্দ্রিয়স্ফুরণ হয়। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়। এই উভয়বিধ

---

[১] সাংখ্যদর্শন ২ অঃ ২৯ সূঃ, ও বৈশেষিক দর্শন ৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সর্ব্বশরীরব্যাপী স্নায়ুজাল ও মস্তকাভ্যন্তরস্থিত মস্তিষ্কদ্বারা সম্পন্ন হয়। সেই স্নায়ুজালের ও মস্তিষ্কের গঠন ও ক্রিয়ার বিবরণ বাহুল্যে লিপিবদ্ধ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে পাঠক শরীরতত্ত্বের ও শরীরতত্ত্বমূলক মনোবিজ্ঞানের পুস্তক[১] পাঠ করিতে পারেন। এই স্থলে কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলা যাইবে। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, ও স্পর্শন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা স্ফুরণ। সেই ক্রিয়া অতি বিচিত্র। তাহার আরম্ভ দেহে ও শেষ আত্মাতে। এই দেহের ক্রিয়া কিরূপে আত্মার ক্রিয়ায় অর্থাৎ বাহ্যবস্তুজ্ঞানে পরিণত হয় তাহা জানা যায় নাই। তবে বস্তুজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী শারীরিক ক্রিয়া প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কিরূপ তাহা শরীরবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণদ্বারা অনেক দূর আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ অতি-বিস্তৃত ব্যাপার। তাহার স্থূল কথা মাত্র সংক্ষেপে এখানে বলা যাইবে।

চক্ষুর ক্রিয়া কিরূপ।—কোন বস্তুতে আলোক পড়িলে এবং সেই আলোক চক্ষুতে অবাধে আসিতে পারিলে, চক্ষুর অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্ম শিরাজাল আছে তদুপরি দৃষ্টবস্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়। সাধারণতঃ চক্ষুর গঠন এত চমৎকার যে, সেই প্রতিকৃতি দৃষ্ট বস্তুর আকারের অবিকল ছবি হয়। তবে বার্দ্ধক্য বা রোগবশতঃ চক্ষুর দোষ জন্মিলে সে প্রতিকৃতি ঠিক হয় না। প্রতিকৃতির অবিকলতার তারতম্যের উপর দৃষ্ট বস্তুর আকারজ্ঞান বিশুদ্ধ হইবে কিনা তাহা নির্ভর করে। ঐ প্রতিকৃতি সূক্ষ্ম স্নায়ুজালের উপর অঙ্কিত হয় ও তাহাকে স্পন্দিত করে, সেই স্পন্দন মস্তিষ্কে নীত হয়, ও তদনন্তর দর্শনজ্ঞান জন্মে।

কর্ণের কার্য্য স্থূলতঃ এইরূপে নিষ্পন্ন হয়—শব্দদ্বারা শব্দবহ বায়ুর যে স্পন্দন হয় তাহা কর্ণকুহরে নীত হইয়া তত্রস্থ পটহচর্ম্মে আঘাতকরতঃ তাহাকে স্পন্দিত করে, ও সেই স্পন্দন কর্ণাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম কেশরপুঞ্জকে স্পন্দিত করে, এবং সেই স্পন্দন স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়, ও তদ্দ্বারা শব্দজ্ঞান জন্মে।

নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বকের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুর সহিত বাহ্য বস্তুর গন্ধরেণু, স্বাদরস, ও আকার উত্তাপ মিলিত হইয়া তাহাদিগকে স্পন্দিত করে, ও সেই স্নায়ুস্পন্দন মস্তিষ্কে নীত হইয়া, ঘ্রাণ, আস্বাদন, ও স্পর্শনজ্ঞান জন্মে। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের স্ফুরণ দ্বারা বহির্জগতের প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে, ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতার যে সেই জ্ঞান জন্মিতেছে এবিষয়েরও সংজ্ঞালাভ হয়।

ইন্দ্রিয়স্ফুরণ-দ্বারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জন্মে।

এতদ্ভিন্ন অন্তর্জগতের আরও কতকগুলি বিচিত্র ক্রিয়া আছে। যাহা একবার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তাহা পরে প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাকে পুনর্ব্বার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনিতে পারা যায়। যথা, একসময় বিশ্বেশ্বরের

অন্তর্জগতের অন্যান্য ক্রিয়া—স্মরণ, কল্পনা, অনুমান, অনুভব, চেষ্টা।

---

১ Foster's *Physiology* এবং Ladd's *Physiological Psychology* দ্রষ্টব্য।

মন্দির দেখিয়াছি বা বেদমন্ত্র পাঠ শুনিয়াছি। সময়ান্তরে তাহা না দেখিয়া বা না শুনিয়াও সেই মন্দিরের রূপ বা সেই মন্ত্রের শব্দবিন্যাস বলিতে পারি। এই ক্রিয়ার নাম **স্মরণ** করা, এবং যে শক্তি দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয় তাহাকে **স্মৃতি** বলে।

যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহা যেরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে ঠিক সেইরূপে স্মরণ না করিয়া, কল্পিত পরিবর্তিতরূপে তাহাকে জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনিতে পারি। যথা, অশ্ব ও হস্তী দেখিয়াছি, এবং অশ্বের ন্যায় পদাদি ও হস্তীর ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট পশুর রূপ মনের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি। সেই ক্রিয়াকে **কল্পনা** করা ও তাহা সম্পন্ন করিবার শক্তিকে **কল্পনা** বলে।

যাহা প্রত্যক্ষ বা কল্পিত হইয়াছে তাহাদিগের জাতিভাগ ও জাতির নামকরণ করিতে, এবং তাহা হইতে নূতন তত্ত্বজ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনিতে পারি। যথা, কোনস্থানে নানাবিধ জন্তু দেখিয়া কতকগুলি গোজাতি, কতকগুলি অশ্বজাতি, কতকগুলি মেষজাতি স্থির করিয়া গো, অশ্ব, মেষ নামকরণ করিতে পারি। কোনস্থানে ধূম দেখিয়া তথায় বহ্নি আছে স্থির করিতে পারি। দুইটি সরলরেখার প্রত্যেকটি আর একটি সরলরেখার সহিত সমান্তর ইহা কল্পনা করিয়া, তাহারা পরস্পর সমান্তর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। এই সকল ক্রিয়ার নাম **অনুমান**, এবং যে শক্তিদ্বারা তাহা সম্পন্ন হয় তাহাকে **বুদ্ধি** বলা যায়।

উপরি-উক্ত ক্রিয়া ভিন্ন অন্তর্জগতের আর এক শ্রেণীর ক্রিয়া আছে, যথা, সুখ, দুঃখ, প্রীতি, হিংসা, ভক্তি, ঘৃণা, অনুরাগ, বিদ্বেষ প্রভৃতি **অনুভব** করা।

এবং এতদ্ব্যতীত অন্তর্জগতের অপর একবিধ ক্রিয়া আছে, যথা, **ইচ্ছা** ও **প্রযত্ন** বা কর্ম করিবার চেষ্টা।

এই সকল ক্রিয়া বা শক্তির সম্যক্ আলোচনা অতি বিস্তৃত ব্যাপার, এবং তাহা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তবে প্রত্যেক ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা যাইবে।

আত্মার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে একথা বলা কতদূর সঙ্গত।

এইখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। স্মরণকল্পনাদি কার্য্য মনের বা আত্মার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় এ কথা বলিতে অনেকে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন মন বা আত্মা এক পদার্থ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি থাকার কোন প্রমাণ নাই। দেহের যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, মনের বা আত্মার সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে, এরূপ বোধ করা অবশ্যই ভ্রান্তিমূলক, কারণ মনের বা আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ভাগ অনুমান করা যায় না। কিন্তু স্মরণকল্পনাদি যে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই, এবং সেই সেই কার্য্য করিবার শক্তি যে মনের বা আত্মার আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং মনের বা আত্মার স্মরণকল্পনাদি

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবেচিত হওয়ার পক্ষে কোন সঙ্গত বাধা দেখা যায় না। তবে এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে আত্মার কোন কার্য্য করিবার শক্তি আছে বলিলেই সেই কার্য্যের সম্পূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান বা হেতুনির্দ্দেশ হয় না।

স্মৃতি

স্মৃতিসম্বন্ধে এই কএকটি কথা প্রধানতঃ বিবেচ্য—(১) স্মৃতির বিষয় কি কি, (২) স্মৃতির কার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়, (৩) স্মৃতির কার্য্য কি কি নিয়মের অধীন, (৪) স্মৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি কিসে হয়।

১। স্মৃতির বিষয় কি কি।

১। **স্মৃতির বিষয়।** যাহা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহা স্মরণ করা যায়। দৃষ্ট বিষয়ের স্মরণ হইলে মনে মনে তাহা চিত্রিত করা যায়, এবং স্মরণকর্ত্তা চিত্রবিদ্যায় নিপুণ হইলে সেই বিষয় অঙ্কিত করিয়া অন্যকে দেখাইতে পারেন। সেইরূপ শ্রুত বিষয়ের স্মরণ হইলে তাহার ধ্বনি আবৃত্তি করা যায়, এবং স্মরণকর্ত্তা ধ্বনি-আবৃত্তিকার্য্যে নিপুণ হইলে তাহা আবৃত্তি করিয়া অন্যকে শুনাইতে পারেন। কোন পূর্ব্ব-অনুভূত ঘ্রাণ, আস্বাদন, বা স্পর্শন, সেইরূপে স্মরণ করা যায় না। তাহা এই পর্য্যন্ত স্মরণ করা যায় যে সেই ঘ্রাণ, আস্বাদন, বা স্পর্শন, অমুক দ্রব্যের ঘ্রাণ, আস্বাদন, বা স্পর্শনের ন্যায় ইহা বলিতে পারা যায়, এবং সেইরূপ ঘ্রাণ, আস্বাদন, বা স্পর্শন, পুনরায় অনুভূত হইলে তাহা যে পূর্ব্বের ন্যায়, ইহাও বলা যাইতে পারে।

২। স্মৃতির কার্য্য কিরূপে হয়।

২। **স্মৃতির কার্য্য কিরূপে হয়।** স্মৃতির কার্য্য অতি বিচিত্র, এবং কিরূপে তাহা সম্পন্ন হয় বলা সহজ নহে। পূর্ণজ্ঞানের পক্ষে ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান, ত্রিকাল এক, এবং সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ই এক কালে সেই জ্ঞানের অনন্ত পরিধির মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু অপূর্ণজ্ঞানের পক্ষে জ্ঞাতবিষয়ের কেবল অল্পমাত্রই এককালে জ্ঞানের সীমার মধ্যে প্রকটিতভাবে থাকে, ও তাহার অধিকাংশই সেই সীমার বাহিরে অপ্রকটিতভাবে অবস্থিতি করে, এবং স্মৃতির দ্বারা কখনও চেষ্টায়, কখনও বিনা চেষ্টায় সেই সীমার মধ্যে আইসে। এই পর্য্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা অনায়াসেই জানা যায়। কিন্তু স্মৃত হইবার পূর্ব্বে সেই সকল জ্ঞাত বিষয় কোথায় কি ভাবে থাকে, ও কি প্রকারেই বা তাহারা স্মৃতির গোচর হয়, তাহা বলা সহজ নহে।

কেহ বলেন, কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিবার সময় ইন্দ্রিয়স্ফুরণ মস্তিষ্কে নীত হইয়া তথায় স্পন্দন ও কুঞ্চন হয়, এবং স্পন্দন থামিয়া গেলে জ্ঞাতবিষয় জ্ঞানের সীমার বাহিরে পড়ে, কিন্তু মস্তিষ্কের কুঞ্চন থাকিয়া যায়। পরে জ্ঞাতার ইচ্ছামত বা অন্যকারণবশতঃ তাহার সন্নিহিত বা সংস্পৃষ্ট কোন ভাগের গতি বিশেষ দ্বারা সেই কুঞ্চিত ভাগ পুনঃস্পন্দিত হইলে পূর্ব্বজ্ঞাত বিষয় স্মৃতিপথে আইসে। একথা সত্য হইতে পারে। এবং বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করিবার জন্য তদানুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি যে মনোযোগ প্রদান করি, সেই প্রক্রিয়া এ কথার সত্যতা অনেকটা প্রতিপন্ন করে। কিন্তু কথাটি সত্য হইলেও তদ্দ্বারা স্মৃতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ মর্ম্মবোধ হয় না। বিস্মৃত বিষয় স্মৃতিপথে আসিলে তাহা

যে পূর্ব্বপরিচিত বিষয়, নূতন বিষয় নহে, এ কথা কে বলিয়া দেয়? এ জ্ঞান কিরূপে জন্মে? জড়বাদী এই প্রশ্নের কোন যুক্তিসিদ্ধ উত্তর দিতে পারেন না এবং চৈতন্যবাদী কেবল এই মাত্র বলিতে পারেন যে পূর্ব্বাপরের এই সাদৃশ্যের বা একতার পরিচয় পাওয়া আত্মার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য।

প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ নিমিত্ত দেহের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সহায়তা যেরূপ আবশ্যক, পূর্ব্বপ্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান স্মৃতিপথে আনিবার নিমিত্ত দেহের অর্থাৎ মস্তিষ্কের বা অন্য কোন দেহভাগের সহায়তা সেরূপ আবশ্যক কিনা, এ বিষয়ের অনুশীলন অতীব বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা অতি কঠিন। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করা যত সহজ, মস্তিষ্কের কার্য্যকলাপ পরীক্ষা করা তদপেক্ষা অনেক দুরূহ।

৩। স্মৃতির কার্য্য কি কি নিয়মাধীন

৩। **স্মৃতির কার্য্য কি কি নিয়মাধীন।** যদিও স্মৃতির কার্য্য কিরূপে হয় স্থির করা অতি কঠিন, সেই কার্য্য কি কি নিয়মাধীন তাহার অনুশীলন অপেক্ষাকৃত সহজ। কোন বিষয় স্মরণ রাখিবার ও কোন বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করিবার নিমিত্ত নিজে কি করি ও অন্যে কি করে তৎপ্রতি প্রণিধান দ্বারা আমরা এ বিষয়ে যে তত্ত্বে উপনীত হই তাহা সংক্ষেপে এই—

প্রথমতঃ—কোন বিষয় যত অধিকক্ষণ বা অধিকবার মনোনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করি, তাহা তত অধিক দিন স্মরণ থাকে, ও বিস্মৃত হইলে তাহা তত অধিক সহজে স্মরণ হয়।

স্মরণ করিবার বিষয় কোন বাক্য হইলে, তাহা অনেক বার আবৃত্তির ফল এই হয় যে, পরে কিয়দংশ আবৃত্তি করিলে অবশিষ্টাংশ অনায়াসে আপনা হইতে আবৃত্তি হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ—স্মরণ রাখিবার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় সকলের প্রতি, ও তাহারা মূল বিষয়ের সহিত যে যেরূপে সম্বন্ধ তৎপ্রতি, বিশেষ মনোযোগ দিলে, আনুষঙ্গিক বিষয়ের কোন একটি মনে পড়িলেই মূল বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিপথে আইসে।

তৃতীয়তঃ—কোন বিস্মৃত বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, তদানুষঙ্গিক যে যে বিষয় স্মৃতিতে থাকে তাহার আলোচনা করিতে করিতে মূল বিষয় মনে পড়ে। যথা, কোন পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তির নাম বিস্মৃত হইলে, সেই নামের সঙ্গে যে যে নামের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় সেই সকল নাম মনে ভাবিতে ভাবিতে বিস্মৃত নাম স্মরণ হয়।

৪। স্মৃতির হ্রাস বৃদ্ধি কিসে হয়

৪। **স্মৃতির হ্রাসবৃদ্ধি কিসে হয়।** যেমন কোন বিষয়ের প্রতি অধিকক্ষণ বা অনেকবার মনোনিবেশ করিলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে ও ভুলিলে সহজে মনে পড়ে, তেমনই কোন বিষয়ের প্রতি অনেক দিন মনোযোগ না করিলে তাহার স্মৃতির হ্রাস হয়, এবং মধ্যে মধ্যে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলে তাহার স্মৃতির বৃদ্ধি হয়।

এতদ্ভিন্ন স্মৃতির হ্রাসবৃদ্ধির অপর কারণও আছে। শরীরের অবস্থার উপর অনেক স্থলে স্মৃতির হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। উৎকট পীড়ায় কোন কোন বিষয়ের পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হয়, আবার কখন কখন বহুদিনের বিস্মৃত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে স্মৃতিপথে আইসে। এবং বার্দ্ধক্যে সাধারণতঃ স্মৃতির হ্রাস হইতে দেখা যায়।

জড়বাদীরা স্বমত সমর্থন নিমিত্ত শেষোক্ত কথার উপর বিশেষ নির্ভর করিয়া থাকেন। কথাটাও চিন্তার বিষয় বটে। আত্মা যদি দেহাতিরিক্ত হয়, তবে দেহের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্মৃতির হ্রাস কেন ঘটে? ইহার উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, আত্মা দেহাতিরিক্ত বটে, কিন্তু যতদিন দেহাবচ্ছিন্ন ততদিন দেহের অবস্থার সহিত জড়িত, সুতরাং স্বকার্য্যে দেহ হইতে সাহায্য বা বাধা প্রাপ্ত হয়।

স্মৃতির সাহায্যার্থে নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, যথা, সংক্ষেপে সূত্ররচনা ও তদ্দ্বারা শাস্ত্র-শিক্ষা। সে সকল বিষয়ের বাহুল্যে আলোচনার স্থল এখানে নহে।

কল্পনা।

প্রত্যক্ষ দ্বারা বহির্জগতের জ্ঞানলাভ হয়। স্মৃতি পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান পুনরায় আনিয়া দেয়। কল্পনা পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়া জ্ঞাতার সাক্ষাতে আনে। সেই রূপান্তর নানা প্রকারের, ও নানা উদ্দেশে তাহা হইয়া থাকে। কখন বা আনন্দ-উদ্ভাবন ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত কল্পনা পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বিষয় ভাঙ্গিয়া গড়িয়া সুন্দরকে অধিকতর সুন্দর, ভয়ানককে অধিকতর ভয়ানক, করুণকে অধিকতর করুণ করিয়া দেখায়, যথা কাব্যগ্রন্থে। কখন বা জ্ঞান-লাভের সুবিধার নিমিত্ত কল্পনা আলোচ্যবিষয়ের জটিলভাগকে ভাঙ্গিয়া সরল করতঃ ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ও বৃহৎকে ক্ষুদ্র করতঃ বা অপরিচিতকে তৎসমভাবাপন্ন পরিচিতের পরিচ্ছদে সজ্জিত করতঃ উপস্থিত করে, যথা, বিজ্ঞানদর্শনাদি গ্রন্থে। আবার কখন বা গভীর গবেষণায় বুদ্ধি যেখানে কোন ধ্রুব অবলম্বন পাইতেছে না, কল্পনা সেখানে অস্থায়ী অবলম্বন আরোপিত করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যের সৌকর্য্য সাধন করে—যথা, বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যোম (ইথার) কল্পনা। কল্পনা যে কেবল কবির আনন্দময়ী সহচরী এ কথা ঠিক নহে। কল্পনা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরও পথপ্রদর্শনী সঙ্গিনী।

কল্পনা সম্বন্ধে দুইটি কথা বিশেষ বিবেচ্য—(১), কল্পনার বিষয়, (২), কল্পনার নিয়ম।

১। কল্পনার বিষয়।

১। কল্পনার বিষয়। পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বিষয় লইয়াই কল্পনার কার্য্য। জানা বিষয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারই সংযোগবিয়োগদ্বারা আমরা কল্পিত বিষয়ের সৃষ্টি করি। কেহ কেহ বলেন কল্পনার কার্য্য দ্বিবিধ। কখনও জানা বিষয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়া, যথা কবির কল্পনার কার্য্য। আর কখনও নূতন বিষয় সৃষ্টি করা, যথা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার বা নূতন প্রকারের যন্ত্রাদিনির্ম্মাণ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, সে নূতনের নূতনত্ব

নিরবচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ নূতনত্ব নহে, তাহা পুরাতনের যোগ ও বিয়োগদ্বারা রচিত।

২। কল্পনার নিয়ম।

২। কল্পনার নিয়ম। বর্ত্তমান ও সন্নিহিতের সহিত কল্পনার সম্বন্ধ অতি অল্প, অতীতের, ভবিষ্যতের, ও দূরস্থিতের সহিতই কল্পনার সমধিক সম্বন্ধ, ইহাই কল্পনার স্থূলনিয়ম। যাহারা বর্ত্তমান ও সন্নিকটস্থ ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত তাহাদের মনে কল্পনা অধিক স্থান পায় না, কাব্যাদি কল্পনাপ্রসূত বস্তুও তাহাদের অধিক প্রীতিপ্রদ হয় না। পক্ষান্তরে যাহাদের চিত্তে কল্পনা প্রবল তাহারা কেবল বর্ত্তমান ও নিকটস্থ বিষয় লইয়া থাকিতে পারে না, অতীত, ভবিষ্যৎ ও দূরস্থ বিষয়ে তাহাদের মন ধাবিত হয়। কল্পনা অত্যধিক প্রশমিত হইলে, মন সংকীর্ণ হইয়া যায়, ও মানুষ নিতান্ত স্বার্থপর ও অদূরদর্শী হয়। আর কল্পনা অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইলে, মনুষ্য প্রকৃত জগৎ ভুলিয়া গিয়া কল্পিত জগতে থাকিতে চাহে, এবং সত্যের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ কমিয়া যায়। অতএব কোন দিকেই আতিশয্য মঙ্গলকর নহে।

বুদ্ধি।

আমরা প্রত্যক্ষদ্বারা বহির্জগতের বিষয় জানিতে পারি। স্মৃতি পূর্ব্ব-পরিজ্ঞাত বিষয়সকল পুনরায় জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনিয়া দেয়। কল্পনা তাহা নানারূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন নূতন বিষয় সৃষ্টি করে। এবং বুদ্ধিও পূর্ব্বপরিজ্ঞাত বিষয় হইতে নানাবিধ নূতন তত্ত্ব বাহির করে। তবে কল্পনার কার্য্যে ও বুদ্ধির কার্য্যে প্রভেদ এই যে, কল্পনাপ্রসূত বিষয়সকল প্রকৃত না হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা নিরূপিত বিষয় বা তত্ত্বসকল প্রকৃত হওয়া আবশ্যক।

বুদ্ধির কার্য্য, ১। জ্ঞাত বিষয় শ্রেণিবদ্ধ করণ, ২। জ্ঞাত বিষয় হইতে নূতন তত্ত্বনিরূপণ।

বুদ্ধির কার্য্য প্রধানতঃ দুইটি—(১), জ্ঞাত বিষয় শ্রেণিবদ্ধকরণ, (২), জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়নিরূপণ।

জ্ঞাত বিষয় শ্রেণিবদ্ধ করণ।

আমাদের জ্ঞাত বিষয়সকল ক্রমশঃ এত অধিক সংখ্যক ও বিবিধ হইয়া পড়ে যে, কিছুদিনের পর তাহা শ্রেণিবদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে উত্তরোত্তর জ্ঞানলাভ ও পূর্ব্বলব্ধজ্ঞানের ফললাভ অসাধ্য হইয়া উঠে। যেমন, কোন দ্রব্য ভাণ্ডারে বহুসংখ্যক বিবিধ দ্রব্য থাকিলে, তাহা গোছাইয়া না রাখিলে নূতন দ্রব্য রাখিবার স্থান ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া যায়, এবং প্রয়োজনমত কোন দ্রব্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হয়, আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারের পক্ষেও ঠিক সেইরূপ ঘটে।

বুদ্ধি আমাদের জ্ঞাত বিষয়সকল শ্রেণিবদ্ধ করিয়া সাজায়, এবং এই শ্রেণি-বদ্ধকরণ বুদ্ধির প্রথম বিকাশ হইতেই ক্রমশঃ আরম্ভ হয়। শিশু একটি বস্তু দেখিয়া পরে সেইরূপ অপর বস্তু দেখিলে তাহাকে প্রথমোক্ত বস্তুর নাম দেয়, দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম প্রথমে এই ত্রিবিধ পদার্থের শ্রেণিবিভাগ করে, ও পরে সম্বন্ধের শ্রেণিবিভাগ করিতে শিখে। কারণ, প্রথম তিন প্রকারের পদার্থ সহজে জ্ঞেয়, এবং সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত দুর্জ্ঞেয় পদার্থ। আমরা প্রথমে মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ, ফল, প্রভৃতি দ্রব্যের,—শুক্ল, কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি বর্ণের অর্থাৎ গুণের,—গমন, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি কর্ম্মের,—শ্রেণিবিভাগ করি। পরে সূর্য্যোদয় আলোকের কারণ, বহ্নি উত্তাপের কারণ, ইত্যাদি কার্য্যকারণ সম্বন্ধের,

ও দিবার পর রাত্রি, অদ্যর পর কল্য, ইত্যাদি পূর্বাপর সম্বন্ধের, বৃক্ষে বৃক্ষে সমান, বৃক্ষে পশুতে অসমান, ইত্যাদি সাম্য বৈষম্য সম্বন্ধের শ্রেণিবিভাগ করিতে শিখি। এবং পদার্থের শ্রেণি বা জাতিবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শ্রেণি বা জাতিকে তাহার জাতীয় নামে অভিহিত করি।

বস্তুর জাতি-বিভাগ।

বস্তুর জাতি বা শ্রেণিবিভাগ তাহাদের পরস্পরের সাম্য ও বৈষম্যের উপর নির্ভর করে। সকল গো অনেক বিষয়ে সমান, অতএব তাহারা সকলেই গোজাতি, এবং যে যে গুণ বা লক্ষণ গো মাত্রেই আছে তাহার সমষ্টিকে গোত্ব বলা যায়। এবং সেইরূপে অশ্বজাতি, মেষজাতি ইত্যাদি নিরূপিত হয়। আবার গো, অশ্ব, মেষ ইত্যাদি, কতকগুলি বিষয়ে সমান, অতএব তাহাদের সকলকেই পশুজাতি, এবং যে যে লক্ষণ তাহাদের সকলেরই আছে তাহার সমষ্টিকে পশুত্ব বলা যায়। সেইরূপে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, কয়েকটি বিষয়ে সমান, অতএব তাহারা জন্তু, জাতি, ইত্যাদি। এইরূপে যতই এক জাতি হইতে তদপেক্ষা বৃহত্তর জাতিতে যাওয়া যায়, ততই একদিকে যেমন জাতির অন্তর্গত বস্তুর সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে, অপরদিকে তেমনই জাতির সামান্য গুণের সংখ্যার হ্রাস হয়।

পূর্বেই (জ্ঞেয় পদার্থের প্রকারভেদের আলোচনায়) বলা হইয়াছে বহির্জগতে পৃথক পৃথক বস্তু আছে এবং প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, ও তন্মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য আছে, এতদ্ভিন্ন বস্তু হইতে পৃথক্‌ভাবে জাতি বহির্জগতে নাই, তাহা কেবল অন্তর্জগতের বিষয়। জাতীয় গুণ বস্তুতে প্রত্যক্ষ করা যায় কিন্তু কোন জাতি বা জাতিত্ব সেই জাতীয় বিশেষ বস্তু হইতে পৃথক্‌ভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা কেবল বুদ্ধি দ্বারা অঙ্কিত বা অনুমিত হইতে পারে।

কেহ কেহ আবার বলেন বুদ্ধি ও মূর্তিদ্বারা জাতি অঙ্কিত করিতে পারে না, কেবল নাম দ্বারা জাতি নির্দেশ করিতে পারে। যথা, আমরা যখন গো-জাতি মনে করি তখন যে মূর্তি মনে হয় তাহা গোজাতির নহে, কিন্তু কোন গো বিশেষের, তবে তাহার বিশেষত্ব অর্থাৎ তাহার বিশেষ বর্ণ কি বিশেষ দৈর্ঘ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গোনামীয় জাতির লক্ষণসমষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখি। শেষ কথাটি ঠিক বটে, কিন্তু এ কথা বলিলেই প্রকারান্তরে বলা হইল যে, জাতির লক্ষণসমষ্টি একত্র করিয়া ও অন্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, বুদ্ধি ভাবিতে পারে। সুতরাং জাতি অর্থাৎ জাতীয়লক্ষণসমষ্টি কেবল নাম নহে, তাহা বোধগম্য অন্তর্জগতের বিষয়। এবং যদিও সেই সাধারণ গুণসমষ্টি মূর্তিদ্বারা স্পষ্ট অঙ্কিত করিতে গেলে সেই মূর্তিতে বিশেষ গুণসকল আসিয়া পড়ে, কোন বিশেষ গুণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সেই সামান্য গুণসমষ্টি অস্পষ্ট চিত্রস্বরূপ ভাবা যাইতে পারে ও ভাবা যায়। অন্তর্দৃষ্টিদ্বারাও এই কথা সপ্রমাণ হয়।

জাতি, বস্তু, কি কেবল নাম মাত্র।

জাতি, বস্তু কি কেবল নামমাত্র ?—এই প্রশ্ন লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে।[১] জাতি যে কেবল নাম নহে তাহা দেখান হইয়াছে। পক্ষান্তরে জাতি যে বহির্জগতের বস্তু নহে তাহাও বলা হইয়াছে। জাতি অন্তর্জগতের বিষয়ীভূত বোধগম্য বস্তু, এবং কোন বহির্জগতের বস্তুর জাতীয়গুণসমষ্টি তজ্জাতীয় প্রত্যেক বস্তুতেই অন্যান্য গুণের সঙ্গে বহির্জগতে বিদ্যমান থাকে।

নাম, শব্দ বা ভাষা চিন্তার সহায়, কিন্তু চিন্তার অনন্য উপায় নহে।

যদিও জাতি কেবলমাত্র নাম নহে, তথাপি জাতিবিষয়ক আলোচনায় নাম অতি প্রয়োজনীয়। এবং সাধারণতঃ নাম বা শব্দ বা ভাষা, কি জাতি কি বস্তু সকল বিষয়েরই চিন্তায় বিশেষ সহায়তা করে। কেহ কেহ এতদূর যান যে তাঁহাদের মতে ভাষা চিন্তার অনন্য উপায়, বিনা ভাষায় চিন্তা হইতে পারে না।[২] এ কথা ঠিক নহে। যদিও ভাষা চিন্তা-কার্য্যের সম্যক্ সাহায্য করে, এবং ভাষা না থাকিলে চিন্তা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিত না, তথাপি এ কথা বলা যায় না যে বিনা ভাষায় চিন্তা চলে না। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারি যে, যখন আমরা কোন বিষয়ের চিন্তা করি, তখন কখনও বা বস্তুর স্পষ্ট কি অস্পষ্ট রূপ ও কখনও তাহার নাম কি অপর কোন চিহ্ন লইয়া চিন্তা করি। তবে চিন্তার বিষয় বা বস্তু সূক্ষ্ম বা দুর্জ্ঞেয় হইলে, এবং তাহার নাম জানা থাকিলে, রূপ অপেক্ষা নামেরই অধিক সাহায্য লওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন যাহারা মূক ও বধির এবং লিখিত ভাষা শিখে নাই ও ওষ্ঠসঞ্চালনদৃষ্টে শব্দ নিরূপণ করিতেও শিখে নাই, তাহারা যে চিন্তা করিতে পারে না, এ কথা বলা যায় না, বরং তাহাদের কার্য্যদৃষ্টে বুঝা যায় তাহারা চিন্তা করিতে অক্ষম নহে।

যেমন অঙ্কপাতদ্বারা গণনা সহজ হয়, কিন্তু অঙ্কপাত না করিলে গণনা হয় না এ কথা বলা যায় না, সেইরূপ ভাষাদ্বারা চিন্তা সহজ হয় বটে, কিন্তু ভাষা না থাকিলে চিন্তা চলিত না এ কথাও কখন বলা যায় না।[৩]

ভাষার সৃষ্টি কিরূপে হইল।

যদিও ভাষা চিন্তার অনন্য উপায় নহে, কিন্তু চিন্তার সহিত ভাষার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে বোধ হয় চিন্তা হইতেই ভাষার সৃষ্টি। চিন্তার পরিণাম নিশ্চল, কিন্তু প্রারম্ভ চঞ্চল। প্রগাঢ় চিন্তা গভীর জলধির ন্যায় স্থির, কিন্তু অপ্রগাঢ় চিন্তা তটসমীপস্থ সিন্ধুর ন্যায় অস্থির। মনুষ্যের মনে যখন চিন্তার প্রথম উদয় হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখভঙ্গি ও দেহের অন্যান্য ভাগের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং তদ্দ্বারা শব্দ উৎপাদিত হয়। আবার

---

[১] Lewis's *History of Philosophy*, Vol. II. 24-32, Ueberweg's *History of Philosophy*, Vol. I. 360-94, দ্রষ্টব্য।

[২] Max Müller's *Science of Thought*, Chapters VI. and X. দ্রষ্টব্য।

[৩] Darwin's *Descent of Man*, 2nd Ed. p. 88 দ্রষ্টব্য।

সেই চিন্তার বিষয় অপরকে জানাইবার জন্য ব্যগ্রতা জন্মে ও তদ্দ্বারা সেই অঙ্গভঙ্গি ও তজ্জনিত শব্দ পরিবর্দ্ধিত হয়। সম্ভবতঃ এইরূপে প্রথমে অস্ফুট ভাষার ও পরে ক্রমে পরিস্ফুট ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

ভাষা সৃষ্টির সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা কেবল আনুমানিক আভাষ মাত্র। ভাষাতত্ত্ববিৎ ও দর্শনবিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ঐরূপ আভাষ দিয়াছেন এবং কেহ কেহ দুই একটা ভাষার আদিম অবস্থার উদাহরণ দর্শাইয়া উক্ত মত সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[১] ভাষার কিরূপে সৃষ্টি হইল জানিবার ইচ্ছা সকলেরই হয়, এবং তাহা জানিবার নিমিত্ত মনীষিগণ অনেক প্রয়াস পাইয়াছেন এবং নানাবিধ অনুমান কল্পনা করিয়াছেন। সেই সকল অনুমানের মধ্যে উল্লিখিত অনুমানটি অনেকদূর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাষাসৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব যে সম্যক্‌রূপে জানা গিয়াছে এ কথা বলা যায় না। বিষয়টি অতি দুরূহ। ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে দুই একটি আদিম অসভ্য জাতির ভাষা যাহার শব্দসংখ্যা অল্প ও গঠন সরল, তাহার সহিত দুই একটি সভ্যজাতির পরিমার্জিত ভাষা, যথা সংস্কৃতভাষা, মিলাইয়া দেখা, ও তত্তৎ ভাষা সম্বন্ধে উপরি-উক্ত অনুমান কতদূর খাটে তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। সেই মিলন ও পরীক্ষাকার্য্যে যে সকল শব্দ ভাষান্তর হইতে গৃহীত, বা দশ জনের ইচ্ছামত পরামর্শপূর্ব্বক কল্পিত, তাহা পরিহার করা আবশ্যক। এই দুই শ্রেণীর শব্দ ভাষার মূলসৃষ্টির কোন নিদর্শন দিতে পারে না। কোন ভাষাই সম্পূর্ণরূপে ভাষান্তর হইতে গৃহীত নহে, এবং তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে—সেই ভাষান্তরের কিরূপে সৃষ্টি হইল? দশজনে ইচ্ছামত পরামর্শ করিয়াও কোন ভাষার প্রথম সৃষ্টি করিতে পারে না, কারণ এ স্থলেও প্রশ্ন উঠে—ভাষাসৃষ্টির পূর্ব্বে দশজনের সেই পরামর্শ কোন ভাষায় হইয়াছিল? প্রকৃতপক্ষে যদিও ভাষান্তর হইতে শব্দ সঙ্কলন ও পরামর্শ করিয়া পারিভাষিকাদি নূতন শব্দ সৃষ্টি এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়া-দ্বারা ভাষার পুষ্টিসাধন হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা মূলে ভাষাসৃষ্টি কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব, উক্ত দ্বিবিধ শব্দবাদ দিয়া, মনুষ্যের আদিম অসভ্য অবস্থায় যে সকল শব্দ নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই লইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে, কিজন্য তাহারা যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই সেই অর্থবোধক হইল। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এই উপলব্ধি হয়, দ্রব্যবোধক শব্দ অপেক্ষা অগ্রে ক্রিয়াবোধক শব্দের সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব, কেননা, ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহভঙ্গি, মুখভঙ্গি ও ধ্বনি উদ্ভাবনের অধিক সম্ভাবনা। সকল শব্দই ধাতু হইতে উৎপন্ন, প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির এই মত কতকটা ঐ কথা সমর্থন করে।

---

১ Darwin's *Descent of Man*, 2nd. Ed. p. 86; Deussen's *Metaphysics*, p. 90; Max Müller's *Science of Thought*, Ch. X দ্রষ্টব্য।

যদি কেহ বলেন যে, শিশুর প্রথম বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবার সময় সে প্রায়ই বস্তুর নাম অগ্রে ও ক্রিয়ার নাম পশ্চাতে শিখে, সে কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে, ভাষার প্রথম সৃষ্টি শিশুর দ্বারা হয় নাই, যুবা ও প্রৌঢ়ব্যক্তিদ্বারা হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমানকালে শিশু ভাষা শিক্ষা করে, ভাষা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এবিষয়ের মূল পরীক্ষা করিতে গেলে যে ধাতু যে অর্থ বুঝায় তাহা কেন সে অর্থ বোধক হইল তাহাই দেখা আবশ্যক। যথা, 'অদ্' ধাতু খাওয়া (যাহা হইতে অদন শব্দ, ইংরাজি Eat শব্দ, লাটিন Edere শব্দ, গ্রীক্ ἔδειν শব্দ প্রভৃতি আসিয়াছে), বা 'স্বপ্' ধাতু নিদ্রা যাওয়া (যাহা হইতে স্বপ্ন শব্দ, ইংরাজি Sleep শব্দ, লাটিন্ Sopire শব্দ, গ্রীক্ ὕπνος শব্দ প্রভৃতি আসিয়াছে)। কেন ঐ ঐরূপ অর্থ বোধক হইল, অর্থাৎ ভক্ষণ কার্য্য কি জন্য 'অদ্' ধাতুদ্বারা ও নিদ্রা যাওয়া কি জন্য 'স্বপ্' ধাতুদ্বারা প্রকাশ করা হইল তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। বলা যাইতে পারে যে, ভক্ষণ অর্থাৎ চর্ব্বণকালে 'অদ্' এইরূপ ধ্বনি মুখ হইতে, ও নিদ্রাগমন কালে 'স্বপ্' বা ইহার কতকটা অনুরূপ ধ্বনি নাসা হইতে নির্গত হয়, কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা ঠিক কি না, এবং অনেক ধাতু আছে যাহার সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা চলে কি না, এ বিষয় বিশেষ সন্দেহের স্থল। একথার আর অধিক আলোচনা এখানে করিব না। কেবল এই মাত্র বলিব যে, ভাষাসৃষ্টির মূল তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গেলে, ভাষাতত্ত্ব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কোন্ শব্দের মূল ধাতু কি, এবং দেহতত্ত্ব অর্থাৎ কোন্ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে দেহের ও বিশেষতঃ বাগ্‌যন্ত্রের কিরূপ গতি ও তদ্দ্বারা কি অঙ্গভঙ্গি ও ধ্বনিস্ফুরণ স্বভাবসিদ্ধ, এই সকল বিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এবং সেই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন মনীষী এই রহস্য ভেদ সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবেন কি না তাহাও বলা যায় না।

ভাষার কার্য্য।

যদিও ভাষার সৃষ্টিতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়, ভাষার কার্য্য আমরা সহজেই দেখিতে পাই অতি বিচিত্র ও বিস্ময়জনক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভাষা চিন্তার প্রবল সহায়। পদার্থের নাম ও রূপ লইয়াই চিন্তা চলে, ও তন্মধ্যে রূপ অপেক্ষা নামই অধিক স্থলে অবলম্বনীয়। শব্দের শক্তি নানা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে[১] ওঙ্কার এক প্রকার সৃষ্টির সার বলিয়া বর্ণিত আছে। গ্রীসে প্লেটো[২] শব্দ বা বর্ণ অশেষ রহস্যপূর্ণ বলিয়া আভাষ দিয়াছেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রেও[৩] শব্দ সৃষ্টির আদি বলিয়া বর্ণিত আছে। শব্দদ্বারাই মন্ত্র রচিত, এবং মন্ত্রবল অসাধারণ বল। এস্থলে মন্ত্রের দৈবশক্তি মানিবার প্রয়োজন নাই। শব্দদ্বারা যে সকল বাক্য রচিত হয় তাহাকেই মন্ত্র বলা যাইতে পারে, এবং তদ্দ্বারাই সংসার শাসিত হইতেছে। শব্দ বা ভাষাদ্বারাই গুরু শিষ্যকে শিক্ষা

---

[১] অধ্যায় ১।১

[২] Cratylus দ্রষ্টব্য।

[৩] John I দ্রষ্টব্য।

দিতেছেন। ভাষাদ্বারাই এক কালের বা এক দেশের অর্জিতজ্ঞান কালান্তরে বা দেশান্তরে প্রচারিত হইতেছে। ভাষাদ্বারাই রাজা প্রজাপুঞ্জকে নিজ আজ্ঞা অনুসারে চালাইতেছেন। শব্দদ্বারাই সেনাপতি সৈন্যকে যথাস্থানে কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন। ভাষার সাহায্যেই দেশদেশান্তর ব্যাপিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতেছে। ভাষাদ্বারা আমাদের চিত্তে সদসৎ বৃত্তিসকল উত্তেজিত হইয়া আমাদিগকে শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে। এবং ভাষায় রচিত শাস্ত্রের আলোচনাতেই পরমার্থ-তত্ত্বানুসন্ধানকরতঃ সাধুগণ শান্তিলাভ করিতেছেন।

শ্রেণিবিভাগকার্য্য তিনটি নিয়মানুসারে হওয়া আবশ্যক।

শ্রেণিবিভাগের নিয়ম।

১। শ্রেণিবিভাগ নানা ভিত্তিমূলে হইতে পারে, কিন্তু একদা একভিত্তিমূলেই হওয়া কর্ত্তব্য।

মানবজাতি শ্রেণিবদ্ধ করিতে গেলে ধর্ম্মানুসারে বিভাগ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে মনুষ্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে। অথবা, দেশানুসারে ভাগ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে মনুষ্য, ভারতবাসী, চীনবাসী, বৃটেনবাসী, প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে। কিম্বা, বর্ণানুসারে ভাগ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে শুক্লবর্ণ, গৌরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রভৃতি শ্রেণিতে মনুষ্য বিভক্ত হইবে। কিন্তু একদা এরূপ বলা সঙ্গত নহে যে, মনুষ্য কতকগুলি হিন্দু, কতকগুলি বৌদ্ধ, কতকগুলি ভারতবাসী, কতকগুলি চীনবাসী, কতকগুলি গৌরবর্ণ ও কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ। কারণ, একই মনুষ্য হিন্দু ভারতবাসী ও গৌরবর্ণ, অথবা হিন্দু ভারতবাসী ও কৃষ্ণবর্ণ, অথবা বৌদ্ধ ভারতবাসী ও কৃষ্ণবর্ণ, অথবা বৌদ্ধ চীনবাসী ও গৌরবর্ণ হইতে পারে।

২। বিভাজ্য বিষয়গুলি বিভাগের কোন না কোন এক শ্রেণির মধ্যে আসা আবশ্যক।

এরূপ হইলে চলিবে না যে বিভাজ্য বিষয় মধ্যে কতকগুলি কোন শ্রেণির মধ্যেই আসিল না।

৩। বিভাগের শ্রেণিগুলি পরস্পর পৃথক্ হওয়া আবশ্যক।

বিভাজ্য বিষয়ের মধ্যে কোনটি একাধিক শ্রেণির মধ্যে আইসে এরূপ হইলে চলিবে না।

জ্ঞাত বিষয় হইতে নূতন বিষয়-নিরূপণ।

বুদ্ধি জ্ঞাতবিষয় শ্রেণিবদ্ধ করিয়া অর্থাৎ তদনুসারে জাতিবিভাগ ও জাতীয় নামকরণ করিয়া, সেই সকল জ্ঞাত বিষয় হইতে নূতন নূতন বিষয় নিরূপণ করে। সেই নূতন বিষয় নিরূপণ-কার্য্য দ্বিবিধ—বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব হইতে সাধারণ তত্ত্বনির্ণয়, ও সাধারণ তত্ত্ব হইতে বিশেষ তত্ত্বনির্ণয়। (১) শিলা পূর্ব্বে যতবার জলে ফেলা গিয়াছে ততবারই ডুবিয়াছে, অতএব পরে শিলা যতবার জলে ফেলা যাইবে ততবারই ডুবিবে। (২) লৌহ যতবার জলে

ফেলা হইয়াছে ততবার ডুবিয়াছে, অতএব পরে লৌহ যতবার জলে ফেলা যাইবে ততবার ডুবিবে। (৩) শিলা, লৌহ প্রভৃতি জল অপেক্ষা ভারী বস্তু অর্থাৎ যে বস্তুর কোন আয়তন তৎসমান আয়তনের জল অপেক্ষা ওজনে অধিক, তাহা জলে ডুবিয়া যায়, অতএব জল অপেক্ষা ভারী সকল বস্তুই জলে ডুবিবে। এই তিনটি বুদ্ধির প্রথমোক্ত প্রকারের কার্য্যের অর্থাৎ বিশেষ তত্ত্ব হইতে সাধারণ তত্ত্ব-নিরূপণের দৃষ্টান্ত। (৪) জল অপেক্ষা ভারী সকল বস্তুই জলে ডুবে, পিত্তল জল অপেক্ষা ভারী, অতএব পিত্তল জলে ডুবিবে। এইটি বুদ্ধির দ্বিতীয়োক্ত প্রকারের কার্য্যের অর্থাৎ "জল অপেক্ষা ভারি সকল বস্তুই জলে ডুবে" এই সাধারণ তত্ত্ব হইতে "পিত্তল জলে ডুবিবে" এই বিশেষ তত্ত্ব-নিরূপণের দৃষ্টান্ত। (৫) দুইটি সরলরেখা ভূমি বেষ্টন করিতে পারে না, সম্মুখে দুইটি সরলরেখা রহিয়াছে, ইহারা কোন ভূমি বেষ্টন করিতে পারিবে না। —ইহাও একটি তদ্রূপ দৃষ্টান্ত। বুদ্ধির এই দ্বিবিধ অনুমানকার্য্য, অর্থাৎ বিশেষ তত্ত্ব হইতে সাধারণ তত্ত্বের অনুমান, এবং সাধারণ তত্ত্ব হইতে বিশেষ তত্ত্বের অনুমান, সংক্ষেপে সামান্যানুমান ও বিশেষানুমান এই দুই নামে অভিহিত হইতে পারে। এই দ্বিবিধ অনুমানসম্বন্ধে কয়েকটি বলিবার কথা আছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

সামান্যানুমান ও বিশেষানুমান।

অনুমানসম্বন্ধীয় স্মরণীয় কথা।

১। উল্লিখিত প্রথম দৃষ্টান্তত্রয়ে বিশেষ তত্ত্ব হইতে যে সাধারণ তত্ত্ব নিরূপণ করা হইল তাহার ভিত্তি কি ইহা অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক স্থলেই এই সাধারণ তত্ত্বটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে—প্রকৃতির কার্য্য সমভাবে চলে, অর্থাৎ তাহা তুল্য স্থলে তুল্য। এই কথা স্বীকার করিলেই তবে বলিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বে যখন শিলা জলে ডুবিয়াছে তখন পরেও সেইরূপ শিলা সেইরূপ জলে ডুবিবে। এভাবে দেখিতে গেলে উল্লিখিত চতুর্থ দৃষ্টান্তে ও প্রথমে উল্লিখিত তিনটি দৃষ্টান্তে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না, উভয় স্থলেই সাধারণ তত্ত্ব হইতে বিশেষ তত্ত্বের অনুমান করা হইয়াছে। অতএব অনুমান মাত্রই সাধারণ তত্ত্ব হইতে অথবা সাধারণ তত্ত্বের সাহায্যে বিশেষ তত্ত্বের অনুমান।

২। বিশেষ তত্ত্বসমূহের মধ্যে কোন বন্ধন বা কার্য্যসাধক সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা হইতে কোন সাধারণ তত্ত্বের অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। যথা, শিলা জলে ডুবে এবং শিলা কৃষ্ণবর্ণ, লৌহ জলে ডুবে এবং তাহাও কৃষ্ণবর্ণ, মৃৎপিণ্ড জলে ডুবে এবং তাহাও কৃষ্ণবর্ণ, এই সকল বিশেষ তত্ত্ব হইতে যদি এই সাধারণ তত্ত্বের অনুমান করা যায় যে, কৃষ্ণবর্ণ বস্তু মাত্রই জলে ডুবিবে, সে অনুমান স্পষ্ট অসিদ্ধ, কারণ বর্ণের কৃষ্ণত্ব ডুবা-ভাসার কোনরূপে কার্য্যসাধক লক্ষণ নহে। আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। ১ ও ২ যোগে ৩, ইহার ১ ভিন্ন ভাজক নাই। ২ ও ৩ যোগে ৫, ইহার ১ ভিন্ন ভাজক নাই। ৩ ও ৪ যোগে ৭, ইহারও ১ ভিন্ন ভাজক নাই। এই তিনটি বিশেষ তত্ত্ব হইতে যদি এরূপ সাধারণ তত্ত্ব অনুমান করিতে যাই যে, কোন দুইটি পর পর সংখ্যার যোগে যে

সংখ্যা হয় তাহার ১ ভিন্ন ভাজক নাই, তবে সে অনুমান স্পষ্টই ভ্রান্ত, কারণ উক্ত তিনটি বিশেষ দৃষ্টান্তের পরেই যে দৃষ্টান্তটি আইসে, তাহা ৪ ও ৫ যোগে, সেই যোগফল ৯, ও তাহার ১ ভিন্ন ৩ একটি ভাজক। তবে যদি উক্ত তিনটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হইতে এই সাধারণ তত্ত্ব অনুমান করা যায় যে, কোন পর পর দুইটি সংখ্যা যোগ করিলে যোগফল অযুগ্ম হইবে, তাহা সিদ্ধ, কারণ এ স্থলে বিশেষ তত্ত্বগুলির মধ্যে এই বন্ধন আছে যে, দুইটি পর পর সংখ্যা লইতে গেলে একটি যুগ্ম ও অপরটি অযুগ্ম হইতেই হইবে। এবং যুগ্মাযুগ্মের যোগফল অবশ্যই অযুগ্ম। অতএব বিশেষ তত্ত্বগুলি অসম্বদ্ধ হইলে, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কোন বন্ধন না থাকিলে, তাহা হইতে কোন সাধারণ তত্ত্বের অনুমান সিদ্ধ নহে।

৩। উপরি-উক্ত অনুমিত সাধারণ তত্ত্বের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথা, লৌহ কি পিত্তল পিণ্ডাকারে না লইয়া তাহাতে ফাঁপা দ্রব্য গড়িয়া জলে ফেলিলে সেই দ্রব্য ভাসিবে। এবং এই ব্যতিক্রম পর্য্যালোচনা করিলে আর একটি সাধারণ তত্ত্ব নিরূপিত হয়, যথা, কোন বস্তু যদি এরূপ আকারে গঠিত হয় যে আপন ভার অপেক্ষা অধিক ওজনের জল সরাইয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে সেই বস্তু জলে ভাসিবে।

বিশেষ তত্ত্ব হইতে সাধারণ তত্ত্বের অনুমানসম্বন্ধে অনেকগুলি সূক্ষ্ম নিয়ম আছে তাহার আলোচনা এখানে করা গেল না।

প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনুমানদ্বারা প্রভূত পরিমাণে অধিক জ্ঞান লাভ করা যায়। বহির্জগৎ বিষয়ক অধিকাংশ এবং অন্তর্জগৎ বিষয়ক প্রায় সমস্ত জ্ঞানই অনুমানলব্ধ।

স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব—নির্ব্বিকল্প জ্ঞান ও সবিকল্প জ্ঞান।

সাধারণ বা বিশেষ তত্ত্ব হইতে অনুমিত তত্ত্ব ভিন্ন আর কতকগুলি তত্ত্ব আছে যাহা আত্মা আপনা হইতেই নিরূপণ করে, এবং যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব বলা যায়। যথা, কোন দুইটি বস্তুর প্রত্যেকটি যদি তৃতীয় একটি বস্তুর সহিত সমান হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুদ্বয় সমান। স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব ও গণিতশাস্ত্রের তত্ত্ব, যথা, ২ ও ৩এর যোগফল ৫, এই সকল তত্ত্বসম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে তাহা নির্ব্বিকল্প জ্ঞান, অর্থাৎ তাহাতে কোন সংশয় থাকে না ও তদ্বিপরীত কল্পনা করা যায় না। অন্য প্রকারের তত্ত্বের বিপরীত কল্পনা করা যাইতে পারে। ২ ও ৩এর যোগফল ৫ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু লৌহ এরূপ হইতে পারিত যে তাহা জলে ভাসিবে, এ কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি। কেহ কেহ বলেন, এই দুই প্রকার তত্ত্বের কোন মূলতঃ প্রভেদ নাই, তবে এক শ্রেণির তত্ত্বের কখনও কোন ব্যতিক্রম দেখি নাই, সেইজন্য তদ্বিপরীত কল্পনা করিতে পারি না, অপর শ্রেণির তত্ত্বের প্রকারান্তরে ব্যতিক্রম দেখা যায়, ও তজ্জন্যই তাহার বিপরীত কল্পনা করা অসাধ্য হয় না।[১] কিন্তু এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

[১] Mill's *Logic*, Bk. II, Ch. V.

২ ও ৩ যোগে যে ৫ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, এ ধ্রুব ধারণা বারংবার পরীক্ষার ফল নহে। এবং যদিও কোন স্থলে এরূপ দেখা যাইত যে, কোন বিশেষ প্রকারের বস্তুর দুইটি ও তিনটি একত্র করিবামাত্র তাহাদের অতিরিক্ত সেইরূপ আর একটি বস্তু উৎপন্ন হইয়া বস্তুর সংখ্যা ছয় হইত, তাহা হইলেও আমরা বলিতাম না যে, ২ ও ৩ যোগে ৬ হয়। আমরা সে স্থলেও বলিতাম ২ ও ৩ যোগে ৫ হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অতিরিক্ত বস্তু উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে, অনেক স্থলে কখনও কোন ব্যতিক্রম না দেখিয়াও আমরা ব্যতিক্রম কল্পনা করিতে পারি, যথা, লৌহের জলে ভাসা।

জ্ঞান কোথাও নির্ব্বিকল্প এবং কোথাও সবিকল্প হওয়ার কারণ কি?

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, জ্ঞান কোন স্থলে নির্ব্বিকল্প ও কোন স্থলে সবিকল্প হওয়ার কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে, যথা—যদি কোন দ্রব্যের লক্ষণে যে গুণ নিহিত, সেই গুণ সেই দ্রব্যে আছে বলা যায়, তাহা হইলে সেই কথাসম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান জন্মিবে তাহা অবশ্যই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান, ও তদ্বিপরীত কথা কখন কল্পনাও করা যাইতে পারিবে না, কারণ কোন দ্রব্য তাহার লক্ষণের বিপরীত হইতে পারে না। একথা ঠিক বটে, কিন্তু ইহা-দ্বারা নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্প জ্ঞানের কারণ নির্দ্দেশ হইল না, কেন-না, যদিও "২ ও ৩ যোগে ৫ হয়" এ স্থলে দুই ও তিন যোগের লক্ষণ পাঁচ হওয়া এরূপ বলা যাইতে পারে, কিন্তু "সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণে অঙ্কিত সমবাহু সমকোণী চতুর্ভুজ তাহার অপর ভুজদ্বয়ে অঙ্কিত তদ্রূপ চতুর্ভুজদ্বয়ের সমষ্টির সমান" এ স্থলে সমকোণী ত্রিভুজের লক্ষণে উল্লিখিত চতুর্ভুজত্রয়ের সম্বন্ধ স্বরূপ গুণ নিহিত থাকা বলা যায় না, অথচ এই তত্ত্ববিষয়ে আমাদের জ্ঞান যে নির্ব্বিকল্প তাহাতেও সন্দেহ নাই। উক্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর বোধ হয় এই—যেখানে কোন তত্ত্বের উল্লিখিত দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান জন্মে, সেখানে সেই তত্ত্বসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নির্ব্বিকল্প, এবং যেখানে তত্ত্বের প্রতিপাদ্য দ্রব্যের ও গুণের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ, সেখানে সেই তত্ত্বের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সবিকল্প। সমকোণী ত্রিভুজ কি, ও তাহার বাহুত্রয়ে অঙ্কিত সমবাহু সমকোণী চতুর্ভুজ কি, এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানি, সুতরাং তদ্বিষয়ক উক্ত তত্ত্বের যে জ্ঞান তাহা নির্ব্বিকল্প। কিন্তু জল ও লৌহের প্রকৃতি কি প্রকার, ও তাহাদের আভ্যন্তরিক গঠন কিরূপ, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানি না, সুতরাং লৌহ জলে ডুবে এ তত্ত্বসম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা সবিকল্প। কিন্তু যদি জল ও লৌহসম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকিত, অর্থাৎ যদি জল ও লৌহের সমস্ত গুণ ও তাহাদের আভ্যন্তরিক গঠন আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতাম, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিত জানিতে পারিতাম যে, লৌহ জলে কখনও ভাসিতে পারে না। অর্থাৎ লৌহ ও জল-সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে আমরা একথা মনেও করিতে পারিতাম না যে, সৃষ্টি এরূপ হইতে পারিত যাহাতে লৌহ জলে ভাসে।

জ্ঞানের অপূর্ণতাপ্রযুক্তই যে অসম্ভবকে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, তাহার একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিব। কোন ব্যক্তি একটি নূতন বাটী প্রস্তুত করেন। তাহা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং তাহার দক্ষিণাংশ অন্দর ও উত্তরাংশ সদর, সুতরাং সদরের ঘরগুলিতে দক্ষিণে বাতাস আইসে না। ইহা দেখিয়া গৃহস্বামীর একজন সুশিক্ষিত ও সুবুদ্ধি বন্ধু বাটীর রচনাকৌশলের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলেন, যখন বাটীর পূর্ব্বদিকে অনেক জমি রহিয়াছে তখন বাটী অনায়াসেই পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা করিয়া পূর্ব্বভাগ অন্দর ও পশ্চিমভাগ সদর করিতে পারা যাইত, এবং তাহা হইলে উভয় ভাগের ঘরেই দক্ষিণে বাতাস আসিত। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, পূর্ব্বদিকের সেই জমি গভীর পুষ্করিণীভরাটি ও তাহার উপর গৃহনির্ম্মাণ অত্যধিক ব্যয়সাধ্য। তাহা জানিলে বাটী পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা করিয়া নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর বলিয়া তিনি কখনই মনে করিতেন না।

অনুমিতির নিয়ম।

বিশেষ তত্ত্ব হইতে সাধারণ তত্ত্বের অনুমান ও সাধারণ তত্ত্ব হইতে বিশেষ তত্ত্বের অনুমান, এই উভয়বিধ অনুমানের প্রক্রিয়া একই মূলনিয়মের অধীন। সে নিয়ম এই—

যদি কোনজাতীয় দ্রব্যমাত্রেরই কোন গুণ থাকে, অথবা কোনজাতীয় প্রত্যেক বিষয়সম্বন্ধেই কোন কথা বলা যাইতে পারে,

এবং যদি কোন বিশেষ দ্রব্য বা বিষয় সেই জাতির অন্তর্গত হয়,

তাহা হইলে সেই বিশেষ দ্রব্যে সেই গুণ আছে, অথবা সেই বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে সেই কথা বলা যাইতে পারে।

বিশেষ তত্ত্ব হইতে সাধারণ তত্ত্বানুমানের দৃষ্টান্ত—

যেখানে ধূম দেখা গিয়াছে সেইখানেই বহ্নি ছিল। অতএব যেখানে ধূম দেখা যাইবে সেইখানেই বহ্নি থাকিবে।

এখানে "যে স্থলে যেরূপ দেখা গিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে তত্তুল্য স্থলে সেইরূপ দেখা যাইবে" এই সাধারণ তত্ত্বটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এবং এই অনুমিতির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে হইবে—

এক স্থলে যেরূপ দেখা গিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে তত্তুল্য সকল স্থলে সেইরূপ দেখা যাইবে।

ধূম থাকিলে বহ্নি থাকা—এক স্থলে দেখা গিয়াছে।

অতএব ধূম থাকিলে বহ্নি থাকা তত্তুল্য সকল স্থলেই প্রকৃতির নিয়মানুসারে দেখা যাইবে।

সাধারণ তত্ত্ব হইতে বিশেষ তত্ত্বানুমানের দৃষ্টান্ত—

যে স্থলে ধূম থাকে সেইস্থলেই বহ্নি থাকে।

এই পর্ব্বতে ধূম আছে।

অতএব এই পর্ব্বতে বহ্নি আছে।

শেষের দৃষ্টান্তে অনুমান-প্রক্রিয়া যে উপরি-উক্ত নিয়মানুসারে হইল তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

সামান্যানুমান ও বিশেষানুমান এই দ্বিবিধ কার্য্যদ্বারা আমাদের জ্ঞানের পরিধি এতই বিস্তৃত হইয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। গণিতশাস্ত্রের অসংখ্য জটিল দুরূহ তত্ত্বাবলী ক-একটি মাত্র সরল স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের উপর নির্ভর করে অনুমিত হইয়াছে। এবং জড়বিজ্ঞানের বিশ্বব্যাপী তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষলব্ধ অত্যল্পসংখ্যক বিশেষত্ব হইতেই অনুমিত। এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে গেলে মনে হয়, মনুষ্যের বুদ্ধি তাহার ক্ষুদ্র নশ্বর দেহ হইতে কখনই উদ্ভূত হইতে পারে না, তাহা অবশ্যই অসীম অনন্ত পরমাত্মার অংশ।

বুদ্ধির আর একবিধ কার্য্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়।

এতদ্ভিন্ন বুদ্ধির আর একটি কার্য্য আছে—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়। বুদ্ধির এই কার্য্য করিবার শক্তিকে কখন কখন বিবেকশক্তি বলা যায়। এই কার্য্য প্রধানতঃ কর্ম্মবিভাগের বিষয় এবং তাহার বিশেষ আলোচনা সেই বিভাগে "কর্ত্তব্যতার লক্ষণ" নামক অধ্যায়ে করা যাইবে। এস্থলে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যেমন বস্তুর ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ত্ব, বা শুক্লত্ব কৃষ্ণত্ব, আমরা প্রত্যক্ষদ্বারা স্থির করিতে পারি, তেমনই কার্য্যের কর্ত্তব্যতা অকর্ত্তব্যতা, বা ন্যায় অন্যায়, আমরা বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিতে পারি। সাধারণতঃ ক্ষুদ্রবৃহতের বা শুক্লকৃষ্ণের পার্থক্যের মত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বা ন্যায়ান্যায়ের পার্থক্যজ্ঞানও সহজেই জন্মে। কিন্তু এ কথার প্রতি এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের পার্থক্য এত সহজে জ্ঞেয়, তবে তাহা লইয়া অনেক সময় এত মতভেদ হয় কেন। তাহার উত্তর এই যে, যেমন ক্ষুদ্রবৃহতের সাধারণ পার্থক্য সহজে জ্ঞেয় হইলেও, অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলে, যথা, একটি গোল ও একটি চতুষ্কোণ বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি বড় কোন্‌টি ছোট বলা কঠিন, অথবা যেমন শুক্লকৃষ্ণের সাধারণ পার্থক্য সহজে জ্ঞেয় হইলেও অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলে, যথা, ঈষৎ-ধূসরবর্ণ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে, কোন্‌টিকে শুক্ল ও কোন্‌টিকে কৃষ্ণ বলা যাইবে ঠিক করা কঠিন, সেইরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পার্থক্য সাধারণতঃ সহজে জ্ঞেয় হইলেও, বিশেষ বিশেষ স্থলে কোন্ কার্য্যটি কর্ত্তব্য ও কোন্‌টি অকর্ত্তব্য বলা যাইবে তাহা স্থির করা সহজ হয় না, অনেক ভাবিয়া তাহা স্থির করিতে হয়, এবং সময়ে সময়ে তৎসম্বন্ধে মতভেদ ঘটে।

অনুভব।

উপরি-উক্ত ক্রিয়া ভিন্ন অন্তর্জগতের আর এক শ্রেণির ক্রিয়া আছে যাহাকে **অনুভব** বলা যায়, এবং আত্মার যে শক্তি দ্বারা সেই শ্রেণির ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে অনুভব শক্তি বলা যায়। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, অনুভব এক প্রকার জ্ঞান। তবে অন্য প্রকার জ্ঞান ও অনুভবের প্রভেদ এই যে, অনুভব কার্য্যে জানিবার বিষয় কোন সত্য বা তত্ত্ব নহে, তাহা জ্ঞাতার নিজের সুখ বা দুঃখ বা অন্যরূপ অবস্থা।

আমরা আমাদের যে সকল অবস্থা অনুভব করি, তন্মধ্যে কতকগুলি দেহের অবস্থা, যথা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, এবং কতকগুলি মনের অবস্থা, যথা, ক্রোধ,

স্নেহ ইত্যাদি। তবে শেষোক্ত অবস্থাগুলি মনের অবস্থা হইলেও তদ্দ্বারা শরীরেরও অবস্থান্তর ঘটে

স্বার্থপর ভাব ও পরার্থপর ভাব।

আমাদের অনুভূত অবস্থা বা ভাবের মধ্যে কতকগুলি স্বার্থপর ও কতকগুলি পরার্থপর, যথা, ক্ষুধাতৃষ্ণাদি শরীরের ভাব, এবং লোভক্রোধাদি মনের ভাব স্বার্থপর, স্নেহ, দয়া, ভক্তি আদি ভাব পরার্থপর।

সংযত স্বার্থপর ভাবের কার্য্য নিতান্ত অশুভকর নহে, ও সময়ে সময়ে আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, এবং অসংযত পরার্থপর ভাবের কার্য্যও সকল স্থলে শুভকর হয় না, ও কখন কখন আত্মোন্নতির বাধা জন্মায়। তবে স্বার্থপর ভাবের সংযম কঠিন, ও তাহার অসংযত কার্য্য অশেষ অনিষ্টের কারণ, এইহেতু তাহা হেয়। এবং পরার্থপর ভাবের আতিশয্যের আশঙ্কা ও তদ্দ্বারা অনিষ্ট সম্ভাবনা অতি অল্প, এই জন্য তাহা আদরণীয়।

ষড়্‌রিপু।

স্বার্থপর ভাবের মধ্যে ছয়টি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, আমাদের ষড়্‌রিপু অর্থাৎ শত্রু বলিয়া পরিগণিত। এবং পরার্থপর ভাবগুলি সদ্‌গুণ বলিয়া বর্ণিত।

স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধ ও মিলন।

স্বার্থপর ভাবগুলি একেবারে তিরোহিত হইলে আত্মরক্ষার ব্যাঘাত হইতে পারে, এ আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেন-না সে তিরোভাবের সম্ভাবনা অতি অল্প। এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনিষ্ট ঘটিবার পূর্ব্বে সাবধান হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ উপায়। পক্ষান্তরে, পরার্থপর ভাবের কার্য্যদ্বারা প্রকৃত স্বার্থসাধনের ব্যাঘাত না হইয়া বরং অনেক স্থলে তাহার সহায়তা হয়।

যেমন রোগে পড়িয়া পরে রোগমুক্ত হইবার চেষ্টা অপেক্ষা, প্রথম হইতে রোগ এড়াইবার চেষ্টা অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ, তেমনই অনিষ্টের মধ্যে পড়িয়া অনিষ্টকারীর নির্য্যাতন চেষ্টা অপেক্ষা অনিষ্ট এড়াইবার চেষ্টা অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ। তবে সকল সময়ে তাহা সাধ্য নহে। যখন তাহা সাধ্য না হয় তখন অনিষ্টকারীর নির্য্যাতন আত্মরক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে তাহা একপ্রকার আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

উপরে বলা হইয়াছে, পরার্থপর ভাবের কার্য্যদ্বারা প্রকৃত স্বার্থের ব্যাঘাত হয় না। ফলতঃ যদিও জীবজগতের নিম্নস্তরে স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধস্থলে স্বার্থপর ভাবই কর্ম্মের প্রধান প্রবর্ত্তক, কিন্তু উচ্চস্তরে অর্থাৎ মনুষ্যমধ্যে স্বার্থ ও পরার্থ এত অবিচ্ছিন্নরূপে সম্বদ্ধ যে, প্রকৃত স্বার্থ পরার্থ ছাড়া হইতে পারে না। স্থূলদর্শী ও অদূরদর্শী লোকেরা মনে করিতে পারেন যে পরার্থ অগ্রাহ্য করিয়া স্বার্থসাধন সহজ, কিন্তু একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সহিত দেখিলেই জানা যায় যে, সে স্বার্থসাধন সুসাধ্য নহে, এবং স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ, আমি ঐরূপ করিলে আমার ন্যায় প্রকৃতির অপর লোকে আমার স্বার্থনাশের চেষ্টা করিবে, ও আমি একা তাহা নিবারণ করিতে পারিব না। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা আমার ন্যায় প্রকৃতির নহে, আমা অপেক্ষা ভাল, তাহারা আমার অন্য অনিষ্ট না করুক, আমাকে দমন করিবার চেষ্টা করিবে। এবং

তৃতীয়তঃ, যদিও কেহ কিছুই না করে, আমি নিজের কার্য্যেই নিজে ঘোরতর অসুখী হইব, কারণ আমার আকাঙ্ক্ষা অসংযতরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে এবং আমাকে অসন্তোষ ও অশান্তিজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

স্বার্থে ও পরার্থে যে বিরোধ আছে তাহার সামঞ্জস্য করা বুদ্ধির একটি প্রধান কার্য্য।

সুখদুঃখ। সুখদুঃখ কেবল অনুভব ক্রিয়ার নহে, অন্তর্জগতের সকল ক্রিয়ারই অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী। কেহ কেহ এ কথা ঠিক কি না সন্দেহ করেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যতদূর জানা যায় তাহাতে সে সন্দেহের কারণ নাই। একথা সত্য বটে, যখন অন্তর্জগতের জ্ঞানবিষয়ক বা কর্ম্মবিষয়ক কোন ক্রিয়া অতি প্রবলভাবে সম্পন্ন হইতে থাকে, তখন তদানুষঙ্গিক সুখদুঃখের প্রতি মনোনিবেশ অতি অল্প থাকায় তাহা সম্পূর্ণ অনুভূত হয় না। কিন্তু তাহা যে একেবারে থাকে না বা একেবারে অনুভূত হয় না, এ কথা বলা যায় না।

যদিও অন্তর্জগতের ক্রিয়ামাত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে হয় সুখ না হয় দুঃখ অবশ্যই অনুভূত হইবে, কোন্ ক্রিয়ার সঙ্গে সুখ ও কোন্ ক্রিয়ার সঙ্গে দুঃখ অনুভূত হইবে তাহার স্থিরতা নাই, এবং তাহা অভ্যাস ও জ্ঞানের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। ভাল ক্রিয়ার সঙ্গে সুখানুভব ও মন্দ ক্রিয়ার সঙ্গে দুঃখানুভব স্বভাবসিদ্ধ, তবে কুঅভ্যাসের ও অজ্ঞানতার ফলে অনেক সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব অভ্যাস ও শিক্ষা এইরূপ হওয়া কর্ত্তব্য যে ভাল কার্য্যেই সুখানুভব ও মন্দ কার্য্যে দুঃখানুভব হয়।

সুখদুঃখ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে যাহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মনু কহিয়াছেন—

> "सर्व्वं परवशं दुःखं सर्व्वमात्मवशं सुखं।
> एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः॥"
>
> (৪, ১৬০।)

"যাহা পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা আত্মবশ তাহাই সুখ। সুখদুঃখের এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।"

অন্যের বশবর্ত্তী হওয়াই দুঃখ, আপনার ইচ্ছা মত চলিতে পারিলেই সুখ, এই ইহার স্থূলার্থ। কিন্তু ইহার ভিতর একটি গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত আছে। যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, এস্থলে কেবল রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক অধীনতানিবন্ধন দুঃখের কথা হইতেছে না। তদ্ব্যতীত আরও নানাবিধ পরাধীনতা আছে, যথা, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অধীনতা, এবং তন্নিবন্ধন অনেক দুঃখ আছে। যাহা কিছু পরবশ তাহাই যখন দুঃখ, এবং যখন আমি অর্থাৎ আমার আত্মা ভিন্ন আর সকলই পর, সর্ব্বদা আমার বশ নহে, এমন কি যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা আমার বলি তাহা অর্থাৎ আমার দেহও আমার বশ নহে, রোগগ্রস্ত হইলে আপন হস্তপদাদিও ইচ্ছামত চালাইতে পারি

না, তখন অন্যের বস্তুর উপর যাহা কিছু নির্ভর করে তজ্জনিত সুখের কামনা বিফল। আমার সুখ কেবল আমার উপরই নির্ভর করিবে, অন্য কাহারও কি অন্য কিছুরই উপর নির্ভর করিবে না, এই ধারণা ও তদনুসারে চিত্ত স্থির করাই প্রকৃত সুখলাভের একমাত্র উপায়। এইখানে—

"स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्तः
सुशान्तसर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः।
अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः
कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः॥"

"যিনি নিজের আনন্দে নিজে সন্তুষ্ট, যাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত, যিনি দিবা-নিশি ব্রহ্মে অনুরক্ত, তিনি কৌপীনধারী হইলেও ভাগ্যবান।"—শঙ্করাচার্য্যের এই অমূল্য বাক্য মনে পড়ে। বিদ্যাভিমানী মনে করেন বিদ্যাদ্বারা সমস্তই আত্মবশ করিবেন। বলাভিমানী মনে করেন বলদ্বারা সমস্তই আত্মবশ করিবেন। কিন্তু বিদ্যানুশীলন বা বলপরিচালন নিমিত্ত যে দেহের সাহায্য আবশ্যক সেই দেহই তাঁহাদের বশ নহে। দুঃখ এড়াইবার এবং সুখলাভ করিবার নিমিত্ত জীবমাত্রই অনবরত ব্যস্ত, কিন্তু পরাধীন সুখের অন্বেষণ অনেক স্থলে বিফল এবং সর্ব্বত্রই কষ্টকর। প্রকৃত সুখ মনুষ্যের নিজের হাতে, তাহাতে অন্য কাহারও অনিষ্ট ঘটে না। আত্মজ্ঞানই তাহার উপাদান। সেই সুখ লাভ করা কঠিন, কিন্তু অসাধ্য নহে। সামান্য যশ লাভের নিমিত্ত মনুষ্য কত দুঃসহ ক্লেশ অবাধে সহ্য করিতে পারে, আর সেই নিত্য পরমানন্দলাভের নিমিত্ত অনিত্য দুঃখ অবহেলা করিতে পারিবে না?

ইচ্ছা।

অন্তর্জ্জগতের আর এক শ্রেণির ক্রিয়া আছে, যাহাকে **ইচ্ছা** নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই ক্রিয়া জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখে, এবং এই পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ কর্ম্মবিষয়ক ভাগে ইহার বিশেষ আলোচনা-স্থল। তবে অন্তর্জ্জগতের ক্রিয়া বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করা গেল, এবং কিঞ্চিৎ আলোচনাও করা যাইবে।

ইচ্ছা সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, এবং তাহা সদসৎ ও নানাবিধ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ।

ইচ্ছা নানাবিধ হইলেও তাহা দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, **প্রবৃত্তিমুখী** ও **নিবৃত্তিমুখী**, অথবা **প্রেয়োমার্গমুখী** ও **শ্রেয়োমার্গমুখী**।[১]

ইহলোকে বৈষয়িক সুখের উপযোগী দ্রব্যসকল পাইবার ইচ্ছা, এবং যাঁহারা পরলোক বা জন্মান্তর মানেন, তাঁহাদের পক্ষে পরলোকে বা পরজন্মে যাহাতে সুখভোগ হইতে পারে তদুপযোগী কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা, প্রথমোক্ত শ্রেণিভুক্ত এবং ইহলোকে যাহাতে প্রকৃত সুখ অর্থাৎ শান্তিলাভ হয়, ও পরলোকে বা পরিণামে যাহাতে মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপ কার্য্য করিবার ইচ্ছা

---

[১] কঠোপনিষদ, ১, ২, ১-২।

দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভোগবাসনা প্রবৃত্তি বা প্রেয়োমার্গমুখী, ভোগের অনিত্যতাবোধে নিত্যসুখের বা মুক্তিলাভের বাসনা নিবৃত্তি বা শ্রেয়োমার্গমুখী। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, প্রবৃত্তি বা প্রেয়োমার্গমুখী ইচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছা, এবং নিবৃত্তি বা শ্রেয়োমার্গমুখী ইচ্ছা আদৌ ইচ্ছা নহে, তাহা ইচ্ছার অভাব। এ প্রকার সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কি মুমুক্ষু কি ভোগাভিলাষী সকলেই ইচ্ছার বশ। কেহই স্থির নহেন, কেহই নিশ্চেষ্ট নহেন, সকলেই ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মে রত। তবে সে ইচ্ছা ও তৎপ্রণোদিত কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অনেকে মনে করিতে পারেন, প্রবৃত্তি বা প্রেয়োমার্গমুখী ইচ্ছাই মনুষ্যকে প্রকৃত কর্ম্মী ও জগতের হিতসাধনে তৎপর করে, এবং নিবৃত্তি ও শ্রেয়োমার্গমুখী ইচ্ছা মনুষ্যকে নিষ্কর্ম্মা ও জগতের হিতসাধনে বিরত করে। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। সত্য বটে, প্রবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছা নিবৃত্তমার্গমুখী ইচ্ছা অপেক্ষা অধিক প্রবল, ও অধিক বেগে আমাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করে, এবং তাহার কারণ এই যে, সে ইচ্ছা যে সুখের অন্বেষণ করে, তাহা অনিত্য হইলেও অতি নিকট ও সহজে ভোগ্য। পক্ষান্তরে, নিবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছা যে সুখের অন্বেষণ করে, তাহা নিত্য হইলেও সুদূরস্থিত এবং সংযতচিত্ত না হইলে কেহ তদ্‌ভোগে অধিকারী হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও নিবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছা যদিও আমাদিগকে ধীরে ধীরে কর্ম্মে নিয়োজিত করে, তথাপি একবার সেরূপ ইচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম্ম আরম্ভ হইলে, অবিশ্রান্তভাবে তাহা চলে, কারণ সে ইচ্ছা যে সুখের অন্বেষণ করে তাহা নিত্য, ও সেই সুখভোগশক্তির কখনও হ্রাস হয় না। কঠোপনিষদে যমনচিকেতা উপাখ্যানে নচিকেতা যখন বৈষয়িক সুখ উপেক্ষা করেন তখন এই কথা বলেন, সে সুখের উপকরণগুলি অস্থায়ী এবং সে সুখভোগ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হয় এবং আমাদের ভোগশক্তির হ্রাস হয়। প্রবৃত্তিমার্গের সুখের এই প্রধান বাধা— সে সুখলাভের নিমিত্ত যে ভোগ্যবস্তুসকল আবশ্যক তাহা অস্থায়ী, এবং সে সুখভোগের নিমিত্ত আমাদের যে শক্তি আছে তাহাও ক্ষয়শীল। পরন্তু প্রবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে গেলে তাহা যথাযোগ্যরূপে নির্ব্বাহিত হওয়ার পক্ষে অনেক শঙ্কা থাকে, কারণ কর্ত্তা নিজে সুখলাভের নিমিত্তই তাহাতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু নিবৃত্তিমার্গমুখী ইচ্ছা দ্বারা যদি কেহ সেই কার্য্যে নিয়োজিত হন, তাহার সম্বন্ধে সেরূপ আশঙ্কা থাকে না। তিনি নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্যটি যাহাতে যথাযোগ্যরূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্যই চেষ্টিত থাকেন। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। রোগীর শুশ্রূষা অতীব সৎকর্ম্ম। প্রবৃত্তিমার্গগামী কোন ব্যক্তি যদি সেই সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পরহিতৈষণা অবশ্যই তাঁহার অন্তরে থাকিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ হিতকামনা অর্থাৎ যশ ও সম্মানলাভের কামনা ভিতরে ভিতরে থাকে, এবং তাহার ফল কখন কখন এরূপ হইতে পারে

যে, যাহাকে কেহই দেখিবার নাই ও যাহার শুশ্রূষা কেহই দেখিতে পাইবে না, সে পড়িয়া থাকিবে, এবং যাহার শুশ্রূষা তত আবশ্যক নহে কিন্তু দশজনে দেখিতে পাইবে, সে অগ্রে সেবা পাইবে। নিবৃত্তিমার্গের পথিক কেহ যদি এরূপ কর্ম্মে ব্রতী হয়েন, তিনি কেবল পরহিতৈষণাপ্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিবেন, কর্ত্তব্যপালনজনিত সুখ ভিন্ন অন্য কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। সুতরাং তিনিই যথাবিহিত কার্য্যকরণে সমর্থ হইবেন।

নিবৃত্তিমার্গ-গামীর প্রাধান্য।

যদি কেহ বলেন যে প্রবৃত্তিমার্গগামীরাই কর্ম্মক্ষেত্রে আগ্রহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্য করত নানাবিধ বৈষয়িক সুখের উপায় উদ্ভাবন দ্বারা মনুষ্যের সম্যক্ হিতসাধন করিয়াছেন, নিবৃত্তিমার্গগামীরা সেরূপ কিছুই করেন নাই, তাঁহাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সেই সকল সুখের উপায় থাকা সত্বেও, যখন কোন ব্যক্তি অসাধ্য রোগে কাতর, দুঃসহ শোকে আকুল, বা দুস্তর নৈরাশ্যে নিমগ্ন, তখন নিবৃত্তিমার্গের পথিকদিগেরই অত্যুজ্জ্বল জীবনের দৃষ্টান্ত তাহার ঘনতমসাচ্ছন্ন চিত্তকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিতে পারে, এবং তাঁহাদিগেরই গভীর চিন্তা-প্রসূত শাস্ত্রোপদেশ তাহার শান্তিলাভের কেবলমাত্র উপায়।

আমাদের ইচ্ছা যাহাতে নিতান্ত প্রবৃত্তিমার্গমুখী না হইয়া কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি-মার্গমুখী হয়, এরূপ যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তাহাতে মনুষ্য নিষ্কর্ম্মা হইয়া যাইতে পারে এ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের স্বার্থপর প্রবৃত্তিসকল এত প্রবল যে নিবৃত্তি অভ্যাস দ্বারা তাহা উন্মূলিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বহুযত্নে তাহা কিয়ৎপরিমাণে মাত্র প্রশমিত হইতে পারে, এবং তাহা হইলে জগতের উপকার ভিন্ন কোন অপকার হইবে না।

ভালমন্দ উভয়বিধ গুণের সামঞ্জস্য মনুষ্যের পূর্ণতার লক্ষণ একথা কত দূর সত্য ?

অনেকে বলেন উচ্চ এবং নীচ, পরার্থপর এবং স্বার্থপর, নিবৃত্তিমার্গমুখী এবং প্রবৃত্তিমার্গমুখী, সকল প্রকার ভাব ও সকল প্রকার ইচ্ছাই মনুষ্যের প্রয়োজনীয়, এবং তৎসমুদয়েরই যথাযোগ্য বিকাশ ও সামঞ্জস্যের সহিত ক্রিয়া মনুষ্যের পূর্ণতালাভের লক্ষণ।[১] এ কথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে।

সংসারে সময়ে সময়ে এমন ঘটে যে স্বার্থপর ভাবের ও নীচ ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত কার্য্য আত্মরক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। যথা, যখন এক জন অপরকে অকারণ বধ করিতে আসিতেছে, সে সময়ে আততায়ীকে আঘাত বা বধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। কিন্তু আত্মরক্ষার সেরূপ কার্য্য অগত্যা অবলম্বনীয় ও এক প্রকার আপদ্ধর্ম্ম। পৃথিবীতে মন্দ লোক আছে বলিয়াই ভাল লোককেও সময়ে সময়ে অগত্যা মন্দ কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া সেরূপ কার্য্যের ও তদুত্তেজক ভাব বা ইচ্ছার অনুমোদন করা যায় না। সে সকল ভাব বা ইচ্ছা মানুষের মনে উদিত হয় বটে,—কিন্তু তাহার প্রাবল্য নীচ প্রকৃতির লক্ষণ, এবং তাহার প্রশমন সুবুদ্ধির কর্ত্তব্য।

---

[১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কৃষ্ণচরিত্র" ২য় সংস্করণ ৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষাদি ভাব যখন মনুষ্যের মনে উদিত হয় এবং অনেকের মনোমধ্যে স্থান পায় ও অনেক সময়ে কার্য্য করে, তখন তাহা পোষণীয়, একথা বলিতে গেলে, ইহাও বলিতে হয় যে, যখন মনুষ্যের নখ ও দন্ত আছে এবং অসভ্য জাতিরা পশুর ন্যায় তাহা শত্রু আক্রমণে ব্যবহার করে ও তাহা কার্য্যে লাগে, তখন নখ ও দন্তের সেইরূপ ব্যবহারও শিক্ষণীয়। ফলতঃ মনুষ্য যতই নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উঠে, ততই নিকৃষ্ট প্রকৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃষ্ট প্রকৃতি গ্রহণ করে। ভাল মন্দ সর্ব্ববিধ গুণের যথাযোগ্য বিকাশ যে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতার নিমিত্ত আবশ্যক এ কথা ঠিক নহে। তবে যতদিন পৃথিবীর সমস্ত লোক ভাল না হইবে, যতদিন কতকগুলি মন্দলোক থাকিবে, ততদিন কেহই সম্পূর্ণ ভাল হইতে পারিবে না, ততদিন মন্দের সংস্রবে ভালকেও কিয়ৎ পরিমাণে মন্দ হইতে হইবে, এবং মন্দের দমন ও মন্দ কর্ত্তৃক নিজের বা অন্যের যে অনিষ্ট হয় তাহার নিবারণ নিমিত্ত ভালকেও মধ্যে মধ্যে অগত্যা অন্যের অনিষ্টকর কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু অন্যের অনিষ্টকরণের ইচ্ছা দমন করা ও সাধ্যমত অন্যের অনিষ্টকরণে নিবৃত্ত থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য।

এরূপ যত্ন ও শিক্ষাদ্বারা লোকে যে ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষাদি ভাব ভুলিয়া গিয়া আত্মরক্ষায় অক্ষম হইবে এ আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। স্বার্থপর প্রবৃত্তি সকল এতই প্রবল যে তাহা একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি বহু যত্ন, শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন মনুষ্য ঐ সকল প্রবৃত্তি ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহারাই পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন বলিতে হইবে।

আর একটি কথা আছে। সংসার ভাল ও মন্দ লোকে মিশ্রিত। যতই ভাল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ততই সংসার সাকল্যে ভাল হইয়া উঠে; এবং কেবল তাহা নহে, ভাল লোকেরা যতই অধিকতর সদ্‌গুণসম্পন্ন ও অসদ্‌গুণরহিত হয়েন, সমগ্র সংসার ততই অধিকতর ভাল হইতে থাকে। শীতল জল ও উষ্ণ জল একত্র করিলে যেমন শীতল উষ্ণকে কিঞ্চিৎ শীতল এবং উষ্ণ শীতলকে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করে, এবং মিশ্রিত জল উভয়ের মাঝামাঝি দাঁড়ায়, সেইরূপ মন্দ লোকের সংস্রবে ভাল লোককেও কিঞ্চিৎ মন্দ হইতে হয়, আবার ভাল লোকের সংস্রবে মন্দকেও কিঞ্চিৎ ভাল হইতে হয়। আর উত্তাপ যেমন স্বভাবতঃ ক্রমশঃ কমিয়া আইসে, মন্দও তেমনই ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে, এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজের গতি ক্রমশঃ উন্নতিমার্গমুখী হইবে।

প্রযত্ন বা চেষ্টা।

ইচ্ছাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া মনুষ্য কর্ম্ম করিতে প্রযত্ন বা চেষ্টা করে। প্রযত্ন বা চেষ্টা অন্তর্জগতের শেষ ক্রিয়া, এবং বহির্জগতের অর্থাৎ সহিত দেহের ও অন্যান্য বস্তুর সাহায্যে তাহা সম্পন্ন হয়। জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মের সহিত প্রযত্নের অধিকতর নিকট সম্বন্ধ, তবে অন্তর্জগতের ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞান বিভাগে এই অন্তর্জগৎবিষয়ক অধ্যায়েও তাহার উল্লেখ আবশ্যক।

প্রযত্ন বা চেষ্টায় মনুষ্য স্বতন্ত্র কি পরতন্ত্র এই কথা লইয়া দার্শনিকদিগের (বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদিগের) মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কর্ম্মবিভাগে "কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না" এই শীর্ষক অধ্যায়ে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হইবে। এখানে এইমাত্র বলিব যে যদিও চেষ্টায় কর্ত্তা স্বতন্ত্র বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে জানা যায়, কর্ত্তা স্বতন্ত্র নহে, চেষ্টা পূর্ব্ববর্ত্তী ইচ্ছার অনুগামী, এবং সেই ইচ্ছা পূর্ব্ব শিক্ষা ও পূর্ব্ব অভ্যাসদ্বারা নিরূপিত। তাহা হইলে অনেকে বলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপপুণ্যের জন্য মনুষ্যের দায়িত্ব থাকে না। এ আপত্তি অখণ্ডনীয় নহে, তবে ইহার খণ্ডনও নিতান্ত সহজ নহে। ইহার খণ্ডনার্থে সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, কর্ত্তার স্বাধীনতা বা পরাধীনতার উপর কর্ম্মের দোষগুণ বা কর্ম্মের ফলভোগ নির্ভর করে না, তবে কর্ত্তার দোষগুণ এবং সমাজের প্রদত্ত দণ্ডপুরস্কার নির্ভর করে। মন্দ কর্ম্মকে মন্দই বলিতে হইবে এবং মন্দ কর্ম্মের জন্য মন্দফলই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা না থাকিলে তাহাকে দোষী ও দণ্ডনীয় বলা যায় না। আর সেই স্বতন্ত্রতা যদি কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় কারণে নষ্ট না হইয়া দূরবর্ত্তী কার্য্যাকারণপ্রবাহে নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে যদিও সমাজনিয়ন্তা সমাজরক্ষার নিমিত্ত কর্ত্তাকে তাহার কার্য্যের জন্য দায়ী করিবেন, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা তাহাকে দায়ী করিবেন না। তবে বিশ্বরাজ্যের অলঙ্ঘ্য নিয়মানুসারে কর্ত্তাকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে। সেই কর্ম্মফল কিন্তু এরূপ কৌশলে অবধারিত যে তাহা ক্রমে মানবের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইয়া মনুষ্যকে সুপথগামী করিবে, এবং তাহার পরিণাম, নিকটেই হউক বা দূরেই হউক, শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, শুভকর ভিন্ন অশুভকর নহে। এই উত্তরের প্রতি আবার আপত্তি হইতে পারে, কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা না থাকিলে, এবং ভাল মন্দ সকলেরই পরিণাম শুভ হইলে, লোকে অধর্ম্মাচরণে বিরত হইবে না, এবং কর্ম্মফলভোগও ঈশ্বরের ন্যায়পরতার সহিত সঙ্গত হইবে না। কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে, ধর্ম্মের মূল উৎসন্ন হইবে, এবং ঈশ্বরকে ন্যায়বান্ বলা যাইবে না। এ কথার উত্তর এই যে, কর্ম্মফলভোগের ভয়ই অধর্ম্মাচরণের যথেষ্ট নিবারক, কারণ অধর্ম্মের আশুফল অশুভ, এবং পরিণাম সকলেরই শুভ হইলেও দুষ্কর্ম্মীর পক্ষে সে শুভপরিণাম সুদূরবর্ত্তী। আর যদি বল স্বতন্ত্রতাবিহীন কর্ত্তার কর্ম্মফলভোগ ঈশ্বরের ন্যায়পরতার বিরুদ্ধ, পক্ষান্তরে, স্বতন্ত্রতাবিশিষ্ট মনুষ্যের কর্ম্মফলভোগ ঈশ্বরের দয়াগুণের বিরুদ্ধ, কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি ত জানিতেন, কে কি করিবে, তবে যে দুষ্কর্ম্ম করিবে ও তজ্জন্য দুঃখভোগ করিবে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন কেন? বস্তুতঃ আমাদের সসীম জ্ঞান ঈশ্বরের অসীম গুণের বিচার করিতে সমর্থ নহে। দেহাবচ্ছিন্ন অপূর্ণ আত্মা কর্ম্মে স্বতন্ত্র নহে, প্রকৃতিপরতন্ত্র বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্যাকারণ নিয়ম মানিতে হইলে যুক্তি এই কথা বলে, এবং আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে আত্মাও তদনুরূপ উত্তর দেয়।

প্রযত্ন বা চেষ্টায় মনুষ্য স্বতন্ত্র কি পরতন্ত্র এই বিষয়ে অনেক মতভেদ।

কর্ত্তা স্বতন্ত্র নহে।

কর্ত্তার প্রকৃতি-পরতন্ত্রতাবাদ ধর্ম্মের বাধা-জনক নহে।

কর্ত্তার প্রকৃতিপরতন্ত্রতাবাদ যদিও একদিকে অসৎকর্ম্মের জন্য দায়িত্ববোধের কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারে, অন্যদিকে তাহা সৎকর্ম্মের জন্য আত্মগরিমা খর্ব্ব করিয়া আমাদের অশেষ অনিষ্টের আকর অহঙ্কার বিনষ্ট করে, সুতরাং তাহাতে মনুষ্যের ধর্ম্মপথ সঙ্কীর্ণ না হইয়া বরং প্রশস্তই হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বহির্জ্জগৎ

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

পূর্ব্বে একবার আভাস দেওয়া হইয়াছে, এখন আর একবার বলিলেও দোষ নাই, এ সামান্য গ্রন্থের 'বহির্জ্জগৎ' শীর্ষক এই ক্ষুদ্র অধ্যায়ে কেহ যেন বহির্জ্জগৎবিষয়ক কোনরূপ সম্যক্ আলোচনা পাঠ করিবার প্রত্যাশা না করেন। বহির্জ্জগৎ অসীম। একদিকে যেমন তাহার বৃহত্তার সীমা নাই, অপরদিকে তেমনই তাহাতে এত ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বস্তু আছে যে তাহাদের ক্ষুদ্রত্বেরও সীমা নাই। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহতারকানীহারিকাপুঞ্জ, অপরদিকে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম অণুপরমাণু। একদিকে মনুষ্য, হস্তী, তিমি, অপরদিকে কীট, পতঙ্গ, কীটাণু। একদিকে বিশাল বনস্পতি, অপরদিকে তুচ্ছ তৃণ। এবং সর্ব্বত্র সেই জড় ও জীবসমষ্টির ও ব্যষ্টির নিরন্তর বিচিত্র ক্রিয়া।—এই সমস্ত বস্তু ও ব্যাপারসঙ্কুল বহির্জ্জগতের সম্যক্ আলোচনা দূরে থাকুক, আংশিক আলোচনাও সহজ কথা নহে। এ স্থলে বহির্জ্জগৎবিষয়ক কেবল এই কয়েকটি কথা মাত্র কিঞ্চিৎ বিবৃত হইবে।—

১। বহির্জ্জগৎ ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত কি না।
২। বহির্জ্জগতের বিষয়সকলের শ্রেণিবিভাগ।
৩। বহির্জ্জগতের কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে দুই একটি বিশেষ কথা।

১। বহির্জ্জগৎ ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত কি না।

১। বহির্জ্জগৎ ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত কি না।

সে জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ, তাহা স্বরূপজ্ঞান নহে।

জ্ঞাতা নিজ অন্তর্জ্জগতের যাহা কিছু জানেন তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানেন, অর্থাৎ তাহা জানিবার নিমিত্ত কোন মধ্যবর্ত্তী বস্তুর সাহায্য লইতে হয় না। কারণ সে স্থলে জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞাতার নিজেরই অবস্থাবিশেষ। কিন্তু বহির্জ্জগৎবিষয়ক জ্ঞান সে প্রকার নহে। বহির্জ্জগতের বস্তুসকল আমার চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আলোক শব্দাদিদ্বারা স্পন্দিত করিলে আমার ইন্দ্রিয়ের সেই স্পন্দিত অবস্থা একপ্রকার মধ্যবর্ত্তীর কার্য্য করে, তাহাতেই আমার তত্তদ্‌বস্তুর জ্ঞান জন্মে। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা কথাটা স্পষ্টীকৃত হইতে পারে। আমি যখন বলি আমি চন্দ্র দেখিতেছি, তখন চন্দ্রালোকদ্বারা আমার চক্ষুতে চন্দ্রের যে প্রতিবিম্ব পড়িতেছে আমি বাস্তবিক তাহাই দেখিতেছি, এবং সেই প্রতিবিম্ব যে চন্দ্রের ঠিক স্বরূপ কি না তাহা অন্য উপায়ে পরীক্ষা না করিলে বলা যায় না। জ্যোতিষশাস্ত্রদ্বারা জানা গিয়াছে, চন্দ্রের যে হ্রাসবৃদ্ধি আমরা দেখি তাহা প্রকৃত

হ্রাসবৃদ্ধি নহে, চন্দ্র যত বড় প্রতিদিন তত বড়ই থাকে, তবে সূর্য্যালোক ভিন্ন ভিন্ন দিনে তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়ায় তাহাকে ঐরূপ দেখায়। অত-দূরের বস্তুর কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাউক অতি নিকটের বস্তু—যথা আমার হস্তস্থিত মৃত্তিকাখণ্ড—সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কি প্রকার। আমার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ কি প্রকার তাহা জানিতেছি। কিন্তু এই সকল গুণের মধ্যে তাহার আকার আমি যে মত দেখিতেছি সেই মত হইলেও তাহার অপর গুণগুলি আমি যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি ঠিক তাহারই যে অনুরূপ, এ কথা বলা যায় না। তাহার বর্ণ শুক্ল আলোকে দেখিতেছি ধূসর, অতএব তাহাতে অবশ্যই এমত কোন গুণ আছে যাহার যোগে শুক্লালোক আমার চক্ষুকে স্পন্দিত করিলে আমি ধূসরবর্ণ দেখি। কিন্তু সেইগুণই যে ধূসরবর্ণ তাহা কি করিয়া বলা যাইবে, যখন শুক্লালোক তৎসহ না মিলিলে সে বর্ণ দেখা যায় না। তাহার রস কষায়, কিন্তু আমার রসনায় যে কষায় আস্বাদন অনুভূত হয়, মৃৎপিণ্ডে তাহা উৎপন্ন করিবার গুণ থাকিলেও সে গুণ যে কষায় আস্বাদন তাহা বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন সেই মৃত্তিকাখণ্ডে আমার ইন্দ্রিয়ের অগোচর অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু আমার জানিবার উপায় না থাকায় আমি তাহা জানিতে পারি না। যেমন চক্ষুবিশিষ্ট মনুষ্য ঐ মৃৎখণ্ডের বর্ণ দেখিতে পায়, কিন্তু জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার বর্ণের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না, ও বর্ণ যে ঐরূপ পদার্থের একটা গুণ তাহাও জানিতে পারে না, তেমনই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ছাড়া কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ ষড়িন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব জানিতে পারে, কিন্তু আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব সেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অভাবে তাহার কিছুই জানিতে পারি না। ফলতঃ আমাদের বহির্জ্জগৎবিষয়ক জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ, তাহা নিরপেক্ষজ্ঞান নহে, এবং স্বরূপজ্ঞানও নহে। এই কারণে কোন কোন দার্শনিকের[১] মতে বহির্জ্জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব আদৌ সন্দেহের স্থল। তাঁহারা বলেন, আমরা আছি বলিয়াই আমাদের বহির্জ্জগৎ আছে, আমরা নিজের মনের সৃষ্টি বাহিরে আরোপিত করিয়া নিজ নিজ বহির্জ্জগতের সৃষ্টি করিয়াছি। পরন্তু বহির্জ্জগৎবিষয়ক জাতি ও সাধারণ নাম স্পষ্টতঃ আমাদের সৃষ্টি, তাহা বহির্জ্জগতে নাই। শঙ্করের মায়াবাদও এই শ্রেণির মত, তবে তাহা আরও একটু অধিক দূর যায়, কারণ সেই মত অনুসারে জগৎ মিথ্যা, কেবল ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য। এ স্থলে যুক্তিবলে এ কথা এই অর্থে সত্য যে, জগতের সকল বস্তুই অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, কেবল জগতের আদি কারণ ব্রহ্ম নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল, এবং জগতের অনেক বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক, রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায়, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাবশতঃ বস্তুর স্বরূপ আবৃত থাকিয়া তাহাতে ভিন্ন রূপ বিক্ষিপ্ত হয়। আর সেই অজ্ঞানতানিবন্ধন সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আমরা অশেষবিধ দুঃখ ভোগ করি। যথা, বৈষয়িক

---

[১] যথা, বার্কলী (Berkeley)

সুখের অনিত্যতা না বুঝিয়া নিত্যজ্ঞানে তাহার অনুসরণ করি, এবং তাহার অনিত্যতাপ্রযুক্ত যখন সে সুখ আর পাওয়া যায় না, তখন তাহাতে বঞ্চিত হইয়া অশেষ ক্লেশ অনুভব করি। কিন্তু এ সকল কথা সত্য হইলেও সমস্ত বহির্জগৎ ও তদ্বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানকে মিথ্যা বলা যায় না।

কিন্তু সে জ্ঞান মিথ্যা নহে।

প্রথমতঃ, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মূলপ্রমাণ জ্ঞাতার উক্তি, এবং জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাওয়া যায় যে, বহির্জগৎ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত। যদিও অনেক স্থলে (যথা, আমি চন্দ্র দেখিতেছি ইত্যাদি স্থলে) আত্মার উত্তর পরীক্ষা দ্বারা সংশোধনসাপেক্ষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, তথাপি সংশোধনের পরে সে উত্তর যে ভাব ধারণ করে তাহাতে বহির্জগৎ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান যে সত্য, এবং আত্মার অবভাসমাত্র বা মিথ্যা নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ সে সংশোধনের ফল এই যে, বহির্জগতের যে বস্তু আমরা মনে করি প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা সেই বস্তুকর্ত্তৃক উৎপাদিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ দেহের অবস্থান্তর। কিন্তু পূর্ব্বেই ("জ্ঞাতা" শীর্ষক অধ্যায়ে) দেখান হইয়াছে আত্মা দেহ ছাড়া। অতএব দেহ যখন আত্মা ছাড়া অর্থাৎ বহির্জগতের অংশ, তখন দেহের অবস্থান্তরজ্ঞান বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান, এবং দেহের অস্তিত্ব বহির্জগতের অস্তিত্ব, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু দেহের এরূপ অবস্থান্তর আপনা হইতে ঘটে না, এবং দেহ ছাড়া ও আত্মা ছাড়া অন্য পদার্থ দ্বারা ঘটে, ইহা আত্মা জানিতেছে। সুতরাং দেহ ছাড়া বহির্জগৎ আছে, একথাও প্রতীয়মান হইতেছে। দেহবন্ধনমুক্ত, পরমাত্মাতে যুক্ত, পূর্ণ তাপ্রাপ্ত আত্মার পক্ষে আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান না থাকিতে পারে, কিন্তু দেহাবচ্ছিন্ন অপূর্ণ আত্মার পক্ষে বহির্জগৎ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রকৃত বলিয়া মানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, যদিও বহির্জগতের বস্তুর সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা লাভ করি তাহা তদ্বস্তুর স্বরূপজ্ঞান না হয়, তাহা সেই বস্তুর স্বরূপকর্ত্তৃক উৎপাদিত, সুতরাং তাহা রজ্জুতে সর্পদর্শনবৎ মিথ্যাজ্ঞান নহে। সেই জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের স্বরূপের সহিত সাদৃশ্য ও ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ আছে।

তৃতীয়তঃ, বহির্জগৎবিষয়ক জাতি ও সাধারণ নাম যদিও অন্তর্জগতে আছে এবং তাহা জ্ঞাতার সৃষ্টি, তথাপি তদ্দ্বারা বহির্জগতের অসত্যতা প্রমাণ হয় না, বরং তাহার সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ যে সকল বস্তুর সম্বন্ধে জাতি বা সাধারণ নামের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে।

চতুর্থতঃ, আর্য্যসুধীগণের মায়াবাদ বোধ হয় জীবকে অনিত্য বিষয়বাসনা হইতে বিরত, ও নিত্যপদার্থ ব্রহ্মচিন্তায় অনুরক্ত করিবার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে। মায়াবাদ সৃষ্টি হইবার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে।—অদ্বৈতবাদীর মতে এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ। ব্রহ্ম হইতেই জড় চেতন সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি। ব্রহ্ম নিত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু দৃশ্যমান

জগৎ অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে এ জগৎ উৎপন্ন হওয়া অনুমানসিদ্ধ নহে। অতএব দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা ও মায়াময় বা ইন্দ্রজালিক। —প্রথমোক্ত অর্থে মায়াবাদ কেবল ভাষার অলঙ্কারমাত্র। সে অর্থে জগৎকে মায়াময় বা মিথ্যা বলাতে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বুঝায় না, পরমার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত তুলনায় জগৎ মিথ্যা বলিলেও বলা যায়, এই মাত্র বুঝায়। দ্বিতীয়োক্ত কারণে জগৎকে মিথ্যা বলা যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় না। যদিও ব্রহ্ম নিত্য ও জগৎ অনিত্য, তথাপি ব্রহ্মশক্তির অভিব্যক্তিদ্বারা জগৎপ্রকাশ পায় এবং সে শক্তি অব্যক্ত থাকিলে জগৎ থাকে না, এভাবে দেখিলে ব্রহ্মের নিত্যতার ও জগতের অনিত্যতার পরস্পর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। এবং ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনশীল এ কথা এই অর্থে সত্য যে, ব্রহ্ম নিজ শক্তি ও ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন কারণে পরিবর্ত্তিত হয়েন না। অতএব ব্রহ্মের নিজ শক্তি ও ইচ্ছা-দ্বারা উৎপন্ন জগতের পরিবর্ত্তন অসঙ্গত বলা যায় না।[১]

বহির্জগতের উপাদান।

বহির্জগৎ সত্য এবং বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান বস্তুর স্বরূপজ্ঞান না হইলেও বস্তুর স্বরূপসম্ভূত জ্ঞান, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, প্রশ্ন উঠিতেছে,—বহির্জগতের উপাদানকারণ কি, এবং আমরা বহির্জগতের বস্তুর যে জ্ঞান লাভ করি তাহার সহিত সেই স্বরূপের কি সম্বন্ধ ?

কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করিতেছে সুতরাং কুম্ভকার ঘটের নিমিত্তকারণ, এই স্থূল দৃষ্টান্ত হইতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ইহা সহজে বুঝা যায়। কিন্তু কুম্ভকার মৃত্তিকা দিয়া ঘট নির্ম্মাণ করে, এবং মৃত্তিকা ঘটের উপাদানকারণ। ব্রহ্ম কি দিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, জগতের উপাদানকারণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিতান্ত সহজ নহে, এবং ইহার উত্তর সম্বন্ধে নানাবিধ মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন জগতের উপাদানকারণ জড় ও জীব, এবং তাহারা উভয়েই অনাদি। কেহ বলেন জীব বা আত্মা পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, কিন্তু জড় ও চৈতন্যে এতই বৈষম্য যে চৈতন্যময় ব্রহ্ম হইতে জড়ের উৎপত্তি হইতে পারে না, সুতরাং জড় অনাদি এবং জড়ই জগতের উপাদানকারণ। জড়বাদীরা বলেন চৈতন্য হইতে জড়ের সৃষ্টি অসম্ভব, ও তাহার কোন প্রমাণ নাই, বরং জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তির প্রমাণ জীবদেহে পাওয়া যায়, সুতরাং জড়ই জগতের একমাত্র মূল কারণ। আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীরা বলেন এক ব্রহ্ম হইতেই চৈতন্য ও জড় উভয়েরই উৎপত্তি এবং ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ।

তৎসম্বন্ধে নানা মত।

এই মতগুলি শ্রেণিবদ্ধ করিলে দেখা যায় তাহা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম, দ্বৈতবাদ অর্থাৎ জড় ও চৈতন্য উভয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার। দ্বিতীয়, অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ একমাত্র পদার্থ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া

---

[১] প্রমথনাথ তর্কভূষণপ্রণীত মায়াবাদ ও কোকিলেশ্বর বিদ্যারত্নপ্রণীত উপনিষদের উপদেশ দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

স্বীকার। এই দ্বিতীয় শ্রেণির মতের আবার তিনটি বিভাগ আছে।—— (ক) জড়াদ্বৈতবাদ অর্থাৎ একমাত্র জড়ই জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার। (খ) জড়চৈতন্যাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ জড় ও চৈতন্য উভয়ের গুণসংযুক্ত এক পদার্থকে জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার। এবং (গ) চৈতন্যাদ্বৈতবাদ, অর্থাৎ চৈতন্যই জগতের একমাত্র উপাদান বলিয়া স্বীকার।

ইহার মধ্যে কোন্ মতটি যে ঠিক তাহা বলা কঠিন। তবে জড়চৈতন্যদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি এই যে, জড় ও চৈতন্যের গুণে যতই বৈষম্য থাকুক না, জড় পদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞানলাভের সময়, এবং আমাদের ইচ্ছামত দেহসঞ্চালনকালে জানা যায় জড় চৈতন্যের উপর, এবং চৈতন্য জড়ের উপর কার্য্য করিতেছে, এবং জড় ও চৈতন্যের বিচিত্র সাক্ষাৎসম্বন্ধ ঘটিতেছে, সুতরাং তাহারা একেবারে বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ হইতে পারে না।

অদ্বৈতবাদের মধ্যেও জড়াদ্বৈতবাদ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না, কারণ জড় পদার্থের সংযোগবিয়োগাদি প্রক্রিয়াদ্বারা চৈতন্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি অচিন্তনীয়। জড়চৈতন্যাদ্বৈতবাদও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ইহাতে অনাবশ্যক কল্পনাগৌরব দোষ রহিয়াছে। যদি জড় বা চৈতন্য একের অস্তিত্বের অনুমান যথেষ্ট হয় তবে জড় ও চৈতন্য উভয়ের গুণসংযুক্ত এক পদার্থের অনুমান অনাবশ্যক। দেখা গিয়াছে এক জড় হইতে জগৎসৃষ্টি হওয়া অসম্ভব, কারণ জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি অচিন্তনীয়। এক্ষণে দেখা যাউক, চৈতন্য হইতে জড়ের সৃষ্টি সম্ভবপর কি না। যদি হয়, তাহা হইলে চৈতন্যাদ্বৈতবাদই সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি যদিও প্রথমে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তির ন্যায় অচিন্তনীয় মনে হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় এ কথাটা তত অসঙ্গত নহে। কারণ জড়ের অস্তিত্বের প্রমাণই জ্ঞাতার জ্ঞান, অর্থাৎ চৈতন্যের অবস্থাবিশেষ। এতদ্দ্বারা একথা বলিতেছি না যে, জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে জড়ের অস্তিত্ব নাই। কেবল ইহাই বলিতেছি যে, জড়ের ও চৈতন্যের মূলে এতটুকু ঐক্য আছে যে তাহাদের মধ্যে জ্ঞেয়জ্ঞাতৃত্বসম্বন্ধ সম্ভবপর। একথা বলিলে অবশ্য প্রশ্ন উঠিবে, যদি তাহাই হইল, তবে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি অসম্ভব মনে করি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যাহাকে জড় বলি তাহাতে চৈতন্যের প্রধান গুণ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান নাই। এই উত্তরের প্রত্যুত্তর হইতে পারে—যদি চৈতন্যের প্রধান গুণ আত্মজ্ঞান জড়ে লক্ষিত হয় না বলিয়া জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি অসম্ভব বলিতে হয়, তবে জড়ের প্রধান গুণ অর্থাৎ দেশ বা স্থানব্যাপকতা চৈতন্যে লক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর বলা যায়। এ আপত্তি খণ্ডনার্থে ইহা বলা যাইতে পারে যে, দেশ বা স্থানব্যাপকতা গুণ যে জড়ে লক্ষিত হয় চৈতন্যে লক্ষিত হয় না, একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় একথা সম্পূর্ণ

ঠিক নহে। বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্টের মতে দেশ আদৌ বহির্জগতে নাই তাহা কেবল জ্ঞাতার অন্তর্জগৎ হইতে উদ্ভূত। সে কথা প্রকৃত হইলে উক্ত আপত্তির খণ্ডন সহজেই হইল। আমরা সে কথা প্রকৃত বলি না, কিন্তু আমাদের মতে স্থানেস্থিতি জড় ও চৈতন্য উভয়েরই লক্ষণ।

এই ত গেল দার্শনিকের তর্ক। এক্ষণে চৈতন্য যে বহির্জগতের উপাদান-কারণ, অর্থাৎ চৈতন্যাদ্বৈতবাদই যে গ্রহণযোগ্য মত, তৎসম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা যুক্তি আছে কি না দেখা কর্ত্তব্য। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই এ সকল কথা আমাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ের অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এ কথা বলিতে পারেন না। তবে তাঁহাদের কথার ভাবে এই পর্য্যন্ত আভাস পাওয়া যায় যে, যাহাকে আমরা জড় বলি তাহা বাস্তবিক জড় নহে, তাহা নিরন্তর গতিশীল ইথার (Ether)-স্থিত শক্তিকেন্দ্রপুঞ্জ।[১] একজন বৈজ্ঞানিক[২] এতদূর গিয়াছেন যে তাঁহার মতে জড় শক্তির সঙ্ঘাত, পরমাণু-বিশ্লেষণদ্বারা শক্তির উদ্ভাবন হইতে পারে, এবং নবাবিষ্কৃত রেডিয়মের (Radium) ক্রিয়া এই শ্রেণির কার্য্য।

চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি, এই সিদ্ধান্ত মানিতে হইলে আর একটি প্রশ্ন উঠে, তৎসম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। যদি চৈতন্য হইতে জড়ের উৎপত্তি হইল, তবে চৈতন্যের আত্মজ্ঞান জড়ে কোথায় গেল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জড় শক্তিসঙ্ঘাত হইলেও যেমন সেই শক্তি তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, কেবল অবস্থাবিশেষে তাহা প্রকাশ পায়, তেমনই আত্মজ্ঞান তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে আছে এবং অবস্থাবিশেষে তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের[৩] গবেষণাও কতকটা এই কথার পোষকতা করে। যদি তাহাই হইল তবে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে আপত্তি কি?—যদি কেহ একথা বলেন, তাহার উত্তর এই যে, যে জড় হইতে চৈতন্যের বিকাশ হইতে পারে বলা যাইতেছে তাহা চৈতন্যসম্ভূত জড়, জড়বাদীর জড় নহে, অর্থাৎ যে জড়ে চৈতন্যের কোন সংস্রব পূর্ব্বে ছিল না সে জড় নহে। জড়াদ্বৈতবাদ ও চৈতন্যাদ্বৈতবাদ এই দুই মতের প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত মতে জড়ই সৃষ্টির মূল কারণ এবং চৈতন্য জড় হইতে উৎপন্ন, আর দ্বিতীয়োক্ত মতে চৈতন্যই সৃষ্টির মূল কারণ এবং জড় চৈতন্য হইতে উৎপন্ন।

বহির্জগতের জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপের সম্বন্ধ।

এক্ষণে বহির্জগতের জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের কি সম্বন্ধ তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

---

১ Karl Pearson's *Grammar of Science*, 2nd ed., Ch. VII দ্রষ্টব্য।

২ Gustave Le Bon's *Evolution of Matter* দ্রষ্টব্য।

৩ *Response in the Living and Non-Living* দ্রষ্টব্য।

জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান যে একই প্রকার পদার্থ একথা অন্তর্জগতের বস্তুসম্বন্ধে সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা বহির্জগতের বস্তুসম্বন্ধেও যে সমভাবে সত্য এরূপ বলা যায় না। আমি স্মৃতিপটে কোন অনুপস্থিত বন্ধুর যে মূর্ত্তি দেখিতেছি সেই অন্তর্জগতের বস্তু ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান একই পদার্থ। সেই বন্ধু সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি তাহা এবং তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান একই প্রকার পদার্থ হইতে পারে। কিন্তু সেই বন্ধুর মধুর স্বরের শ্রুতিজ্ঞান ও সেই স্বরের স্বরূপ, অথবা সেই বন্ধুদত্ত কোন সুমিষ্ট ফলের স্বাদজ্ঞান ও সেই স্বাদোদ্ভাবক রসের স্বরূপ যে পরস্পর একই প্রকার পদার্থ, ইহা অনুমান করা যায় না। তবে পক্ষান্তরে এ কথাও বলা যায় না যে, বহির্জগৎ-বিষয়ক জ্ঞান ও বাহ্য বস্তুর স্বরূপের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, অথবা বহির্জগৎ মিথ্যা ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান মায়াময় ও ভ্রান্তিমূলক। এরূপ বলিতে গেলে সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্য একটা বিষম প্রতারণা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

বাহ্য বস্তুর স্বরূপ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন প্রকারের পদার্থ হইলেও পরস্পর ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ। যথা জ্ঞানের স্পষ্টতার তারতম্য জ্ঞেয় বস্তুর গুণের বা জ্ঞানোদ্ভাবক শক্তির অল্পতা বা আধিক্যজ্ঞাপক। এবং জ্ঞেয় বস্তুর অভাবে তদ্‌বিষয়ক জ্ঞানেরও অভাব হয়।

জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ ও তজ্জনিত জ্ঞানের পার্থক্য, আস্বাদন, ঘ্রাণ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধেই বিশেষ প্রতীয়মান। দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয় লব্ধ আকৃতিজ্ঞান ও আকৃতির স্বরূপ এই দুয়ের পার্থক্য তত স্পষ্ট বলিয়া অনুমিত হয় না।

বহির্জগতের জ্ঞেয়বস্তুবিষয়ক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি তত্তদ্‌বস্তুর জাতিবিভাগ করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সেই জাতি কেবল নাম নহে, তাহা তজ্জাতীয় বস্তুসমূহের সাধারণ গুণসমষ্টি। জাতি তজ্জাতীয় বস্তু হইতে পৃথক্ রূপে বহির্জগতে নাই। জাতীয় গুণসমষ্টি জাতির প্রত্যেক বস্তুতে আছে। জাতি কেবল অন্তর্জগতের পদার্থ, এবং জাতিবিষয়ক জ্ঞান ও জাতির স্বরূপ, এই দুয়ের পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

২। বহির্জগতের বিষয়সকলের শ্রেণিবিভাগ।

২। বহির্জগতের বিষয়সকলের শ্রেণিবিভাগ।

বহির্জগতের বিষয়সকলকে শ্রেণিবদ্ধ করিতে গেলে নানা প্রণালীতে তাহা করা যাইতে পারে।

বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ, অতএব বহির্জগতের বিষয়সকল, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের এই পঞ্চবিধ বিষয় অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

অথবা বহির্জগতের বস্তুসকল, চেতন, উদ্ভিদ্, বা অচেতন, অতএব তাহা-দিগকে ঐ তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে।

আবার বহির্জগতের বস্তুসকলের পরস্পরের কার্য্য নানাবিধ, যথা—ভৌতিক, রাসায়নিক, জৈবিক, অতএব বহির্জগতের বিষয়সকল, ভৌতিক, রাসায়নিক, ও জৈবিক, এই তিন শ্রেণিতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

জড়পদার্থের যে সকল ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হইয়া কেবল বাহ্য আকৃতি আদির পরিবর্ত্তন হয় তাহাকে উপরে **ভৌতিক**[১] ক্রিয়া বলা হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত, ছোট বস্তুকে টানিয়া বা পিটিয়া বড় করা, তপ্ত বস্তুকে শীতল ও শীতল বস্তুকে তপ্ত করা, কঠিন বস্তুকে তরল করা, ইত্যাদি।

জড় পদার্থের যে সকল ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় তাহাকে **রাসায়নিক**[২] ক্রিয়া বলে। তাহার দৃষ্টান্ত, তামা ও মহাদ্রাবক মিশ্রণে তুঁতের উৎপত্তি, গন্ধক ও পারার মিশ্রণে হিঙ্গুলের উৎপত্তি, ইত্যাদি।

সজীব উদ্ভিদ্ বা চেতন পদার্থের যে সকল কার্য্য হয় তাহাকে **জৈবিক**[৩] ক্রিয়া বলা যায়। তাহার দৃষ্টান্ত, মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে পদার্থ লইয়া উদ্ভিদের পুষ্টি, খাদ্য দ্রব্য হইতে সজীব দেহে রক্তমাংসের উৎপত্তি, ইত্যাদি।

উক্ত ক্রিয়ার মধ্যে আবার অবান্তর বিভাগ আছে। যথা,—ভৌতিক ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি উত্তাপজনিত, কতকগুলি বৈদ্যুতিক, ইত্যাদি। জৈবিক ক্রিয়ার মধ্যে কতকগুলি অজ্ঞান জৈবিক, কতকগুলি সজ্ঞান জৈবিক, ও শেষোক্ত শ্রেণির মধ্যে কতকগুলি মানসিক, কতকগুলি নৈতিক, ইত্যাদি।

বহির্জগতের বস্তু বা বিষয়সকল এইরূপে নানা প্রণালীতে শ্রেণিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে যে প্রণালী যে আলোচনার নিমিত্ত সুবিধাজনক তাহাই সে স্থলে অবলম্বনীয়।

৩। বহির্জগতের বিষয়সম্বন্ধে দুই-একটি বিশেষ কথা।

৩। বহির্জগতের বিষয়সম্বন্ধে দুই-একটি বিশেষ কথা।

বহির্জগতের জড় বস্তুসকলের আলোচনা করিতে গেলে নিম্নলিখিত দুইটি প্রশ্ন উপস্থিত করা যাইতে পারে—

বহির্জগতের জড় বস্তু মূলে একবিধ কি নানাবিধ পদার্থে গঠিত?

প্রথম—বহির্জগতের জড় বস্তুসকল মূলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে কি একবিধ পদার্থে গঠিত, এবং একবিধ পদার্থে গঠিত হইলে তাহা কি?

দ্বিতীয়—বহির্জগতের জড় বস্তুর ক্রিয়াসকল মূলে নানাবিধ কি একবিধ, এবং একবিধ হইলে তাহা কি প্রকারের?

বহির্জগতের জড় বস্তুর ক্রিয়া মূলে একবিধ কি নানাবিধ?

পূর্ব্বে জগতের উপাদানকারণ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, উপরে প্রথম প্রশ্নে সেই কথাই উঠিতেছে, আপাততঃ এরূপ মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জগতের উপাদান-কারণ কি?—এই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্য,

---

[১] ইংরাজী 'Physical' শব্দের প্রতিশব্দ।
[২] ইংরাজী 'Chemical' শব্দের প্রতিশব্দ।
[৩] ইংরাজী 'Biological' শব্দের প্রতিশব্দ।

জগৎ মূলে কেবল জড় হইতে, কি কেবল চৈতন্য হইতে, কি জড় ও চৈতন্য উভয় হইতে সৃষ্ট, এই বৃহৎ তত্ত্ব নির্ণয় করা। বর্ত্তমান প্রশ্ন—বহির্জগতের জড় বস্তুসকল মূলে ভিন্ন ভিন্ন কি একবিধ পদার্থে গঠিত?—পূর্ব্বের প্রশ্ন অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ, এবং ইহার উদ্দেশ্য—জড় পদার্থ সকল মূলে নানাবিধ কি একবিধ জড় হইতে উদ্ভূত, এবং সেই নানাবিধ বা একবিধ জড় কি প্রকারের, এই তত্ত্ব নির্ণয় করা"। দুরূহ দার্শনিক "তত্ত্বানুসন্ধান ছাড়িয়া দিলেও, অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাদ্বারা এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরলাভে কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। এবং পারত্রিক বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত হইলেও, ঐহিক ব্যাপারের নিমিত্ত এই প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজনীয়। এক বস্তু হইতে অপর বস্তু উৎপন্ন করা অনেক সময়ে আবশ্যক, এবং সুলভ বস্তুকে দুর্লভ বস্তুতে পরিণত করা সকল সময়েই বাঞ্ছনীয়। সার ও জল হইতে বৃক্ষলতাদির রস, ও তাহা হইতে তাহাদের প্রচুর পরিমাণে পত্রপুষ্পফল উৎপন্ন করা অনেক সময় আবশ্যক। যখন পৃথিবীর লোকসংখ্যা অল্প ছিল, তখন অযত্নসম্ভূত ফলমূল ও মৃগয়ালব্ধ মাংসই যথেষ্ট হইত। এখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, উদ্ভিজ্জ বস্তু হইতে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক, ও তজ্জন্য কিরূপ সার দিলে সে উদ্দেশ্য সফল হয় তাহা জানা আবশ্যক। তাম্র, সীসক প্রভৃতি অল্প মূল্যবান্ ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারা সকলেরই বাঞ্ছনীয়, এবং তন্নিমিত্ত নানা দেশে নানা সময়ে প্রচুর চেষ্টা হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে সফলতা লাভকরণার্থে অগ্রে জানা কর্ত্তব্য, যে বস্তুকে অপর যে বস্তুতে পরিবর্ত্তিত করা উদ্দেশ্য, সেই দুই বস্তু মূলে এক প্রকার কি ভিন্ন প্রকার। যদি মূলে তাহারা ভিন্ন প্রকারের হয় তবে বাঞ্ছিত পরিবর্ত্তন অসাধ্য। মূলে এক প্রকারের হইলে কোন্ প্রক্রিয়াদ্বারা এক বস্তুকে অপর বস্তুতে পরিণত করা যায় তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়। রসায়ন ও উদ্ভিদ্বিদ্যার আলোচনায় জানা গিয়াছে যে উদ্ভিদোৎপন্ন খাদ্যে যবক্ষারজান বায়ু প্রচুর মাত্রায় থাকে, অতএব সেই বায়ু যেরূপ সার দিলে উদ্ভিজ্জদেহে প্রচুর মাত্রায় প্রবেশ করিতে ও স্থিতিলাভ করিতে পারে সেইরূপ সার দেওয়া কর্ত্তব্য। এখনও জানা যায় নাই যে স্বর্ণ ও অপর ধাতু মূলে এক পদার্থ হইতে উৎপন্ন কি না। সুতরাং অপর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যায় কি না এখনও বলা যায় না। রসায়নশাস্ত্রানুসারে সকল প্রকার জড় পদার্থ অন্যূন ৭০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের এক বা একাধিকের যোগ হইতে উৎপন্ন, এবং স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতুসকলেই এক একটি সেই মৌলিক পদার্থ। একথা ঠিক হইলে অপর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যায় না। কিন্তু এক্ষণে কোন কোন রসায়নশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত[১] এরূপ আভাস দিতেছেন যে, আমরা যে সকল পদার্থ মৌলিক

---

১ যথা Sir William Ramsay. তাঁহার *Essays Biographical and Chemical*, p. 191 দ্রষ্টব্য।

বলিয়া থাকি তাহারা পরস্পর একেবারে এতদূর বিভিন্ন নহে যে এককে অপরে পরিণত করা অসম্ভব। তবে এখনও এরূপ পরিবর্ত্তন সাধ্য বলিয়া কেহ স্থির করিতে পারেন নাই।

সকল মৌলিক পদার্থই স্ব স্ব প্রকারের পরমাণুসমষ্টি, ইহাই রসায়নশাস্ত্রানুমোদিত তত্ত্ব। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এরূপ আভাস দেন যে, পরমাণু আবার ব্যোম বা ইথারের ঘূর্ণায়মান কেন্দ্রসমষ্টি।

ইথারের গতি জড়জগতের বস্তুর ও ক্রিয়ার মূল।

বহির্জ্জগতের জড় পদার্থের ক্রিয়াসকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়া, রাসায়নিক আকর্ষণ ক্রিয়া, তাপঘটিত ক্রিয়া, আলোকঘটিত ক্রিয়া, বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র ক্রিয়া দেখা যায়, এবং আপাততঃ তাহারা পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা এই সকল ক্রিয়ার একতা-সংস্থাপনার্থ অনেক প্রয়াস পাইতেছেন, ও কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে। তাপ যে গতি বা গতির বেগরোধদ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা অনেক দিন হইতে লোকে জানে। অরণি ঘর্ষণদ্বারা, ও চকমকি পাথরে লৌহ ঠুকিয়া, অগ্নি বাহির করা তাহার দৃষ্টান্ত। এবং কি পরিমাণ গতিক্রিয়ার বা গতিরোধের ফল কতটা বা কয় ডিগ্রী তাপ, ৬০ বৎসর হইল মান্‌চেষ্টার নগরের ডাক্তার জুল পরীক্ষাদ্বারা নির্ণয় করেন। আলোকও যে বস্তু নহে কিন্তু বস্তুবিশেষের অর্থাৎ ইথারের স্পন্দন বা গতি, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ডাক্তার ইয়ং প্রতিপন্ন করেন, এবং সেই মতই এখনও সর্ব্ববাদিসম্মত। আর আলোকঘটিত ক্রিয়া ও বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা ক্লার্ক ম্যাক্‌সোয়েল্ এক প্রকার সপ্রমাণ করিয়াছেন। তবে মাধ্যাকর্ষণ যে ইথারের কোনরূপ ক্রিয়া ইহা এখনও কেহ বলিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আশা করা যাইতে পারে বিজ্ঞানানুশীলনদ্বারা জড়জগতের সমস্ত ক্রিয়াই ইথারের স্পন্দন বা গতি হইতে উদ্ভূত ইহা কালক্রমে সপ্রমাণ হইবে।[১] এবং জড়পদার্থও সেই ইথারের ঘূর্ণায়মান কেন্দ্রসমষ্টি বলিয়া একদিন যে প্রতিপন্ন হইবে, এরূপ আশাও হইতে পারে।

কিন্তু এইখানে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন উঠিতেছে।—যে ইথারের ঊর্মি বা নর্ত্তন বা স্পন্দন (কোন্ প্রকার গতি কেহ ঠিক বলিতে পারে না) তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিষয়ক ক্রিয়া উৎপন্ন করে, এবং যাহার ঘূর্ণায়মান কেন্দ্রই পরমাণুর উপাদান, ও সেই কেন্দ্রসমষ্টি জড়পদার্থ রূপে প্রতীয়মান হয়, সেই ইথার কি প্রকার পদার্থ? তাহার সহিত শক্তির সম্বন্ধ স্থূল জড়ের সহিত শক্তির সম্বন্ধের মত কি না? যখন তাহার গতি আছে তখন সেই গতি সঙ্কোচ ও প্রসরণদ্বারা সম্পন্ন হয় কি অন্য কোন প্রকারে হয়? এবং তাহার সঙ্কোচ ও প্রসরণ সম্ভাব্য হইলে, তাহার অভ্যন্তরে শূন্য স্থান থাকা আবশ্যক, সুতরাং তাহা কিরূপে বিশ্বব্যাপী হইতে পারে? আবার তাহা স্থূল জড় পদার্থের অভ্যন্তরব্যাপী,

---

১ Preston's *Theory of Light*, Introduction, p. 26 দ্রষ্টব্য।

কিন্তু সেই ব্যাপ্তিই বা কিরূপে নিষ্পন্ন হয় ?—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বিজ্ঞান এখনও সমর্থ নহে। মূল কথা, বিজ্ঞানকল্পিত ইথার ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ নহে, তবে আলোক, বিদ্যুৎ, চুম্বকাদির ইন্দ্রিয়গোচর ক্রিয়ার কারণানুসন্ধান করিতে গেলে ইথারের অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়।

এক স্রষ্টা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি ইহাই ঈশ্বরবাদীর মত। এক প্রকারের বস্তু বা অল্প প্রকারের বস্তু হইতে অনেক প্রকারের বস্তুর উৎপত্তি, ইহাই নিরীশ্বরবাদীর মতে সৃষ্টির প্রক্রিয়া। কিন্তু উভয় মতেই এক হইতে অনেকের উৎপত্তি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মূল কথা। কি কি প্রণালীতে কি কি নিয়মে সেই সকল ক্রিয়া চলিতেছে তাহার অনুশীলনই বিজ্ঞানদর্শনের উদ্দেশ্য। সেই সকল প্রণালী বা নিয়ম জানিতে পারিলে আমরা তাহার বিপরীত ক্রম অনুসরণ করিয়া অনেক হইতে একে পুনরায় উপনীত হইতে পারি। এক হইতে অনেকের উৎপত্তিপ্রণালী-নিরূপণ, এবং তদ্দ্বারা অনেক হইতে একে পুনঃ-প্রত্যাবর্ত্তন, জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য।

কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, কোন ক্রিয়াপ্রণালী জানা থাকিলেই যে তাহার বিপরীত ক্রম অনুসরণ সহজ বা সাধ্য, একথা বলা যায় না। একটি গরম ও একটি ঠাণ্ডা বস্তু সংলগ্ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিলে প্রথমটির উত্তাপ কিছু কমিয়া ও দ্বিতীয়টির উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি হইয়া উভয়েরই উত্তাপ মাঝামাঝি দাঁড়ায়। কিন্তু দ্বিতীয় বস্তুটির নবাগত উত্তাপটুকু বাহির করিয়া লইয়া তাহা প্রথমটিতে পুনরর্পিত করা সহজ নহে।

গতির কারণ শক্তি—শক্তির মূল চৈতন্যের ইচ্ছা।

বহির্জগতে জড়ের ক্রিয়া সমস্তই স্থূল পদার্থের এবং ইথাররূপী সূক্ষ্ম পদার্থের গতিদ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং গতিবিষয়ক আলোচনা অতি আবশ্যক। গণিতের সাহায্যে গতিবিষয়ক শাস্ত্র অতি বিস্ময়জনক বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই শাস্ত্র আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীর পদার্থ হইতে অনন্ত বিশ্বের সুদূরস্থিত তারকাদিসম্বন্ধীয় তত্ত্বনির্ণয়ে নিয়োজিত হইতেছে। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে সেই গতির মূল কারণ কি ? কেহ কেহ বলেন তাহা স্থূল পদার্থের উপাদানভূত পরমাণুপুঞ্জের বা ইথারের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কেহ বা বলেন তাহা জগতের আদিকারণ চৈতন্যের ইচ্ছা। অনেক দার্শনিকের এই মত। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইহার প্রতি পরিহাস করেন।[১] গতির কারণ শক্তি, এবং সেই শক্তির মূল অনাদি অনন্ত চৈতন্য শক্তি, এই কথাই যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

জীবজগতের ক্রিয়া।

এ পর্য্যন্ত কেবল জড়জগতের কথা হইতেছিল। জীবজগতের ব্যাপার আরও বিচিত্র। জীবজগৎ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, উদ্ভিজ্জবিভাগ এবং প্রাণিবিভাগ। এই দুই ভাগেই জড়ের গতি উদ্ভাবনী শক্তির ক্রিয়ার অতিরিক্ত আর এক শ্রেণির ক্রিয়া লক্ষিত হয়, যথা জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু। ইহাকে

১ Pearson's *Grammar of Science*, Ch. IV দ্রষ্টব্য।

জৈবিক ক্রিয়া বলা যায়। এবং প্রাণিবিভাগে এতদতিরিক্ত আরও এক শ্রেণির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ইচ্ছামত গমনাগমন ও উদ্দেশ্যসাধনে প্রযত্ন। ইহাকে সজ্ঞান ক্রিয়া বলা যাইতে পারে।

জড়জগৎসম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহা মূলে একবিধ বস্তুতে গঠিত কি নানাবিধ বস্তুতে গঠিত, এবং তাহার ক্রিয়াসকল মূলে এক কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, জীবজগৎসম্বন্ধেও সেইরূপ প্রশ্ন উঠে—আমরা যে সকল নানাবিধ জীব দেখিতে পাই তাহা একবিধ জীব হইতে কি তত্তৎপ্রকারের নানাবিধ জীব হইতে উৎপন্ন? এবং জীবজগতের ক্রিয়াসকল মূলে একবিধ কি নানাবিধ? প্রথমোক্ত প্রশ্নের দুইটি উত্তর পাওয়া যায়। একটি এই যে, সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন ভিন্ন জীব পৃথক্‌রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক প্রকার জীব হইতে কেবল সেই প্রকার জীবই জন্মিয়া থাকে। অপর উত্তরটি এই যে, মূলে দুই-এক প্রকার জীব ছিল, তাহা হইতে বহুকালক্রমে নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ে ক্রমশঃ নানা প্রকার জীব উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ আবার এতদূর যান যে, তাঁহাদের মতে জড় হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মত **ক্রমবিকাশবাদ** বা **বিবর্ত্তবাদ** নামে অভিহিত হইতে পারে। প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডারবিন এই মত সমর্থনার্থে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। এ মতের অনুকূলে অনেকগুলি কথা আছে, তাহার দুই-একটি এখানে বলা যাইতেছে।

ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তবাদ।

উদ্ভিজ্জ জগতে দেখা যায় কোন কোন জাতীয় বৃক্ষলতাদির অবস্থা-পরিবর্ত্তনে তাহাদের ফুলফলের বিশেষ উন্নতি বা অবনতি ঘটে। যথা, গাঁদা ফুলের গাছ অনেকবার কলম করিলে তাহার ফুল খুব বড় হয়। পঞ্চমুখী জবা গাছের ডাল ভাল আলো ও হাওয়া না পাইয়া যদি অত্যন্ত আওতায় পড়ে তবে সেই ডালে একহারা জবা ফুটে। আঁটির গাছের ফলের অপেক্ষা কলমের গাছের ফলের আঁটি ছোট ও শাঁস বেশি হয়। প্রাণিজগতেও দেখা যায় পালিত জন্তুর মধ্যে পালনের ইতরবিশেষে তিন চারি পুরুষ পরে অবস্থার অনেক ইতর-বিশেষ ঘটে। যথা, ভাল পালনে ঘোটক ক্রমশঃ দ্রুতগতি হয়, মেষ ও কুক্কুট ক্রমশঃ মাংসল হয়, বাহক পারাবতের চঞ্চু বড় হয়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন জাতীয় জন্তু, যাহাদের কঙ্কাল ভূগর্ভে পাওয়া যায়, এক্ষণে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং ভূপৃষ্ঠের অর্থাৎ তাহাদের আবাসভূমির অবস্থাপরিবর্ত্তনই তাহাদের অস্তিত্বলোপের কারণ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপ দৃষ্টান্তসকল স্থূলভাবে দেখিলে কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যায়, একজাতীয় জীবের অবস্থাভেদে তজ্জাতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ এতদূর ঘটিতে পারে যে, সেই উৎকর্ষ ও অপকর্ষবিশিষ্ট জীবসকল একজাতীয় হইলেও সেই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিভুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তদ্ভিন্ন একজাতীয় জীব অপরজাতীয় হইল একথা বলা যায় না। ক্রমবিকাশবাদীরা স্বমতসমর্থনার্থে এই কথা বলেন, জীবজগতে এমন আশ্চর্য্য ক্রমপরম্পরা দৃষ্ট হয় যে, একজাতীয় জীব তাহার

সন্নিকটস্থ জাতীয় জীব হইতে অতি অল্প বিভিন্ন, এবং কিঞ্চিৎ অবস্থাভেদে এক জাতি অপর জাতিতে উপনীত হইতে পারে।[১] তাঁহারা আরও বলেন, কোন জাতীয় জীবের মধ্যে যাহারা পরিবর্ত্তিত অবস্থায় জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার উপযোগী প্রকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন, তাহারাই বাঁচিয়া যায়, ও তত্তদ্‌সম্পন্ন জীবেরা বিনষ্ট হয়, এবং এইরূপে একজাতীয় জীব হইতে স্বল্প বিভিন্ন অপর জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। একথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ক্রমপরম্পরায় প্রায় সকল জাতীয় জীবই রহিয়াছে, জাতিবিলোপের কথা দৃষ্টান্তদ্বারা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হয় না। যাহা হউক ক্রমবিকাশদ্বারা নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে কি না একথার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। এবং ক্রমবিকাশবাদের প্রতিবাদ এ স্থলে অনাবশ্যক, কারণ সে মত মানিলেই যে নিরীশ্বরবাদী বা জড়বাদী হইতে হয় এরূপ মনে করি না। ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্ত একটা প্রক্রিয়া মাত্র। সেই প্রক্রিয়া যে শক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয় সেই শক্তি অবশ্যই জীবদেহে ও তাহার মূল উপাদানে আছে, এবং তাহাতে সেই শক্তি যাহার দ্বারা অর্পিত হইয়াছে সেই আদি-কারণই ঈশ্বর। আর সেই আদি-কারণ যে চৈতন্যযুক্ত, তৎসম্বন্ধীয় যুক্তি ও তর্কের উল্লেখ এই অধ্যায়ের প্রথমেই করা হইয়াছে।

জীবজগতের ক্রিয়া—অজ্ঞান ও সজ্ঞান।

জড়জগতের ক্রিয়াসকল যেমন সম্ভবতঃ মূলে একবিধ, এবং স্থূল, জড়, পরমাণু ও ইথারের গতিমূলক, জীবজগতের বিচিত্র ও বিবিধ ক্রিয়াসকলও মূলে সেইরূপ কোন একবিধ ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন কি না, এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতেছে। এই প্রশ্ন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক, কারণ জীবজগতের ক্রিয়াসকল আদৌ দ্বিবিধ, **অজ্ঞানক্রিয়া**—যথা, জীবদেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়, এবং **সজ্ঞানক্রিয়া**—যথা, জীবের ইচ্ছামত বিচরণ ও উদ্দেশ্যসাধন নিমিত্ত চেষ্টা।

অজ্ঞান জৈব ক্রিয়া প্রধানতঃ জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয়, ও বিনাশ এই কয়েক প্রকার। এক জীবের দেহের অংশ হইতে অন্য জীবের উৎপত্তির নাম জন্ম। তাহা ভিন্ন অন্য জীবের বিনা সংস্রবে জীবের উৎপত্তির সম্বন্ধে যদিও মতান্তর আছে, কিন্তু সেরূপ উৎপত্তির অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কখনও এক জীবদেহের যে কোন অংশ হইতে অন্য জীবের উৎপত্তি হয়, যথা, গাছের ডাল হইতে কলমের গাছ, এবং কোন কোন জাতীয় কীটের দেহের খণ্ড হইতে পৃথক্ কীটের উৎপত্তি। কিন্তু প্রায়ই এক জীবের দেহের বিশেষ অংশ হইতে অপর জীবের উৎপত্তি হয়, এবং সেই বিশেষ অংশকে বীজ বলা যায়। বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রভেদ এই, বৃদ্ধি কেবল দেহের আয়তনের বিস্তার, বিকাশ আয়তনের এরূপ বিস্তার যাহাতে তাহার কার্য্যোপযোগিতার উন্নতি হয়। দেহের আয়তন বা কার্য্যোপযোগিতার অবনতির নাম ক্ষয়। এবং জীবনান্তের নাম

[১] Darwin's *Origin of Species*, Ch. 1 দ্রষ্টব্য।

বিনাশ বা মৃত্যু, তাহাতে দেহের তিরোভাব হয় না, নির্জীব দেহ পড়িয়া থাকে।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জৈবক্রিয়াসকলের নিমিত্ত তাপ বিদ্যুৎ আদি বিষয়ক ক্রিয়ার অর্থাৎ ভৌতিক ক্রিয়ার, ও রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রয়োজন, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, ঐ সকল ক্রিয়া ভিন্ন অপর কোন একবিধ ক্রিয়ার সংস্রব রহিয়াছে, তাহা না হইলে সজীব বীজ বা জীবদেহাংশের মূলে প্রয়োজন থাকিত না। তবে ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়া যে শক্তির ক্রিয়া, জৈব ক্রিয়াও মূলে সেই শক্তির ক্রিয়া কি অপর কোন শক্তির ক্রিয়া, এ কথা লইয়া অধিক মতভেদ নাই। এ সমস্ত ক্রিয়াই যে মূলে একই শক্তির ক্রিয়া ইহা স্বীকার করিতে বিশেষ বাধা দেখা যায় না। কিন্তু জৈব ক্রিয়ার মূলপ্রণালী কিরূপ তাহা ঠিক বলা যায় না, কেবল এইমাত্র বলা যায় যে, সজীব বীজ বা জীবদেহাংশের সাহায্য ভিন্ন সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।[১] ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন স্থূল জড়পদার্থ ও সূক্ষ্ম পরমাণু ও ইথারের গতিমূলক, জৈব ক্রিয়াও সেইরূপ জীবদেহে সন্নিহিত পরমাণু ও ইথারের গতিমূলক কি না, ইহার উত্তর সহজে দেওয়া যায় না, কেননা এ বিষয়ের গবেষণা অতি দুরূহ, ও তাহার কারণ এই যে, পরমাণু-সমাবেশ সামান্য জড়ে যেরূপ অনুমান করা যায়, জীবদেহে তাহা তদপেক্ষা অনেক বিচিত্র ও জটিল।

অজ্ঞান জৈব ক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান যখন এতই দুরূহ, তখন সজ্ঞান জৈব ক্রিয়ার তত্ত্বনির্ণয় আরও অধিকতর কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। শেষোক্ত ক্রিয়ার নিমিত্ত যে সকল দেহসঞ্চালনাদি শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন তাহা অজ্ঞান জৈব ক্রিয়ার ন্যায়। কিন্তু সেই শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক যে সকল মানসিক ক্রিয়া, তাহা যে কেবল মস্তিষ্কের পরমাণুস্পন্দন ভিন্ন আর কিছু নহে, এ কথা সহজে স্বীকার করা যায় না। যে চৈতন্য জগতের মূলকারণ, এই শেষোক্ত ক্রিয়া সেই চৈতন্যের ক্রিয়া বলিয়া মানিতে হয়। সেই চৈতন্যশক্তিদ্বারাই এই পৃথিবীর, এবং কেবল এই পৃথিবীর নহে, জগতে যেখানে সজ্ঞান জীব আছে সে সকল স্থানের, সমস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। সে সকল ক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। তাহা কর্ম্মবিভাগের বিষয়। এ স্থলে কেবল এইমাত্র বলিব, অজ্ঞান ক্রিয়া জড়ের ক্রিয়ার ন্যায় যেমন গতিমূলক, সজ্ঞান ক্রিয়া বা চৈতন্যের ক্রিয়া তেমনই স্থিতি বা শান্তি-অন্বেষক। জীব সজ্ঞানে যে কোন-কার্য্য করে তাহা সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ শান্তিলাভের নিমিত্ত। এবং সেই শান্তি লাভ করিবার নিমিত্ত

জগতের গতি ও স্থিতির আবর্ত্তন।

---

১ Kirke's *Handbook of Physiology*, Ch. XXIV ও Landois and Stirling's *Text-book of Physiology*, Introduction দ্রষ্টব্য।

যদিও কর্ম্ম অর্থাৎ গতি অনন্য উপায়, কিন্তু তাহা নিজে গতির বিরাম অর্থাৎ স্থিতি।

অর্জুন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥"[১]

কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ যদি জনার্দ্দন।
তবে কেন কর্ম্মে মোরে কর নিয়োজন॥

এবং আমাদের সকলেরই এই কথা বলিতে, ও কর্ম্ম হইতে বিরাম লাভ করিয়া শান্তিপ্রদ জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকিতে, ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন—

"न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥
न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥"[২]

"লোকে কর্ম্ম না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না। কেবলমাত্র কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কোন অবস্থাতেই ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ সত্ত্বরজস্তমোগুণ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়"।

কর্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্ম হইতে বিরাম বা শান্তিলাভ হয় না। গতিই গতিবিরাম অর্থাৎ স্থিতিলাভের পথ, তবে জীবের সেই স্থিতি স্থায়ী হইবে কি ক্ষণিক হইবে, এবং দোলকের ন্যায় স্থিতি-স্থানে ক্ষণমাত্র থাকিয়া পূর্ব্বগতিজনিত সঞ্চিত বেগের ফলে বিপরীত দিকে পুনরায় গতি আরম্ভ হইবে, তাহা ঠিক বলা যায় না। জীবের পূর্ব্বগতি ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের পথগামিনী হইলে, শাস্ত্রে কথিত আছে, সেই জীব ব্রহ্মলোক লাভ করে, "न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते"[৩] আর তাহার পুনরাবর্ত্তন ঘটে না।"

শাস্ত্র ছাড়িয়া যুক্তিমূলে আলোচনা করিলেও বোধ হয় ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

জগৎ জড় ও চৈতন্যের ক্রিয়াময়। জড় ও জড়ের ক্রিয়া স্থূল জড়ের এবং পরমাণু ও ইথার রূপ সূক্ষ্ম জড়ের গতিসম্ভূত। এবং সেই গতি সূক্ষ

---

১ গীতা ৩।১।
২ গীতা ৩, ৪, ৫।
৩ ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১৫।১।

জড়ের অন্তর্নিহিত শক্তিসম্ভূত। চৈতন্যের ক্রিয়া তাহার নিজশক্তিজনিত, ও তদ্দ্বারাও জড়ের গতির উৎপত্তি হয়। এই উভয় শক্তিমূলে এক কি পৃথক্, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু তাহারা মূলে এক এই কথাই যে সঙ্গত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আবার পরমাণু যে প্রচ্ছন্ন শক্তিসঙ্ঘাত, ও অবিনশ্বর নহে, এবং কালক্রমে নিজ উপাদানভূত সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকীর্ণ করিয়া ইথারে বিলীন হয়, এই মতের পোষকতায় একজন বৈজ্ঞানিক অনেক যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইয়াছেন।[১] এবং তিনি আরও আভাস দিয়াছেন যে তাহাই যদি হয়, তবে অসংখ্য কল্পান্তে সেই শক্তিসঙ্ঘাত দ্বারা পরমাণুর পুনর্জ্জন্মও হইতে পারে। অতএব জগতের যাবতীয় ব্যাপার জড় ও শক্তির বিচিত্র মিলনের ফল। সেই ফল প্রথমে অনিয়মিত গতি—যথা নীহারিকা পুঞ্জে, তদনন্তর নিয়মিত গতি—যথা সৌর জগতে, পরিশেষে সেই গতির নিবৃত্তি যাহা বিশ্বব্যাপী ইথারের বাধাজনিত ও কালক্রমে অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই বিরামের পর অবিনশ্বর বিশ্বশক্তির বলে শক্তির পুনরাবর্ত্তন ও নূতন সৃষ্টি।[২]

এইত গেল জড়ের কথা। জীবেরও যত দিন পূর্ণ জ্ঞান লাভ না হয় ততদিন পুনর্জ্জন্ম হউক আর না হউক, এবং জীব যে ভাবেই থাকুক, তাহার অজ্ঞানতা নিবন্ধন দুঃখানুভব ও সুখ লাভাকাঙ্ক্ষা থাকিবে, ও তজ্জন্য তাহাকে গতিশীল থাকিতে ও কর্ম্ম করিতে হইবে। পরিণামে যখন তাহার পূর্ণ জ্ঞান হইবে অর্থাৎ জগতের আদিকারণ ব্রহ্মকে সে উপলব্ধি করিবে, তখন আর তাহার কোন অভাব বা আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, কর্ম্মও তাহার পক্ষে আবশ্যক হইবে না।

জগতে শুভাশুভের অস্তিত্ব।

এক্ষণে জগতে **শুভাশুভের** অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইবে।

জগতে শুভ এবং অশুভ দুইই আছে এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। জীবমাত্রই সুখ এবং দুঃখ উভয়ই অনুভব করে। প্রত্যেকেই অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিজ নিজ সম্বন্ধে এ কথার প্রমাণ পাইবেন, এবং বাহিরে অন্য জীবের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদেরও জীবন যে সুখদুঃখময় তাহার প্রমাণ পাইবেন। এতদ্ভিন্ন আমাদের নিজ নিজ প্রকৃতি স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, শুভাশুভের বীজ আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে। এক দিকে দয়া, উপচিকীর্ষা, স্বার্থ-ত্যাগ প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি আমাদিগকে নিজের ও জগতের শুভকর কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে, আবার অন্যদিকে ক্রোধ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তি আমাদিগকে নিজের ও অপরের অশুভকর কার্য্যে প্রবলভাবে উত্তেজিত করিতেছে। এবং এই সকল প্রবৃত্তির প্ররোচনায়

---

[১] Gustave Le Bon's *Evolution of Matter*, pp 307-19 দ্রষ্টব্য।

[২] Spencer's *First Principles*, Pt. II, Chapters XXII, XXIII দ্রষ্টব্য।

যেমন এক দিকে জীবের দুঃখনিবারণ ও সুখোৎপাদন নিমিত্ত নানাবিধ যত্ন হইতেছে, তেমনই অপর দিকে জীবের উৎপীড়ন ও বিনাশ নিমিত্ত অশেষ প্রকার চেষ্টা হইতেছে। অজ্ঞানজীবগণমধ্যে পরস্পর খাদ্যখাদকসম্বন্ধ-প্রযুক্ত একজাতীয় জীব অপর জাতিকে বিনষ্ট করিতেছে। জড়জগতেও, যেমন এক দিকে সৌরকরোজ্জ্বল সুনীল নির্ম্মল নভোমণ্ডল, ও স্নিগ্ধসুগন্ধ-মন্দানিলান্দোলিত স্বচ্ছ সরসী বা নদীবক্ষ জীবকে সুখ ও শান্তি বিতরণ করিতেছে, তেমনই অন্য দিকে নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন ভীষণঅশনিসম্পাতপ্রতিধ্বনিত অন্ধতমসাবৃত গগন, ও প্রচণ্ডঝটিকা-উদ্বেলিত উত্তালতরঙ্গমালাবিলোড়িত সাগর জীবের অশুভ ও অশান্তি উৎপাদিত করিতেছে। এতদ্ভিন্ন আগ্নেয়গিরির ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত, ধরাতলবিধ্বংসী ভূমিকম্প প্রভৃতি খণ্ডপ্রলয়ও সময়ে সময়ে জীবের অশেষবিধ অমঙ্গল ঘটাইতেছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে প্রশ্ন উঠে,—যে জগৎ মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টি তাহাতে এত অশুভ কেন? এ অশুভের পরিণাম কি? এবং এ অশুভের প্রতিকার আছে কি না? অনেকে মনে করিতে পারেন, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন অকর্ম্মা দার্শনিকদিগের আলোচ্য। কিন্তু তৃতীয় প্রশ্ন নিশ্চিতই কার্য্য-কুশল বৈজ্ঞানিকদিগেরও বিবেচ্য বিষয়। আর যেখানে বিজ্ঞানদ্বারা প্রতি-বিধান সাধ্য নহে, সেখানে প্রথমোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের আলোচনা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নহে কারণ সে সকল স্থলে যদি শুভশান্তির কোন পথ থাকে, তাহা কেবল সেই আলোচনা হইতে পাওয়া সম্ভাবনীয়। অতএব ক্রমানুয়ে তিনটি প্রশ্ন-সম্বন্ধেই কিছু কিছু বলা যাইবে।

জগতে অশুভ কেন?

পবিত্র ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টিতে পাপ ও অমঙ্গল কি প্রকারে প্রবেশ করিল, এই প্রশ্নের নানা স্থানে নানাবিধ উত্তর দেওয়া হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই আভাস পাওয়া যায় যে, স্বর্গে ঈশ্বরের অনুচরমধ্যে একজন ঈশ্বর-বিদ্রোহী হইয়া সয়তান নামে অভিহিত হয়, এবং তাহার কুমন্ত্রণায় মনুষ্যজাতির আদি-পুরুষ ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপে পতিত হন, ও সেই সূত্রে পৃথিবীতে পাপ ও অমঙ্গল প্রবেশ করে। এ কথাটা এক সম্প্রদায়ের মত, এবং যুক্তির সহিত ইহার ঐক্য করা কঠিন। হিন্দুশাস্ত্রে জীবের শুভাশুভ জীবের কর্ম্মফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে—

"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি।"[১]

বেদান্তদর্শনে শাঙ্করভাষ্যেও বলা হইয়াছে ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রযত্ন অনুসারে ফল বিধান করেন।[২] কিন্তু একথা বলিলেও অশুভের সহিত ঈশ্বরের সংস্রব

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩।২।১৩।

২ বেদান্ত দর্শন, শাঙ্করভাষ্য ৩।২।৪১।

নাই ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ প্রশ্ন উঠিবে, জীবের শুভাশুভের মূল যে কর্ম্মাকর্ম্ম তাহার মূল কি? ঈশ্বরই জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবের কর্ম্মাকর্ম্ম করিবার শক্তি ও প্রকৃতি তাঁহা হইতেই প্রাপ্ত, সুতরাং জীবের শুভাশুভের মূল সেই ঈশ্বর হইতে। এবং ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ঝটিকাদি জড়জগতের দুর্ঘটনাজনিত জীবের অশুভ কিরূপে জীবের কর্ম্ম ফল বলা যাইতে পারে, তাহাও সহজে বুঝা যায় না। কেহ কেহ বলেন, আমরা যাহাকে অশুভ বলি তাহা প্রকৃত পক্ষে অশুভ নহে, কতক কতক জীবের পক্ষে অশুভকর হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত জগতের মঙ্গলকর বটে। যথা, এক জাতীয় জীব অপর জাতীয় জীবকে আহারার্থে যে বিনাশ করে তাহা জগতের হিতকর, কারণ তাহা না হইলে জল জীবিত ও মৃত মীনপূর্ণ, বায়ু জীবিতপক্ষিপতঙ্গপূর্ণ, ও ধরাপৃষ্ঠ জীবিত ও মৃত জন্তুপূর্ণ হইয়া শীঘ্রই অন্য জীবের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত। আর পাপের উৎপত্তির সহিত ঈশ্বরের সংস্রব না থাকা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বলেন, পাপ স্বাধীন জীবের স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফল। এবং তাঁহারা এতদুর যাইতে প্রস্তুত যে, স্বাধীন জীব যে দুষ্কর্ম্ম করিবে তাহা ঈশ্বর পূর্ব্বে জানিয়া জীব সৃষ্টি করিলে তাঁহার প্রতি পাছে দোষস্পর্শ হয়, এই আশঙ্কা নিরাস নিমিত্ত তাঁহারা এ বিষয়ে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব খর্ব্ব করিতে বাধা দেখেন না।[১]

যুক্তিমূলে আলোচনা করিতে গেলে জগতে অশুভের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর সেই অশুভের কারণ যে ঈশ্বরাতীত তাহাও স্বীকার করা যায় না। এবং সর্ব্বশক্তিমান্ সকলমঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টিতে অশুভ কেন আসিল এই প্রশ্নের উত্তরে, আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে, এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, কূটস্থ নির্গুণ ব্রহ্ম যেরূপই হউন না, প্রকটিত জগতের নিয়মানুসারে কোন জ্ঞানগম্য বিষয়ই তদ্বিপরীত হইতে একেবারে অনবচ্ছিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং জগতে শুভ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই অশুভ থাকিবে, অশুভ না থাকিলে শুভের অস্তিত্ব জ্ঞানগোচর হইত না। একথা ঈশ্বরের অসীম দয়ার প্রতি বিশ্বাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কারণ জীবের ইহজীবনের অশুভ যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহা তাহার অনন্ত জীবনের পরিণামশুভের সঙ্গে তুলনায় ক্ষণিকমাত্র। এবং এই স্থানে ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, অশুভ ও দুঃখভোগই জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির ও মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় আর সেই অশুভ বা দুঃখভোগ যত তীব্র, জীবের উন্নতিলাভ ততই শীঘ্র ঘটে। এ ভাবে দেখিলে কতক জীবের অমঙ্গল যে কেবল অন্য জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, এবং অমঙ্গল কেবল সাকল্যে মঙ্গল, এমত নহে, তাহা অশুভভোগী জীবগণের নিজ নিজ মঙ্গলের হেতু বলিয়া

---

১ Martineau's *Study of Religion*, Bk. II, Ch. III ও Bk. III Ch. II, p. 279 দ্রষ্টব্য।

মানিতে হইবে। পশুপক্ষিপ্রভৃতি যাহাদের আমরা অজ্ঞান জীব বলি, তাহাদের অন্তরে কি হয় বলিতে পারি না। কিন্তু সজ্ঞান জীব অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রই আপন আপন আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, দুঃখভোগ আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান উপরে যে বলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাইবেন। এইখানে আবার আর একটি কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। জগতে অশুভ আছে, এবং তাহার কারণ ঈশ্বরাতীত নহে, এই দুটি কথা স্বীকার করিলে, ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তাহার কি প্রমাণ রহিল? এবং এই শেষ কথা অর্থাৎ ঈশ্বর মঙ্গলময়, যদি সপ্রমাণ না হয়, তবে জীবের ইহজীবনের অশুভ যে অনন্তজীবনের মঙ্গলের মূল হইবে, এরূপ অনুমান করিবারই বা কি হেতু রহিল?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, জগতের শুভাশুভ যতদূর দেখা যায়, তুলনা করিলে শুভ অংশই অধিক, অশুভ অংশই অল্প, অতএব ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বের সন্দেহ করিবার প্রবল কারণ নাই। তবে জগতের শুভাশুভের জমাখরচ করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বসংস্থাপন অতি দুরূহ ব্যাপার, অসাধ্য বলিলেও চলে, এবং সে অসাধ্যসাধন-চেষ্টার প্রয়োজনও নাই। আমাদের নিজ নিজ আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। বহির্জগতে এত অশুভ রহিয়াছে, অন্তরেও অনেক প্রবৃত্তি আমাদিগকে অশুভ কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে, কিন্তু তাহা সত্বেও আমরা শুভ ভাল বাসি, নিজের মঙ্গলসাধনে নিরন্তর ব্যাকুল, অমঙ্গল ঘটিলে অন্যের দ্বারা মঙ্গলসাধনের আকাঙ্ক্ষা রাখি, অনেক সময় পরের মঙ্গল কামনা করি, এবং সুযোগ পাইলে পরের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্‌ও হই। এমন কি চোরও তাহার চৌর্য্যলব্ধ দ্রব্য অন্য কেহ অপহরণ করিবে না এ বিশ্বাস রাখে, ঘোর নৃশংস দুষ্কর্ম্মীও ধৃত হইলে অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া ক্ষমা পাইবার আশা করে, এবং পাপাচারীও পাপের প্রলোভনে কিছুদিন মুগ্ধ থাকিয়া পরিণামে পাপাচরণজন্য মর্ম্মভেদী ক্লেশ সহ্য করে। শুভের নিমিত্ত আমাদের অন্তর্নিহিত এই অপ্রতিহত অনুরাগ কোথা হইতে জন্মে? জগতের আদি-কারণ মঙ্গলময় না হইলে মঙ্গলের দিকে আমাদের আত্মার এই অপ্রতিহত গতি কখনই হইত না। অতএব ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না, এবং তাহা হইলে জীবের ইহজীবনের অশুভ অনন্তজীবনের শুভের নিমিত্ত এ অনুমান অমূলক না হইয়া বরং সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

অশুভের পরিণাম কি?

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতেই, অশুভের পরিণাম কি, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। জগতে জীবের যে কিছু অশুভ-ভোগ তাহা অল্পক্ষণস্থায়ী, ও পরিণামে সকল জীবেরই পরমমঙ্গল ও মুক্তিলাভ ঘটিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। এ সিদ্ধান্তের মূলভিত্তি ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব। তাহার পর জীবজগতে যত ক্রমবিকাশ দেখা যায় তাহা উন্নতির দিকে। এবং মনুষ্যের দুঃখভোগ যে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় তাহাও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা

করিলে অনুমান হয়, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক জীবের পরিণাম শুভ ভিন্ন অশুভ নহে।

অশুভের প্রতিকার আছে কি না?

জগতে যে অশুভ আছে তাহার প্রতিকার আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, জড়জগৎ সম্ভূত যে সকল অশুভ, বিজ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা ক্রমশঃ অনেক স্থলে তাহার প্রতিকার উদ্ভাবিত হইতেছে, মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তিজনিত যে সকল অশুভ, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রালোচনাদ্বারা সুশিক্ষা ও সুশাসনপ্রণালী সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে এবং যে সকল স্থলে অন্য প্রতিকার অসাধ্য, সেখানে মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নির্ভর করিয়া ইহজীবনের অশুভ ক্ষণিক ও অনন্তজীবনের মঙ্গলের কারণ-স্বরূপ, এই বিশ্বাস অবিচলিত রাখাই একমাত্র প্রতিকার।

পঞ্চম অধ্যায়

জ্ঞানের সীমা

অন্তর্দৃষ্টির শক্তি সীমাবদ্ধ।

আমাদের অন্তর্জগৎ বিষয়ক জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা লব্ধ, এবং বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান, দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন ও স্পর্শন দ্বারা লব্ধ। সেই অন্তর্দৃষ্টির শক্তি ও দর্শনশ্রবণাদির শক্তি সকলই সীমাবদ্ধ।

অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব জানিতে পারি বটে, কিন্তু সেই আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কোথা হইতে আসিল, কোথায় বা যাইবে, তাহার আদি কি এবং তাহার অন্ত কি, এ সকল বিষয়ের কিছুই অন্তর্দৃষ্টি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায় না। এ সকল বিষয় সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বিশ্বাস করি তাহাতে অনেক যুক্তিতর্ক দ্বারা আমাদিগকে উপনীত হইতে হয়। তার পর যদিও অন্তর্জগতের কতকগুলি ক্রিয়ার ফল, যথা বহির্জগতের বস্তুর প্রত্যক্ষ, অতীত বিষয়ের স্মৃতি ইত্যাদি জ্ঞানের সীমার অন্তর্গত, কিন্তু অন্তর্জগতের ক্রিয়াসকল কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, বহির্জগতের বিষয়ের সহিত আত্মার কি প্রকারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে, অধিক কি আমার দেহের সহিত আমার আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, এবং কি প্রকারেই বা আত্মা দেহকে পরিচালিত করিতেছে, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এ সকল কথার কিছুই জানা যায় না, এবং এ সকল বিষয় আমাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে। আমার আত্মা কিরূপে কার্য্য করিতেছে, তাহা আমি জানিতে পারি না, ইহা অতি বিচিত্র কথা, কিন্তু বিচিত্র হইলেও ইহা সত্য।

চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিও তদ্রূপ।

আপন আত্মার অভ্যন্তরে কিরূপে কার্য্য হইতেছে তাহাই যখন আমরা সমস্ত জানিতে পারি না, তখন বহির্জগতের বিষয় সমস্ত যে জানিতে পারিব এরূপ মনে করা যায় না। বহির্জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের পথ চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন ও স্পর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, এবং তদ্দ্বারা রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। কিন্তু যেমন চক্ষু না থাকিলে রূপ বা আলোক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হইত না, এবং যে জন্মান্ধ তাহার পক্ষে সে জ্ঞান হইতে পারে না, তেমনই আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত অন্য কোন ইন্দ্রিয় না থাকায়, রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ এই পঞ্চগুণের অতিরিক্ত অন্য কোন গুণ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান জন্মিতে পারে না, এবং বহির্জগতের বস্তুর এই পঞ্চ গুণ ব্যতীত অন্য গুণ আছে কি না তাহা আমরা জানি না। কিন্তু অন্য গুণ নাই এ কথাও কোন মতে বলিতে পারি না। অন্য গুণ থাকিলে তাহা আমাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে।

10—1705 3

তার পর, যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে তাহাদেরও শক্তি অতি সঙ্কীর্ণ। চক্ষু দ্বারা আলোক ও আকার বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, কিন্তু আলোক অতি অল্প বা আকার অতি ক্ষুদ্র হইলে চক্ষু তাহা বিনা সাহায্যে দেখিতে পায় না, তবে দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কতক পরিমাণে দেখিতে পায়। আবার অল্পাধিক্যের প্রভেদ ছাড়া, আলোকরশ্মির বর্ণগত প্রভেদ আছে, এবং তন্মধ্যে কয়েকটি বর্ণের রশ্মি ভিন্ন অন্য বর্ণের রশ্মি সহজে দেখিতে পাইবার শক্তি আমাদের চক্ষুর নাই। তবে তাহাদের কার্য্যদ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। সেইরূপ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ও সকল প্রকার শব্দ শুনিতে পায় না। অতি ধীরে শব্দ হইলে তাহা আমরা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত শুনিতে পাই না। আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি কুক্কুর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জাতীয় জন্তুর ঘ্রাণ শক্তি অপেক্ষা অল্প। আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় উত্তাপের অল্প তারতম্য সহজে অনুভব করিতে পারে না, সেই তারতম্য স্থির করিবার নিমিত্ত যন্ত্রের প্রয়োজন। যন্ত্রেরও শক্তি সীমাবদ্ধ, এই জন্য নীহারিকাসমস্ত তারকাপুঞ্জ কিনা স্থির করা যায় না, এবং পরমাণুর আকার কিরূপ তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব পাঁচটির অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের অভাব, এবং যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে তাহাদের শক্তির অপূর্ণতা বশতঃ বহির্জগতের অনেক বিষয় আমাদের জানিবার উপায় নাই, এবং তাহা আমাদের দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় জ্ঞানের বাহিরে থাকিবে। দেহপিঞ্জরমুক্ত হইলে আত্মার জ্ঞানের সীমার বৃদ্ধি হইবে কি না তাহাও আমরা জানি না।

কি? ও কেন? এই দুই প্রশ্নের উত্তর।

আর এক বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমা অতি সঙ্কীর্ণ। আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা আমাদিগকে সর্ব্বদাই 'কি?' এবং 'কেন?' এই দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে প্রণোদিত করিতেছে। প্রথম প্রশ্নটি সকল বিষয়ের স্বরূপ, ও দ্বিতীয়টি সকল বিষয়ের কারণ, নিরূপণ করিতে চাহে। দুইটির মধ্যে কোনটিরই সম্পূর্ণ উত্তর আমরা পাই না।

বস্তুর বা বিষয়ের স্বরূপজ্ঞান অসম্পূর্ণ, কিন্তু অযথা নহে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়টি অন্তর্জগতের হইলে অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা, বহির্জগতের হইলে ইন্দ্রিয়দ্বারা, তাহার কি তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মে। কাহারও কাহারও মতে আবার তাহা জ্ঞেয় বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান নহে, তাহা স্বরূপের অবভাস। তবে আমাদের মনে হয় এতদূর সন্দেহের উপযুক্ত কারণ নাই, আর যদিও আমাদের কোন বিষয়েরই সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান হয় না, যেটুকু জানিতে পারি তাহা জ্ঞেয় বিষয়ের আংশিক স্বরূপ বটে।

কারণজ্ঞান অধিকতর অসম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাওয়া আরও কঠিন। অর্থাৎ কোন জ্ঞাতব্য বিষয় কেন ঘটিল, তাহার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে আমরা অতি অল্পই জানি। যদি বিষয়টি অন্তর্জগৎসম্বন্ধীয় হয় তবে আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই কথঞ্চিৎ উত্তর পাওয়া যায়। বিষয়টি বহির্জগতের হইলে সম্পূর্ণ উত্তর পাইবার সম্ভাবনা কখনই নাই, এবং অনেক সময়ে কোন উত্তরই

পাওয়া যায় না। দুই একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

প্রথমে অন্তর্জগৎবিষয়ক একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। "আমি যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছি সে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম কেন?"—এই প্রশ্ন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলে, এই সহজ উত্তর পাই—"আমার ইচ্ছা হইল বলিয়া।" কিন্তু এই উত্তরের ভিতরে একটি অতি কঠিন প্রশ্ন সন্নিহিত রহিয়াছে—"ইচ্ছা হইলে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হয় কেন?" এবং যতদিন আমাদের আত্মার সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞান না জন্মিবে, অর্থাৎ যতদিন ইচ্ছা ও ক্রিয়া আত্মাতে কিরূপ নিবদ্ধ আছে আমরা জানিতে না পারিব, ততদিন এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। উক্ত সহজ উত্তরটির উপর আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—"ইচ্ছা হইল কেন?" এবং তাহার এই উত্তর পাই—"এ পুস্তকের এ অধ্যায়ে যে বিষয় বিবৃত করিব মনে করিয়াছি, বর্ত্তমান আলোচনা তাহার অঙ্গ বলিয়া মনে হইয়াছে।" ইহার উপর আরও প্রশ্ন হইতে পারে—"তাহাই বা মনে হইল কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর নিতান্ত সহজ নহে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দেখা যাউক। "উপরে যেখানে প্রশ্নের উত্তর দিতে ক্ষান্ত হইলাম, সেখানে ক্ষান্ত হইলাম কেন?" ইহার উত্তর একপ্রকার উপরেই দিয়াছি, যখন বলিয়াছি "এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই"।—কিন্তু তাহার পর প্রশ্ন উঠিতেছে "এরূপ মনে করিলাম কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। এবং ইহার উত্তরে যতগুলি কথা বলা উচিত তৎসমুদয় আমি বোধ হয় ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। "আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই" এ কথা যখন বলিয়াছি, তখন কি কি কারণে আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল তাহা সমস্ত এখন স্মরণ করিয়া বলা কঠিন, কেননা সে সমস্ত কারণ বোধ হয় মনে স্পষ্টরূপে উদিত ও আলোচিত হয় নাই, এবং এখন ভাবিয়া চিন্তিয়া যে কারণগুলি স্থির করিব তাহারাই যে তখন মনে আসিয়াছিল একথা ঠিক বলা যায় না।

এক্ষণে বহির্জগৎবিষয়ক দুই একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাইবে। "আমার পেন্‌সিল্ সঞ্চালনে কাগজে অক্ষর অঙ্কিত হইতেছে কেন?"—ইহার সহজ উত্তর এই হইবে—"আমি অক্ষর অঙ্কিত করিবার উপযোগিরূপে হস্তসঞ্চালন করিতেছি সুতরাং আমার হস্তধৃত পেন্‌সিল্ অক্ষর অঙ্কিত করিবে।" কিন্তু এই উত্তর যথেষ্ট নহে। হস্তসঞ্চালন আমার ইচ্ছার কার্য্য ও অভিপ্রেত অক্ষরাঙ্কনের উপযোগি হইতে পারে, পেন্‌সিলের গতিও তদনুরূপ হইতে পারে, এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেও প্রশ্ন উঠিতেছে "পেন্‌সিলের গতিতে কাগজে কাল দাগ পড়িতেছে কেন?" যদি বলা যায় পেন্‌সিলের ভিতরে যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আছে কাগজের উপর তাহার ঘর্ষণদ্বারা দাগ পড়িতেছে, তাহার উপর প্রশ্ন উঠিবে "ঘর্ষণ দ্বারা দাগ পড়ে কেন?" এ প্রশ্নটি কেহ যেন বৃথা বলিয়া

মনে না করেন। সকল কৃষ্ণবর্ণ বস্তু কাগজে ঘষিলে দাগ পড়ে না। যদি বলা যায় পেন্‌সিল্ নরম, ঘষিলে ক্ষয় হয়, এবং তাহার বিচ্ছিন্ন অংশগুলি কাগজে লাগিয়া দাগ পড়ে, তাহা হইলে অন্ততঃ আর দুইটি কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হয়—"ঘর্ষণে পেন্‌সিলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হয় কেন?" আর "তাহারা কাগজেই বা লাগিয়া থাকে কেন?" এবং এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর, পেন্‌সিলের ও কাগজের আণবিক গঠনের ও আণবিক আকর্ষণের স্বরূপজ্ঞান না হইলে, আমরা দিতে পারি না।

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। "বৃন্তচ্যুত ফল উপরে না উঠিয়া নিম্নে পড়ে কেন?" ইহার সহজ উত্তর—"পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণদ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়া।" কিন্তু এ উত্তর যথেষ্ট নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠিতেছে, "পৃথিবী ফলকে আকর্ষণ করে কেন?" এবং তদুত্তরে যদি বলা যায় "প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তুকে আকর্ষণ করা জড়ের ধর্ম্ম," তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে "জড়ের এরূপ ধর্ম্ম কেন?" যতদিন আমরা জড়ের আভ্যন্তরিক গঠনের ও অন্তর্নিহিত শক্তির স্বরূপ জানিতে না পারি ততদিন এই শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসাধ্য। মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা নিউটন্ যদিও ঐ আকর্ষণ বস্তুর গতি কি নিয়মে পরিবর্ত্তিত করে তাহা নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু এক বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে কেন তাহার কোন বিশেষ উত্তর দেন নাই। বরং এরূপ আভাস দিয়াছেন যে, আকর্ষণের নিয়ম গণিতের নিয়ম মনে করিয়া গতিবিষয়ক আলোচনা করিলে অনেক তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু আকর্ষণ কেন সেরূপ নিয়মে চলে তাহা ভিন্ন কথা।[১]

উপরে যাহা বলা হইল তদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে, জগতের বস্তু ও বিষয়ের স্বরূপ ও কারণ জ্ঞান আমাদের অতি অসম্পূর্ণ, এবং বর্ত্তমান দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় অসম্পূর্ণই থাকিবে।

মনোনিবেশ ও বিজ্ঞান চর্চ্চা-দ্বারা জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত হয়।

কেহ কেহ বলেন দেহাবচ্ছিন্ন জীবও যোগবলে অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এ বিষয়ের বিশেষরূপ প্রমাণপরীক্ষা না করিয়া কোন কথাই নিশ্চিত বলা যায় না। তবে মনীষিগণ যে সকল অত্যাশ্চর্য্য পারমার্থিক ও বৈষয়িক নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন তদ্দৃষ্টে বোধ হয় মনোনিবেশদ্বারা মনুষ্যের জ্ঞানের সীমা অনেক দূর বৃদ্ধি হইতে পারে।

রঞ্জেন[২] রশ্মিদ্বারা যখন কাষ্ঠ বা অন্য অস্বচ্ছ পদার্থব্যবধানের ভিতর দিয়া দেখিতে পাই, তখন মনে হয় আমরা অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তি লাভ করিয়াছি।

---

১ Newton's Principia Bk. I, Sec. I Def. VIII, and Sec. XI, Scholium, Davis's Edition, Vol. I, pages 6 and 174 দ্রষ্টব্য।

২ Rontgen।

কিন্তু তদ্দ্বারা বাস্তবিক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির প্রমাণ হয় না, সে স্থলে দেখিতে পাওয়া, চক্ষুর গুণে নহে, আলোকরশ্মির গুণে। তবে যে প্রকারেই হউক, পূর্ব্বে যেখানে দেখিতে পাইতাম না এখন সেখানে দেখিতে পাইতেছি, এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে বিজ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা নানা দিকে জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত হইতে পারে।

স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় কঠিন, নিয়ম নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ।

যদিও জগতের কোন বিষয়েরই স্বরূপ বা কারণ আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি না, কিন্তু অনেক বিষয়ই কি নিয়মে নিষ্পন্ন হয় তৎসম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারি। উপরের মাধ্যাকর্ষণসম্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত উপলক্ষে তাহা বলা হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণের স্বরূপ ও কারণ না জানিয়া এবং অগত্যা জানিতে ক্ষান্ত হইয়াও, কেবল মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম জানিয়া আমরা সৌরজগতের গ্রহাদির গতিসম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিয়াছি, এবং আডাম্‌স্ সাহেব নেপ্‌চুন্ গ্রহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রকৃতির নিয়ম নিরূপণ, স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় অপেক্ষা অনেক স্থলে সুসাধ্য ও সুফলপ্রদ, এবং বৈজ্ঞানিকেরা সেই দিকেই জ্ঞানের সীমা বিস্তার করিতে যত্নবান্। তবে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাতে পূর্ণ হয় না, সুতরাং মনুষ্য কোন বিষয়েরই স্বরূপ ও কারণ জানিবার চেষ্টায় বিরত হইতে পারে না, এবং দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চাও বৈজ্ঞানিকের বিদ্রূপে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞানলাভের উপায়

জ্ঞানলাভার্থে শিক্ষা ও অনুশীলন আবশ্যক।

জ্ঞানলাভের নিমিত্ত জ্ঞানার্থীর নিজের যত্ন এবং অন্যের সাহায্য উভয়ই আবশ্যক। জ্ঞানলাভোপযোগি অন্যের সাহায্য শিক্ষা নামে অভিহিত, এবং তদুপযোগী যত্নকে অনুশীলন বলা যাইতে পারে। জ্ঞানলাভের নিমিত্ত সকল সময়েই অনুশীলন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এবং প্রথম অবস্থায় শিক্ষার উপরও অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। অতএব অগ্রে শিক্ষা সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ বক্তব্য তাহা বলা যাইবে, এবং পরে অনুশীলনের কথা হইবে।

শিক্ষা

শিক্ষা

শিক্ষাসম্বন্ধে মনীষিগণ অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক অনেক কথা আছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর "রিপব্লিক্"[১] নামক পুস্তকে এ বিষয়ের বিবিধ প্রসঙ্গ আছে। সিসরো ও কুইন্টিলিয়ন্ রোমের বিখ্যাত বাগ্মিদ্বয় স্ব স্ব গ্রন্থে শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এবং ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের পণ্ডিতগণ লোকশিক্ষার্থে নানাবিধ মত প্রচার ও নানারূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সে সকল কথার সমালোচনা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষাবিষয়ক কএকটি স্থূল কথার মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে।

সে কএকটি কথা এই—১, শিক্ষার বিষয়, ২, শিক্ষার প্রণালী, ৩, শিক্ষার উপকরণ।

শিক্ষার বিষয়, বিদ্যার শ্রেণি-বিভাগ।

১। **শিক্ষার বিষয়।** শিক্ষার বিষয় আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্তজগৎ। যখন শিক্ষার বিষয় প্রায় অসংখ্য, তখন তাহাদের আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত তাহাদিগকে যথাসম্ভব শ্রেণিবদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

একভাবে দেখিতে গেলে, অর্থাৎ যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, মানুষের যখন শরীর ও আত্মা আছে তখন শিক্ষা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা আবার জ্ঞানবিষয়ক বা মানসিক, এবং নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক বা নৈতিক, এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

আর একভাবে দেখিলে, অর্থাৎ যাহার কথা শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, শিক্ষা অন্তর্জ্জগৎবিষয়ক ও বহির্জ্জগৎবিষয়ক, এই দুইভাগে, এবং শেষোক্তবিষয়ক শিক্ষা, জড়বিষয়ক, অজ্ঞান জীববিষয়ক, ও সজ্ঞান

---

[১] Bk. VII. দ্রষ্টব্য।

জীব-বিষয়ক, এই তিন ভাগে—অর্থাৎ সমস্ত শিক্ষার বিষয় সাকল্যে চারিভাগে, বিভক্ত হইতে পারে। আর এই চারিটি বিষয়ের বিদ্যাকে, আত্মবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান (অর্থাৎ জীবের সজ্ঞান ক্রিয়াবিষয়ক বিদ্যা) বলা যাইতে পারে। এই ভাগচতুষ্টয়ের প্রত্যেক ভাগেরই আবার অবান্তর বিভাগ অনেক আছে। যথা, আত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভাগ—ন্যায় বেদান্তাদি দর্শন, মনোবিজ্ঞান, গণিত। জড়বিজ্ঞানের অবান্তর বিভাগ—স্থূল জড়বিজ্ঞান বা জড়ের স্থিতি ও গতিবিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, শব্দ বা ধ্বনিবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, তাপবিজ্ঞান, বিদ্যুৎবিজ্ঞান, চুম্বক-বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানের অবান্তর বিভাগ—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা। নীতি-বিজ্ঞানের (অর্থাৎ জীবের সজ্ঞানক্রিয়াবিষয়ক বিদ্যার) অবান্তর বিভাগ—ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি।

যাহা বলা হইল তাহা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত আকারে দর্শিত হইতে পারে—

শিক্ষা
(শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলে)

- শারীরিক
- আধ্যাত্মিক
  - মানসিক
  - নৈতিক

শিক্ষার বিষয় বা
বিদ্যা

- অন্তর্জগৎ বিষয়ক
  - আত্মবিজ্ঞান
    - ন্যায়াদি দর্শন
    - মনোবিজ্ঞান
    - গণিত অর্থাৎ কাল ও স্থান-মূলক বিদ্যা
- বহির্জগৎ বিষয়ক
  - জড়বিজ্ঞান
    - স্থূলজড় বিজ্ঞান (জড়ের স্থিতি ও গতি)
    - ভূবিদ্যা
    - জ্যোতিষ
    - রসায়ন
    - ধ্বনিবিজ্ঞান
    - আলোক বিজ্ঞান
    - তাপবিজ্ঞান
    - বিদ্যুৎ বিজ্ঞান
    - চুম্বক বিজ্ঞান
  - জীববিজ্ঞান
    - উদ্ভিদ্‌বিদ্যা
    - প্রাণিবিদ্যা
  - নৈতিক (অর্থাৎ জীবের সজ্ঞান কার্য্যবিষয়ক) বিজ্ঞান
    - ভাষা সাহিত্য ও শিল্প
    - ইতিহাস
    - সমাজনীতি
    - অর্থনীতি
    - রাজনীতি
    - ধর্ম্মনীতি
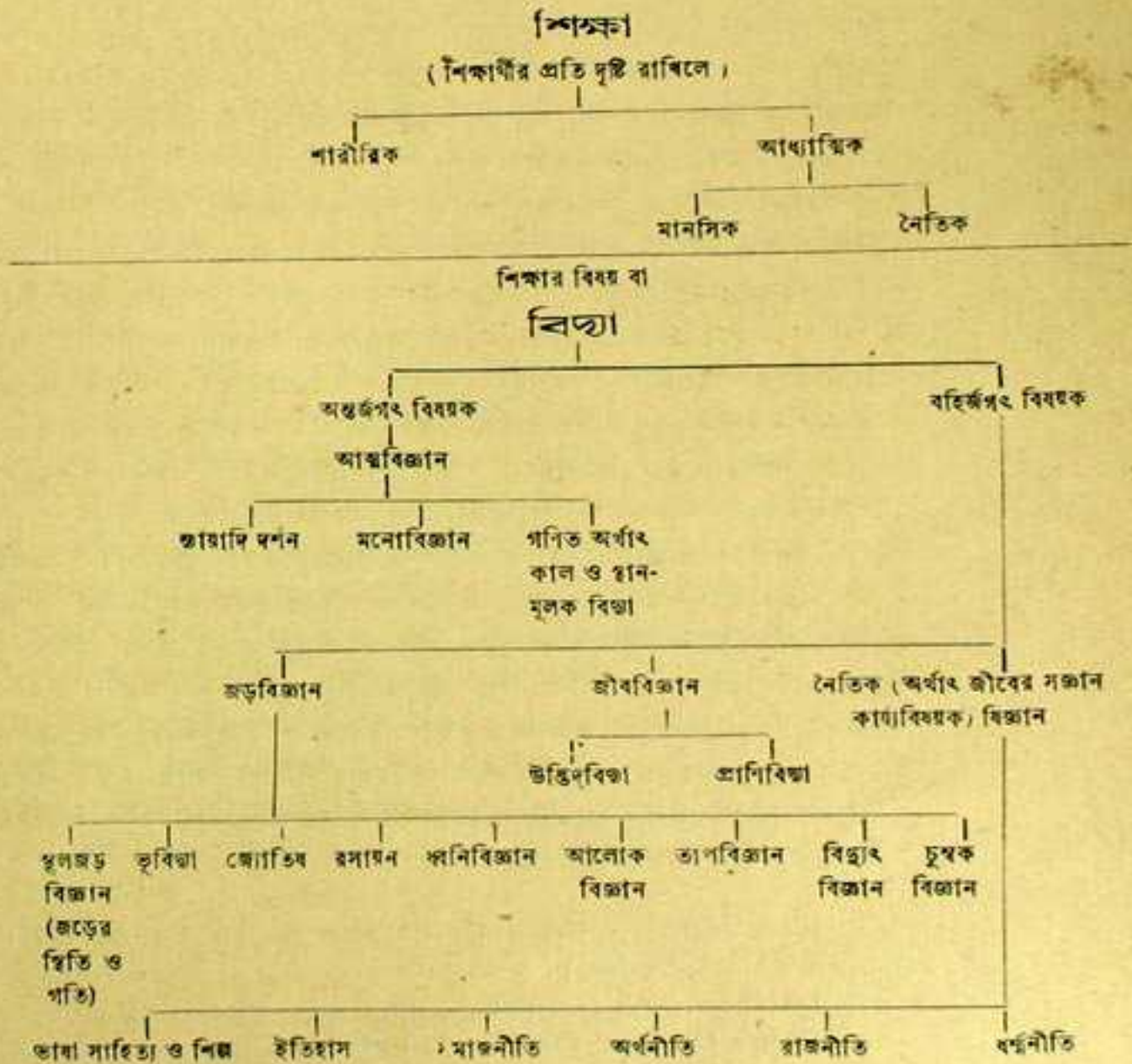
উপরে বিদ্যার যে শ্রেণিবিভাগ করা হইল তাহা অসম্পূর্ণ এবং শ্রেণিবিভাগের নিয়মানুসারে সর্ব্বাংশে ন্যায়সঙ্গতও নহে। তাহা কেবল আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত মোটামুটি একপ্রকার বিভাগমাত্র। বিদ্যার সম্পূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত শ্রেণিবিভাগ দুরূহ কার্য্য। বেকন্, কোম্‌ত, স্পেন্সার প্রভৃতি যত্ন করিয়াও নির্দ্দোষবিভাগ করিতে পারেন নাই।[১]

এক্ষণে শিক্ষার উপরিউক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা হইবে।

শারীরিক শিক্ষা।

শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না এবং লোকে কোন কার্য্যই ভালরূপে করিতে পারে না। সত্যই "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" "শরীরই ধর্ম্মসাধনের আদি উপায়।"

অতএব **শারীরিক শিক্ষা** অতিপ্রয়োজনীয়। এ স্থলে শারীরিক শিক্ষা বলিলে কেবল ব্যায়াম বুঝাইবে না—উপযুক্ত আহারগ্রহণ, উপযুক্ত পরিচ্ছদপরিধান, যথাযোগ্য ব্যায়াম অভ্যাস, আবশ্যকমত বিশ্রাম লওয়া, যথা সময়ে নিদ্রা যাওয়া, প্রভৃতি যে সকল কার্য্যদ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও উৎকর্ষলাভের বিঘ্ন না হইয়া বরং সহায়তা হয়, তৎসমুদয়েরই অনুষ্ঠান বুঝাইবে।

আহার কেবল দেহরক্ষা ও দেহের পুষ্টি লাভের নিমিত্ত, এবং যে খাদ্য দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহাই গ্রহণ করা যাইতে পারে, এরূপ মনে করা ঠিক নহে। কারণ খাদ্যের ইতরবিশেষে যে কেবল দেহের অবস্থার ইতরবিশেষ হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা মনের অবস্থারও ইতরবিশেষ ঘটে। সত্য বটে, যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন "যাহা মুখের অন্তর্গত করা যায় তাহা মানুষকে অপবিত্র করে না, কিন্তু যাহা মুখ হইতে বহির্গত হয় তাহাই মানুষকে অপবিত্র করে।"[২] এ কথা দেশকালপাত্র বিবেচনায় যথাযোগ্য হইয়াছিল। কারণ, তৎকালে ইহুদীরা অন্তরে শুচি হওয়ার প্রয়োজন একপ্রকার ভুলিয়া গিয়া কেবল বাহিরে শুচি ও আহারে শুচি হইলেই যথেষ্ট মনে করিত, এবং তাহাদের শিক্ষার্থে ঐ কথা বলা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ উপদেশ সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত নহে। দেহতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, খাদ্যের উপর মনের অবস্থা অনেকটা নির্ভর করে, এবং মাংসাশীরা কিছু উগ্রস্বভাব ও স্বার্থপর হয়।[৩] মাদক দ্রব্যের গুণাগুণ সকলেই জানেন। তাহা সেবন করিলে অন্ততঃ অল্প কালের জন্য যে চিত্তবিকার জন্মে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং মদ্যমাংস বর্জনীয়। এ কথা লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে বটে, কিন্তু আমাদের

---

১ Karl Pearson's Grammar of Science, 2nd Ed. Ch. XII. ও Deussen's Metaphysics, p. 6 দ্রষ্টব্য।

২ Matthew, XV, II দ্রষ্টব্য।

৩ Haig's Diet and Food, p. 119 দ্রষ্টব্য।

দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মদ্যমাংসের প্রয়োজনাভাব, এবং তাহা অপকারক ভিন্ন উপকারক নহে, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। যাহারা জীবহিংসায় বিরত হওন নিমিত্ত অথবা মনের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত নিরামিষ ভোজী, তাহাদের ত কথাই নাই, শরীরের উৎকর্ষসাধন নিমিত্তও এদেশে মাংসভোজন নিষ্প্রয়োজন। মৎস সম্বন্ধে অধিকতর মতভেদ আছে। মৎস্য অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ ও সুলভ, এবং পরিত্যাগ করিলে তৎপরিবর্ত্তে তুল্য উপকারক খাদ্য পাওয়াও কঠিন। এতদ্ভিন্ন মৎস্যের ক্রীড়ার স্থল জলের ভিতর এবং জল হইতে তুলিলেই মৎস্য মরিয়া যায়, সুতরাং মৎস্য মারিতে দৃশ্যতঃ অধিক নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে হয় না। এই জন্য মৎস্য ত্যাগের নিয়ম তত দৃঢ় করা যায় নাই। পরন্তু কেবল খাদ্যা-খাদ্যের বিচার করিলেই হইবে না, আহারের পরিমাণও অতিরিক্ত হওয়া অনুচিত। মনু কহিয়াছেন—

> "অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
> অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"[১]

"অতিভোজন আরোগ্য, দীর্ঘায়ু, স্বর্গলাভ ও পুণ্যকার্য্যের বাধাজনক এবং লোকের নিকট নিন্দনীয়, অতএব তাহা ত্যাগ করিবে।" এই মনুবাক্য কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি নহে, ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রেরও অনুমোদিত।[২] অতএব আহার কেবল রসনাতৃপ্তির বা শরীরপুষ্টির নিমিত্ত নহে। শরীর ও মন উভয়ের উৎকর্ষসাধন নিমিত্ত তাহা শুচি, সাত্ত্বিক, পুষ্টিকর ও পরিমিত হওয়া উচিত, এই শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন।[৩]

পরিচ্ছদ। পরিচ্ছদ কেবল দেহাবরণের ও শীতাতপ হইতে দেহরক্ষার নিমিত্ত নহে, পরিচ্ছদের সহিত মনেরও বিলক্ষণ সংস্রব আছে। পরিচ্ছদের মলিনতা ও অসংলগ্নতা পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস না করিলে, ক্রমে অন্যান্য কার্য্যেও পরিচ্ছন্নতা ও সংলগ্নতার প্রতি লক্ষ্য কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে, পরিচ্ছদের শোভার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি থাকিলে ক্রমে বৃথাভিমান বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, সংলগ্নতা, ও সুরুচি শিখান আবশ্যক।

ব্যায়াম। ব্যায়াম বলিলে সহজে মল্লক্রীড়াই বুঝায়, কিন্তু শারীরিক শিক্ষার নিমিত্ত তাহা যথেষ্ট নহে। তদ্দ্বারা বলবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ হওয়া যেমন আবশ্যক, সর্ব্বাংশে কার্য্যকুশল হওয়াও তেমনই আবশ্যক। অতএব হস্তসঞ্চালনদ্বারা লিখন-চিত্রকরণাদিশিক্ষা, ও পদসঞ্চালনদ্বারা বিনা পদস্খলনে দ্রুতগমন অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। চক্ষুকর্ণাদিও সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে বিজ্ঞানানুশীলন ও জড়জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সম্পূর্ণ শক্তি

---

১ মনু, ২।৫৭।

২ Dr. Keith's Plea for a Simpler Life দ্রষ্টব্য।

৩ গীতা, ১৭।৮ দ্রষ্টব্য।

হয় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বুদ্ধির ন্যূনাধিক্য অনেক স্থলে দর্শন ও শ্রবণ শক্তির ন্যূনাধিক্য ভিন্ন আর কিছু নহে, এবং দৃষ্ট ও শ্রুতবিষয় যে দেখিবামাত্র ও শুনিবামাত্র সম্পূর্ণরূপে দেখিতে ও শুনিতে পায়, সেই তাহার মর্ম্ম সত্বর বুঝিতে পারে। অতএব চক্ষুকে সত্বর দেখিতে ও কর্ণকে সত্বর শুনিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কি প্রকারে সেই শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহা স্থির করা সহজ নহে, এবং কোন শিক্ষাই ফলবতী হইবে কি না এ সন্দেহও উঠিতে পারে। কিন্তু এ কথা বলা যায় যে শিক্ষার্থী সত্বর দেখিতে ও সত্বর শুনিতে মনোযোগের সহিত বার বার চেষ্টা করিলে, অভ্যাসদ্বারা কিঞ্চিৎ সিদ্ধি-লাভ করিতে পারে। এরূপ অভ্যাসের সুফল অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শন ও শ্রবণশক্তির যে তারতম্যের কথা এখানে বলা যাইতেছে তাহা স্থূল তারতম্যের কথা নহে, সূক্ষ্ম তারতম্যের কথা। তাহার পরীক্ষা নানারূপে হইতে পারে। যথা, পরীক্ষার্থী দর্শকের সম্মুখে কোন বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত এক খণ্ড তাস একখানি তক্তায় লাগাইয়া রাখিয়া, মধ্যে বৈদ্যুতচুম্বকে আকৃষ্ট ক্ষুদ্রছিদ্রবিশিষ্ট লৌহফলক ব্যবধান রাখিয়া, চুম্বকের বৈদ্যুতিকতারসংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলে, লৌহফলক তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে, এবং পড়িতে পড়িতে যতক্ষণ তাহার ছিদ্র তাসটুকরার সম্মুখে থাকিবে ততক্ষণ মাত্র সেই টুকরাটি দর্শক দেখিতে পাইবে। সেই অত্যল্পক্ষণের পরিমাণ কত তাহা ফলকের নিম্নগতির পরিমাণ ও ছিদ্রের আয়তনের পরিমাণ হইতে গণনাদ্বারা স্থির করা যাইতে পারে, এবং ছিদ্রের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা সেই ক্ষণকালের পরি-মাণেরও হ্রাসবৃদ্ধি ইচ্ছামত করা যাইতে পারে। এই রূপে দেখা গিয়াছে সেই কাল ·০০৫ সেকেণ্ডেরও ন্যূন হইলে কোন দর্শকই সেই রংকরা তাস-টুকরা দেখিতে পায় না।[১] শ্রবণ সম্বন্ধে পরীক্ষা আরও সহজ। একটি ঘটিকা যন্ত্রের নিকট হইতে পরীক্ষার্থী শ্রোতাকে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে বলুন, এবং দেখুন কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াও তিনি ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পান ও ঠিক গণিতে পারেন। সেই দূরত্বের পরিমাণ তাঁহার শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতার পরিচায়ক।

ব্যায়াম সম্বন্ধে ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তাহা নিয়মিত অথচ স্বেচ্ছামত, এবং স্বাস্থ্যকর অথচ অন্যদিকেও কার্য্যকর হয়। ব্যায়ামে নিয়মের অধিক বাঁধাবাঁধি থাকিলে তাহা কষ্টকর ও অনিষ্টকর হইয়া পড়ে। আর স্বাস্থ্যের নিমিত্ত নিয়মিত ব্যায়ামকালে দ্রুত চলিতে পারিবে, কিন্তু কার্য্যার্থে প্রয়োজন কালে দুপা চলিতে পারিবে না, এরূপ ব্যায়ামশিক্ষার কোন ফল নাই।

নিদ্রা ও বিশ্রাম।

নিদ্রা ও বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তবে তাহার পরিমাণ সকলের পক্ষে ও সকল সময়ে সমান হওয়া আবশ্যক নহে। অল্প বয়সে অধিক নিদ্রার প্রয়োজন। বালকেরা সহজেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং অনেকক্ষণ

---

[১] **Dr. Scripture's New Psychology**, Ch. VI দ্রষ্টব্য।

নিদ্রা যায়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, অনিদ্রার ফল দেহ ও মন উভয়ের পক্ষেই অতি অনিষ্টকর।[১] একথা শিক্ষার্থীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

অনেক ছাত্র পরীক্ষার সময় নিকট হইলে পাঠাভ্যাসের নিমিত্ত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে। তাহারা বুঝে না যে তদ্দ্বারা পাঠাভ্যাসের প্রকৃত সুবিধা হয় না। অধিক রাত্রি জাগরণে কেবল শরীর অসুস্থ হয় এমত নহে, তাহাতে মনেরও অসুস্থতা জন্মে, এবং কোন বিষয় বুঝিবার ও স্মরণ রাখিবার শক্তির হ্রাস হয়। সুতরাং অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠ করিলে অধিক কার্য্য না হইয়া বরং তাহার বিপরীত ফল হয়। কিন্তু কেবল ছাত্রদিগের দোষ দেওয়া উচিত নহে, যাঁহাদের উপর পরীক্ষার নিয়ম সংস্থাপনের ও পাঠ্যাবধারণের ভার, তাঁহাদেরও দেখা কর্ত্তব্য যে, ছাত্রদিগের উপর অপরিমিত ভার চাপান না হয়।

নিদ্রার ন্যায় বিশ্রামেরও প্রয়োজন, কারণ বিশ্রাম না করিলে শ্রান্ত হইতে হয়, এবং অল্প সময়ে অধিক কার্য্য করিতে পারা যায় না। তবে বিশ্রামের অর্থ আলস্য নহে। আলস্যে কোন উপকার হয় না, এবং সত্যই "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"[২], "ক্ষণমাত্রও কেহ একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না।" নিয়মিতরূপে কার্য্যকরা, এবং এক প্রকার কার্য্য অনেকক্ষণ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই, শ্রান্তি পরিহারের প্রকৃত উপায়।[৩]

শারীরিক শিক্ষার আবশ্যকতা।

অনেকে মনে করিতে পারেন জ্ঞান লাভের জন্য এত শারীরিক নিয়ম-পালনের প্রয়োজন নাই, বুদ্ধি থাকিলেই যতক্ষণ শরীর নিতান্ত অসুস্থ না হয় ততক্ষণ জ্ঞানলাভের কোন বাধা হয় না। কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবীর পক্ষে, শরীরের অবস্থা ভাল না থাকিলেও জ্ঞানার্জ্জনের অধিক বিঘ্ন না হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা ঘটে না, এবং আহার ও ব্যায়াম, নিদ্রা ও বিশ্রাম, যথানিয়মে চলিলেই শরীর ও মনের অবস্থা জ্ঞানার্জ্জনের উপযোগী হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ব্রহ্মচর্য্যপালন ও আহারনিদ্রার সংযমই শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রশস্ত নিয়ম।

সহজ অবস্থায় অনেক শারীরিক নিয়মলঙ্ঘন সহ্য হয়, এবং অনেক সহজ-কার্য্য বিনা শারীরিক শিক্ষায় একপ্রকার চলে, কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক নিয়মপালন ও শারীরিক শিক্ষা অনাবশ্যক বলা যায় না। নিয়মিত আহার, ব্যায়াম ও বিশ্রাম দ্বারা অনেক দুর্ব্বল দেহ সবল হয়। হস্ত ও চক্ষুর সুশিক্ষাদ্বারা লোকে চিত্রকরণে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে

---

১ Marie de Manaceine's "Sleep" pp. 65—70 দ্রষ্টব্য।

২ গীতা ৩।৫।

৩ Dr. Fleury's Medicine and Mind Ch. V. দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা না করিলে চিত্র করা দূরে থাকুক, একটি দীর্ঘ সরল রেখাও টানিতে পারা যায় না।

মানসিক শিক্ষা।

মন যেমন শরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ, মানসিক শিক্ষা ও সেইরূপ শারীরিক শিক্ষা অপেক্ষা কঠিন বিষয়। এস্থলে মানসিক শিক্ষা বিদ্যাশিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায়, সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষা জগতের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বুঝায়, কিন্তু মানসিক শিক্ষা তদতিরিক্ত আরও কিঞ্চিৎ বুঝায়, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞানলাভের শক্তিবর্দ্ধন এই দুইটিই বুঝায়। উপরিউক্ত বিশেষ বিশেষ বিদ্যা শিখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই মানসিক শিক্ষা লাভ হয়—যথা, দর্শন বা গণিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, ইতিহাস শিখিতে গেলে অভ্যাসদ্বারা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শিক্ষার প্রতি পৃথক্ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কারণ বিদ্যাশিক্ষা যদিও অনেক সময়েই মানসিকশক্তি বৃদ্ধি করে, কখন কখন আবার তাহা তদ্বিপরীত ফলও উৎপন্ন করে। নিরবচ্ছিন্ন এক বিদ্যা আলোচনা দ্বারা যদিও সেই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু মনের সাধারণ শক্তির তদ্দ্বারা বৃদ্ধি না হইয়া বরং হ্রাস হইয়া যায়, এবং এইরূপে পণ্ডিতমূর্খ বলিয়া যে এক শ্রেণির বিচিত্র লোক আছে তাহার সৃষ্টি হয়। বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও যদি মানসিক শিক্ষার অভাবে লোকে এইরূপ পরিহাসভাজন হইতে পারে, তবে সেই অত্যাবশ্যক মানসিক শিক্ষা কি, এবং কিরূপে তাহা লাভ করা যায়?—উৎসুক হইয়া সকলেই এই প্রশ্ন করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানসিক শিক্ষা কেবল বিষয় বিশেষের জ্ঞানলাভ নহে, সকল বিষয়েরই জ্ঞানলাভের শক্তিবর্দ্ধন–ইহার মূল লক্ষণ। সেই শক্তিবর্দ্ধনের উপায় নানা বিষয়ের যথাসম্ভব শিক্ষা, এবং সকল বিষয়েই যথাসাধ্য আয়ত্ত করিবার অভ্যাস। সকল বিষয় সকলের সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হইতে পারে না, কিন্তু সকল বিষয়েরই সহজ কথা কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করার শক্তি সকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরই থাকা উচিত, এবং একটু যত্ন করিলেই সে শক্তি লাভ করা যায়। বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি বড়। বিদ্যা কম থাকিলেও লোকের চলে, কিন্তু বুদ্ধি কম থাকিলে চলা ভার। প্রকৃত মানসিক শিক্ষা না হইলে জ্ঞানলাভ সহজে হয় না।

নৈতিক শিক্ষা।

শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা অপেক্ষা **নৈতিক শিক্ষা** অধিকতর প্রয়োজনীয়। শরীর সবল ও বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলেও যাহার নীতি কলুষিত, সে নিজের এবং অপর সাধারণের অমঙ্গলের কারণ হয়। চাণক্য যথার্থই বলিয়াছেন—

> "দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
> মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥"

"দুর্জন বিদ্বান্ হইলেও পরিত্যাজ্য। সর্পের মস্তকে মণি থাকিলে কি সে ভয়ঙ্কর নহে?" নৈতিক শিক্ষা যেমন অতি প্রয়োজনীয়, তেমনই অতি

কঠিন। সুনীতি কাহাকে বলে এবং দুর্নীতি কাহাকে বলে তাহা স্থির করা প্রায়ই সহজ। কিন্তু তাহা হইলেও যে নৈতিক শিক্ষা এত কঠিন, তাহার কারণ এই যে, নৈতিক শিক্ষা লাভ, কি সুনীতি কি দুর্নীতি ইহা জানিলেই সম্পন্ন হয় না। কার্য্যতঃ যাহা সুনীতি তাহা আচরণ করা ও যাহা দুর্নীতি তাহা পরিহার করাই নৈতিক শিক্ষা লাভের লক্ষণ, এবং সেইরূপ কার্য্য করিতে পারা বহু যত্ন ও অভ্যাসের ফল। ফলতঃ নৈতিক শিক্ষা কেবল জ্ঞানবিষয়ক নহে, ইহা প্রধানতঃ কর্ম্মবিষয়ক। তবে নৈতিক শিক্ষা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। যদিও দুর্জ্জন বিদ্যালঙ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু দুর্জ্জনের প্রকৃত জ্ঞানলাভ প্রায়ই ঘটে না। তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যে সকল যত্ন ও অভ্যাস আবশ্যক, তদুপযোগী মনের শান্তভাব দুর্নীত ব্যক্তি-দিগের থাকে না। তাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু ধীরবুদ্ধি হয় না। তাহারা সূক্ষ্ম কথা ধরিতে পারে, কিন্তু কোন বিষয়ের স্থূল ও প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে না। তাহারা কুতর্ক করিয়া কুটিল পথে যাইতে পারে, কিন্তু সুযুক্তি-দ্বারা সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। যেখানে কোন দোষ নাই, সেখানে তাহারা দোষ দেখে, যেখানে প্রকৃত দোষ আছে, তাহাদের বক্রদৃষ্টি তাহা দেখিতে পায় না। বোধ হয় এই জন্যই আর্য্যঋষিরা যাহাকে তাহাকে উপদেশ দিতেন না। শান্ত, ঋজু, এবং দম্ভবর্জ্জিত না হইলে কাহাকেও শিষ্য করিতেন না, অর্থাৎ শিষ্য আগে নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে জ্ঞান-শিক্ষা দিতেন না। আরও একটি কথা আছে। দুর্নীত ব্যক্তির জড়জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। সুতরাং নৈতিক শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

নৈতিক শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক কষ্ট বৃদ্ধি হয়, এবং নীতিশিক্ষা দ্বারা আমাদের অনেক কষ্টের লাঘব হইতে পারে। সত্য বটে নীতিশিক্ষা দ্বারা দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু নিবারিত হয় না, কারণ তদ্দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদ-নোপযোগী দ্রব্য বা রোগোপশমের ঔষধ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। কিন্তু নীতিশিক্ষা যে আলস্য-অপব্যয়াদি সম্ভূত দারিদ্র্য এবং অতিভোজন-ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতাদি জনিত রোগ নিবারণের উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুনীতি-সম্পন্ন ব্যক্তি যথাসাধ্য যত্ন করিয়া দারিদ্র্য ও রোগ নিবারণে সতত তৎপর থাকেন। আবার দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু, দৈবদুর্ঘটনাদি যেখানে অনিবার্য্য, সেখানে তজ্জনিত দুঃখভার সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিবার ক্ষমতা নীতিশিক্ষা বিনা আর কিছুতেই জন্মে না, এবং সেই ক্ষমতা এই সুখদুঃখময় সংসারে বড় অল্প মূল্যবান্ সম্পদ্ নহে।

এতদ্ব্যতীত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় দৈবদুর্বিপাকাদি আমাদের যত দুঃখের মূল, আমাদের দুর্নীতি তদপেক্ষা অল্প দুঃখের মূল নহে। প্রথমতঃ আমাদের নিজের দুর্নীতিতে নিজের অশেষ দুঃখ ঘটে। অতি-ভোজনাদি অসংযত ইন্দ্রিয়সেবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা

ভোগ করিতে ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। দুরাকাঙ্ক্ষা, অতি-লোভ, ঈর্ষা-দ্বেষাদি দুষ্প্রবৃত্তি হইতে আমরা নিরন্তর তীব্র মনোবেদনা সহ্য করি। দ্বিতীয়তঃ, পরের দুর্নীতির জন্য অপমান, বঞ্চনা, চৌর্য্যাদিদ্বারা অর্থনাশ, শত্রুহস্তে আঘাত ও অপমৃত্যু, প্রভৃতি নানাপ্রকার গুরুতর ক্লেশ ভোগ করি। রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত অমঙ্গলও মনুষ্যের দুর্নীতির ফল। অতএব ইন্দ্রিয়সংযম ও দুষ্প্রবৃত্তিদমন শিক্ষা না করিলে, কেবল বিজ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ভোগের দ্রব্য ও রোগের ঔষধ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারিলেও মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে না।

আত্মবিজ্ঞান।

উপরে বিদ্যার যে শ্রেণিবিভাগ করা হইয়াছে তন্মধ্যে আত্মবিজ্ঞান বা অন্তর্জগৎ বিষয়ক বিদ্যারই প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার সম্যক্ শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে সম্ভাব্য নহে। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার আত্মজ্ঞান বহির্জগতের জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিকাশ পায়, এবং তাহার বিকাশ প্রাপ্তির নিমিত্ত নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন হয়। এই জন্যই আমাদিগের শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার অবধারিত হইয়াছে। এবং এই কারণেই বোধ হয় গ্রীক্ দার্শনিক আরিষ্টটল্ ও তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট আত্মবিজ্ঞান "উত্তরবিজ্ঞান"[১] নামে অভিহিত হয়। ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান যে আত্মবিজ্ঞানের অংশ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে গণিত আত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত কি না একথা লইয়া মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু গণিত কাল ও স্থান মূলক বিদ্যা, এবং কাল ও স্থান অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়ের বিষয় হইলেও শুদ্ধগণিতের সমস্ত তত্ত্বই অন্তর্জগতের নির্বিকল্প নিয়মের বিষয়ীভূত। অতএব গণিতকে আত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইতে পারে না।

গণিত।

গণিত অতি বিচিত্র বিদ্যা। ইহাতে কএকটি মাত্র সামান্য সরল স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব অবলম্বনে অসংখ্য অত্যাশ্চর্য্য জটিল দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে ও হইতেছে। সেই তত্ত্বানুশীলন অসীম আনন্দের উৎস, এবং সেই তত্ত্বনিচয় বিজ্ঞান আলোচনার ও সংসারের অন্যান্য অনেক কার্য্যেরই অশেষ প্রকার উপযোগী। না বুঝিয়াই লোকে গণিত চর্চ্চা নীরস বা নিষ্প্রয়োজন মনে করে। শিক্ষকের তাড়না বা শিক্ষা প্রণালীর বিড়ম্বনা এই ধারণার মূল। একটু যত্ন করিয়া যথানিয়মে শিখিতে আরম্ভ করিলে সকলেই কিঞ্চিৎ গণিত শিক্ষা করিতে পারে। সকলে যে এ বিদ্যায় বা অন্য কোন বিদ্যায় সমান পারদর্শিতালাভ করিতে পারে এ কথা বলা যায় না। কিন্তু গণিত চর্চ্চার আনন্দানুভব যে সকলেই করিতে পারে, ও গণিতের কিঞ্চিৎ তত্ত্ব সকলেই শিখিতে পারে, এবং সকলেরই শিক্ষা করা আবশ্যক, এ বিষয়ে সন্দেহের প্রকৃত কারণ নাই।

---

১ Metaphysics শব্দের এই মৌলিক অর্থ।

মনোবিজ্ঞান অন্তর্জগৎ বিষয়ক বিদ্যা, কিন্তু কেবল অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় তত্ত্ব নির্ণয় হয় না। আমাদের দেহের সহিত মনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং দেহের অবস্থার উপর মনের অবস্থা যেরূপ নির্ভর করে, তাহাতে মনস্তত্ত্ব দেহতত্ত্বের সঙ্গে একত্র অনুশীলনীয়, এবং পাশ্চাত্য-প্রদেশে এক্ষণে তাহাই হইতেছে[১]। এই প্রণালীতে মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা চলিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। অনেক স্থলে মনের বিকার ও দৌর্ব্বল্য মস্তিষ্ক স্নায়ু প্রভৃতি দেহাংশের বিকার ও দৌর্ব্বল্যসম্ভূত, এবং কোন্ স্থলে তাহা ঘটিয়াছে জানিতে পারিলে, শারীরিক চিকিৎসা দ্বারা মানসিক বিকার ও দৌর্ব্বল্য উপশমের বিশেষ সহায়তা হইবার সম্ভাবনা। ইহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যদি দেখা যায় কোন বালক পাঠ মনে রাখিতে পারে না, তাহা হইলে অনুসন্ধান করা উচিত, সে অমনোযোগী বলিয়া ঐরূপ ঘটিতেছে, কি যথাসাধ্য মনোযোগ দিয়াও সে কৃতকার্য্য হইতেছে না। প্রথমোক্ত স্থলে যাহাতে সে পাঠে অধিক মনোযোগ দেয় সেই উপায় অবলম্বনীয়। দ্বিতীয়োক্ত স্থলে সম্ভবতঃ তাহার মস্তিষ্কের বিকার বা দৌর্ব্বল্য তাহার পাঠ বিস্মৃত হওয়ার কারণ, এবং তন্নিবারণার্থ যথাযোগ্য শারীরিক চিকিৎসা ও পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা আবশ্যক।

মনোবিজ্ঞান।

দর্শনশাস্ত্র কেহ কেহ নিষ্ফল মনে করেন। কিন্তু আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম? জগৎ কি, কেনই বা হইল? এবং আমাদের ও জগতের পরিণাম কি?—এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে হইলেও, প্রশ্ন করিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। এই সকল প্রশ্নের উত্তর কত দূর পাওয়া যাইতে পারে, এবং কোথায় গিয়া আমাদের নিবৃত্ত হইতে হইবে, অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিতও নহে। সুতরাং দর্শনের চর্চ্চা অবশ্যই চলিবে।

বহির্জগৎ জড় ও জীব লইয়া। **স্থূল জড়বিজ্ঞান** অর্থাৎ স্থূল জড়ের গতি ও স্থিতিবিষয়ক বিদ্যা গণিতের সাহায্যে আমাদের সৌর-জগতের অনেক অদ্ভুত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার ও আডাম্‌সের নেপ্‌চুন্ আবিষ্কার এই বিদ্যার ফল। আর এই ক্ষুদ্র সৌরজগৎ ছাড়াইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারকা ও নীহারিকাপুঞ্জের গতিনিরূপণের উপায় উদ্ভাবন উদ্দেশে এই বিদ্যা উদ্যত।

জড়বিজ্ঞান।

সূক্ষ্ম জড়বিজ্ঞান অর্থাৎ তাপ, আলোক ও বিদ্যুতের ক্রিয়ানির্ণয়ক বিদ্যা, একদিকে সংসারের অনেক সামান্য কার্য্যের সুবিধা ও সামান্য বিষয়ে আমাদের অভাব মোচন করিয়া দিতেছে, অন্যদিকে জড় পদার্থ

---

[১] Scripture's New Psychology এবং Wundt ও Ladd প্রভৃতির গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কি, তাপ, বিদ্যুৎ আদি শক্তি মূলে এক কি বিভিন্ন, ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের অনুসন্ধানদ্বারা আমাদের জ্ঞানপিপাসা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইতেছে।

জীববিজ্ঞান।

জীববিজ্ঞান জীবনীশক্তি কি, জীবের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও মৃত্যু কি নিয়মের অধীন, ইত্যাদি নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছে। সেই অনুসন্ধানদ্বারা রোগাদি অনিষ্ট হইতে দেহরক্ষার উপায় উদ্ভাবন, ও উদ্ভিদ্ পদার্থের উন্নতিসাধনপূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হইতেছে।

জীববিজ্ঞান একটি অদ্ভুত তত্ত্বসংস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছে। সে তত্ত্বটি এই—নিম্নতম এক শ্রেণির জীব হইতে অবস্থাভেদে তাহার নানারূপ পরিবর্ত্তনদ্বারা ক্রমশঃ উচ্চ, উচ্চতর নানাজাতীয় জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই তত্ত্বানুযায়ি মতকে ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তবাদ বলা যায়। এই মত নানাপ্রকারে সপ্রমাণকরণার্থ জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা চেষ্টা করিতেছেন। এবং অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে, মনুষ্যের ভ্রূণদেহের আরম্ভ হইতে পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত জরায়ুতে ক্রমান্বয়ে আকারের যে সকল পরিবর্ত্তন হয় তাহা প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। জরায়ুস্থ মানবদেহের সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন আকারের সহিত নিম্ন শ্রেণির ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের দেহের আকারের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্য দৃষ্টে জীববিজ্ঞান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহে যে, জাতিগত রূপপরিবর্ত্তন ও ভ্রূণাবস্থায় ব্যক্তিগত রূপপরিবর্ত্তন একই নিয়মাধীন, অর্থাৎ যে প্রকার পরিবর্ত্তন দ্বারা জরায়ুমধ্যে প্রথম অপূর্ণাবস্থার আকার হইতে শেষ পূর্ণাবস্থার মানব আকার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা জগতে নিম্নজাতীয় জীব হইতে মানবজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।[১]

কেহ কেহ বলিতে পারেন পৌরাণিক দশাবতারতত্ত্ব জীববিজ্ঞানের এ কথার পোষকতা করে। কারণ, প্রথম ছয় অবতার, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম এবং ইহার ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, নিম্ন হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবে পরিণতি—যথা জলচর ও হস্তপদাদিবিহীন মৎস্য হইতে উভচর ও এক প্রকার হস্তপদযুক্ত কূর্ম্ম এবং উভচর কূর্ম্ম হইতে স্থলচর চতুষ্পদ বরাহ, আবার বরাহ হইতে অর্দ্ধনর অর্দ্ধপশু নৃসিংহ, ও তাহা হইতে বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রনর, এবং অবশেষে পূর্ণ নরদেহধারী পরশুরাম। তবে এই সকল কথা কেবল সুবুদ্ধিকল্পনামাত্র, কি প্রকৃত তত্ত্বমূলক,এসম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ থাকিতে পারে। যাহা হউক জরায়ুস্থ নরদেহের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত রূপ এবং নিম্নশ্রেণিস্থ জীবদেহ হইতে উচ্চশ্রেণিস্থ জীবদেহের ক্রমশঃ আকারভেদ, এই উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে, এবং তাহা বিশেষ অনুশীলনযোগ্য।

---

১ Haeckel's Evolution of Man দ্রষ্টব্য।

জীববিজ্ঞানের আর একটি বিচিত্র আবিষ্কার এই যে, জীবজগতের অনেক হিতকর ও অহিতকর কার্য্য কীটাণুপুঞ্জদ্বারা সম্পন্ন হয়--যথা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি-নিমিত্ত সার প্রস্তুত করা, জন্তুর আহারপরিপাকে সাহায্য করা প্রভৃতি হিতকর কার্য্য, এবং যক্ষ্মা, বিসূচিকা, প্রভৃতি উৎকট রোগোৎপাদনাদি অহিতকর কার্য্য। কীটাণুতত্ত্ব জীববিজ্ঞানের একটি প্রধান বিভাগ, এবং তাহার অনুশীলনদ্বারা কীটাণুকৃত হিতকর কার্য্যের বৃদ্ধি ও অহিতকর কার্য্যের হ্রাস হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, জীববিজ্ঞানের একটি বিভাগ, অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্র, অতি প্রয়োজনীয় বিদ্যা, এবং মনুষ্যমাত্রেরই তাহার কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক।

নৈতিক বিজ্ঞান-ভাষা।

নৈতিক অর্থাৎ জীবের সজ্ঞানকার্য্যবিষয়ক বিজ্ঞানের বিভাগমধ্যে সর্ব্বাগ্রে ভাষাসাহিত্য ও শিল্পবিজ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাষা সজ্ঞান জীবের একটি অদ্ভুত সৃষ্টি, এবং যদিও ভাষা ব্যতিরেকে চিন্তা চলিতে পারে কি না এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মতামত আছে, এবং পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিনা ভাষায় দর্শনবিজ্ঞানের চর্চ্চা ও জ্ঞানের প্রচার অতি দুরূহ হইত। ভাষার সৃষ্টি কিরূপে হইল এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। এ সম্বন্ধে মনীষিগণ নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষার উন্নতি-অবনতি কি নিয়মের অধীন ও নূতন ভাষাশিক্ষা কিরূপে সহজে হইতে পারে, এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু এই দুইটি বিষয়ের অনুশীলন সর্ব্বদাই চলিতেছে, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অতি আবশ্যক।

সাহিত্য ও শিল্প।

মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্যানুরাগ সুন্দর ভাবকে সুন্দর ভাষায় ও সুন্দর চিত্রাদিদ্বারা ব্যক্ত করিতে গিয়া সাহিত্যের ও শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। সাহিত্য ও শিল্প হইতে আমরা অনেক জ্ঞানলাভ করি, এবং অনেক সৎকর্ম্মে প্রণোদিত হই। আবার সেই সাহিত্য ও শিল্প কুরুচিরচিত হইলে তদ্দ্বারা আমরা অনেক সময়ে কুপথে ও কুকর্ম্মে নীত হইতে পারি।

ইতিহাস।

ইতিহাস মনুষ্যের সজ্ঞান কার্য্যের বিবরণ। কোন্ জাতি কবে কোথায় কি করিয়াছে কেবল তাহার তালিকা রাখা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে। সেই সকল কার্য্যের কারণ কি, ও তাহাদের ফলই বা কি, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির অভ্যুত্থান, উন্নতি, ও অবনতি কি নিয়মে ঘটিয়াছে, মনুষ্যজাতিই বা কি নিয়মে কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে, এই সকল তত্ত্বনির্ণয় ইতিহাসের উদ্দেশ্য।

সমাজনীতি।

মনুষ্য একাকী থাকিতে পারে না, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে। সমাজ, জাতি অপেক্ষা ছোট, পরিবার অপেক্ষা বড়। অনেকগুলি ব্যক্তি লইয়া একটি পরিবার, অনেকগুলি পরিবার লইয়া একটি সমাজ, এবং অনেকগুলি সমাজ লইয়া একটি জাতি, গঠিত হয়। পারিবারিক বন্ধনের মূল বিবাহ, জাতীয় বন্ধনের মূল একভাষা, একধর্ম্ম, এক রাজার অধীনতা, বা এই তিনের মধ্যে অন্ততঃ এক। সামাজিক বন্ধনের মূল সমাজবদ্ধ ব্যক্তিদিগের ইচ্ছা।

12—1705B

তবে যেমন কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন নহে, সকলেই রাজা বা রাজশক্তির সংস্থাপিত নিয়মের অধীন, সমাজও সেইরূপ নিয়মাধীন। সমাজবন্ধন আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের স্বেচ্ছাসম্ভূত, পরেচ্ছাপরতন্ত্র নহে, এইজন্যই সমাজ এত সমাদৃত এবং এত হিতকর। সমাজের শাসন একপ্রকার আত্মশাসন বলিলে বলা যায়। তাহা কঠোর নহে, এবং তদ্দ্বারা লোক অনেক অন্যায় কার্য্য হইতে নিবারিত হয়। কেহ কেহ এই মর্ম্ম না বুঝিয়া সমাজের অবমাননা করেন, এবং আইন-আদালতের শাসন ভিন্ন অন্য শাসন মানিতে চাহেন না। তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্ত। **সমাজনীতি** অতি বিচিত্র বিষয়। সমাজ যখন সমাজবদ্ধ ব্যক্তি-গণের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন কোন সমাজবিশেষের নীতি অবশ্যই সেই সমাজের ব্যক্তিগণের বা তাহাদের অধিকাংশের ব্যক্ত বা অব্যক্ত ইচ্ছার অনুমোদিত। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, সেই ইচ্ছার মূল কোথায়? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, লোকের ইচ্ছার মূল তাহাদের পূর্ব্ব সংস্কার, শিক্ষা, ও বর্ত্তমান প্রয়োজন। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, আমাদের ইচ্ছাও আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহা কার্য্যকারণসম্বন্ধীয় নিয়মের অধীন, এবং পূর্ব্বে যে কএকটি মূলের বা কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদের ইচ্ছা তাহা হইতেই উৎপন্ন। সমাজনীতির অনুশীলন ও সংশোধন করিতে গেলে সেই নীতির মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাহা না রাখিলে সেই অনুশীলন ও সংশোধনের চেষ্টা ফলপ্রদ হইতে পারে না।

অর্থনীতি।

অর্থনীতি আর একটি অতি-প্রয়োজনীয় বিদ্যা। কেহ কেহ বলেন, ইহা নিকৃষ্ট বিদ্যা, কিন্তু সে কথা ঠিক নহে। কোন বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান নিকৃষ্ট হইতে পারে না। তবে অর্থনীতির ভ্রান্ত অনুশীলন ও অর্থের একান্ত অনুসরণ নিকৃষ্ট হইতে পারে। এস্থলে অর্থ শব্দ কেবল টাকাকড়ি বুঝাইতেছে না, মূল্যবান্ বস্তুমাত্র বুঝাইতেছে। যদি তাহাই হইল তবে অর্থনীতির অন্ততঃ কিঞ্চিৎ অনুশীলন মনুষ্যমাত্রেরই আবশ্যক। কারণ দেহধারী মনুষ্যের দেহরক্ষার্থে যে সকল বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা প্রায় সকলই মূল্যবান্, কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। এমন কি, নির্ম্মল বায়ু এবং উজ্জ্বল আলোকও জনাকীর্ণ অট্টালিকাসঙ্কুল নগরে বিনামূল্যে দুষ্প্রাপ্য। কি নিয়মে বস্তুর মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হয়? কতদূর পর্য্যন্ত ধনী শ্রমজীবীকে নিজ লাভের নিমিত্ত খাটাইতে পারেন? রাজশাসনই বা কতদূর অর্থনীতি-ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও সুসঙ্গত?—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর কিছু কিছু সকলেরই জানা কর্ত্তব্য।

রাজনীতি।

রাজনীতি অতি গহন শাস্ত্র। তত্ত্বনির্ণয় সর্ব্বত্রই দুরূহ, এবং এ শাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা অধিক দুরূহ হইবার কারণ এই যে, যে সকল তত্ত্ব-নির্ণয় এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহা অতি জটিল ও তাহার অনুশীলনের ভ্রমে পতিত হওয়া অতি সহজ। রাজশক্তির প্রয়োজন কি ও তাহার মূল কোথায়, অর্থাৎ একের স্বাধীনতা অন্যের শাসন করিবার প্রয়োজন কি ও অধিকার

কি সূত্রে, কি প্রণালীতেই বা সেই শাসন সুচারু হয়,—এই সকল তত্ত্বনির্ণয় রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। মনুষ্যমাত্রই স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাধীনতার অধিকারী, অথচ একের পূর্ণ স্বাধীনতা অন্যের পূর্ণ স্বাধীনতার বিরোধী, কারণ একব্যক্তি যদি কোন রম্য স্থান বা ভাল বস্তু অধিকার করিতে চাহে, আর কেহ তাহা তৎকালে অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ পরস্পরের স্বাধীনতার বিরোধ-মীমাংসা, অর্থাৎ স্বাধীনতার শাসন, সহজ ব্যাপার নহে। তাহার উপর আবার মনুষ্য নানা দেশবাসী, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর স্বার্থ বিভিন্ন, ও অনেক স্থলে পরস্পর বিরোধী। এবং এক দেশবাসীর মধ্যেও বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন জাতীয় ভাব, প্রভৃতি নানা পার্থক্যের জন্য স্বার্থের বিরোধ। এই সমস্ত নানাবিধ বিরোধের ঘাতপ্রতিঘাতে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের পরস্পরের সম্বন্ধ অসংখ্যবিচিত্র আবর্ত্তসঙ্কুল, ও অতি জটিল হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং রাজাপ্রজার সম্বন্ধবিচার ও শাসনপ্রণালীর নিয়ম-নিরূপণ, অতি কঠিন ব্যাপার। অথচ এই সম্বন্ধবিচার ও নিয়ম-নিরূপণ-কার্য্যের সঙ্গে যখন আমাদের পরম প্রিয়-স্বার্থ, অর্থাৎ নিজস্বাধীনতা জড়িত রহিয়াছে ও তাহা সঙ্কীর্ণ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন মনুষ্যস্বভাবসিদ্ধ স্বার্থপরতা আমাদিগকে মোহান্ধ করিয়া পদে পদে এই আলোচনায় ভ্রান্ত করিবার সম্ভাবনা। আবার এই সম্বন্ধবিচারে ও নিয়ম-নিরূপণে কোন গুরুতর ভ্রম থাকিলে অশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। রাজা বা রাজশক্তি ন্যায়ানুসারে কার্য্য না করিলে প্রজার অসন্তোষ জন্মে। পক্ষান্তরে প্রজা ন্যায়ানুমোদিত রাজভক্তিবিহীন হইলে ও রাজশাসন অমান্য করিলে, শান্তিরক্ষা হয় না বলিয়া রাজা শাসন দৃঢ়তর করেন। সুতরাং রাজাপ্রজার অসদ্ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে, ও তন্নিবন্ধন দেশে নানা অশান্তির উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত কারণে রাজনীতি অতি গহন হইলেও তাহার মূলতত্ত্ব সকলেরই কিঞ্চিৎ অবগত থাকা উচিত। অন্ততঃ এ কথাটা সকলেরই জানা আবশ্যক। যে রাজা কেবল দেশের শোভার্থে বা তাঁহার নিজের সুখস্বচ্ছন্দ ও অন্যের উপর কর্তৃত্ব উপভোগ করিবার নিমিত্ত নহেন, দেশের শান্তিরক্ষার নিমিত্তই তাঁহার অস্তিত্ব, এবং তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

ব্যবহারনীতি।

ব্যবহারনীতি রাজনীতির একটি অতি-প্রয়োজনীয় অংশ। প্রজায় প্রজায় বিবাদ-মীমাংসার নিমিত্ত ব্যবহারশাস্ত্রের সৃষ্টি। ইহা যে কেবল ব্যবহারাজীবদিগের বিদ্যা এমত নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বত্বাস্বত্ব লইয়া অন্যের সহিত বিবাদ হওয়া সম্ভাবনীয়।

ধর্ম্মনীতি।

ধর্ম্মনীতি সকল শাস্ত্রের উপরের শাস্ত্র। যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের আদি কারণ বলিয়া মানেন, তাঁহাদের মতে ঈশ্বরলাভই জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য, সুতরাং ধর্ম্মনীতিদ্বারাই তাঁহাদের সকল কার্য্য অনুশাসিত।

যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহাদের মতে ধর্মনীতি ও আচারনীতি একই। কিন্তু তাঁহারা যখন সদাচার অর্থাৎ ন্যায়পরতা মনুষ্যের সকল কার্য্যের শ্রেষ্ঠ নিয়ম বলিয়া মানেন, তখন তাঁহাদের মতেও ধর্মনীতি বা আচারনীতি সকল শাস্ত্রের উপরের শাস্ত্র।

ধর্মনীতির ঈশ্বরতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবিভাগের একাংশ অতি কঠিন। কিন্তু তাহার অপরাংশ অপেক্ষাকৃত সহজ। কোন্ কার্য্য উচিত কোন্ কার্য্য অনুচিত তাহা জানা অধিকাংশ স্থলেই সহজ। কিন্তু সেই জ্ঞানানুসারে কার্য্য করা অনেক স্থলেই কঠিন। ইহার কারণ এই যে, জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্ম কঠিন। জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক দিনের অভ্যাস আবশ্যক। একটি সামান্য দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। সরলরেখা কাহাকে বলে এবং তাহা কেমন করিয়া টানিতে হয় আমরা সকলেই জানি। কিন্তু একটু লম্বা সরল-রেখা যন্ত্রের বিনা সাহায্যে কয় জন টানিতে পারে? এইজন্য ধর্মনীতির আলোচনা ও সৎকর্ম্মের অভ্যাস মনুষ্য যত শীঘ্র আরম্ভ করিতে পারে ততই ভাল।

শিক্ষার প্রণালী।

২। **শিক্ষার প্রণালী।** শিক্ষার বিষয়সম্বন্ধে উপরে কিঞ্চিৎ বলা হইল। শিক্ষার বিষয় অসংখ্য, তন্মধ্যে কএকটি মাত্র শাস্ত্র বা বিদ্যাসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষার প্রণালীসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

শিক্ষার বিষয় যখন এত বিস্তৃত এবং নানা বিষয়ের কিছু কিছু যখন সকলেরই জানা আবশ্যক, তখন কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে অল্প সময়ে ও অল্প শ্রমে শিক্ষার্থী অধিক বিষয় শিখিতে পারে—এ প্রশ্ন সকলেরই মনে উঠিবে, এবং ইহার প্রকৃত উত্তর পাইবার নিমিত্ত অবশ্যই সকলে আগ্রহান্বিত হইবে। পুরাকাল হইতে সকল দেশেই এই প্রশ্নের আলোচনা হইয়া আসি-তেছে, এবং মনীষিগণ নানা সময়ে এ বিষয়ে নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সে সমস্ত মতের বিস্তারিত বিবৃতি বা সম্যক্ সমালোচনা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে সেই সকল মতের কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে যে যে মূলতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় তাহাই লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কিরূপ ছিল।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত। সে শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর হৃদয়ে ধর্মভাবের উদ্রেক, ও তাহার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ। এবং সে শিক্ষার প্রণালী কঠোর ব্রহ্মচর্য্যপালনদ্বারা শিক্ষার্থীর দেহ ও মন সংযত করিয়া ও অচলা গুরুভক্তি জন্মাইয়া তাহাকে শিক্ষালাভের যোগ্য করিয়া লওয়া।[১] লৌকিক বিদ্যার আলোচনা যে ছিল না এমত নহে[২], তবে বৈদিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেহের উৎকর্ষসাধনের

[১] মনু ২য় অধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫।৩ দ্রষ্টব্য।

[২] মনু ২য় অধ্যায় ১১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রতিও অমনোযোগ ছিল না। ব্রহ্মচর্য্যপালন ও সংযম-অভ্যাসে সে উদ্দেশ্য আপনা হইতে অনেক দূর সিদ্ধ হইত। কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হইলেও, কর্ম্মফল অবশ্যভোক্তব্য বলিয়া অসৎকর্ম্ম পরিত্যাগ ও সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান, শিক্ষার এক অংশ ছিল। ঐহিক সুখের অনিত্যতাবোধ প্রবল হওয়াতে, জড়জগতের তত্ত্বানুসন্ধানের প্রতি অবহেলা, এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের নিমিত্ত একাগ্রতা জন্মে, এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলনে ভারতের মনীষিগণ অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু দেশের বৈষয়িক অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটিয়াছে। চৈতন্যজগৎ জড়জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও ঈশ্বরের সৃষ্টির একতার নিয়ম এমনই আশ্চর্য্য যে, তাহার সর্ব্বাংশই পরস্পরাপেক্ষী, এবং কোন অংশের প্রতি অবহেলা করিলে তাহার প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

প্রাচীন গ্রীসে শিক্ষার্থী যাহাতে জ্ঞানী হইতে পারে শিক্ষার লক্ষ্য প্রধানতঃ সেই দিকে ছিল, ও শিক্ষাপ্রণালী তদুপযোগী ছিল। প্রাচীন রোমে শিক্ষার্থীকে প্রধানতঃ কর্ম্মী করিয়া লওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল।

ইয়ুরোপে মধ্যযুগে গ্রীস্ ও রোমের প্রবর্ত্তিত প্রণালী, এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে নূতন ধর্ম্মভাবপ্রণোদিত চিন্তার স্রোত, এই উভয়ের মিলনে শিক্ষা-প্রণালী এক নূতন ভাব ধারণ করে, এবং তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলনের কিঞ্চিৎ অধিকতর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই প্রণালীতে কএকটি গুরুতর দোষ ছিল। প্রথমতঃ, শিক্ষা প্রধানতঃ শব্দগত ছিল, ততটা বস্তুগত ছিল না। শব্দের মারপ্যাঁচ, ব্যাকরণের বিধিনিষেধ, ও ন্যায়ের তর্কবিতর্ক লইয়াই শিক্ষার্থীর অধিক সময় কাটিয়া যাইত, প্রকৃত বস্তু বা পদার্থ-জ্ঞানের দিকে ততটা দৃষ্টি রাখা হইত না। দ্বিতীয়তঃ, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়েরই তত্ত্বানুসন্ধানে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কেবল চিন্তা ও তর্কের দ্বারা জ্ঞানলাভের প্রয়াস পাইতে শিক্ষা দেওয়া যাইত, এবং সে প্রয়াস প্রায়ই নিষ্ফল হইত। তৃতীয়তঃ, শিক্ষা বস্তুগত না হইয়া শব্দগত হওয়াতে, এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পরিবর্ত্তে কেবল চিন্তা ও তর্ক অবলম্বনীয় হওয়াতে, শিক্ষা নূতন নূতন জ্ঞানলাভজনিত আনন্দের আকর না হইয়া, নীরস আবৃত্তির ও নিষ্ফল চিন্তার শ্রমজনিত কষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল দোষাপনয়ননিমিত্ত চিন্তাশীল মহাত্মারা সময়ে সময়ে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। রাটিস্ এবং কমিনিয়স্ শিক্ষা বস্তুগত করিবার ও প্রকৃতির নিয়মানুকারী, অর্থাৎ যে নিয়মে প্রকৃতি পশুপক্ষীকে শিক্ষা দেন, সেই নিয়মানুযায়ী, করিবার নিমিত্ত অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। রাবেলাস্ এবং মণ্টেন্ শিক্ষার আরও একটু উচ্চতর আদর্শ দর্শাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শিক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থীর দেহ ও মন এরূপ গঠিত করা উচিত যে, তদ্দ্বারা তাহাকে একটি প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করা হয়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি মিল্টন্ ও প্রসিদ্ধ দার্শনিক লক্‌ও শিক্ষার এই উচ্চাদর্শ অবলম্বনে নিজ নিজ গ্রন্থে

শিক্ষার নিয়ম বিবৃত করেন। রুসো, পেষ্টালট্‌সি, এবং ফ্রবেলও শিক্ষা মানুষ তৈয়ারের অর্থাৎ শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনের উপায় বলিয়া গণ্য করেন, এবং শিক্ষার কঠোরতা নিবারণার্থে তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। শেষোক্ত মহাত্মার মতে বিদ্যালয় বালোদ্যান বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। এবং তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী 'বালোদ্যান'[১]-প্রণালী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

শিক্ষাপ্রণালীর কতিপয় নিয়ম।

শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে নানা দেশে নানা সময়ে যে সকল বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া, এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যে কয়েকটি স্থূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। এখানে বলা উচিত নিম্নে যাহা লিখিত হইল তাহার কিয়দংশ আমার "শিক্ষা" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

১। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন।

১। শিক্ষার প্রণালীনিরূপণ-নিমিত্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ আবশ্যক। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ-সাধন। কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেষ্ট নহে, এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মী হওয়াও আমাদের পক্ষে তুল্য প্রয়োজনীয়। জীবন সঙ্কীর্ণ, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় অসীম। সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা কাহারও সাধ্য নহে, সুতরাং প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ হইলেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। আর কর্ম্মী হইতে হইলে দেহ ও মনের সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন আবশ্যক।

এস্থলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

কতকগুলি বিষয়সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই প্রয়োজনীয়। যথা, আমাদের দেহের আভ্যন্তরিক গঠন ও কার্য্য স্থূলতঃ কিরূপ, ও কি নিয়মে চলিলে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিবর্দ্ধন হয়, আমাদের মানসিক ক্রিয়াসকল মোটামুটি কি নিয়মে চলে, আমরা কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় বা যাইব, ইত্যাদি বিষয়ের কিছু কিছু জানা সকলেরই আবশ্যক। আবার অনেক বিষয় আছে যাহা সমগ্র সকলের জানিবার প্রয়োজন নাই, এবং যাহার এক একটি প্রত্যেকের নিজ অবলম্বিত ব্যবসায় অনুসারে জানা আবশ্যক। যথা, চিকিৎসার বিষয় চিকিৎসকের, ব্যবহারশাস্ত্র ব্যবহারাজীবের, ও কৃষিতত্ত্ব কৃষকের জানা আবশ্যক।

সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধনসম্বন্ধে একটি কঠিন প্রশ্ন উঠিতে পারে। এক দিকের সম্পূর্ণ উন্নতির চেষ্টা করিতে গেলে অন্য দিকের সম্পূর্ণ উন্নতি অনেক সময়ে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যথা, দেহের সম্পূর্ণ উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইতে গেলে মনের সম্পূর্ণ উন্নতির নিমিত্ত যে মানসিক শ্রম আবশ্যক তাহার সময় থাকে না, ও সেরূপ শ্রম করিতে গেলে দেহের সম্পূর্ণ উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে। দেহ ও মন উভয়ের উন্নতি যখন এইরূপ পরস্পর বিরোধী তখন কি

---

[১] Kingergarten শব্দের এই অর্থ।

কর্ত্তব্য? এই প্রশ্নের কেবল একটি উত্তর সম্ভবপর। এইরূপ বিরোধস্থলে বাঞ্ছিত উৎকর্ষের প্রাধান্যের তারতম্য, ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক স্থলে কার্য্য করিতে হইবে। যথা, বাল্যকালে দেহের পুষ্টিসাধন অত্যাবশ্যক, এবং জ্ঞানার্জ্জনের ও মানসিক উৎকর্ষসাধনের শক্তি অল্প, অতএব তৎকালে দেহের উৎকর্ষসাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে দেহের নিমিত্ত যত্ন ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অল্প করিলেও চলিবে। এবং যে শিক্ষার্থীর দেহ দুর্ব্বল তাহার দেহের নিমিত্ত যত্ন সবলদেহ শিক্ষার্থীর অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ইহা মনে রাখা উচিত। মূল কথা এই যে, যেরূপ নিয়মে চলিলে শিক্ষার সমগ্র ফল অধিক হয় তাহাই অবলম্বনীয়। এক দিকে একেবারে অযত্ন করিয়া অন্য দিকে অত্যধিক যত্ন করিলে চলিবে না, সকল দিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে।

এরূপ স্থলে গণিতের গরিষ্ঠ ফলনিরূপণের নিয়ম স্মরণীয়। তাহার একটি উদাহরণ এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একটি বৃত্তের মধ্যে বৃহত্তম ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইলে, বৃহত্তম লম্ব অন্বেষণ করিলে চলিবে না। কারণ তাহা হইলে ত্রিভুজের একেবারে তিরোধান হইবে। বৃহত্তম ভূমি খুঁজিলেও হইবে না। প্রকৃত বৃহত্তম ত্রিভুজ বৃত্তমধ্যস্থ সমবাহু ত্রিভুজ।

আমাদের কোন বিষয়েই পূর্ণতা নাই, সকল বিষয়েই আমরা সীমাবদ্ধ বৃত্তমধ্যে কার্য্য করি। আমাদের জীবনের অনেক সমস্যাই গণিতের গরিষ্ঠ ফলনিরূপণের সমস্যার ন্যায়। কোন একদিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিলে, অধিক ফললাভ হওয়া দূরে থাকুক, কখন বা একেবারে নিরাশ হইতে হয়। সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত করিলেই সম্ভবমত ফল পাওয়া যায়।

পরস্পর বিরোধ-স্থলে জ্ঞানলাভ অপেক্ষা উৎকর্ষ-সাধনের অধিক প্রয়োজন।

এক দিকের উৎকর্ষসাধন যেমন অন্য দিকের উৎকর্ষসাধনের বিরোধ, তেমনই শিক্ষার্থীর উৎকর্ষসাধন এবং জ্ঞানলাভও কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর বিরোধী হইতে পারে। সম্ভবমত জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যে যত্ন ও শ্রম আবশ্যক তাহা প্রায়ই শিক্ষার্থীর মনের উৎকর্ষসাধন করে, সুতরাং সে পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ ও মনের উৎকর্ষসাধন সঙ্গে সঙ্গে চলে। তবে দেহের উৎকর্ষসাধনও সেই সঙ্গে সর্ব্বত্র হয় কিনা বলা যায় না। যেখানে তাহা না হয় সেখানে দেহেরও সম্ভবমত উৎকর্ষসাধনার্থে পৃথক্ যত্ন করা আবশ্যক, ও তদ্দ্বারা জ্ঞানলাভোপযোগী শ্রমের সহায়তা হইতে পারে। কিন্তু অধিক জ্ঞানলাভার্থ যে যত্ন ও শ্রম আবশ্যক তাহা যদি শিক্ষার্থীর স্মৃতি ও শ্রমশক্তির অতিরিক্ত হয়, তবে তদ্দ্বারা তাহার দেহের ও মনের উৎকর্ষসাধন না হইয়া বরং অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এবং সেরূপ স্থলে তাহার লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারযোগ্য শস্ত্র বা শোভন ভূষণ না হইয়া ভারবোঝা স্বরূপ হয়, এবং তাহাকে পণ্ডিত মূর্খের শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয়। এই কথা মনে রাখিলেই বুঝা যাইবে যে, শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই শিক্ষার উন্নতি হয় না।

উচ্চ বা সম্মানলাভার্থ পরীক্ষার শিক্ষার বিষয়ও পাঠ্যের সংখ্যা অধিক হওয়া উচিত। কিন্তু নিম্ন বা সামান্য উপাধিলাভার্থ পরীক্ষায় সেরূপ নিয়ম করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ সে পরীক্ষার নিমিত্ত স্বভাবতঃ অনেকেই প্রার্থী হইবে, ও যেন তেন প্রকারে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে, এবং উত্তীর্ণও হইবে, অথচ শিক্ষার বিষয় অধিক হইলে, তদ্দ্বারা তাহাদের প্রকৃত জ্ঞানলাভ ও উৎকর্ষসাধনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, মানবজাতির উন্নতির নিমিত্ত শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা উচিত। একথা সত্য। কিন্তু সেই পরিমাণবৃদ্ধি-সাধন সাবধানে ও ক্রমশঃ হওয়া আবশ্যক, এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধি সমাজের অনায়াসলব্ধ জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলা উচিত। একথার উপর এই এক আপত্তি হইতে পারে, সমাজের অনায়াসলব্ধ জ্ঞানের পরিমাণ-বৃদ্ধির নিমিত্ত অন্ততঃ সেই বর্দ্ধিত পরিমাণজ্ঞানের আকর সমাজের মধ্যে থাকা আবশ্যক, এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিলে সেই আকর কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? এ আপত্তি খণ্ডনার্থে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, সমাজের অনায়াসলব্ধ বা সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত যদিও শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক, সে আবশ্যকতা সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে নহে, কারণ সকলের নিকট বা অধিকাংশের নিকট শিক্ষার পূর্ণ ফলের আশা করা যায় না। জন কতক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষা ও যথেষ্ট উৎসাহ পাইলেই, তাহারা স্বদেশীয় সরল ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় রচিত নিজ নিজ গ্রন্থ ও তাহাদের সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত বা সভাসমিতিতে পঠিত প্রবন্ধদ্বারা সাধারণ সমাজের নানা বিষয়ে জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে পারে।

শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভ ও তাহার দেহ ও মনের উৎকর্ষসাধন এই দুয়ের মধ্যে যখন শেষোক্ত উদ্দেশ্যের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন তাহারই প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য। এবং তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ দেহ ও মনের উৎকর্ষলাভ না হইলে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কার্য্যে লাগান যায় না। পক্ষান্তরে দেহ ও মনের উৎকর্ষলাভ হইলে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান অল্প থাকিলেও কার্য্যকালে তাহা একপ্রকার খাটাইয়া লওয়া যায়। এ স্থলে একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কোন দূরদেশযাত্রীর পথের সম্বল কিরূপ থাকিলে ভাল হয়? প্রস্তুত করা অন্নব্যঞ্জন, না অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা ও আবশ্যকীয় দুই একটি যন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার মূল্য? প্রস্তুত করা অন্নব্যঞ্জন কত দিবেন? কত দিনই বা তাহা চলিবে? প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা ও আবশ্যকমত দ্রব্যক্রয়ের মূল্য সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কার্য্যে লাগিবে। সেইরূপ পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কার্য্যে লাগিবে এমত আশা করা যায় না, কিন্তু সবল দেহ ও মার্জ্জিত বুদ্ধি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কার্য্যকালে উপস্থিতমত উপায় উদ্ভাবনদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লইতে পারে।

বুদ্ধির অভাবে বিদ্যা যে কার্য্যকরী নহে তদ্বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। কোন স্থূলবুদ্ধি ছাত্র সমস্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া পরীক্ষার্থে রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা আপন হীরক অঙ্গুরীয় হস্তমধ্যে রাখিয়া ক্ষণকাল পরে প্রশ্ন করিলেন—"আমার মুষ্টিমধ্যে কি আছে"?—পরীক্ষার্থীর জ্যোতিষের সমস্ত বচন কণ্ঠস্থ ছিল, তদনুসারে গণনা করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই জানিতে পারিল, রাজার মুষ্টিমধ্যে যে দ্রব্য আছে তাহা গোলাকার প্রস্তর বিশিষ্ট ও মধ্যে ছিদ্রযুক্ত। এবং তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া উঠিল "মহারাজ আপনার মুষ্টিমধ্যে একখানি ঘরট্ট আছে।" গননার দোষ হয় নাই, কিন্তু অল্পবুদ্ধি পণ্ডিতমূর্খ ভাবিল না যে মুষ্টিমধ্যে একখানা জাঁতা থাকিতে পারে না।

২। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ কি?

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন তখন শিক্ষার প্রণালীনিরূপণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ কাহাকে বলে এই প্রশ্নের আলোচনা। এ প্রশ্নের উত্তর কি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস উপরে দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে সেই উত্তর আর একটু স্পষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

প্রয়োজনীয় জ্ঞান দ্বিবিধ—সাধারণ জ্ঞান, যথা, ভাষা, গণিত, ভূবৃত্তান্ত, ইতিহাস, দেহ-তত্ত্ব, মনো-বিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, ও ধর্ম্মনীতিবিষয়ক জ্ঞান—

প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিষয় দ্বিবিধ। কতকগুলি বিষয় সকলেরই জানা কর্ত্তব্য, আর কতকগুলি বিষয় শিক্ষার্থী যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাহার উপর নির্ভর করে।

প্রথম প্রকারের বিষয়গুলি এই—শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা এবং অপর যে জাতির সহিত শিক্ষার্থীকে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিতে হইবে তাহাদের ভাষা, গণিত, ভূবৃত্তান্ত, ইতিহাস, দেহতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও ধর্ম্মনীতি। এই কএকটি বিষয়ের কিছু কিছু জানা সকলেরই নিতান্ত আবশ্যক। প্রথম বিষয় অর্থাৎ স্বজাতীয় ভাষা জানার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করা অনাবশ্যক, ও তাহা শিক্ষা করিতে অধিক কষ্ট হয় না। এবং অন্ততঃ একটি বিজাতীয় ভাষা জানা না থাকিলে সংসারের কার্য্য ভালরূপে চালান যায় না। তবে বিজাতীয় ভাষায় ও সাহিত্যে সকলের পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই। গণিতেরও কিঞ্চিৎ জানা অতি প্রয়োজনীয়, কারণ তাহা না হইলে সামান্য হিসাবপত্র রাখা যায় না, ভূমির ক্ষেত্রফল নিরূপণ করা যায় না, সামান্য বিষয়ের লাভালাভ বুঝা যায় না। এই স্থানে গণিতের গভীর বা সূক্ষ্মতত্ত্বের কথা বলা যাইতেছে না। ভূবৃত্তান্ত অর্থাৎ আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তাহার আকার প্রকার কিরূপ, ও তদুপরিস্থিত প্রধান প্রধান দেশ, নগর, পর্ব্বত, সাগর, ও নদীর নাম, ও একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার পথ কিরূপ, এ সকল বিষয় কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। তবে পৃথিবীর সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব যে সকলকে জানিতে হইবে এ কথা ঠিক নহে। ইতিহাস অর্থাৎ বড় বড় জাতির প্রধান প্রধান কার্য্য ও পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা সেই সকল কার্য্যদ্বারা কতদূর সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহারও কিঞ্চিৎ বিবরণ জানা থাকিলে সকলেরই পক্ষে ভাল। তবে ছোট বড় সকল স্থানের ইতিহাস, ও সকল দেশের রাজার নামের ফর্দ্দ, ও ছোট বড় সকল যুদ্ধের

তারিখের তালিকা, ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিষয় অধিকাংশ লোকের পক্ষে অনাবশ্যক। দেহতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান, অর্থাৎ আমাদের দেহ ও মন স্থূলতঃ কিরূপ ও কি নিয়মে তাহাদের কার্য্য স্থূলতঃ চলে, এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ জ্ঞান, বলা বাহুল্য, সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জড়বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র অর্থাৎ জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণ, তাপ, বিদ্যুৎ, আলোক ও রাসায়নিক শক্তির ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে সংসারের নিত্যকর্ম্ম চলে না। তবে সকল বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব জানা অনেকের পক্ষেই সহজ বা সম্ভবপর নহে। সর্ব্বোপরি ধর্ম্মনীতি, এবং তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই নিতান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরবাদীর ত কথাই নাই, নিরীশ্বরবাদীর সম্বন্ধেও এ কথা খাটে, কারণ ন্যায়পরায়ণ হওয়ার আবশ্যকতা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং ন্যায়পরায়ণ হইতে গেলে যে কোন ভাবেই হউক ধর্ম্মনীতিচর্চ্চার প্রয়োজন। যিনি ঈশ্বর মানেন তাঁহার নিকট কি পারিবারিক নীতি, কি সামাজিক নীতি, কি রাজনীতি, সকলেরই মূল ধর্ম্মনীতি, অর্থাৎ বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম। যিনি ঈশ্বর মানেন না, তাঁহার নিকট এক ধর্ম্ম-নীতি অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ম সকল নীতির মূল না হইয়া, পারিবারিকধর্ম্ম, সামাজিকধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম ইহারা আপন আপন বিষয়ের নীতির মূল। কিন্তু ন্যায়পথ সকলেরই সকলবিষয়ে অনুসরণীয়। সুতরাং নীতিবিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই প্রয়োজনীয়।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, উপরে যতগুলি বিষয়ের উল্লেখ হইল তাহা ভালরূপে জানা অনেকেরই পক্ষে সম্ভবপর নহে, এবং কোন বিষয় ভাল-রূপে জানিতে না পারিলে তাহা না জানা ভাল, আর অনেকগুলি বিষয় অল্প জানা অপেক্ষা অল্পবিষয় ভালরূপে জানা ভাল। এরূপ আপত্তি কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্গত, কিন্তু সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে। উপরে যে বিষয়গুলির উল্লেখ হইয়াছে তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে বা ভালরূপে জানা, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু সে সমস্ত বিষয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞান যে সকলেরই প্রয়োজনীয় ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না, এবং উপরে যেরূপ আভাষ দেওয়া গিয়াছে, সেই সকল বিষয়ের সেই সেই পরিমাণ সামান্য জ্ঞান লাভ করা যে সকলেরই সাধ্য তাহাতেও অধিক সন্দেহের কারণ নাই। যে বিষয়ের যেটুকু জানা যায় তাহা ভালরূপে জানা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন বিষয় জানিতে হইলেই যে তাহার অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল জানিতে হইবে, ও তাহা না হইলে সে বিষয় একেবারে না জানা ভাল, একথা অপূর্ণ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যের পক্ষে সঙ্গত নহে। ইহা একশাস্ত্রে পণ্ডিতাভিমানীর কথা। সংসারে পূর্ণতা কোথায়? সকলই অপূর্ণ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভাল, কিন্তু যেখানে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে অল্পে সন্তুষ্ট না হইয়া, অধিক পাইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া যে অল্পটুকু পাওয়া যায়, অভিমান করিয়া তাহা লইব না বলা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অনেক বিষয়ের অল্পজ্ঞান অর্থাৎ পল্লবগ্রাহিতা অপেক্ষা অল্প বিষয়ের গভীর জ্ঞান ভাল। কিন্তু সে কথা

শিক্ষার শেষ ভাগের কথা। প্রথমভাগে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়েরই কিছু কিছু জ্ঞানলাভের যত্ন কখনই নিষ্ফল নহে। অনেকে বলেন, যে যে বিষয় ভাল করিয়া জানিবার ইচ্ছা করে তাহার সেই বিষয়, শিক্ষার প্রথম অবস্থা হইতেই ভালরূপে শিখিবার চেষ্টা করা উচিত, এবং তাহা হইলে অন্যান্য বিষয় শিখিতে তাহার সময় থাকে না। একথা ততদূর সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ অনেকগুলি বিষয়ের কিছু কিছু জানা না থাকিলে শিক্ষার্থী প্রথম অবস্থাতেই স্থির করিতে পারে না, কোন্ বিষয়টি শিক্ষা করা তাহার পক্ষে উপযোগী। দ্বিতীয়তঃ অনেকগুলি বিষয় অল্পমাত্রায় কিন্তু ভাল অর্থাৎ বিশুদ্ধরূপে জানিতে শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যে সময় লাগে তাহা বৃথা যায় না। সেই শিক্ষাতে বুদ্ধির যে পরিচালনা ও নানা বিষয়ের সামান্য জ্ঞান লাভ হয়, তদ্দ্বারা পরে যে কোন বিশেষ শাস্ত্র সূক্ষ্মরূপে শিক্ষা করা যায় তাহা শিখিবার পক্ষে সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা হয় না। সেইরূপে প্রথমে শিক্ষিত নানা বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানসম্পন্ন ও সেই শিক্ষাদ্বারা পরিমার্জিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ছাত্রেরা পরিণামে নিজ নিজ অভীপ্সিত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে।

বিশেষ জ্ঞান, যথা শিক্ষার্থীর অবলম্বিত ব্যবসায় সংসৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান।

দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিষয়সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। যথা, চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর পক্ষে জীবনীশক্তির ক্রিয়া বুঝিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ জীবতত্ত্ব, ও ঔষধাদি চিনিবার ও দ্রব্যাদির দোষ-গুণ বুঝিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ উদ্ভিজ্জ ও খনিজ দ্রব্যবিষয়ক শাস্ত্র জানা আবশ্যক। ব্যবহারাজীবের পক্ষে আইনের সঙ্গতি, অসঙ্গতি, ও তাহার শাসনাধিকারের সীমা বিচারকরণার্থ কিঞ্চিৎ ন্যায় ও রাজনীতি জানা আবশ্যক। ইত্যাদি।

সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ।

সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ কি জানিতে হইলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে মনুষ্যের দেহ, মন, ও আত্মা আছে, অর্থাৎ দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি, ও আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। যদি কোন জড়বাদী বলেন, শেষোক্ত শক্তিদ্বয় দৈহিক শক্তি হইতে উৎপন্ন ও তাহারই রূপান্তর, সে কথায় এস্থলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ এই ত্রিবিধ শক্তিমূলে একই হউক আর পৃথক্ হউক, ইহাদের কার্য্যের বিভিন্নতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেহ বা দৈহিক শক্তি যথেষ্ট ধারণ করে, গুরুভার উত্তোলন করিতে পারে, অনেক দূর দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, কিন্তু অতি সরল বিষয়ও সহজে বুঝিতে পারে না, এবং কোন ন্যায়ানুগত কার্য্যে যত্নবান্ হইতে পারে না। আবার কেহ কেহ বুদ্ধিমান্ হইয়াও ন্যায়পরায়ণ বা সবল নহে। এবং কেহ বা সবল ও বুদ্ধিমান্ হইয়াও ন্যায়পরায়ণ নহে। অতএব সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সে স্থানেই সাধিত হইয়াছে যেখানে দেহের বল, মনের মার্জিত বুদ্ধি, ও আত্মার নির্ম্মলতা অর্থাৎ ন্যায়পরতা আছে। যে শিক্ষা দ্বারা এই তিন গুণই লাভ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।

৩। শিক্ষা যথাসাধ্য

৩। শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনায় প্রথমতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, এবং দ্বিতীয়তঃ সেই উদ্দেশ্য অনুসারে শিক্ষার নিতান্ত আবশ্যক বিষয় কি কি, এই

সুখকর করা উচিত।

দুইটি কথা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা হইল। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে তৃতীয় কথা এই যে শিক্ষা যথাসাধ্য সুখকর করা উচিত।

এই দুঃখময় জগতে জীবমাত্রই সুখলাভ ও দুঃখনিবারণ নিমিত্ত নিরন্তর ব্যস্ত। সুতরাং শিক্ষা সুখকর হউক এ বিষয়ে যে শিক্ষার্থী ও প্রকৃত শিক্ষাদাতা যত্নবান্ হইবেন তাহা বিচিত্র নহে। বরং ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে শিক্ষকগণ সময়ে সময়ে একথা বিস্মৃত হইয়া, মনে করেন শিক্ষাপ্রণালীর কঠোরতা বৃদ্ধি করিলেই তাহার কার্য্যকারিতার বৃদ্ধি হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সত্য বটে কঠোরতা সহ্য করিবার ও সুখদুঃখ সমভাবে দেখিবার ক্ষমতা, দেহ, মন ও আত্মার চরম উৎকর্ষ লাভের ফল, এবং সেই উৎকর্ষসাধন শিক্ষার উদ্দেশ্য। এবং ইহাও সত্য বটে যে শিক্ষার্থীকে সুখার্থী হইতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু সেই জন্য শিক্ষা সুখকর না করিয়া কঠোর করিতে হইবে এ কথা যে ঠিক নহে একটু ভাবিয়া দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুখের নিমিত্ত অধিক লালসা ভাল নহে, ইহা তাড়নাদ্বারা শিখাইতে গেলে, যদিও শিষ্য গুরুর ভয়ে বা অনুরোধে মুখে তাঁহার উপদেশ ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, তথাপি মনের ভিতর সুখের লালসা থাকিয়া যাইবে। কিন্তু ঐ কথাই যদি অতি মিষ্টভাবে হেতু দর্শাইয়া ও হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত দ্বারা এরূপে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে শিক্ষার্থী নিজ জ্ঞানে বুঝিতে পারে, সুখের অধিক লালসা সুখের কারণ না হইয়া বরং দুঃখেরই কারণ হয়, তাহা হইলে সে লালসা তাহার মন হইতে অবশ্যই চলিয়া যাইবে। শিষ্যের কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইবার কারণ যেখানে কেবল গুরুর আদেশ, সেখানে সেই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি অন্যের অনুরোধের ফল, ও সম্পূর্ণ সুখকর না হইয়া কিঞ্চিৎ কষ্টকর হয়। কিন্তু যদি শিষ্য বুঝিতে পারে যে এই কার্য্য আমার করণীয় বা অকরণীয়, এবং সেই বোধে তাহাতে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি স্বেচ্ছাসম্ভূত হওয়াতে কষ্টের কারণ হয় না। এস্থলে

"সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥"[১]

"যাহা পরবশ তাহা দুঃখ, যাহা আত্মবশ তাহা সুখ। সুখ দুঃখের এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।" মনুর এই অমোঘ বাক্য স্মরণীয়।

আদেশ বা বিধিনিষেধের হেতু বিচারের ক্ষমতা প্রথমে আমাদের থাকে না, এবং বাল্যকালে গুরুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি ও ভালবাসা, ও অবিচলিত ও প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার আদেশ পালন, শিক্ষার্থীর অবশ্যকর্ত্তব্য ও তাহা শিক্ষালাভের অনন্য উপায়। সেই জন্যই বলিতেছি শিক্ষায় কঠোরতা থাকা উচিত নহে,

---

[১] মনু ৪। ১৬০।

কারণ তাহা হইলে গুরুর প্রতি সেই প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা, ও তাঁহার আদেশ পালনে সেই অবিচলিত ও প্রফুল্ল ভাব, জন্মিতে পারে না। শিক্ষা কোমল ভাব ধারণ করিলেই শিক্ষার্থীর মনে ঐরূপ গুরুভক্তি ও গুরূপদেশপালনে স্বতঃ-প্রবৃত্ত তৎপরতা জন্মিতে পারে।

শিক্ষা সর্ব্বথা সুখকর হওয়া উচিত ইহাই যদি স্থির হইল, তবে প্রশ্ন উঠিতেছে, কি রূপে শিক্ষা সুখকর করা যাইতে পারে? এ প্রশ্নটি নিতান্ত সহজ নহে। একদিকে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভ ও উৎকর্ষসাধন, এবং সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে শিক্ষার্থীর শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করা, ও আপন ইচ্ছা সংযত করিয়া অন্যের অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া চলা আবশ্যক, সুতরাং অন্যের বশ্যতাজনিত দুঃখ অপরিহার্য্য। অপরদিকে, শিক্ষা সুখকর করিতে গেলে শিক্ষার্থীকে স্বেচ্ছামত চলিতে দেওয়া আবশ্যক। এই দুই বিপরীত দিকের কোন্ দিক রক্ষা করা যাইবে? সংসারের অন্যান্য সঙ্কট স্থলের মধ্যে এই শিক্ষাবিষয়ক সঙ্কট বড় তুচ্ছ নহে, এবং সেই জন্যই এ সম্বন্ধে এত মতভেদ ঘটিয়াছে। উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে গরিষ্ঠ ফল লাভ হয় সেই পথে চলিতে হইবে। প্রকৃত কথা এই, উপরে উদ্ধৃত মনু-বাক্যে যে আত্মবশের উল্লেখ আছে, আমাদের অপূর্ণতাপ্রযুক্ত তাহা দুর্লভ। যখন এই অপূর্ণতা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপর ভেদজ্ঞান গিয়া সকলই ব্রহ্মময় বলিয়া উপলব্ধি হইবে, তখনই পরবশবোধ ও তজ্জনিত দুঃখের নাশ হইয়া সমস্ত সুখময় ও আনন্দময় বোধ হইবে। কিন্তু তাহা উচ্চস্তরের কথা, এবং যদিও প্রবীণ শিক্ষাদাতার তাহা মনে রাখিয়া আপনাকে উৎসাহিত করা উচিত, নবীন শিক্ষার্থীর তাহা বোধগম্য নহে। তাহার পক্ষে দুইটি উপায় অবলম্বনীয়, প্রথমতঃ তাহার শ্রমের লাঘব করা, দ্বিতীয়তঃ তাহার আনন্দ উদ্ভাবন করা।

সেই শ্রমলাঘব ও আনন্দ উদ্ভাবন নিমিত্ত যে সকল নিয়ম অনুসরণ করা যাইতে পারে তাহা দ্বিবিধ—কতকগুলি সাধারণ, ও কতকগুলি দেশকালপাত্র ও বিষয়ভেদে বিভিন্ন।

শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘবের একটি সাধারণ উপায় শিক্ষার বিষয়ের অনাবশ্যক জটিলভাগ বর্জন। কিন্তু তাই বলিয়া আবশ্যক জটিল কথাগুলি বাদ দিলে চলিবে না। সেরূপে শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘব করা আর রণতরীর কামানগুলি ফেলিয়া দিয়া তাহাকে লঘু ও বেগবতী করা তুল্য।

শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘব করিতে হইলে, বুঝিবার বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা, ও প্রয়োজনমত ব্যাখ্যার বস্তু বা তাহার অনুকল্প শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থিত করা, আবশ্যক। শিক্ষার বিষয় যদি কোন কার্য্য হয়, তবে সেই কার্য্য সহজে সম্পন্ন করিবার পথ দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন পাঠাভ্যাস সহজে করিবার নিমিত্ত যাহাতে তাহা সহজে মনে থাকে সেইরূপ সঙ্কেত ছাত্রকে বলিয়া দেওয়া উচিত।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাগুলি স্পষ্ট হইতে পারে। বিশদব্যাখ্যা-দ্বারা বুঝিবার বিষয় যে কত সহজ করা যাইতে পারে নিম্নের দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

কোন পাত্রে ক সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু থাকিলে, তাহা হইতে প্রতিবারে খ সংখ্যক বস্তুর ভিন্ন রূপে সংগৃহীত সমষ্টি লইলে, যতগুলি পৃথগ্বিধ সমষ্টি হইবে, প্রতিবারে (ক—খ) সংখ্যক বস্তু লইলেও ঠিক ততগুলি পৃথগ্বিধ সমষ্টি হইবে, ইহা বীজগণিতের মিশ্রণ অধ্যায়ের একটি তত্ত্ব, এবং প্রমাণদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করা যায়। কিন্তু বীজগণিত না পড়িয়াও বুঝা যায়, যতবার খ সংখ্যক বস্তু গৃহীত হইবে ততবার (ক—খ) সংখ্যক বস্তু পাত্রে পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং দুই প্রকারের ভিন্নরূপ সমষ্টির সংখ্যা অবশ্যই সমান। এই শেষোক্ত ভাবে বুঝাইলে, তত্ত্বটি অতি স্থূলবুদ্ধি ছাত্রেরও অনায়াসে বোধগম্য হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, সকল কথা এরূপ বিশদভাবে বুঝাইতে পারা যায় না। যাহা হউক প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা শিক্ষকের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এইরূপ ব্যাখ্যার যত প্রচার হইবে ততই কেবল শিক্ষা সহজ হইবে এমত নহে, নানাবিষয়ে সমাজের অনায়াসলব্ধ জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে।

শিক্ষার বিষয় সহজে বুঝিবার ও মনে রাখিবার সঙ্কেতের একটি দৃষ্টান্ত দিব।

বর্ণের উচ্চারণস্থাননির্ণয় সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণে যে সকল নিয়ম আছে তাহা বুঝিতে ও মনে রাখিতে বালকদিগের অনেক শ্রম করিতে হয়। কিন্তু কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, এই কএকটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তত্তৎস্থান হইতে উচ্চার্য্য বর্ণগুলি স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া ছাত্রকে শুনাইলে, ব্যাকরণের এই বিষয়টি অতি সহজেই তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাকে এই সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া যায় যে, কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ, পাঁচটি উচ্চারণ-স্থান যেমন ক্রমশঃ শরীরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে, তত্তৎস্থান হইতে উচ্চারিত বর্ণগুলিও (দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সেই ভাবে বর্ণমালায় ক্রমে গ্রথিত আছে, যথা—

কণ্ঠ	তালু	মূর্দ্ধা	দন্ত	ওষ্ঠ
অ আ	ই ঈ	ঋ ৠ	ঌ ৡ	উ ঊ
কবর্গ	চবর্গ	টবর্গ	তবর্গ	পবর্গ
	য	র	ল	ব
হ	শ	ষ	স	

তাহা হইলে ব্যাকরণের এই প্রকরণ ছাত্র অতি সহজে বুঝিবে ও স্মরণ রাখিবে, এবং কখন ভুলিবে না।

শিক্ষায় আনন্দ উৎপাদনার্থে নানা স্থানে নানা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। তাহার মূলসূত্র শিক্ষাকে ক্রীড়ায় পরিণত করা। ইউরোপে এই পদ্ধতি ফ্রবেলের "কিণ্ডারগার্টেন্", অর্থাৎ 'বালোদ্যান' নামে অভিহিত, এবং বিদ্যালয় বালকের ক্রীড়াবন বলিয়া পরিগণিত হয়। পদ্ধতিটি স্থূলতঃ মন্দ নহে, কিন্তু তাহা ক্রমশঃ এত সূক্ষ্ম নিয়মাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, শিক্ষা-কার্য্য তদ্দ্বারা সুখকর না হইয়া বরং কষ্টকর হইয়া উঠে।

শিক্ষাকার্য্য সুখকর করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শিক্ষার্থীকে তাড়না বা ভয়প্রদর্শন না করিয়া আদর ও উৎসাহ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষাদ্বারা যে উপকারলাভ হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ শিক্ষার বিষয় সুমিষ্ট ভাষায় চিত্তরঞ্জক উদাহরণ ও সুন্দর চিত্রদ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়া হৃদয়গ্রাহিভাবে বিবৃত করা উচিত। এবং চতুর্থতঃ শিক্ষা একটা অসাধারণ ও দুরূহ ব্যাপার বলিয়া গম্ভীরভাবে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থিত না করিয়া, তাহা আহার বিহারাদি সামান্য সহজ নিত্যকর্ম্মের ন্যায় আর একটি সুখের কাজ বলিয়া আনন্দের সহিত তাহাকে সেই কার্য্যে নিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য। শিক্ষা বড় বিষয় এবং ভক্তির বিষয় সন্দেহ নাই, এবং তাহাকে খেলার বিষয় বলিয়া ছোট করা উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ভয় হইতে প্রকৃত ভক্তি হয় না, ভাল-বাসা হইতেই ভক্তির উৎপত্তি। পিতামাতা দেবতাস্বরূপ। কিন্তু শিশু অগ্রে সস্নেহে তাঁহাদের অঙ্কে আরোহণ করিতে শিখিয়া পরে ভক্তিভাবে তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিবার যোগ্য হয়।

৪। শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

৪। শিক্ষাপ্রণালীর চতুর্থ কথা এই যে, শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রথমতঃ ছাত্রের পাঠাভ্যাসের সময় ও শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। যেমন অতিভোজন শরীরের পুষ্টিসাধক নহে, তেমনই অতিরিক্ত পাঠ মনের পুষ্টিসাধক নহে। কিন্তু দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন একটা সহজ ও স্থূল কথাও অনেক সময়ে শিক্ষক ও ছাত্র-দিগের অভিভাবকগণ বিস্মৃত হইয়া যান। অনেকে মনে করেন যত বেশি পুস্তকের পাতা উল্‌টান হইল তত বেশি পড়াশুনা হইল। তাহার মর্ম্মগ্রহণ করা হইল কি না, এবং এক একটা নূতন কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে শিক্ষার্থীর কতবার মনোনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করা আবশ্যক, ইহা কেহ ভাবেন না। আবার যেখানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক, সেখানে আর একটি বিষম বিপদ ঘটে। প্রত্যেক শিক্ষকমহাশয় অনেক সময় কেবল আপন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন, ও তাহাতে যদিও একএকটি বিষয়ের পাঠাভ্যাস করিবার যথেষ্ট সময় থাকে, সমস্ত বিষয়গুলি অভ্যাস করিতে গেলে সময় থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে পাঠের বিষয়সকল নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। বালকের সকল বিষয় বুঝিবার শক্তি থাকে না। বয়োবৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে ও শিক্ষাদ্বারা ক্রমশঃ বুদ্ধির বিকাশ হয়, এবং বুদ্ধির বিকাশানুসারে সহজ হইতে ক্রমশঃ দুরূহবিষয়ের শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিয়মের প্রতি প্রাচীনভারতে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত।[১] এই নিয়মকেই অধিকারিভেদে শিক্ষাভেদের নিয়ম বলে। অনধিকারীর হস্তে পবিত্রব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ ভগবদ্গীতাও হিংসাদ্বেষপ্রণোদিত বৈরনির্য্যাতনপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

শিক্ষার্থীর শক্তির অতিরিক্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যে নিষ্ফল, তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ ফরাসী শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ রুসো তাঁহার "এমিলি" নামক গ্রন্থে দিয়াছেন। কোন গ্রাম্য শিক্ষক একজন অল্প বয়স্ক বালককে আলেক্জান্দার্ ও তাঁহার চিকিৎসক ফিলিপের গল্পে যে নীতিশিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেছিলেন। গল্পটি সংক্ষেপে এই—দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের ফিলিপ্ নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন। ফিলিপ্ রাজার প্রিয় পাত্র হওয়াতে ঈর্ষাবশতঃ একজন পারিষদ আলেক্জান্দারকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে তাঁহার চিরশত্রু পারস্যদেশাধিপতি দেরায়সের কুমন্ত্রণায় ফিলিপ্ ঔষধের সঙ্গে তাঁহাকে বিষ পান করাইবে। আলেক্জান্দার্ দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা করিয়া ফিলিপের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, একজন সামান্য লোকের কথায় সে বিশ্বাস বিচলিত হইতে না দিয়া, তিনি ঐ পত্রপ্রাপ্তির পরদিন সহাস্যমুখে পত্রখানি ফিলিপের হস্তে দিয়া তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া এক চুমুকে সমস্ত পান করিলেন। এতদ্দ্বারা আলেক্জান্দার্ মনের অসীম দৃঢ়তার ও সাহসের পরিচয় দেন। গ্রাম্য শিক্ষকের এই গল্প ও তদানুষঙ্গিক উপদেশবাক্য সমাপ্ত হইলে, রুসো তাঁহার উপদেশের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায়, শিক্ষক মহাশয় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রুসোকে অনুরোধ করেন। এবং উক্ত গল্পে কিপ্রকারে আলেক্জান্দারের দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় পাওয়া গেল জিজ্ঞাসা করায়, বালক উত্তর দিল "একবাটি ঔষধ ইতস্ততঃ না করিয়া একচুমুকে খাইয়া ফেলা।" তখন শিক্ষক মহাশয় বুঝিলেন তাঁহার ব্যাখ্যা সত্ত্বেও বালকের বুদ্ধির দৌড় যতদূর সে ততদূর মাত্রই বুঝিয়াছে।

৫। যাহা শিখান যায় তাহা ভালরূপে শিখান উচিত।

৫। শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে পঞ্চম কথা এই যে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা ভালরূপে শিখান উচিত।

যাহা শিখান যায় তাহা ভালরূপে না শিখাইলে তাহাতে কোন ফল হয় না। যখন যে বিষয় শিখান যায় তখন শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন কারণে কোন বিষয় বুঝাইতে বাকি থাকে, সে কথা শিক্ষার্থীকে বলিয়া দেওয়া উচিত। কোন বিষয় ভাল করিয়া না শিখাইলে যে কিরূপ দোষ ঘটে তাহা নিম্নের দুইটি দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

---

[১] মনু, ২।১১২—১১৬ দ্রষ্টব্য।

একবার কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাঁহার দশ কি একাদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রটি কিরূপ পড়াশুনা করিতেছে আমাকে পরীক্ষা করিতে বলেন। সে বালক তখন একখানি ভূগোল পড়িতেছে দেখিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সূর্য্য পৃথিবী হইতে কতদূর?" সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "নয়কোটি পঞ্চাশলক্ষ মাইল।" তৎপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখন পৃথিবী হইতে কতদূর?" এই প্রশ্নের উত্তর সে সত্বর দিতে পারিল না। বালকটি যে নিতান্ত নির্ব্বোধ এমত নহে। কিন্তু দূরত্ব ও নৈকট্য কাহাকে বলে, ও পৃথিবী কোথায় এ সকল কথা তাহাকে ভালরূপে বুঝান হয় নাই।

আর একবার কএকটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করি, "কোন সংখ্যা ৪ দিয়া বিভাজ্য কিনা, দৃষ্টি মাত্র কিরূপে জানা যায়?" অনেকেই উত্তর দিল, "যদি তাহার দক্ষিণের শেষ দুইটি সংখ্যা ৪ দিয়া ভাগ করা যায়।" উত্তর ঠিক হইল না। ১২৫৬ এই সংখ্যা ৪ দিয়া বিভাজ্য, কিন্তু দক্ষিণের শেষ সংখ্যাদ্বয় (৫ ও ৬) ৪ দিয়া বিভাজ্য নহে। উত্তরে "শেষ দুইটি সংখ্যা" স্থলে "শেষ দুইটি অঙ্ক লইয়া যে সংখ্যা হয় তাহা" এই কথা বলা উচিত ছিল।

৬। সকল কার্য্যই যথা-নিয়মে ও যথা-সময়ে করিবার শিক্ষা আবশ্যক।

৬। শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে ষষ্ঠ কথা এই যে, সকল কার্য্যই যথাসময়ে ও যথানিয়মে সমাধা করিবার অভ্যাস হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মনুষ্য কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেষ্ট নহে, এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্মী হওয়াও আবশ্যক। এবং কর্ম্মী হইতে গেলে সকল কার্য্য যথা-সময়ে ও যথানিয়মে সম্পন্ন করার অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন, কি কার্য্য আমাদের কর্ত্তব্য এবং কিরূপে সেই কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হয়, এই দুই বিষয় জানা থাকিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। উক্ত দুইটি বিষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিবার অভ্যাস নিতান্ত আবশ্যক। অভ্যাস না থাকিলে সামান্য কার্য্যও সহজে করা যায় না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সামান্য উদাহরণটি সকলেরই মনে রাখা উচিত। সরলরেখা কাহাকে বলে আমরা জানি, কিরূপে তাহা অঙ্কিত করিতে হয় তাহাও জানি। কিন্তু এক হস্ত পরিমিত একটি সরলরেখা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে বিলক্ষণ অভ্যাস না থাকিলে বোধ হয় কেহই টানিতে পারে না।

যথাসময়ে যথানিয়মে কার্য্য করিবার অভ্যাস এই সংসারযাত্রার মহামূল্য সম্বল। তাহ পাইবার নিমিত্ত সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। সেই অভ্যাসশিক্ষা প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্টকর, এবং কিছুদিন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। কিন্তু মঙ্গলময়ী প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, একবার অভ্যাস জন্মাইলে আর কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, আপনা হইতে শিক্ষার্থী যথানিয়মে অভ্যস্ত কার্য্য করে, না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

৭। ভ্রম ঘটিলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন আবশ্যক।

৭। শিক্ষাপ্রণালীর সপ্তম কথা এই যে, ভ্রম ঘটিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধন আবশ্যক।

এই নিয়ম ইহার পূর্ব্বোক্ত নিয়মের এক প্রকার অনুবৃত্তি। যাহা অভ্যাস করা যায় তাহা ক্রমশঃ সহজ হইয়া আইসে ও ছাড়িয়া দেওয়া কঠিন হয়। ভ্রম একবার হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধন যত সহজ, বারংবার হইতে থাকিলে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায়, এবং তাহার সংশোধন আর তত সহজ হয় না।

এ নিয়ম কেবল মানসিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় নহে, শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষাতেও ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নিয়ম।

অনেকে মনে করেন, সামান্য ভ্রম বা সামান্য দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন নাই, কেবল গুরুতর ভ্রম ও গুরুতর দোষ সংশোধন করা আবশ্যক। এরূপ মনে করা বড় ভুল। সামান্য ভ্রম ও সামান্য দোষ সংশোধনে বিরত থাকিলে গুরুতর ভ্রম ও গুরুতর দোষ সহজেই ঘটে, এবং তাহার সংশোধন কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে।

৮। শিক্ষার্থীর আত্মসংযম আবশ্যক।

৮। শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে অষ্টম কথা এই যে, শিক্ষার্থীর আত্মসংযম অত্যাবশ্যক। কারণ প্রবৃত্তি সংযত করিতে না পারিলে অন্য কর্ত্তব্যপালন দূরে থাকুক, শিক্ষালাভের নিমিত্ত যে সময় দিতে ও যে শ্রমস্বীকার করিতে হয়, শিক্ষার্থী তাহা দিতে ও স্বীকার করিতে সমর্থ হইবে না, পাঠাভ্যাসকালে অন্য প্রবৃত্তি তাহার মনকে অপর দিকে লইয়া যাইবে।

শিক্ষা সুখকর হওয়া উচিত, পূর্ব্বোক্ত এই নিয়মের সহিত বর্ত্তমান কথার বিরোধ আছে, কেহ যেন এরূপ আশঙ্কা না করেন। শিক্ষা সুখকর হইতে গেলে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করা চলে না, সত্য। কিন্তু আত্মসংযম স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য নহে। বরং কর্ত্তব্যপালননিমিত্ত কখনও যাহাতে স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে না হয়, অথচ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি দমন কষ্টকর না হয়, সেই অবস্থাপ্রাপ্তি সংযম শিক্ষার উদ্দেশ্য। না বুঝিয়া পরের ইচ্ছা ও আদেশমত কার্য্য করা আত্মসংযম নহে, বুঝিয়া স্বেচ্ছায় আপন প্রবৃত্তি দমন করার নাম আত্মসংযম।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আত্মসংযম ভীরু ও অনুদ্যমশীলের কার্য্য। এ কথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ক্রোধলোভাদি বৃত্তির উত্তেজনায় কার্য্য করা মানসিক বলহীন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। প্রবৃত্তি দমন করাই প্রকৃত মানসিক বলের কার্য্য।

৯। শিক্ষা প্রথমে বাচনিক, ও শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হওয়া আবশ্যক।

৯। শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে, শিক্ষা প্রথম অবস্থায় বাচনিক ও শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষার্থী যতদিন পড়িতে না শিখে এবং অন্য ভাষা না জানে, ততদিন তাহার শিক্ষা অবশ্যই বাচনিক ও তাহার মাতৃভাষায় হইবে। কেহ কেহ বলেন, শিক্ষা এই ভাবে কিছুদিন চলা ভাল। এবং আর কেহ কেহ বলেন, ছাত্রকে শীঘ্র পড়িতে শিখাইয়া ও অন্য ভাষা শিখাইয়া পুস্তকের ও আবশ্যকমত অন্য ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে পারিলে অল্পদিনে অধিক শিক্ষা লাভ হইতে পারে।

ভাষার সাহায্য বিনা শিক্ষাকার্য্য চলিতে পারে না। ভাষাও একটি শিক্ষার বিষয়। এবং পুস্তকপাঠ ভিন্ন নানাদেশের নানাকালের মনীষিগণের তত্ত্বালোচনা আমাদের জ্ঞানগোচর হইতে পারে না। অতএব ভাষাশিক্ষা ও পুস্তক পাঠ করিতে শিক্ষা জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। কিন্তু কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, ভাষাশিক্ষা ও পুস্তকপাঠ শিক্ষাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জগতে নানা বস্তু ও বিষয়ের জ্ঞানলাভ ও শিক্ষার্থীর নিজের উৎকর্ষসাধন। ভাষাশিক্ষা ও পঠনশিক্ষা তাহারই উপায়মাত্র। তবে এই দুইটি উপায় শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে যত শীঘ্র অবলম্বন করা যাইতে পারে ততই ভাল।

মাতৃভাষার বাচনিক শিক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থীর শব্দসম্বল ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান-সম্বল কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইলে তাহার জানা শব্দ ও বিষয় বিশিষ্ট পুস্তক পড়িতে, এবং পুস্তকের কথা ও অন্যান্য জানা কথা লিখিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

ক্রমশঃ পঠন ও লিখনশিক্ষা।

উচ্চারিত শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিশ্লেষণ, সেই বর্ণগুলিকে চিহ্নদ্বারা অঙ্কিতকরণ, এবং সেই অঙ্কিত চিহ্ন বা অক্ষরসংযোগে পুনরায় শব্দ উচ্চারণ, আমাদের অভ্যস্ত বলিয়া আমরা যত সহজ মনে করি, শিশুর পক্ষে তাহা তত সহজ নহে, এবং শিশুকে শিখাইবার সময় এই কথা মনে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা হইলে শিশুকে তাড়না না করিয়া তাহার ঔৎসুক্য ও কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষা সুখকর করিতে পারা যাইবে।

লিখনশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ রেখাগণিত শিখাইলে ভাল হয়।

সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ রেখা-গণিত শিখান উচিত।

এ কথা শুনিয়া যেন কোন শিক্ষকের মনে চিন্তা বা শিক্ষার্থীর মনে ভয় না হয়। সেই চিন্তা ও ভয়নিবারণ নিমিত্তই এই কথা বলিলাম। রেখাগণিত জটিলরূপ ধারণপূর্ব্বক সহসা উপস্থিত হয়, এইজন্য তাহার আগমন চিন্তা ও ভয়ের কারণ হয়। কিন্তু যদি তাঁহার সরল মূর্ত্তিতে তিনি ক্রমশঃ আমাদের সহিত পরিচিত হয়েন, তাহা হইলে সে ভাব ঘটে না। লিখনশিক্ষার সময় যদি সরলরেখা, বক্ররেখা, গোলরেখা, লম্ব, সমান্তররেখা, কোণ, সমকোণ, এই ক'একটি বিষয় বিনা আড়ম্বরে শিশুদিগকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সুপ্রণালীতে লিখনের নিয়ম এবং রেখাগণিতের ক'একটি স্থূলকথা একসঙ্গে সহজে শিখিতে পারে।

১০। ভাষা ও রচনাপ্রণালীসম্বন্ধে ক'একটি বিশেষ কথা আছে তাহা এই স্থানে একবার বলা উচিত।

১০। ভাষা ও রচনাশিক্ষার বিশেষ নিয়ম। অপ্রচলিত ভাষাশিক্ষার্থে কাব্য ও ব্যাকরণপাঠ, প্রচলিত ভাষা-শিক্ষার্থে সেই সঙ্গে কথোপ-কথন-প্রণালী অবলম্বনীয়।

প্রচীন অপ্রচলিত ভাষাশিক্ষার নিমিত্ত সরল কাব্য ও কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ-পাঠই প্রশস্ত উপায়। বর্ত্তমানে প্রচলিত ভাষাশিক্ষার্থে উক্ত উপায় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষায় কথোপকথন অবলম্বনীয়।

কেহ কেহ বলেন, শিশু যে প্রণালীতে মাতৃভাষা শিখে সেই প্রণালীতে, অর্থাৎ কথোপকথনদ্বারা অন্য ভাষাশিক্ষা দেওয়াই ভাষাশিক্ষার মুখ্য উপায়, এবং ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে কাব্যপাঠদ্বারা ভাষাশিক্ষা করা

ভাষাশিক্ষার গৌণ উপায়। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে।

মাতৃভাষা শিক্ষার স্থলে, শিক্ষক স্বয়ং প্রকৃতি, শিক্ষার উত্তেজক শিশুর অত্যন্ত প্রয়োজন, শিক্ষার সহকারী বিষয়ের নূতনত্ব ও তজ্জনিত আনন্দ। এ শিক্ষা সুখকর বটে, কিন্তু সহজ বা অনায়াসলব্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। একটি নূতন কথা শুনিয়া শিখিবার নিমিত্ত শিশু অনবরত আবৃত্তি করিতে থাকে, কখন শুদ্ধভাবে কখন অশুদ্ধভাবে, কখন ভুলিয়া যায় আবার শুনিয়া লয়, স্বয়ং প্রয়োগ করিতে কত অসংলগ্নতা দেখায় ও তাহাতে 'অমৃতং বালভাষিতং' বলিয়া কত আদর পায়। কতবার নিজে প্রয়োগ করে, এবং কতবার অপরকৃত প্রয়োগ শুনে। এইরূপে অনেক অভ্যাসের পর কথাটি ঠিক শিখে। তবে কোন কঠোর শিক্ষকের অন্যায় তাড়না বা অবিবেচক শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের সময় বাঁচাইবার নিমিত্ত বৃথা যত্ন এ শিক্ষার বাধা জন্মায় না। অন্য ভাষাশিক্ষার সময় এই সকল বাধার নিবারণ কর্ত্তব্য, এবং তাহা হইতেও পারে। কিন্তু উপরি উক্ত সুযোগগুলি সমস্ত পাওয়া অসম্ভব। সেই সুযোগ কিয়ৎপরিমাণে পাইবার এক উপায়, যাহারা শিখাইবার ভাষা কহে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার্থীকে রাখা। যেখানে সে উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব, সেখানে শিখাইবার ভাষা লিখনপঠন ও কথনে শিক্ষার্থীকে অভ্যাস করানই প্রশস্ত উপায়।

কাহার কাহার মতে যদিও কাব্যপাঠ ভাষাশিক্ষার উপায় হইতে পারে, প্রথম অবস্থায় ব্যাকরণপাঠ নিষ্প্রয়োজন ও কষ্টকর। বর্ত্তমানে প্রচলিত যে সকল ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ, এবং শব্দরূপ ও ধাতুরূপ স্বল্প ও সরল (যেমন ইংরাজী ভাষা), তাহা শিক্ষার নিমিত্ত প্রথম অবস্থায় ব্যাকরণপাঠ আবশ্যক না হইতে পারে। কিন্তু যে সকল প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষার ব্যাকরণ সহজ নহে, এবং যাহাতে শব্দরূপ ও ধাতুরূপ অতি বিস্তৃত ও জটিল ব্যাপার, (যেমন সংস্কৃত ভাষা) তাহা শিক্ষার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ব্যাকরণপাঠ অর্থাৎ অন্ততঃ সচরাচর ব্যবহৃত শব্দের ও ধাতুর রূপ কণ্ঠস্থ করা শ্রমসাধ্য হইলেও একমাত্র উপায়। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, ব্যাকরণপাঠ বাদ দিলে সেই শ্রমের প্রকৃত লাঘব হয় না। আপাততঃ লাঘব হইল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে দেখা যাইবে ব্যাকরণ বাদ দিয়া কেবল কাব্যপাঠদ্বারা ভাষা শিখাইতে মোটের উপর অধিক সময় ও শ্রম লাগে।

রচনাশিক্ষা, অর্থাৎ সুপ্রণালীতে সরল ভাষায় সংক্ষেপে মনের ভাব প্রকাশের নিমিত্ত ভাষাপ্রয়োগশিক্ষা,—তত্ত্বনির্ণয় বা জ্ঞানপ্রচারার্থে গ্রন্থপ্রণয়ন, লোকের চিত্তরঞ্জন বা লোককে ইচ্ছামত পরিচালননিমিত্ত বক্তৃতাকরণ, অথবা দৈনন্দিন সামান্য কর্ম্মসম্পাদন—সকল প্রকার কার্য্যের নিমিত্তই প্রয়োজনীয়। রচনাপ্রণালী সংক্ষেপে দ্বিবিধ—বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক। প্রথমোক্ত প্রণালীতে বর্ণিত বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ যথানিয়মে ও যথাক্রমে বিবৃত হয়। দ্বিতীয়োক্ত প্রণালীতে বর্ণিত বিষয়ের গোটাকতক বাছা বাছা

রচনাপ্রণালী দ্বিবিধ—বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক।

কথা নিয়মের বাঁধাবাঁধি না করিয়া যাহার পর যেটি বলিলে স্নুবিধা হয় সেইরূপে এমন কৌশলের সহিত বিবৃত হয় যে, তদ্দ্বারা পাঠক অনুক্ত কথাগুলি সমস্ত, অন্তত: বিবৃত বিষয়ে যাহা কিছু জানিবার যোগ্য, একপ্রকার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই দুই প্রণালীর প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইবে।

মনে করুন, কোন একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা রচনার উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেই দেশের আকার, আয়তন, ভূমির বন্ধুরতা, নদী, গিরি, বন, উপবন, গ্রাম, নগর, উদ্ভিদ্, জন্তু, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, শাসনপ্রথা ইত্যাদি যথাক্রমে বিবৃত হইবে। সাহিত্যিক প্রণালীতে উক্ত বিষয়ের মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলিমাত্র এরূপ কৌশলে বর্ণিত হইবে যে, তদ্দ্বারা সমস্ত প্রদেশের একখানি ছবি পাঠকের মনে অঙ্কিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর লেখক পাঠককে সঙ্গে লইয়া বর্ণিত প্রদেশের সমস্তভাগে পর্য্যটন করেন। সাহিত্যিক প্রণালীর লেখক পাঠককে লইয়া নিকটস্থ কোন উচ্চ শৈলশিখরে আরোহণ করেন ও অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বর্ণিত প্রদেশ এককালে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করিয়া দেন। শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বন সুখকর, কিন্তু সকলেরই সাধ্য নহে। প্রথমোক্ত প্রণালী কষ্টকর হইলেও সকলের আয়ত্তাধীন। পাঠককে সঙ্গে লইয়া সমস্ত প্রদেশ পর্য্যটন কষ্টকর হইলেও সকলেরই সাধ্য। কিন্তু উচ্চগিরিশৃঙ্গে আরোহণ, আবার একা নহে, পাঠককে লইয়া, বিশেষ শক্তিসাপেক্ষ। সে শক্তি যাহার নাই, তাহার পক্ষে সে উচ্চস্থানে আরোহণের আশা দুরাশা। রচনাশিক্ষায় এই কথা মনে রাখা আবশ্যক।

১১। জাতীয় শিক্ষা। শিক্ষা প্রথম স্তরে জাতীয় ভাষায় জাতীয় আদর্শানুসারে চলা উচিত, পরে নানা ভাষায় ও সার্ব্বভৌমিক ভাবে চলিবে।

১১। শিক্ষাপ্রণালীর যে কয়েকটি কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল তাহার একাদশ ও শেষ কথা জাতীয় শিক্ষাসম্বন্ধীয়।

অনেকেই বলেন, শিক্ষা জাতীয়ভাষায় জাতীয় সাহিত্য-দর্শনের উচ্চ আদর্শ অনুসারে দেওয়া উচিত। আবার কেহ কেহ বলেন, শিক্ষাতে জাতীয় ভাব আনা অবৈধ। শিক্ষা সার্ব্বভৌমিক ভাবে চলা উচিত, তাহা না হইলে, শিক্ষার্থীর মন উদারতাস্থলে সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই দুইটি কথাই কিয়ৎ-পরিমাণে সত্য, কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে।

শিক্ষা যতদূর সাধ্য শিক্ষার্থীর জাতীয় ভাষায় দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই শিক্ষার বিষয়গুলি অল্পায়াসে ও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থীর বোধগম্য হয়। বিজাতীয় ভাষা শিখিবার শ্রম ও বুঝিবার অস্নুবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হয় না। এবং জাতীয় সাহিত্য-দর্শনের উচ্চাদর্শ অনুসারে শিক্ষাও সেইরূপ সহজে ফলপ্রদ হয়, কারণ পূর্ব্বসংস্কারবশত: শিক্ষার্থীর চরিত্র ও মন কিয়ৎ-পরিমাণে সেই আদর্শানুসারে গঠিত, স্নুতরাং তদনুসারে শিক্ষা দিলে তাহাকে আর ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিজাতীয় ভাষাশিক্ষায় অবহেলা, ও বিজাতীয় সাহিত্য-দর্শনের উচ্চাদর্শের প্রতি অনাস্থা, কখনই

যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। বিজাতীয় ভাষাতেও এরূপ অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা থাকিতে পারে যাহা ছাত্রের জাতীয় ভাষাতে নাই। এবং তাহা না হইলেও, সেই ভাষা আমাদের ন্যায় একজাতীয় মনুষ্যের ভাষা, এবং তদ্দ্বারা আমাদের ন্যায় একজাতীয় মনুষ্য তাহাদের সুখদুঃখাদি মনের ভাব, এবং সরল ও জটিল জ্ঞানের কথা ব্যক্ত করে, সুতরাং বিজাতীয় ভাষা মনুষ্যের পক্ষে অবহেলার বস্তু নহে। আর বিজাতীয় উচ্চাদর্শ স্বজাতীয় উচ্চাদর্শের স্বরূপ হইলে ত অবশ্যই আদরণীয়, এবং তাহা না হইলেও আদরণীয় ও যথাসম্ভব অনুকরণীয়। বিজাতীয় উচ্চাদর্শের ও সদ্‌গুণের অনাদর বৃথা ও ভ্রান্ত জাত্যভিমানের কার্য্য। এস্থলে—

"श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि ।
अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥"[১]

"শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি নিকৃষ্টের নিকটেও শুভা বিদ্যা আর পরম ধর্ম্মজ্ঞান, এবং নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন, লাভ করিতে পারে।"—এই প্রসিদ্ধ মনুবাক্য মনে রাখা উচিত।

শিক্ষা সার্ব্বভৌমিক ও উদার ভাবের হওয়া উচিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সে নিয়ম শিক্ষার উচ্চস্তরের নিয়ম, নিম্নস্তরে প্রযোজ্য নহে। শিক্ষার্থী অনবচ্ছিন্ন ও নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে আইসে না ও থাকে না। নিয়মিত শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বেই প্রকৃতি তাহাকে জাতীয় ভাষায় শিক্ষিত, ও কতকগুলি জাতীয় সংস্কারে দীক্ষিত করেন, এবং কতকগুলি জাতীয় ভাব তাহার অন্তরে বিকশিত করেন। সেই ভাষার সাহায্যে সেই সংস্কারের ও ভাবের উৎকৃষ্ট ভাগগুলিকে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিত করণোদ্দেশে প্রথম অবস্থায় শিক্ষাকার্য্য চালাইলে শিক্ষা শীঘ্র সুফলপ্রদ হয়। এবং তাহা না করিয়া সে সমস্ত সংস্কার ও ভাবগুলি শিক্ষার্থীর মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া নূতন আদর্শানুসারে তাহাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে, শিক্ষার ফললাভ শীঘ্র হয় না, এবং পরিণামে সুফল ফলিবার সম্ভাবনাও অধিক থাকে না। শিক্ষার উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীকে বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষিত ও বিজাতীয় উচ্চাদর্শ সম্ভবমত অনুকরণে প্রবৃত্ত করা উচিত।

জাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ উচ্চ সদ্‌গুণ, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর প্রভূত হিতসাধন হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ অন্য জাতির ও অন্য দেশের প্রতি বিদ্বেষভাবে পরিণত হওয়া উচিত নহে। সত্য বটে প্রাচীন গ্রীসে জাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ ঐ ভাব ধারণ করিয়াছিল, এবং গ্রীসের প্রতিভাবলে পাশ্চাত্য সাহিত্য কতকটা ঐ ভাবে উদ্ভাবিত। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের ঐ সময় পাশ্চাত্য জাতির বাল্যকাল বলিলেও বলা যায়। এবং বাল্যের কলহপ্রিয়তা ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রৌঢ়াবস্থায় শোভা পায় না।

---

[১] মনু ২।২৩৮।

শিক্ষার উপকরণ।

৩। **শিক্ষার উপকরণ।** এক্ষণে শিক্ষার উপকরণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

শিক্ষার উপকরণ নানাবিধ, যথা—(১) শিক্ষক, (২) বিদ্যালয়, (৩) বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) পুস্তক, (৫) পুস্তকালয়, (৬) যন্ত্র ও যন্ত্রালয়, (৭) পরীক্ষা।

এই সাতটির প্রত্যেকের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা যাইবে।

১। শিক্ষক।

১। **শিক্ষকই** শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণ। আশা করি শিক্ষার উপকরণ বলাতে শিক্ষকের মর্য্যাদার কোন হানি হইবে না।

তাঁহার লক্ষণ। শারীরিক গুণ: স্পষ্ট ও উচ্চ স্বর, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তীব্র শ্রবণশক্তি। মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণ: ধীর বুদ্ধি।

উপযুক্ত শিক্ষকের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকা আবশ্যক। শারীরিক গুণের মধ্যে স্পষ্ট ও উচ্চ স্বর, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, ও তীব্র শ্রবণশক্তি প্রয়োজনীয়। বহুসংখ্যক ছাত্রকে একত্র শিক্ষা দিতে হইলে এ গুণগুলি না থাকিলে চলে না। মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুণের মধ্যে প্রথমতঃ ধীর বুদ্ধির প্রয়োজন। বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইয়াও চঞ্চল হইলে শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে চলে না। এককালে অনেককে বুঝাইতে হইবে, অনেকের সংশয় ছেদন করিতে হইবে, সুতরাং শিক্ষকের নিজের বুদ্ধি ধীর থাকা আবশ্যক।

নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি ও কোন এক শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, এবং জ্ঞানের সীমা-বিস্তার নিমিত্ত আগ্রহ।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকের নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি ও কোন এক শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা আবশ্যক। নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন এই যে, সকল শাস্ত্র পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট, ও এক শাস্ত্রের কথা অন্যান্য শাস্ত্রদ্বারা উদাহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকিলে শিক্ষক যে শাস্ত্রব্যবসায়ী তাহার বিশদব্যাখ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন। কোন এক শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা এই যে, তাহা না থাকিলে গভীর পাণ্ডিত্য কি তাহা জানা যায় না, এবং তাহা না জানিলে তৎপ্রতি নিজের তাদৃশ অনুরাগ জন্মে না, এবং শিক্ষার্থীর মনেও তৎপ্রতি অনুরাগ জন্মান সম্ভবপর নহে। আর এক কারণেও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের আবশ্যকতা আছে। যদিও পূর্ব্বসুধীদিগের অর্জিত জ্ঞান, যাহা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতি বিপুল, কিন্তু জ্ঞান অনন্ত, অতএব নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের সীমা বিস্তার করা শিক্ষার একটি প্রধান কর্ত্তব্য, এবং শাস্ত্রবিশেষে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য না থাকিলে সেই শাস্ত্রের নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের শক্তি হয় না। ঐ শক্তি উচ্চশ্রেণির শিক্ষকদিগের থাকা আবশ্যক, এবং যাহাতে উচ্চশ্রেণির ছাত্রদিগের ঐ শক্তি জন্মে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা।

বলা বাহুল্য, শিক্ষক মাত্রেরই শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শিক্ষাবিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ (যথা মনু, প্লেটো, রুসো, লক, স্পেন্সর, বেন প্রভৃতি প্রণীত গ্রন্থ) তাঁহাদের পাঠ করা আবশ্যক।

সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা।

সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা শিক্ষকের প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণ। তাহা না থাকিলে তিনি নিজের চিত্ত স্থির, ও শিক্ষার্থীর চিত্ত শ্রদ্ধাযুক্ত ও আকৃষ্ট রাখিতে পারেন না।

শিক্ষাকার্য্যের প্রতি ও শিক্ষার্থীর প্রতি অনুরাগ।

শিক্ষাকার্য্যের প্রতি ও শিক্ষার্থীর প্রতি অনুরাগ থাকা শিক্ষকের নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না থাকিলে নির্জীব কলের মত শিক্ষাকার্য্য চলিবে, সজীব আগ্রহের সহিত শিক্ষার্থীর অন্তরে শিক্ষক নব-জীবন সঞ্চার করিতে পারিবেন না। এই অনুরাগপ্রযুক্ত অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছাত্রের ন্যায় নিত্য পাঠাভ্যাস করিয়া অধ্যাপনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, এবং এইরূপে কোন্ কথার পর কোন্ কথা বলিলে ভাল হয় অগ্রে স্থির করিয়া আসেন বলিয়াই তাঁহারা অল্প-সময়ে অধিক কথা শিখাইতে পারেন।

শিক্ষক ছাত্রের মনে ভক্তির উদ্রেক করিবেন, ভয়ের উদ্রেক করা অবিধি ও অনিষ্টকর। প্রসিদ্ধ শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ লক[1] যথার্থই বলিয়াছেন, "বায়ু-বিকম্পিত পত্রে স্পষ্ট লিখনের চেষ্টা এবং ভয়ে কম্পিত ছাত্রের মনে স্থায়ী উপদেশ অঙ্কিত করণের চেষ্টা তুল্য।"

ছাত্রের সহিত সহানুভূতি আবশ্যক।

ছাত্রের সহিত সহানুভূতি শিক্ষকের নিতান্ত আবশ্যক। তাহা থাকিলে ছাত্রের অভাব ও অপূর্ণতা শিক্ষক বুঝিতে পারেন, এবং বিরক্ত না হইয়া তাহা পূরণ করিতে সমর্থ হয়েন। ও তাহার ফলে ছাত্রের মনে ভক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে আকৃষ্ট ও তাঁহার উপদেশগ্রহণে সমধিক আগ্রহযুক্ত করেন। আর সেই সহানুভূতি না থাকিলে, একদিকে শিক্ষক ছাত্রের অভাবপূরণে যথা-যোগ্য যত্ন করিতে বিরত থাকেন, এবং অপরদিকে সেই যত্নের অভাবপ্রযুক্ত ছাত্রও তাঁহার উপদেশগ্রহণে তাদৃশ তৎপর হয় না। আর একটি কথাও মনে রাখা উচিত। শিক্ষক যদি ছাত্রকে হীনজাতি ও হীনবুদ্ধি মনে করেন, তাহা হইলে দুরূহ শিক্ষাকার্য্যে যে দৃঢ় যত্ন আবশ্যক, তাহা প্রয়োগ করিতে তাঁহার সমধিক উত্তেজনা থাকে না, কেননা, তিনি ভাবেন তাঁহার শিক্ষাকার্য্যের নিষ্ফলতার কারণ তাঁহার নিজের অযোগ্যতা নহে, তাঁহার ছাত্রদিগের অযোগ্যতা।

মহম্মদের গল্প।

উপদেশদাতা ও উপদেশগ্রহীতার মধ্যে সহানুভূতিসম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। কোন দরিদ্র মুসলমান তাহার পুত্রকে লইয়া মহম্মদের নিকট আইসে, এবং পুত্র চিনি খাইতে ভালবাসে কিন্তু সে তাহা যোগাইতে পারে না, অতএব কি করিবে উপদেশ চাহে। মহম্মদ তাহাদিগকে একপক্ষ পরে আসিতে আদেশ দেন, এবং তাহারা পুনরায় আসিলে, দরিদ্রের পুত্রকে অতি তেজস্বি-ভাষায় ক্রমশঃ চিনি ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করেন। পিতা-পুত্র অবশ্যই সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য বোধ করিল, কিন্তু পিতা জিজ্ঞাসা করিল, এই সামান্য উপদেশ দিবার নিমিত্ত স্বয়ং পয়গম্বর কেন একপক্ষ সময় লইয়াছিলেন। মহম্মদ হাসিয়া বলিলেন, তিনি অতিশয় মিষ্টপ্রিয় ছিলেন, নিজে চিনি ছাড়িতে না পারিলে অন্যকে তাহা ছাড়িবার আদেশ করা অন্যায়, এইজন্য একপক্ষ সময় লইয়া

---

[1] *Some Thoughts on Education* দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ও যখন নিজে ছাড়িতে পারিয়াছেন, তখন অপরকে ছাড়িবার আদেশ দিতে সঙ্কোচবোধ করিলেন না।

ছাত্রদিগকে আদেশ দিবার পূর্বে শিক্ষক মহাশয়ের এই সুন্দর গল্পটি মনে রাখিলে ভাল হয়।

শিক্ষা ও শাসনের প্রভেদ।

কেহ কেহ বলেন একটু কঠোর না হইলে এবং ছাত্রের মনে একটু ভয় না জন্মাইলে ছাত্র শিক্ষককে মানিবে না, এবং শিক্ষাকার্য্যে সুশৃঙ্খলা থাকিবে না। একথাটি ভুল। শিক্ষা ও শাসন যদি একই হইত তাহা হইলে একথা ঠিক হইত। কিন্তু শিক্ষা ও শাসনে অনেক প্রভেদ। শাসনের উদ্দেশ্য শাসিত ব্যক্তি, তাঁহার অন্তরে যাহাই থাকুক, বাহিরে কোন বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তরের দোষ সংশোধিত হইয়া তাহার উৎকর্ষলাভ হয়। সুতরাং শাসন ভয় দেখাইয়া হইতে পারে। শিক্ষা ভক্তির উদ্রেক ভিন্ন হয় না।

২। বিদ্যালয়।

২। বহু ছাত্র একত্র এক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিলে শিক্ষা কার্য্যে যে শ্রম ও সময় লাগে তাহার অনেক লাঘব হইতে পারে। একজন শিক্ষক এক শ্রেণির বিশ পঁচিশটি ছাত্রকে এক সঙ্গে এক বিষয় অনায়াসে শিখাইতে পারেন। এইরূপে অনেকগুলি শিক্ষক একস্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ছাত্রকে শিক্ষা দিলে একস্থানে অনেক দূরপর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া চলে। এই জন্য বিদ্যালয়, অর্থাৎ একত্র ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির অনেক ছাত্রের শিক্ষার স্থান, শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিন্তু অনেকগুলি ছাত্রকে একত্র শিক্ষা দেওয়াতে যেমন সুবিধা আছে, তেমনই অসুবিধাও আছে। অনেক ছাত্রকে একস্থানে অনেকক্ষণ আবদ্ধ রাখিলে তাহাদের শারীরিক কষ্ট হইতে পারে। একশ্রেণির সকল ছাত্রের বুদ্ধি সমান হয় না। কেহ শীঘ্র বুঝে, কেহ বিলম্বে বুঝে, কেহ এক বিষয় সহজে বুঝে, কেহ অন্য বিষয় সহজে বুঝে, কেহ সর্ব্বদা পাঠে মনোযোগী, কেহ মধ্যে মধ্যে অমনোযোগী। এতদ্ব্যতীত, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ছাত্রকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন, এবং তাঁহাদের একমত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ছাত্র ও ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক লইয়া একত্র সুচারুরূপে কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রয়োজনীয়, যথা—

তৎসম্বন্ধে নিয়ম।

(১) বিদ্যালয়ের গৃহ স্বাস্থ্যকর হওয়া আবশ্যক।

(২) প্রত্যেক দিন পাঠের মধ্যে ছাত্রদিগকে বিশ্রাম ও ক্রীড়ার সময় দেওয়া উচিত।

(৩) দৈনিক পাঠের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে তাহা বাটীতে অভ্যাস করিয়া ছাত্রেরা বিশ্রাম করিবার সময় পায়।

(৪) কোন শিক্ষকের উপর ত্রিশজন অপেক্ষা অধিক ছাত্রের এককালীন শিক্ষার ভার দেওয়া অনুচিত।

(৫) কোন্ সময়ে কোন্ বিষয়ে কোন্ শ্রেণিতে কোন্ শিক্ষক শিক্ষা দিবেন তাহার দৈনিক নিয়মপত্র থাকা উচিত।

(৬) প্রত্যেক শ্রেণির শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য পুস্তক যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, ও পাঠ্য পুস্তক ক্রমানুয়ে পঠিত হওয়া উচিত।

(৭) প্রতি মাসে অথবা দুই তিন মাসান্তর শিক্ষা কার্য্যের পরিদর্শন ও শিক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা হওয়া উচিত, এবং সেই পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ও গড় পড়তায় প্রত্যেক শ্রেণির কিরূপ ফল হয় তাহা দর্শিত হওয়া উচিত।

ছাত্রনিবাস।

(৮) ছাত্রদিগের চরিত্র ও ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রতিমাসে অভিভাবকগণকে জানান উচিত। এই স্থানে ছাত্রনিবাস সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যে সকল ছাত্র দূর হইতে আইসে ও যাহাদের কোন অভিভাবক নিকটে নাই, তাহাদের থাকিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ের নিকটে ও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ছাত্রনিবাস থাকিলে ও তথায় ছাত্র ও শিক্ষক একত্র অবস্থিতি করিলে সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অসুবিধাও আছে। বহুসংখ্যক ছাত্রের একত্র বাস সুশৃঙ্খলামত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার, এবং তত্ত্বাবধানের একটু ত্রুটি হইলেই অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা। স্বজনবর্গের মধ্যে থাকিলে শিক্ষার্থীর যেরূপ চিত্তবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে, শিক্ষকের নিকটে থাকিলেও, সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। ছাত্রগণ স্ব স্ব আবাসে থাকিলে স্বাতন্ত্র্য ও সংসারের সর্ব্বদিকে দেখাশুনা অভ্যাস করিতে পারে, ছাত্রনিবাসে থাকিলে তাহা হয় না। সুশাসিত ছাত্রনিবাসে ছাত্রগণ কলের মত পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মানুষের মত চলিতে শিখে কি-না সন্দেহের স্থল। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, এবং তত্ত্বাবধানের বিশেষ সুযোগ না থাকিলে, ছাত্রনিবাসে থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয় না। কেহ কেহ মনে করেন ছাত্রনিবাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সর্ব্বদা সমাবেশ হইতে পারে, অতএব ছাত্রনিবাসে অবস্থান প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে বাসের ন্যায় ফলপ্রদ। একথা ঠিক নহে। কারণ, প্রথমতঃ, ছাত্রনিবাস গুরুগৃহ নহে, গুরু তথায় সপরিবারে অবস্থিতি করেন না, এবং নিজের বা গুরুর স্বজনপরিবৃত থাকিয়া ছাত্র যেরূপ পালিত ও শিক্ষিত হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে তাহা হইতে পারে না। এবং দ্বিতীয়তঃ, পুরাকালে শিষ্য গুরুকে ভক্তি উপহার দিত ও স্নেহ প্রতিদান পাইত। ভক্তি ও স্নেহ এই দুইমাত্র আদানপ্রদানের সামগ্রী ছিল, এবং এই দুয়ের বিনিময়ই এক অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করিত। বর্ত্তমান কালে ছাত্রনিবাসে ছাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তদুপযুক্ত বাসস্থান ও খাদ্যদ্রব্যাদি পায় ও বুঝিয়া লয় বা লইবার চেষ্টা করে। এই অর্থ ও দ্রব্যের আদানপ্রদানমূলক ব্যাপার সেই ভক্তি ও স্নেহের বিনিময়সম্ভূত সম্বন্ধের সহিত কোন মতে তুলনীয় হইতে পারে না।

৩। বিশ্ব-বিদ্যালয়।

৩। যেমন অনেকগুলি শিক্ষকের একত্র মিলনে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তেমনই অনেকগুলি বিদ্যালয়ের একত্র মিলনে একটি **বিশ্ববিদ্যালয়**

স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক উচ্চ শিক্ষা প্রদান, উপযুক্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক শিক্ষার্থিগণের পরীক্ষাগ্রহণ ও তাহার ফলানুসারে উপাধি ও সম্মান বিতরণ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সম্যক্ উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য বহুবিধ ও জটিলনিয়মসঙ্কুল হওয়া উচিত নহে।

৪। পুস্তক

৪। **পুস্তক** শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ।

যখন যে বস্তুর বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় তখন সেই বস্তু শিক্ষার্থীর সম্মুখে রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রকৃতি এই প্রণালীতে শিশুকে প্রথমে শিক্ষা দেন। কিন্তু শিক্ষার বিষয় যখন 'আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত' সমস্ত জগৎ, তখন একথা সর্ব্বত্র খাটে না। অনেক স্থলে বস্তুর অনুরূপ বা প্রতিকৃতি লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়। তন্মধ্যে শব্দরচিত বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও অধিক ব্যবহৃত, এবং বস্তুর এই শব্দময় রূপ পুস্তকে অঙ্কিত থাকে।

পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয় গুণ।

শিক্ষোপযোগী পুস্তকের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, যথা—

(১) শিক্ষার্থীর অর্থ, সময়, ও শক্তির অপচয় নিবারণার্থে পাঠ্য পুস্তকের আয়তন যথাসম্ভব ছোট হওয়া, ও তাহাতে বর্ণিত বিষয় যথাসাধ্য সংক্ষেপে অথচ পূর্ণতার সহিত, সরল অথচ শুদ্ধ ভাষায়, বিশদরূপে অথচ স্বল্প কথায় বিবৃত হওয়া উচিত।

(২) শিক্ষা সুখকর করিবার নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক সুন্দররূপে মুদ্রিত, ও মধ্যে মধ্যে বিবৃত বিষয়ের চিত্রদ্বারা শোভিত, এবং সুমিষ্ট ভাষায় সরলভাবে রচিত হওয়া উচিত।

(৩) ভাষাশিক্ষার প্রথম পাঠ্যপুস্তকে নূতন শব্দ ও নূতন বিষয় অতি অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত, এবং দুরূহ শব্দ ও বিষয় একেবারে পরিত্যাজ্য।

(৪) ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ্যপুস্তকে কেবল তত্তদ্বিষয়ক স্থূল কথাগুলি থাকিবে।

(৫) গণিতের প্রথম পাঠ্যপুস্তকে অতিদুরূহ উদাহরণ থাকিবে না।

অন্য প্রকার পুস্তকের দোষ-গুণ।

এইগুলি পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ। এতদ্ব্যতীত পুস্তক মাত্রেরই সাধারণতঃ কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, অন্ততঃ কতকগুলি দোষ বর্জ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ এস্থলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সেই দোষগুণসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে: (১) পুস্তকের আয়তন সম্বন্ধীয়, (২য়) পুস্তকের ভাষা ও রচনা প্রণালী সম্বন্ধীয়, (৩য়) পুস্তকের বিষয় সম্বন্ধীয়।

এই আলোচনায়, বড় ছোট, ভাল মন্দ, সর্ব্বপ্রকার পুস্তক সম্বন্ধেই কথা কহিতে হইবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে গ্রন্থকার মহাশয়দিগের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন, তাঁহাদের রচনা সম্বন্ধে কথা কহিবার আমার এই একমাত্র অধিকার আছে যে, সেই সকল রচনা হইতে আমি অপর সাধারণ পাঠকের ন্যায় জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি, এবং সাধারণ পাঠকদিগের পক্ষ হইতে

গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য সে কথাগুলি প্রকাশ করিলে সাধারণের উপকার হইতে পারে, কেবল এই আশায় এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

(১ম) পুস্তকের আয়তন। সকল পুস্তকই যথাসম্ভব স্বল্পায়তন হওয়া উচিত। সকল পাঠকেরই সময়, এবং অধিকাংশ পাঠকেরই অর্থসঙ্গতি সঙ্কীর্ণ, সুতরাং বৃহদাকার গ্রন্থ সংগ্রহ করা ও পাঠ করা প্রায় সকলেরই পক্ষে অসুবিধাজনক। বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন গ্রন্থকারের পক্ষেও সুবিধাজনক নহে, কারণ তাহা মুদ্রিত করা সমধিক ব্যয়সাধ্য। তবে যে প্রয়োজনাতীত বৃহদাকার গ্রন্থ কেন প্রণীত হয় তাহারও কারণ আছে। প্রথমতঃ, প্রয়োজনীয় সকল কথা বিশদভাবে অথচ সংক্ষেপে বলা বড় আয়াসসাধ্য, সুতরাং গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধি সহজেই হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা এত বৃথাভিমানী যে, না ভাবিয়াও অনেক সময় বড় জিনিসের আদর করি, সুতরাং বড় পুস্তক, কি গ্রন্থকার কি পাঠক সকলেরই নিকট সহজেই সমাদৃত হয়।

পূর্ব্বকালে যখন মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, এবং পুস্তক হাতে লিখিতে হইত, আর সে লেখা স্বভাবতঃই কষ্টকর হইত, সেই কষ্ট কমাইবার নিমিত্ত, এবং গ্রন্থ পাঠকের স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে সুবিধার নিমিত্ত, এ দেশে অনেক গ্রন্থ সূত্রাকারে, অর্থাৎ অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে, রচিত হইত। সেই সূত্রের লক্ষণ এই—

"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥"

"স্বল্পাক্ষর, অসন্দিগ্ধ, সারবৎ, সকলদিকে দৃষ্টিবিশিষ্ট, বৃথাশব্দশূন্য, এবং নির্দ্দোষ, এরূপ রচনাকে সূত্রজ্ঞেরা সূত্র বলিয়া গ্রহণ করেন।"

স্বল্পাক্ষর অথচ অসন্দিগ্ধ, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ, এই দ্বিবিধ গুণ কিয়ৎ পরিমাণে বিরোধী, একটি থাকিলে অপরটিকে সেই সঙ্গে পাওয়া কঠিন। এই দুই বিরুদ্ধ গুণ একত্র করা সংসারের অন্যান্য সঙ্কটাপন্ন কার্য্যের মধ্যে একটি। এরূপ স্থলে উভয় গুণই যথাসম্ভব একত্র করিবার চেষ্টা করা, অর্থাৎ উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলাই কর্ত্তব্য। তাহা না হওয়াতে, আমাদের সূত্র-গ্রন্থের অধিকাংশই স্বল্পাক্ষর হইয়াছে বটে, কিন্তু অসন্দিগ্ধ না হইয়া একই সূত্র পরস্পরবিরুদ্ধ ভাষ্যের আধার হইয়াছে।

পুস্তক প্রাচীন সূত্রগ্রন্থের ন্যায় সংক্ষিপ্ত হইবারও প্রয়োজন নাই, আবার এক্ষণকার অতি বিস্তৃত গ্রন্থের ন্যায় হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। দুয়ের মাঝামাঝি হইলেই ভাল হয়।

এক কথা বার বার বলিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এক কথা স্পষ্ট করিয়া একবার বলিলে যে ফল হয়, অস্পষ্টভাবে দশবার বলিলেও সে ফল হয় না। উচ্চৈঃস্বরে একবার ডাকিলে আহূত ব্যক্তি শুনিতে পায়, কিন্তু মৃদুস্বরে তাহাকে দশবার ডাকিলেও সে ডাক তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না। যে ভাল করিয়া বলিতে পারে সে বলিবার কথা একবার বলিয়াই সন্তুষ্ট

হয়। যে ভাল করিয়া বলিতে পারে না সে এক কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দশবার বলে, ও তাহাতেও বলা হইল বলিয়া সন্তুষ্ট হয় না।

দুই-এক প্রকার পুস্তক সম্বন্ধে দীর্ঘায়তন বোধ হয় অনিবার্য্য, যথা চিকিৎসা-শাস্ত্রবিষয়ক ও ব্যবহারশাস্ত্রবিষয়ক পুস্তক। রোগ এত প্রকার, ও এক প্রকার রোগই এত বিভিন্নভাব ধারণ করে, এবং ঔষধও এত প্রকার ও অবস্থাভেদে তাহাদের প্রয়োগও এত বিভিন্ন প্রকার, যে তাহাদের সম্পূর্ণ সুক্ষ্ম বিবরণ দিতে হইলে অবশ্যই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে। তবে সেই বিবরণ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিলে কতদূর সংক্ষিপ্ত হইতে পারে চিকিৎসক মহাশয়েরা বলিতে পারেন।

আইনসংক্রান্তবিষয়েরও যে বিভাগই লওয়া যাউক, তাহা এত বিস্তৃত ও তাহার এক এক কথা এত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উপস্থিত হইতে পারে, এবং তৎসম্বন্ধীয় নজির ক্রমশঃ এত বেশি হইয়া আসিতেছে যে তৎ-সমুদয়ের আলোচনা করিতে গেলে আইনের পুস্তক বৃহৎ না হইলে চলে না। তবে বিষয়সকল শ্রেণিবদ্ধ করিলে এবং বক্তব্য কথার ও প্রযোজ্য নজিরের সারমর্ম্ম সুশৃঙ্খলামত বিবৃত করিলে গ্রন্থ যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইতে পারে।

(২য়) পুস্তকের ভাষা ও রচনাপ্রণালী। পুস্তকের ভাষা বিষয়ভেদে ও গ্রন্থকারের প্রকৃতি ও রুচিভেদে অবশ্যই নানা প্রকারের হইবে, এবং তাহা না হইয়া সর্ব্বত্র এক প্রকারের হইলে গ্রন্থপাঠের সুখ এক ব্যঞ্জন দিয়া আহারের সুখের ন্যায় সংকীর্ণ হইয়া পড়িত।

তবে সেই সকল বাঞ্ছনীয় বৈষম্যের মধ্যে একটি তুল্যবাঞ্ছনীয় সাম্য সর্ব্বত্র থাকা উচিত। সেই সাম্য ভাষার সরলতা ও স্বাভাবিকতা। যে গ্রন্থকারের প্রকৃতি ও রুচি যেরূপই হউক, সকল গ্রন্থকারই ইচ্ছা করেন তাঁহাদের ভাষা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয়। কিন্তু ভাষা সুন্দর হইতে গেলে তাহা সরল হওয়া আবশ্যক, কারণ সরলতা এস্থলে সৌন্দর্য্যের মূল, আর অলঙ্কারের আধিক্য সৌন্দর্য্যের হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধিকারক নহে। এবং ভাষা হৃদয়গ্রাহী হইতে গেলে তাহা স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইয়া পারিপাট্য ও ভাবভঙ্গিপূর্ণ হইলে কৌতুকাবহ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষে মানুষে যতই প্রকৃতিভেদ ও রুচিভেদ থাকুক না কেন, সে সমস্তই এক প্রকার বাহিরের ভেদ, এবং সে সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে অন্তরে সকল মনুষ্যেরই একপ্রকার সাম্য আছে। আমাদের অন্তর্নিহিত গভীর ভাবগুলি সেই সাম্যে সংস্থাপিত। আবার ভাষা ও ভাব বিচিত্ররূপে সম্পৃক্ত, এবং ভাষা ভাবের একপ্রকার স্ফুরণ-মাত্র। অতএব যে ভাষা মনুষ্যের সেই অন্তর্নিহিত গভীর ভাবের স্ফুরণ, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। সেই ভাষাই প্রকৃত মন্ত্র। তাহাই মনুষ্যকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। সে ভাষায় অধিকার প্রতিভাবলেই জন্মে। শিক্ষা, অভ্যাস, এবং যত্নেও কাহার কাহার কখন জন্মিয়া থাকে। কিন্তু যাহার সেই মন্ত্রসদৃশ ভাষায় অধিকার না জন্মে, তাহার পক্ষে বৃথা আড়ম্বরশূন্য সরল ভাষাই অবলম্বনীয়।

রচনা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিবিধ, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক। বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে রচনা করা, একটু যত্ন করিলে, সকলেরই পক্ষে সাধ্য। সাহিত্যিক প্রণালীতে রচনা করার চেষ্টা, বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের পক্ষে বৃথা। কিন্তু অভিমানপরতন্ত্র হইয়া অনেকেই সেই বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকেন।

রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা আছে। অনেকে বোধ হয় নিজের বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার অথবা পাঠকের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে ভালবাসেন। সেই ইঙ্গিত সার্থক ও সরল হইলে ক্ষতি হয় না, বরং তাহাতে পাঠকের আনন্দলাভ হয়। কিন্তু তাহা নিরর্থক বা কষ্টকল্পনাদূষিত হইলে রচনার স্পষ্টতা নষ্ট করে।

আবার কখন কখন রচনায় উজ্জ্বল পাণ্ডিত্যের ছটা দেখাইবার প্রয়াসে, প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক, এবং সংলগ্ন হউক আর না হউক, উদ্ভট ও সাধারণের অপরিজ্ঞাত উদাহরণ দ্বারা সরল কথা জটিল করিয়া তোলা হয়।

(৩য়) পুস্তকের বিষয়। জ্ঞানের সীমা যেমন অনন্ত, পুস্তকের বিষয়ও তেমনই অসংখ্য। তবে উপস্থিত আলোচনার নিমিত্ত পুস্তক দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে—বিজ্ঞানবিষয়ক ও সাহিত্যবিষয়ক।

বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের দোষগুণসম্বন্ধে এস্থলে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ঐ শ্রেণির পুস্তক সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত নহে, বিশেষ বিশেষ পাঠকের নিমিত্ত। তাহার দোষ-গুণ পাঠকগণ বিচার করিতে সমর্থ। এবং সেই গুণদোষের ফলাফল অন্ততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাধারণকে ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু সাহিত্যবিষয়ক পুস্তক সেরূপ নহে। তাহা সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত। তাহার দোষ-গুণ বিচার করিতে পাঠক অনেক স্থলেই সমর্থ নহে। অথচ এই শ্রেণির গ্রন্থের গুণ-দোষের ফলাফল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাধারণকে ভোগ করিতে হয়। একটি সামান্য উপমা দিব। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচয়িতা যন্ত্রাদিবিক্রেতার সহিত তুলনীয়, ও সাহিত্যিক গ্রন্থরচয়িতা খাদ্যাদিবিক্রেতার সহিত তুলনীয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তির পণ্য ব্যবসায়ী ক্রেতা দোষ-গুণ বিচার করিয়া ক্রয় করে, এবং প্রতারিত হইলেও প্রায়ই আর্থিক ভিন্ন তাহার অন্য কোন প্রকারের ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির পণ্য, ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী, বুদ্ধিমান্ নির্ব্বোধ, সকলেই ক্রয় করে, অনেকেই তাহার দোষ-গুণ বিচার করিতে সমর্থ নহে, এবং প্রতারিত হইলে তাহাদিগকে কেবল আর্থিক ক্ষতি নহে, শারীরিক অনিষ্টও সহ্য করিতে হয়। যেখানে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ একজন বুঝিয়া পড়ে, সেখানে সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ একশত জন না ভাবিয়া পাঠ করে, এবং সেই পাঠ দ্বারা তাহাদের রুচি, প্রবৃত্তি ও কার্য্য পরিচালিত হয়। সুতরাং

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থপ্রণেতা অপেক্ষা সাহিত্যিক গ্রন্থপ্রণেতার দায়িত্ব শতগুণে অধিক গুরুতর। ভাল সাহিত্যগ্রন্থ সুরুচি ও সুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া যে পরিমাণে সাধারণের হিতসাধন করিতে পারে, মন্দ সাহিত্যগ্রন্থ কুরুচি ও কুপ্রবৃত্তি উৎসাহিত করিয়া কেবল সে পরিমাণে নহে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাধারণের অনিষ্ট করিতে পারে। কারণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ উন্নতির পথে অপেক্ষা অবনতির পথে গতি অতি সহজ। এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, পৃথিবীর অনেক সাহিত্যিক গ্রন্থ রচিত না হইলে কোন ক্ষতি হইত না, বরং লাভ হইত।

সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ সুরুচিসম্পন্ন, সুপ্রবৃত্তি উত্তেজক, ও সদুপদেশপ্রদ না হইলে তাহা প্রণীত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় সকল সভ্যজাতির ভাষাতেই এত উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ আছে যে লোকে তাহাই পাঠ করিয়া উঠিতে পারে না। এমত স্থলে নিকৃষ্ট গ্রন্থের প্রয়োজন কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ অবশ্যই বলিতে পারেন,—সমাজ স্থিতিশীল নহে, সর্ব্বদাই গতিশীল, সামাজিক রীতিনীতি নিরন্তর পরিবর্ত্তিত এবং ক্রমশঃ উন্নতিমুখী হইতেছে। মানবের চিন্তাশক্তি অতীতে যে সকল উচ্চাদর্শ দর্শাইয়াছে, ভবিষ্যতে তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ দর্শাইতে পারে। সুতরাং সেই চিন্তাস্রোত রোধ এবং নূতন কাব্যপ্রণয়ন বন্ধ করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। কাব্য প্রণীত হইতে গেলে সকল কাব্যই যে উৎকৃষ্ট হইবে এরূপ আশা করা যায় না, কেহ ভাল, কেহ মন্দ ও অধিকাংশ না ভাল না মন্দ, এইরূপ হইবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। দশখানার মধ্যে একখানা ভাল গ্রন্থ হইলেও যথেষ্ট মনে করা উচিত।—এ সকল কথা সত্য, এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ভিন্ন অন্য গ্রন্থের প্রণয়ন একেবারে অনুচিত বলা যায় না। নূতন বালুকাময় চরভূমিতে যেমন প্রথমে আগাছা জন্মে, ও মরিয়া পচিয়া সেই ভূমির সারস্বরূপ হয়, এবং তাহাকে উর্ব্বরা করিয়া শস্য ও সুবৃক্ষ উৎপাদনের যোগ্য করে, সেইরূপ নূতন ভাষায় বা নূতন বিষয়ে প্রথমে নিকৃষ্ট পুস্তক রচিত হইয়া একপ্রকার ভূমি প্রস্তুত করিয়া মনীষিগণকে সেই ভাষায় বা সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়নে প্রণোদিত করে। নিকৃষ্ট পুস্তকদ্বারা এরূপ উদ্দেশ্য সাধিত হইলে তাহার প্রণয়ন একেবারে অনুচিত বলা যায় না। এবং যে পুস্তকে এই মুহূর্ত্তে সেই সকল কথার আলোচনা হইতেছে তাহা যদি এরূপ উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে, তবে তাহার প্রণয়ন নিষ্ফল মনে করিব না। কিন্তু যে সকল পুস্তক কেবল নিকৃষ্ট নহে, স্পষ্টরূপে অনিষ্টকর, এবং সাধারণের কুরুচি ও কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া লোককে কুপথগামী করে, ও সমাজকে কুশিক্ষা প্রদান করে, তাহারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত ভূমি প্রস্তুত করুক আর না করুক, তাহাদের নিজ পূতিগন্ধে চতুষ্পার্শ্বের বায়ু দূষিত করিয়া সমাজের অশেষ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি উৎপন্ন করে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ গ্রন্থপ্রণয়ন নিতান্ত অনুচিত।

পুস্তকালয়।

৫। পুস্তকালয়ও শিক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। এক পক্ষে যেমন কথিত আছে—

पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं।
कार्य्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनं॥"

(পুথিগত বিদ্যা, পরহস্তগত ধন,
কাজের সময় কাজে লাগে না কখন।।)

পক্ষান্তরে, ইহাও কথিত আছে,

"ग्रन्थी भवति पण्डितः ।"

(গ্রন্থ আছে যার ক্রমে সে হয় পণ্ডিত।)

বস্তুতঃ উভয় কথাই কিয়ৎপরিমাণে সত্য। কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় পুথিগত হইলে চলে না, হৃদ্‌গত হওয়া আবশ্যক। এবং বহুতর বিষয় আছে যাহার সমস্ত সর্ব্বদা মনে রাখা অসাধ্য বা অনাবশ্যক, কিন্তু সময়ে সময়ে তন্মধ্যে কোন কোনটি জানা আবশ্যক, ও তন্নিমিত্ত তাহা কোন্ পুস্তকে কোথায় আছে তাহা জানা উচিত, এবং সেই সকল পুস্তক হস্তগত হইতে পারা আবশ্যক। এই জন্য পুস্তকালয় শিক্ষার একটি উপকরণ। তবে সকল পুস্তকালয়ে যে সকল পুস্তক থাকিবে এরূপ আশা করা যায় না। যেখানে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া যায় সেখানে সেই সকল বিষয়সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি থাকিলেই চলে।

৬। যন্ত্র ও যন্ত্রালয়।

৬। যন্ত্র ও যন্ত্রালয় শিক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক। এমত অনেক কঠিন ও জটিল বিষয় আছে যাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বস্তুর শব্দময় বিবরণ বা পুস্তকে অঙ্কিত চিত্র যথেষ্ট নহে। তাহাদের অন্য প্রকার প্রতিকৃতি,—যাহা যন্ত্রাদি দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে, শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত যন্ত্রাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তবে এ সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখা উচিত। সম্পূর্ণ সুসজ্জিত যন্ত্রালয় যদিও বাঞ্ছনীয় কিন্তু তাহা অধিক ব্যয়সাধ্য। অল্প ব্যয়ে ও সহজে গঠিত যন্ত্রদ্বারা যতই শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হয় ততই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই গৌরব।

৭। পরীক্ষা।

৭। পরীক্ষা অর্থাৎ বৈধ পরীক্ষা শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। কিন্তু অবৈধ পরীক্ষা শিক্ষার অপকরণ বলিলেও বলা যায়। যে পরীক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষাকার্য্য কিরূপে চলিতেছে ও ছাত্রেরা কতদূর শিখিতেছে তাহা দেখা, সে পরীক্ষা শিক্ষার উপকার করে। কিন্তু যে পরীক্ষার উদ্দেশ্য তাহা না হইয়া প্রশ্নের বৈচিত্র্য দ্বারা শিক্ষার্থীদের অজ্ঞতা দেখান ও তাহাদিগকে অপ্রতিভ করা, সে পরীক্ষা শিক্ষার উপকার না করিয়া বরং অপকার করে। কারণ সেরূপ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে গিয়া শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জ্জন ও মানসিক উৎকর্ষসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, কি উপায়ে বিচিত্র বিচিত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

পরীক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখা উচিত—

(১) পরীক্ষা শিক্ষার ফল নিরূপণার্থ ও শিক্ষার অনুগামী হইবে। শিক্ষা পরীক্ষার ফললাভার্থ নহে ও পরীক্ষার অনুগামী হইবে না।

(২) মাসিক, বার্ষিক ও অন্যবিধ সাময়িক পরীক্ষা ভিন্ন নিত্য পরীক্ষার অর্থাৎ শিক্ষালব্ধ বিষয়ের নিত্যালোচনার আবশ্যক।

(৩) অতিদুরূহ বা অত্যধিকসংখ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অনুচিত। কিন্তু প্রতিভার পরিচয় পাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে দুই একটি কঠিন প্রশ্ন থাকা বিধেয়।

অনুশীলন

অনুশীলন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জ্ঞানলাভার্থ নিজের যত্ন ও অন্যের সাহায্য উভয়েরই প্রয়োজন, এবং অন্যের সাহায্য শিক্ষা নামে অভিহিত, ও নিজের যত্নকে **অনুশীলন** বলা যাইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। এইক্ষণে অনুশীলন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইবে।

জ্ঞানের বিষয়ভেদে অনুশীলনের প্রণালী বিভিন্ন। বহির্জগতের বিষয় সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা অনুশীলন কার্য্য চলে। অন্তর্জগতের বিষয় সম্বন্ধে, অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা নিজের আত্মাকে জিজ্ঞাসা ও অন্যের আত্মার বাহ্যকার্য্য পর্য্যবেক্ষণই অনুশীলনের উপায়। বহির্জগতসম্বন্ধীয় অনুশীলনে অনেক স্থলে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা উভয়ই সাধ্য। যথা জীবদেহের তত্ত্বানুশীলনে দেহের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে, এবং জীবকে ইচ্ছামত অবস্থান্তরিত করিয়া সেই অবস্থান্তরের ফল পরীক্ষাও করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন কোন স্থলে পর্য্যবেক্ষণই একমাত্র উপায়, পরীক্ষাসাধ্য নহে। যথা সূর্য্যের কলঙ্ক কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত সূর্য্যমণ্ডল নিত্য পর্য্যবেক্ষণ ও সর্ব্বগ্রাস-গ্রহণসময়ের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন ইচ্ছামত সূর্য্যের অবস্থাপরিবর্ত্তন দ্বারা পরীক্ষাসাধ্য নহে।

অনুশীলনের উদ্দেশ্য নানাবিধ। তন্মধ্যে কএকটির উল্লেখ।

অনুশীলনের উদ্দেশ্য নানাবিধ,—কখন বা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার, কখন পূর্ব্বাবিষ্কৃত তত্ত্বাবলির পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়, কখন অনুশীলনকর্ত্তার ও সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের জ্ঞানলাভ, কখন বা জনসাধারণের নিমিত্ত সুখকর বস্তু উৎপাদন অথবা হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান, ইত্যাদি। কেহ বা যশোলাভার্থে সাহিত্যানুশীলন ও কাব্য প্রণয়ন করিতেছে, কেহ বা যশ ও অর্থ লাভের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুশীলন করিতেছে, কেহ বা জীবকে রোগমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জীবতত্ত্বানুশীলনে রত, আবার কেহ বা এ সকল পার্থিব বিষয় ছাড়াইয়া উঠিয়া মুক্তিলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিতেছে। সে সব অনেক কথা, এবং তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। যে কএকটি বিষয়ের অনুশীলন নিতান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়, এস্থলে কেবল তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন।

(১) স্মৃতিশক্তি জ্ঞানোপার্জনের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। সেই শক্তি বৃদ্ধি করিবার কোন প্রকৃত উপায় আছে কি না তদ্বিষয়ে শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক অনুশীলন অতি আবশ্যক, কারণ, তাহার ফল শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে পরমোপকারক হইতে পারে। সেই সঙ্গে আর একটি বিষয়েরও অনুশীলন বাঞ্ছনীয়। সে বিষয়টি এই, স্মৃতিশক্তি ও বিবেকশক্তি পরস্পরের বিরোধী কি না।

কেহ বলেন, "স্মৃতি যথা প্রবল তথায় বুদ্ধি ক্ষীণ।
বুদ্ধি যথা দীপ্ত, স্মৃতি তথায় মলিন॥"[১]

আবার কেহ কেহ এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন, এবং তাঁহারা দেখান যে অনেক অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রবল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

২। ভাষাশিক্ষার প্রশস্ত উপায় উদ্ভাবন।

(২) ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে কোন্ প্রণালী প্রশস্ত, অর্থাৎ কথোপকথনের সঙ্গে কাব্যাদিপুস্তক ও ব্যাকরণ পাঠ, অথবা কেবল কথোপকথনের উপর নির্ভর, এ বিষয়ের অনুশীলন শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক নিরপেক্ষভাবে হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়, কারণ সেই অনুশীলনের ফল অনেকদূরব্যাপী। বহুসংখ্যক ব্যক্তিকেই নানা কারণে মাতৃভাষা ভিন্ন অপর দুই একটি ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, এবং তাহাতে তাহাদের অনেক সময় ও শ্রম লাগে। যদি এত লোকের সেই সময়ের ও শ্রমের ব্যয় শিক্ষার সুপ্রণালীদ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্রাতেও কমাইতে পারা যায়, তাহা হইলে লাভ বড় অল্প নহে। এ সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ আছে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। যুক্তি, তর্ক ও অল্প বিস্তর পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া সেই সকল মতামত প্রকাশ করা হইয়া থাকে, এবং সেই যুক্তি, তর্ক ও পরীক্ষা যে আমাদের আত্মাভিমানদোষে দূষিত নহে একথাও বলা যায় না। অল্প দেখিয়া শুনিয়া ও অল্প চিন্তা করিয়া প্রথমে যে আনুমানিক সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই, তত্ত্বানুসন্ধান নিমিত্ত তাহা পথপ্রদর্শক হইতে পারে, আর স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহা তত্ত্বানুসন্ধানের পথরোধক হয়। কিন্তু আত্মাভিমানবশতঃ নিজের অনুমানের প্রতি আমাদের এতই অনুরাগ জন্মে যে, তাহার যথার্থতার প্রতি সন্দেহ হয় না, এবং পরীক্ষার ফল তাহার বিপরীত হইলে সে পরীক্ষা দূষিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয়। এই জন্য ভাষাশিক্ষা প্রণালীর প্রশস্ততা নির্ণয়ার্থ অনুশীলন নিরপেক্ষভাবে হওয়া আবশ্যক এই কথা উপরে বলা হইয়াছে। তাহা না হইলে মাতৃভাষাশিক্ষার প্রণালী সকল ভাষা শিক্ষাতেই খাটে এ মত যাঁহারা অগ্রেই প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের সেই মত পরিবর্ত্তন করা অতি কঠিন।

৩। শাস্ত্রের তত্ত্ব সরল প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা।

(৩) গণিতশাস্ত্রের, ও অন্যান্য শাস্ত্রেরও, তত্ত্বসকল জটিল তর্ক ও প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন না করিয়া, পূর্ব্ব দর্শিত মিশ্রণ সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্তের ন্যায় সরল ও

---

[১] Pop'es *Essay on Criticism* কবিতার চারিটি পংক্তির অনুবাদ।

সর্ব্বজনবোধগম্য প্রমাণদ্বারা যাহাতে নির্ণীত হইতে পারে তদ্বিষয়ের অনুশীলন মহোপকারক। সেই অনুশীলন যত সফল হইবে ততই শিক্ষার্থীদিগের জ্ঞানার্জন সহজ হইবে, এবং সাধারণ সমাজেরও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কারণ, শাস্ত্রের তত্ত্ব সহজে বোধগম্য হইলেই তাহা আর কেবল শিক্ষিতদিগের বিশেষ সম্পত্তি থাকিবে না, সাধারণেরও অধিকারভুক্ত হইবে।

(৪) কবিরাজী ও হাকিমী অনেক ঔষধ এ দেশে ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রকৃত কার্য্যকারিতা ও দোষ-গুণ সম্বন্ধে অনুশীলন বড়ই বাঞ্ছনীয়।

৪। কবিরাজী ও হাকিমী ঔষধ পরীক্ষা।

কবিরাজ ও হাকিমদিগের চিকিৎসাশাস্ত্র অভ্রান্তই হউক আর ভ্রমাত্মকই হউক, তাঁহাদের ঔষধ যখন অনেকস্থলে ফলপ্রদ হয় তখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণকর্ত্তৃক অন্ততঃ তাহার উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত। যদি সে ঔষধ এ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং উপকারক হয়, তবে লোকে সেই উপকারলাভে বঞ্চিত থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে নিত্য নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে, অথচ আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয় এই যে এ দেশে পুরাতন এবং বহুদিনের পরীক্ষিত ঔষধের যথাযোগ্য পুনঃপরীক্ষা পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকগণকর্ত্তৃক হইতেছে না।

(৫) দুষ্কর্ম্মজন্য দণ্ডিত ব্যক্তিগণের কোনরূপ শিক্ষা বা চিকিৎসাদ্বারা সংশোধন হইতে পারে কি না, এ বিষয়ের অনুশীলন লোকহিতার্থে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৫। দণ্ডিতের সংশোধন।

সমাজ ও সভ্যতার আদিম অবস্থায় হিংসকের দণ্ড হিংসিতের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হইত।[১] পরে ঐ নিকৃষ্ট ইচ্ছা কমিয়া আইসে এবং দণ্ডবিধানের উচ্চতর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সেই উদ্দেশ্য—হিংসক ও তাঁহার পথানুগামী অপর ব্যক্তিকে দণ্ডের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারণ, স্থানবিশেষে হিংসিত ব্যক্তির যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ, এবং হিংসকের যথাসাধ্য সংশোধন। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য যদি সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে পারে তাহা হইলে হিংসক ও তাহার তুল্যপ্রকৃতির ব্যক্তি আপনা হইতেই দুষ্কর্ম্মে নিবৃত্ত হইবে, দণ্ডের ভয় দেখাইবার আর প্রয়োজন থাকিবে না। সুতরাং দণ্ডনীয় ব্যক্তির সংশোধনে একদা তাহার হিতসাধন, ও সমাজের অনিষ্টনিবারণ উভয় ফলই পাওয়া যায়। এই জন্য বলা যাইতেছে যদি কোনরূপ শিক্ষা বা চিকিৎসা দ্বারা দণ্ডনীয় ব্যক্তির, সংশোধন সম্ভবপর হয়, সেই শিক্ষা বা চিকিৎসা কিরূপ তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করা শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য।[২]

---

১ Salmond's *Jurisprudence* p. 82, Holmes' *Common Law*, *Lecture* II, Bentham's *Theory of Legislation*, Part II Ch. 16, *Deuteronomy* XIX 21 দ্রষ্টব্য।

২ Dr. Wines's *Punishment and Reformation* দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য

জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য।

কেহ বলেন জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব, কেহ বলেন তাহার উদ্দেশ্য আমাদের অবস্থার উন্নতিসাধন। প্রকৃতপক্ষে বোধ হয় এই দুইটিকেই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। জ্ঞানলাভের অর্থাৎ সকল বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার প্রবৃত্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এবং প্রবৃত্তিমাত্রেরই চরিতার্থতা আনন্দের কারণ, ও সেই আনন্দলাভের নিমিত্তই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা হয়। সুতরাং জ্ঞানলাভের একটি উদ্দেশ্য যে তজ্জনিত আনন্দলাভ তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার আমাদের অভাব ও অপূর্ণতা এত অধিক যে তাহা পূরণের নিমিত্ত আমরা নিরন্তর সচেষ্ট। এবং জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই অভাব ও অপূর্ণতার অধিকতর উপলব্ধি হয়, ও তাহা পূরণের উপায়ও সমধিক আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমাদের অবস্থার উন্নতিসাধন যে জ্ঞানলাভের আর একটি উদ্দেশ্য একথাও সুঙ্গত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি ও সর্ব্বপ্রকার সুখবৃদ্ধিই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য। এবং দুঃখ কি ও সুখ কি, এ প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, অভাব ও অপূর্ণতাই দুঃখ আর তাহার পূরণই সুখ। একথা "পরবশ সকল বিষয়ই দুঃখ, আত্মবশ সকল বিষয়ই সুখ" এই মনু[১]-বাক্যের বিরুদ্ধ নহে, কেননা অভাব ও অপূর্ণতাই আমাদের পরবশ হইবার কারণ, এবং পূর্ণতালাভ হইলেই আমরা আত্মবশ হইতে পারি।

দুঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধি।

জ্ঞানলাভের ফল।

জ্ঞানলাভদ্বারা যে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধি হয় তাহা এইরূপে ঘটে। প্রথমতঃ, জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহা জানিতাম না তাহা জানিলাম, এই বলিয়া যে অপূর্ব্ব আনন্দ হয় তাহা অল্প সুখের কারণ নহে। সেই সুখই বিশ্বনিয়ন্তার শুভকর নিয়মানুসারে বিদ্যার্থীর জ্ঞানার্জ্জননিমিত্ত শ্রমের বিশেষ লাঘব করে। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানদ্বারা আমাদের দুঃখের কারণ যে সকল অভাব ও অপূর্ণতা তাহা জানিতে এবং তাহা পূরণার্থে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি। অভাব ও অপূর্ণতাজনিত দুঃখানুভব জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলেই করে, কিন্তু সেই দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ ও তাহা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইলে উপযুক্ত জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, যেখানে দুঃখ অনিবার্য্য সে স্থলেও জ্ঞানদ্বারা দুঃখের সেই অনিবার্য্যতার

১। তজ্জনিত আনন্দ লাভ।

২। দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ ও নিবারণের উপায়উদ্ভাবন।

---

[১] মনু ৪।১৬০।

উপলব্ধি হইলে সে দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হউক অনেক লাঘব হয়। যে দুঃখ অনিবার্য্য বলিয়া জানা যায় তাহার নিবারণনিমিত্ত পূর্ব্বে বৃথা চেষ্টা, বা নিবারণের চেষ্টা হয় নাই বলিয়া পরে বৃথা অনুতাপ করিয়া ক্লেশ পাইতে হয় না। চতুর্থতঃ, প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে সংসার ও সাংসারিক সুখ-দুঃখ অনিত্য, এবং আত্মার উৎকর্ষসাধনই নিত্যসুখের একমাত্র মূল, এই দুইটি কথা হৃদয়ঙ্গম হইয়া ক্রমশঃ সকল দুঃখবিনাশ হয় এবং সর্ব্বাবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিবার অধিকার জন্মে।

৩। অনিবার্য্য দুঃখের জন্য বৃথা নিবারণ চেষ্টা ও অনুতাপ নিবৃত্তি।

৪। সাংসারিক সুখ দুঃখের অনিত্যতা বোধে শান্তি লাভ।

জ্ঞানলাভদ্বারা উপরি উক্ত চতুর্ব্বিধ ফলপ্রাপ্তির অনেক বাধা আছে, এবং তন্নিমিত্ত অনেক স্থলেই সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। সেই সকল বাধা ও তন্নিবন্ধন প্রকৃত ফললাভের ব্যাঘাত সম্বন্ধে এক্ষণে কএকটি কথা বলা যাইবে।

জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দলাভ হইবার কথা তৎসম্বন্ধে তিনটি প্রধান বাধা আছে,—১ শিক্ষাবিভ্রাট, ২ পরীক্ষাবিভ্রাট, ৩ উদ্দেশ্যবিপর্য্যয়।

জ্ঞানলাভজনিত আনন্দানুভবের বাধা, শিক্ষা-বিভ্রাট, পরীক্ষা-বিভ্রাট, উদ্দেশ্য-বিপর্য্যয়।

শিক্ষাবিভ্রাট নানাবিধ—যথা, শিক্ষার্থীর শিখিবার শক্তি ও অধিকারের অতিক্রান্ত শিক্ষা, শিক্ষকের শিখাইবার শক্তির অতিক্রান্ত শিক্ষা, শিক্ষার্থীর অনাবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা, অকারণ কঠোর প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা, ইত্যাদি। এ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেকগুলি কথা বলা হইয়াছে, এখন আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

পরীক্ষাবিভ্রাট প্রধানতঃ এই, পরীক্ষার্থী অধীত বিষয়ের কতদূর জানিতে পারিয়াছে তাহার পরীক্ষা না লইয়া সে তাহা কতদূর জানিতে পারে নাই তাহারই পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা, এবং পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে একপ্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ সৃষ্টি করা। পরীক্ষার্থী যেন প্রতি-পদে পরীক্ষককে প্রবঞ্চনা করিতে উদ্যত এইরূপ মনে করিয়া সরল প্রশ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক কূট প্রশ্ন করিতে গেলে, পরীক্ষার্থীও সরলভাবে জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত না হইয়া যাহাতে কূট প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ হয় কেবল সেই পন্থায় ফিরে।

এই দুই বিভ্রাটের ফল এই হয় যে জ্ঞানলাভ আনন্দজনক না হইয়া বরং কষ্টকর হইয়া উঠে।

উদ্দেশ্যবিপর্য্যয় জ্ঞানলাভজনিত আনন্দ অনুভবের একটি প্রধান বাধা। শিক্ষার্থী যদি নিষ্পাপচিত্তে নির্দ্দোষ ভাবে জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, তবেই তাহার জ্ঞান লাভে আনন্দ হইবে। তাহা না হইয়া যদি সে কোন কু-অভিসন্ধি সাধনার্থে কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে শঙ্কিতভাবে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়, এবং সে জ্ঞানলাভের সঙ্গে আনন্দের কোন সংস্রব থাকিতে পারে না। এরূপ স্থলে জ্ঞানার্জ্জন যে কেবল জ্ঞানার্থীর আনন্দদায়ক হয় না তাহা নহে, উহা সাধারণেরও গুরুতর অনিষ্টজনক হইতে পারে। সেই ভাবি অনিষ্ট নিবারণনিমিত্ত পূর্ব্বকালে শিক্ষকেরা অন্যের অনিষ্টসাধনে যে বিদ্যার প্রয়োগ হইতে পারে তাহা সৎপাত্রে ভিন্ন প্রদান করিতেন না। বর্ত্তমানকালে তাহা

সম্ভবপর নহে। এখন শিক্ষার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে। বিদ্যা এখন কেবল গুরুবক্ত্রগম্যা নহে, পুস্তকপাঠেও শিক্ষা করা যায়। এখন অনিষ্টসাধনে প্রযোজ্য বস্তুর ক্রয়বিক্রয় আইনও রাজশাসনদ্বারা সুশাসিত করা ভিন্ন উক্তরূপ অনিষ্টনিবারণের উপায়ান্তর নাই।

জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে আনন্দলাভের যে তিনটি বাধার কথা উপরে বলা হইল, তন্মধ্যে শেষোক্ত বাধা জ্ঞানকৃত পাপজনিত, এবং সেরূপ বাধা সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রকার শুভফলনাশক। অতএব তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তাহা সর্ব্বধর্ম্মবিরুদ্ধ ও সর্ব্বত্র ঘৃণিত। অপর যে দুইটি বাধার উল্লেখ হইয়াছে তাহা সেরূপ নহে। তাহা ভ্রান্তিমূলক, জ্ঞানকৃত পাপমূলক নহে। শিক্ষায় যে ফল হইবার নহে তাহা জটিল ও কঠিন নিয়ম দ্বারা ঘটাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা সেই ভ্রমের মূল। সে এক প্রকার বৃথাভিমান। এবং অন্যত্র যেমন, এস্থলেও তেমনই বৃথাভিমান অনেক অনিষ্টের মূল।

জ্ঞানলাভদ্বারা দুঃখের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াও তাহা নিবারণ নিমিত্ত চেষ্টায় বাধা, অসাধু-বৃত্তির উত্তেজনা।

জ্ঞানলাভদ্বারা যে সকল অভাব ও অপূর্ণতা আমাদের দুঃখের মূল তাহা জানিতে পারিয়াও তাহা পূরণের উপযুক্ত উপায় যে অনেক স্থলে অবলম্বন করা হয় না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায়, কখন বা ভ্রম, কখন বা অভিমান, কখন বা লোভ, কখন বা অন্য কোন অসাধু প্রবৃত্তির উত্তেজনা। এ বিষয়ের দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত মাদক সেবন।

প্রায় সকলেই জানেন ও স্বীকার করেন যে ঔষধার্থ ভিন্ন অন্য কোন কারণে মাদকদ্রব্য সেবন, অন্ততঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে নিতান্ত অনিষ্টকর। অর্থনাশ, স্বাস্থ্যনাশ, দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি প্রভৃতি নানাবিধ গুরুতর অনিষ্ট মাদকদ্রব্য সেবন হইতে ঘটে। কিন্তু সেই সকল অনিষ্ট নিবারণার্থে আমরা কি উপায় অবলম্বন করিতেছি? সত্য বটে স্থানে স্থানে সুরাপান-নিবারণী সভা আছে, এবং সেই সকল সভার সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে সুরাপানের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্ক করেন ও সুরাপাননিবারণের নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করণার্থে রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু প্রায় কোন সুসভ্য রাজ্যেই সুরাপান নিবারণার্থ কার্য্যকারক নিয়মপ্রণালী দেখা যায় না।

অনেকে মনে করেন সুরাপান নিবারণার্থ কঠোর রাজশাসন অবৈধ ও নিষ্ফল। তাঁহারা মনে করেন সুরাপান এত দোষের নহে যে রাজশাসন দ্বারা তাহা নিবারণ করা উচিত। তাঁহারা বলেন পান ও আহারের সম্বন্ধে লোকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ অন্যায়। তাঁহারা আরও বলেন, লোকের মাদক-দ্রব্যসেবনের প্রবৃত্তি এত প্রবল যে রাজশাসনদ্বারা তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা কোন মতেই সফল হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের মতে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করণের ও তাহার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর করস্থাপনদ্বারা তাহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ও তাহার উৎপাদন ও ব্যবহার অনুশাসিত করিয়া তাহার সেবন যতদূর নিবারণ করা যাইতে পারে, তাহার অধিক চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু এ সকল কথা সম্পূর্ণ অকাট্য বলিয়া বোধ হয় না।

যদি মাদকদ্রব্য সেবন গুরুতর দোষের না হয়, তবে তাহা রাজশাসনদ্বারা নিবারণের চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু মাদকদ্রব্য সেবনে যে সকল ঘোরতর অনিষ্ট ঘটে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা যে গুরুতর দোষের নহে একথা কোন মতেই বলা যায় না।

পান, আহার ও অন্য অনেক বিষয় সম্বন্ধেই লোকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ অন্যায়। কিন্তু কোনরূপ বলপ্রয়োগদ্বারা মাদকদ্রব্যসেবীর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ, নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে ভিন্ন অন্যত্র কেহই চাহে না ও অনুমোদন করে না। তবে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় কেবল করসংস্থাপনদ্বারা অনুশাসিত না হইয়া, বিষ প্রস্তুতকরণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় অধিকতর কঠিন নিয়মদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়, অন্ততঃ নিতান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। কেবল করসংস্থাপনে এক দিকে মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে মাদকদ্রব্য দরিদ্রের পক্ষে কিঞ্চিৎ দুষ্প্রাপ্য হয় বটে, কিন্তু ধনীর পক্ষে তাহাতে কোন ফলই হয় না। আর অন্যদিকে রাজকোষ পূরণার্থে অনেক রাজকর্ম্মচারী মাদকদ্রব্য সাধারণের সুলভ করিতে যত্নবান হইতে পারেন।

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপণ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। একের স্বাধীনতা যখন অন্যের অনিষ্টকর, তখন সে স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপণ সমাজের ও রাজার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। যদি বলা যায় মাদকদ্রব্যসেবী অন্যের অনিষ্ট করে না, কেবল নিজের অনিষ্ট করে, তাহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ মাদকদ্রব্যসেবী যে কেবল নিজের অনিষ্ট করে একথা ঠিক নহে। সে অন্ততঃ আপন পরিবার ও প্রতিবেশীর অনিষ্ট ও অশান্তির কারণ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং সে কেবল আপনার অনিষ্টকারী বলিয়া স্বীকার করিলেও যে তাহার কার্য্যে অন্যের হস্তক্ষেপণের অধিকার নাই একথা বলা যায় না। যদি আত্মঘাতীর স্বাধীনতা নিবারণ অন্যায় না হয়, তবে যে মাদকসেবী আপন স্বাস্থ্য ও জ্ঞান নাশে প্রবৃত্ত, তাহাকে সেই কার্য্য হইতে নিবারণ করিতে যে টুকু স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ হয় তাহা অন্যায় বলা যায় না।

মাদকদ্রব্য সেবন প্রবৃত্তি অতিপ্রবল, অতএব তাহা নিবারণের কঠিন নিয়ম নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা ; এই যে আপত্তি, ইহা অবশ্যই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। যে নিয়ম নিশ্চিতই লঙ্ঘিত হইবে, তাহার সংস্থাপন কেবল নিষ্ফল নহে, অনিষ্ট-জনক। কারণ যে দোষ নিবারণ করা উদ্দেশ্য তাহা ত রহিয়া গেল, অধিকন্তু নিয়মলঙ্ঘন জন্য আর একটি দোষের, এবং নিয়মলঙ্ঘন অপরাধের দণ্ড এড়াইবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনাদি নানাবিধ দোষের উৎপত্তি হয়।

সুতরাং লোকের অসাধু প্রবৃত্তি প্রথমে উপদেশদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধিত করিয়া তাহার পর কঠিন নিয়ম সংস্থাপনদ্বারা তাহার নিবারণচেষ্টা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু অপরদিকে আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যেখানে প্রবৃত্তি অতি প্রবল সেখানে কেবল উপদেশবাক্য অধিক ফলপ্রদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার দ্রব্য পাইতে বাধা হয় এরূপ নিয়মের সহায়তা

আবশ্যক। এবং সে নিয়ম একেবারে নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ প্রবল প্রবৃত্তি যেমন চরিতার্থতা লাভের নিমিত্ত লোককে উত্তেজিত করে, তেমনই আবার উপযোগী দ্রব্য অভাবে চরিতার্থতা লাভ না করিতে পারিলে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়। তবে উপরি উক্ত নিয়ম অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে স্থির করা আবশ্যক। যাহাতে তাহা সহজে লঙ্ঘন করিতে না পারা যায় এবং লঙ্ঘন করিলে যাহাতে সহজে ধৃত হইতে হয়, এইরূপ নিয়মের প্রয়োজন।

নূতন অভাব-সৃষ্টি সুখের কারণ নহে

জ্ঞানলাভদ্বারা আমাদের অভাব ও অপূর্ণতার পূরণ হইয়া যাহাতে প্রকৃত সুখবৃদ্ধি হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা না হইয়া অনেকস্থলে জ্ঞানলাভদ্বারা নূতন অভাব সৃষ্টি হয়। একটি সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথাটি স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন চাএর চাষ এ দেশের লোকে ভাল বুঝিত না, তখন চা ভারতবাসীদিগের মধ্যে অতি অল্প প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন চা এদেশে এত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে যে, কি ধনী, কি নির্ধন অনেকের প্রত্যহ চা পান না করিলে চলে না, অথচ চা অনেকের পক্ষে পুষ্টিকর না হইয়া বরং অপকারক।[১] এবং অনেকের অবস্থা এরূপ যে, চা পানে যে খরচ হয় তাহা প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ব্যয় কমাইয়া সংগ্রহ করিতে হয়। যখন চাএর চাষবাস আমরা জানিতাম না তখন চাএর অভাবও জানিতাম না। এখন চাএর চাষবাস জানিয়া আমরা চা পানের স্পৃহাজনিত একটি নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়াছি, এবং চা পানদ্বারা উৎপন্ন অসুস্থতা আমাদের অপূর্ণ দেহের অপূর্ণতা বৃদ্ধি করিতেছে। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শিক্ষিত সমাজে চা পানের অভ্যাস সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। অনেকে মনে করেন অভাব অল্প হওয়া সভ্যতার লক্ষণ বা সুখের কারণ নহে। মনুষ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অভাব বৃদ্ধি হয় ও তাহার পূরণে সুখ বৃদ্ধি হয়। একজন পাশ্চাত্ত্যকবি কহিয়াছেন—

"অল্পমাত্র সুখ তার অল্পাভাব যার।
অভাবে আকাঙ্ক্ষা, সুখ পূরণে তাহার॥"[২]

একথা সত্য বটে, জ্ঞানবৃদ্ধির এবং শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাববোধের ও তাহা পূরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আদিম অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য সজ্জিত বাসস্থান, সুস্বাদু খাদ্য, ও সুন্দর পরিচ্ছদের অভাব বোধ করে না, ও বোধ করিলেও তাহা পূরণে সমর্থ হয় না। কি শিশু, কি অসভ্য মনুষ্য, সকলেই অনুভব করিবার শক্তি অনুসারে যাহা সুখকর তাহা পাইবার ইচ্ছা করে, ও না পাইলে অভাব বোধ করে। তবে কোন্ দ্রব্য সুখকর তদ্বিষয়ের অনুভবশক্তি জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত ও

---

[১] Dr. Weber's *Means for the Prolongation of Life*, p. 51 দ্রষ্টব্য।

[২] Goldsmith's *Traveller*, Lines 211-214, দ্রষ্টব্য।

পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং সুখের ও সুখকর দ্রব্যের আদর্শও ক্রমশঃ উচচ হইতে উচচতর হইতে থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া ভোগলালসা বর্দ্ধন এবং প্রভূত ভোগ্য বস্তু প্রস্তুতকরণ ও ভোগকরণ যে সভ্যতার লক্ষণ ও সুখের কারণ, একথা স্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ, ইহা মনে রাখা উচিত যে, ভোগজনিত সুখ ক্ষণিক, এবং তদ্দ্বারা যে ভোগলালসা বৃদ্ধি হয় তাহাই আবার সেই সুখ নাশের কারণ হইয়া উঠে। মনু সত্যই কহিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" [১]

(ভোগেতে বাসনা পরিতৃপ্ত কভু নয়।
ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত বহ্নিসম বৃদ্ধি পায়॥)

দ্বিতীয়তঃ, নানাবিধ অভাব অনুভব করিবার, উত্তম উত্তম বস্তু উপভোগ করিবার, ও সেই সকল বস্তু প্রস্তুত করিবার, শক্তি থাকা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু সেই শক্তির নিরন্তর ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নহে। ভাল খাদ্যের অভাব অনুভব করিবার, এবং আস্বাদন দ্বারা মন্দ খাদ্য পরিত্যাগ করিবার ও খাদ্যের রসের সামান্য প্রভেদ পরীক্ষা করিবার শক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা বলিয়া ভাল দ্রব্য পান আহারে দিবারাত্র ব্যাপৃত থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভাল খাদ্য প্রস্তুত করিবার শক্তির নিরন্তর ব্যবহারে দোষ কি? তাহার উত্তর এই যে, রসনাতৃপ্তিকর দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্তুত করিতে গেলে লোকের লোভ বৃদ্ধি করা হয়, ধনীকে অতিভোজনের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, নির্ধনের প্রয়োজনীয় ভোজ্যদ্রব্যের অভাব ঘটান হয়। যদি কেহ বলেন সুখকর দ্রব্যভোগের বাসনা সমাজে না থাকিলে ভাল বস্তু প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কাহারও যত্ন হইবে না, এবং শিল্পাদি কলাবিদ্যারও উন্নতি হইবে না, সে কথার উত্তর এই যে, বাসনা একেবারে ত্যাগ করিতে কেহ বলিতেছে না, বলিলেও তাহা ঘটিবার নহে; তবে বাসনা সংযত হওয়া উচিত, এবং সংযত ভাব ধারণ করিলে ভোগবাসনা যে পরিমাণ থাকিবে তাহাই শিল্পাদি কলাবিদ্যার উন্নতি সাধনে যথেষ্ট উৎসাহ দিবে। আর একটি কথা আছে। লোকে নিজের ভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল না হইয়া ভক্তিভাজন ও স্নেহভাজন ব্যক্তিদিগের ভোগার্থে যদি উত্তম বস্তুর অন্বেষণ করে, তাহা হইলে উত্তম বস্তুর প্রতি অনুরাগপ্রদর্শন ও তাহা প্রস্তুতকরণের উৎসাহপ্রদান যথেষ্ট হয়, অথচ লোকে বিলাসী ও স্বার্থপর হইয়া পড়ে না। পূর্ব্বকালে হিন্দু সমাজে ও অন্যান্য অনেক শিক্ষিত সমাজে এই ভাবই প্রবল ছিল। তখন লোকে দেবমন্দির ও সাধারণের কার্য্যে নিয়োজিত অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে শোভিত ও সজ্জিত গৃহ নির্ম্মাণের ইচ্ছা তৃপ্ত করিয়া, নিজের বাসার্থ সামান্য অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গৃহই যথেষ্ট মনে করিত।

---

[১] মনু, ২।৯৪।

গুরুজন ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত বিবিধ তৃপ্তিকর ভক্ষ্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়া, নিজে সামান্য অথচ স্বাস্থ্যকর আহারে তৃপ্তি লাভ করিত। এবং বালক-বালিকাদিগকে সুন্দর পরিচ্ছদ পরাইয়া আপনারা সামান্য অথচ শুদ্ধ বস্ত্রাদি পরিধানে সন্তুষ্ট থাকিত। এবং এইরূপে লোকে যে অর্থ বাঁচাইতে পারিত, তাহা জলাশয় খনন, অতিথিশালা স্থাপন, ইত্যাদি নানাবিধ সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিত। সকলকেই বড় ও সজ্জিত বাটীতে থাকিতে হইবে, রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য খাইতে হইবে, ও সৌখীন বেশভূষা ধারণ করিতে হইবে, তাহা না হইলে সভ্যতার লক্ষণ কি হইল, একথা সমাজের হিতার্থীর ও জ্ঞানীর কথা নহে, স্বার্থ সাধন-তৎপর ব্যবসাদারের কথা।

তৃতীয়তঃ, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখের ও সুখকর বস্তুর আদর্শ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে, অন্ততঃ উচ্চ হওয়া উচিত, কিন্তু ভোগের ও ভোগ্যবস্তুর আধিক্য সেই উচ্চতার লক্ষণ নহে। উচ্চাদর্শের সুখ তাহাকেই বলা যায় যাহা ক্ষণিক বা অন্যের অনিষ্টকর নহে, এবং উচ্চাদর্শের ভোগ্যবস্তু তাহাকেই বলা যায় যাহা সেই উচ্চাদর্শের সুখের কারণ, ও যাহা আহরণ করিতে পর-প্রত্যাশী বা অন্যের অনিষ্টকারী হইতে হয় না। ইন্দ্রিয়সুখ সমস্তই ক্ষণিক, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ভোগ করা যায় ততক্ষণই সেই সুখ অনুভূত হয়, তাহার পর আর সে সুখ থাকে না, এবং সেই অতীত সুখের স্মৃতি সুখকর না হইয়া বরং দুঃখের কারণ হয়। কিন্তু সৎকর্ম্মানুষ্ঠানজনিত সুখ সেরূপ ক্ষণিক নহে, তাহার স্মৃতিও সুখপ্রদ। এতদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ভোগশক্তি সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখ কখনই উচ্চাদর্শের সুখ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়সুখের উপযোগী বস্তুও উচ্চাদর্শের ভোগ্যবস্তু নহে। তাহা পাইবার নিমিত্ত অন্যের প্রত্যাশী হইতে হয়। এবং পৃথিবী বিপুলা হইলেও ভাল ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ অসীম নহে, সুতরাং একজন অধিক পরিমাণ ভাল বস্তু ভোগ করিতে গেলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা প্রকারান্তরে অন্যের ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ সঙ্কীর্ণ করিতে ও সেই কারণে অন্যের অনিষ্টকারী হইতে হয়। এরূপ ভোগ্যবস্তু উচ্চাদর্শের ভোগ্যবস্তু হইতে পারে না।

জ্ঞানবৃদ্ধির ফল অশুভ নিবারণ কিন্তু কখন কখন তদ্বিপরীত ঘটে। কুগ্রন্থ প্রচার।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশুভ নিবারণ না হইয়া বরং কখন কখন তদ্বিপরীত ফল ফলে। তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত, কুরুচি-প্রণোদিত ও কুপ্রবৃত্তি-উত্তেজক সাহিত্যগ্রন্থের অপরিমিত প্রচার। যখন মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অল্প ছিল, তখন গ্রন্থের প্রচারও অল্প ছিল। সুতরাং মন্দ পুস্তক-পাঠ দ্বারা লোকের অনিষ্টের সম্ভাবনা অধিক ছিল না। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রদ্বারা গ্রন্থ প্রচারের সুবিধা হইয়াছে, এবং লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয় তাহা অনেকে পড়ে, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা নিরবচ্ছিন্ন সুখের বিষয় না হইয়া দুঃখের সহিত জড়িত রহিয়াছে। কারণ অনেক কুরুচি-প্রণোদিত ও কুপ্রবৃত্তি-উত্তেজক পুস্তক প্রণীত হইতেছে, এবং সহজে বোধগম্য ও আপাততঃ আনন্দপ্রদ বলিয়া সেই সকল পুস্তকই অধিক

পঠিত হইতেছে। স্পষ্ট অশ্লীলতাপূর্ণ পুস্তক রাজশাসনের অধীন, ও সভ্য সমাজে প্রকাশ্যে পঠিত হইতে পারে না। স্পষ্টকুষ্ঠরোগগ্রস্তের ন্যায় তাহা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যে সকল পুস্তকে অশ্লীলতা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে তাহা অলক্ষিত কুষ্ঠরোগীর ন্যায় পরিত্যক্ত না হইয়া সর্ব্বত্র মিশিতে পায়, ও অশেষ অনিষ্টের কারণ হয়।

উচ্ছৃঙ্খলতা ও সামাজিক রাজ-নৈতিক বিপ্লব।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশুভবৃদ্ধির আর একটি দৃষ্টান্ত, উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব।

জনসমাজে যতদিন জ্ঞানের চর্চ্চা অল্প থাকে, ততদিন সামাজিক ও রাজ-নৈতিক আন্দোলনও অল্পই থাকে, এবং বিশেষ গুরুতর কারণ উপস্থিত না হইলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে নিজ নিজ স্বার্থ, নিজ নিজ অধিকার, ও দেশের পক্ষে কি শুভ, কি অশুভ, এ সকল বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়, এবং নিজের ও দেশের মঙ্গলসাধন ও অমঙ্গল-নিবারণের উপায় চিন্তা করে। এ সমস্তই জ্ঞানলাভের সুফল সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অতি অনিষ্টকর কুফলও মিশ্রিত রহিয়াছে। অল্পবুদ্ধি বিচলিতচিত্ত উদ্ধত অবিবেচক কতকগুলি লোক মনে করে বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা কিছু অসুখকর আছে তাহা একেবারে সমাজ বা রাজতন্ত্র হইতে ছলে বলে যেন তেন প্রকারে অপসৃত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে যাহা তাহাদের অপরিপক্ক বিবেচনায় সুখকর তাহারই সংস্থাপনের চেষ্টা, সমাজসংস্কারকে ও স্বদেশানুরাগীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। তাহারা বুঝে না পুরাতনের সংস্কার ও নূতনের সৃষ্টিতে কত প্রভেদ। নূতন ভূমিতে নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ সহজ। পুরাতন অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়া, সেই ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া তদুপরি নূতন বাটী নির্ম্মাণ কিঞ্চিৎ অধিক শ্রম ও ব্যয়সাধ্য হইলেও কঠিন নহে। কিন্তু পুরাতন বাটী সমস্ত না ভাঙ্গিয়া কেবল তাহার ভগ্ন ও জীর্ণ ভাগের সংস্কার, এবং সেই বাটীতে তৎকালে বাস করিয়া সেই সংস্কার সম্পাদন করা, অতি কঠিন কার্য্য ও তাহা অতি সাবধানে করিতে হয়। পুরাতন সমাজ ও প্রচলিত রাজতন্ত্রের সংস্কারও সেইরূপ কঠিন কার্য্য, ও তাহাতে সেইরূপ সাবধানতার প্রয়োজন। সমাজ বা রাজতন্ত্র ভাল করিব বলিয়া একেবারে বলপ্রয়োগ দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে গেলে, যতদিন না নূতন সমাজ বা নূতন রাজতন্ত্র গঠিত হয় ততদিন সেই নূতন গঠনের অনিশ্চিত শুভফলের আশায়, স্বেচ্ছাচার ও অরাজকতাদি নিশ্চিত অশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। ইহা আরও দুঃখের বিষয় যে, এই শ্রেণির রাজনৈতিক সংস্কর্ত্তারা তাহাদের উদ্দেশ্য সাধু বলিয়া তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অসাধু উপায় অবলম্বনে বিরত হয় না। শুনা যায়, অনেক সুশিক্ষিত লোক ইয়ুরোপে গুপ্তবিপ্লবকারী-দিগের[১] দলভুক্ত, এবং তাহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে ভীষণ হত্যাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এবং ব্যথিতচিত্তে দেখিতে হইতেছে ধর্ম্মভীরু স্বভাবতঃ করুণহৃদয় হিন্দু ভদ্র-

---

[১] ইংরাজি Anarchist শব্দের প্রতিশব্দ।

সন্তানের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ অতি গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইতেছে। তাহারা বলে—অমঙ্গল একেবারে পরিত্যাগ করিতে গেলে মঙ্গলের আশাও ত্যাগ করিতে হয়। অশুভ হইতে শুভ উৎপত্তি ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যে প্রচণ্ড ঝটিকা বাস্তবৃক্ষ ভূমিসাৎ করে, তাহা দ্বারাই বায়ুরাশি পরিষ্কৃত হয়। যে ভীষণ প্লাবন বাসস্থান সহ জীব জন্তু ভাসাইয়া দেয়, তাহা দ্বারাই ভূপৃষ্ঠের মলিনতা ধৌত ও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়।—এ সকল কথা সত্য। এবং ইহাও সত্য, কোন বিপ্লব বিনাকারণে ঘটে না। দেশের অবস্থায় ও দেশের শিক্ষাপ্রণালীতে অবশ্যই এমত কোন দোষ থাকিবে যদ্দ্বারা বিপ্লবকারীরা বিপ্লবে উত্তেজিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া বিপ্লব ভাল, ইহা কখনই বলা যায় না। অন্ধ প্রকৃতির কার্য্যে ঝটিকাপ্লাবনাদি ঘটে। অজ্ঞান জনসাধারণের উত্তেজিত ও অসংযত প্রবৃত্তির প্ররোচনায় বিপ্লব ঘটে। এবং সেই সকল অশুভ হইতে শুভও ঘটে। কিন্তু সেইরূপে অশুভ হইতে শুভ ঘটাইবার জ্ঞানকৃত চেষ্টা কখনই অনুমোদন-যোগ্য নহে। জ্ঞানের কার্য্য অন্ধ শক্তিকে সুপথে চালিত করা। অজ্ঞান জীব কেবল প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কার্য্য করে। জ্ঞানবান্ জীব জ্ঞান দ্বারা প্রবৃত্তিকে শাসিত ও সংযত করিয়া কার্য্য করে। যাহারা জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করে এবং সমাজ ও শাসনপ্রণালীর সংস্কারক হইতে চাহে, তাহারা কখনই অন্ধপ্রকৃতির দোহাই দিয়া অশুভ হইতে শুভ আনিব বলিয়া, তাহাদের উদ্দেশ্য যত সাধু হউক না কেন, অসাধু উপায় অবলম্বন উচিত বলিতে পারে না। যদি কেহ বলেন অন্ধপ্রকৃতির পরিচালক অনন্ত জ্ঞানময় চৈতন্য, কিন্তু তথাপি প্রকৃতির কার্য্যে অশুভ হইতে শুভ ফল ঘটে, তাহার সহজ উত্তর এই—অনন্তজ্ঞান অভ্রান্ত, তদ্দ্বারা পরিচালিত প্রকৃতির অশুভকার্য্য হইতে আমাদের অল্প বুদ্ধির অজ্ঞাত কোন শুভফল নিশ্চিত ফলিবে, কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রান্ত অদূরদর্শী মনুষ্যের পক্ষে অনিশ্চিত শুভফলের আশায় নিশ্চিত অশুভকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কখনই উচিত হইতে পারে না। আমরা নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য দায়ী, কর্ম্মফল আমাদের আয়ত্ত নহে। সদুপায় দ্বারা শুভফল ঘটাইতে অক্ষম হইলে অসদুপায় দ্বারা তাহা পাইবার চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষান্ত থাকাই আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

জাতীয় বিবাদ—যুদ্ধ।

জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও সকল সময়ে পৃথিবীর দুঃখনিবারণ হয় না, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। কথাটি বড় কথা, অতএব তাহা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত-ভাবে বলিব।

ব্যক্তিগত নীতি অনুসারে পরস্ব অপহরণ ও পরপীড়ন দোষের, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। জাতীয় নীতিতেও যে একথা সত্য, ইহাও সকলে স্বীকার করেন। কিন্তু জাতিতে জাতিতে বিবাদ ঘটিলে যুদ্ধ অর্থাৎ পরস্পরের পীড়ন ও বিত্তাপহরণ এখনও সর্ব্বত্র অনুমোদিত রহিয়াছে। যুদ্ধের অনুকূলে অবশ্যই বলা যাইতে পারে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা বা রাজ-প্রতিনিধি তাহার মীমাংসা করিয়া দেন, কিন্তু জাতিতে জাতিতে বিবাদ উপস্থিত

হইলে তাহার মীমাংসক কোন রাজাই হইতে পারেন না। তাহার শেষ মীমাংসা যুদ্ধ। জাতিতে জাতিতে বিবাদস্থলে যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, অতএব যুদ্ধ ভালই হউক আর মন্দই হউক, সময়ে সময়ে তাহা অনিবার্য্য। সভ্য জাতিতে ও অসভ্য জাতিতে বিবাদস্থলে বোধ হয় একথা সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। তবে সেস্থলে যদি সভ্য বিবাদী কিঞ্চিৎ বিবেচনার সহিত চলেন তাহা হইলে যুদ্ধের ভীষণ ভাব অনেকটা প্রশমিত হইতে পারে। কারণ বর্ত্তমান সভ্য ও অসভ্য জাতিদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সভ্যে অসভ্যে যুদ্ধ সবলে ও দুর্ব্বলে সংগ্রাম, এবং সবল একটু সদয়ভাব ধারণ করিলে তাহা শীঘ্রই শেষ হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু সভ্য জাতিতে ও সভ্য জাতিতে বিবাদস্থলে যে যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই একথা স্বীকার করিতে মনে ব্যথা লাগে। কারণ একথা স্বীকার করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যাঁহারা সভ্য ও সুশিক্ষিত তাঁহারাও নিজের বিবাদস্থলে স্বার্থ বা অভিমান মোহে অন্ধ হইয়া ন্যায়পথ দেখিতে পান না। এরূপ স্থলে অন্ততঃ একপক্ষ মোহান্ধ না হইলে বিনা যুদ্ধে বিবাদনিষ্পত্তির কোন বাধা থাকা সম্ভাবনীয় নহে। দুইটি সভ্য জাতির পরিচালক তত্তৎশীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষগণের মধ্যে ন্যায়পথ স্থির করিবার উপযোগী বিদ্যা, বুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার অভাব থাকিতে পারে না, সুতরাং যদি তাঁহারা নিঃস্বার্থপরভাবে বিবাদ মীমাংসার নিমিত্ত যত্নবান্ হয়েন, ও নিজ নিজ দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের প্রয়োজন থাকে না। সময়ে সময়ে অবশ্য এরূপ ঘটিতে পারে যে, অতি সুক্ষ্ম-ভাবে দেখিতে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে কাহার কথা কতদূর ন্যায্য স্থির করা কঠিন। কিন্তু সে সকল স্থলে যুদ্ধের ভীষণ অনিষ্ট নিবারণার্থ উভয়পক্ষেরই কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকারপূর্ব্বক একটু স্থূল সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া কি বিচক্ষণের কার্য্য নহে ?

যুদ্ধে অনাস্থা ও যুদ্ধনিবারণে ব্যগ্রতা যে কেবল যুদ্ধে অনভ্যস্ত কোমল-স্বভাব বাঙ্গালীর গুণ বা দোষ এমত নহে। যুদ্ধে অভ্যস্ত দৃঢ়স্বভাব ইয়ুরোপীয়-দিগের মধ্যেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহাতেই কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয় যে পরিণামে এক দিন পৃথিবী হইতে এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের তিরোভাব হইবে। সুপ্রসিদ্ধ কৌণ্ঠটল্‌ষ্টোয় ও ষ্টেড্ সাহেব যুদ্ধ নিবারণার্থে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা একদেশদর্শী অসংযতচেতা আন্দোলনকারী বলিয়া যদি কেহ তাঁহাদের কথা উড়াইয়া দিতে চাহেন, বিখ্যাত নানাশাস্ত্রবিদ্ ধীরমতি অধ্যাপক হিওয়েলের কথা সেরূপে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। তিনি কোন বিবাদস্থলে বা কোন পক্ষসমর্থনার্থে সে কথা বলেন নাই, আপন উইলে অর্থাৎ চরমপত্রে ঐ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং কেবল কথা বলিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, কথানুসারে কার্য্যও করিয়াছেন। তিনি আপন উইলে লিখিয়াছেন তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে বার্ষিক ৫০০ পাউণ্ড (৭৫০০ টাকা) বেতন দিয়া কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক একজন জাতীয়বিধানের অধ্যাপক নিযুক্ত

হইবেন, এবং সেই অধ্যাপক জাতীয়ব্যবহারশাস্ত্র অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া "এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণে যত্নবান্ হইবেন, যদ্দ্বারা যুদ্ধের অমঙ্গলের হ্রাস হয় এবং পরিণামে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের তিরোভাব হয়।"[১]

যুদ্ধ সম্বন্ধে আর একটি দুঃখের কথা এই যে শত্রুর প্রতি ধর্ম্মযুদ্ধে যেরূপ বীরোচিত ব্যবহার প্রাচীন কালে বিধিবদ্ধ ছিল, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উৎকর্ষ বিধান না হইয়া বরং বোধ হয় কিঞ্চিৎ অপকর্ষ ঘটিয়াছে।[২] যুদ্ধে কপটতা এক্ষণে কাহার কাহার মতে নিষিদ্ধ নহে।[৩] বিজ্ঞান চর্চ্চাদ্বারা যে সকল ভীষণ সংহারশস্ত্র প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার যথা তথা প্রয়োগ হইতেছে। এতদিন ক্ষিতি ও সাগর রণস্থল ছিল। সম্প্রতি আকাশকেও রণক্ষেত্রে পরিণত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। এই উদ্যোগ সফল হইলে তাহার পরিণাম কি ভয়ানক হইবে তাহা কল্পনাতীত।

যুদ্ধের অনুকূলে কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, যুদ্ধ দ্বারাই অধিকাংশ পৃথিবী ক্ষমতাশালী ও সভ্য জাতির হস্তগত হইয়াছে, অসভ্য জাতি সভ্য জাতির বশীভূত হইয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে, এবং যেখানে কোন অসভ্য জাতিকে বশীভূত করা অসাধ্য বা অতিকঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেখানে হিংস্র জন্তুর ন্যায় তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ভূপৃষ্ঠে সভ্য জাতির আবাসভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে। পুরাবৃত্ত ইহার পূর্ণ সত্যতা সপ্রমাণ করে না। অনেকস্থলে যুদ্ধ সভ্যে অসভ্যে হয় নাই, সবলে ও দুর্ব্বলে ঘটিয়াছে। এবং তন্মধ্যে দুর্ব্বল সভ্য জাতি পরাস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত মতানুসারে জগতে জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, এবং এই নিয়মের ফলে যোগ্যতম জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া, অশুভকর জীবনসংগ্রাম হইতে জীবজগতের উন্নতিসাধন-রূপ শুভফল উৎপন্ন হইতেছে। একথাও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অজ্ঞান জীবজগতে ইহা সত্য বটে, কিন্তু সজ্ঞান জীবজগতে সংগ্রাম ও সখ্য, বিদ্বেষ ও প্রীতি, এই উভয়ের ক্রিয়া একত্র চলিতেছে। জীবের প্রথম অবস্থায় জ্ঞানোদয়ের প্রারম্ভে ক্ষুদ্র স্বার্থের প্ররোচনায় আত্মরক্ষার্থে জীবগণ পরস্পর বিদ্বেষভাবে সংগ্রামে নিযুক্ত থাকে, এবং যোগ্যতমেরই জয় হয়। কিন্তু ক্রমশঃ মানবজাতির পরিণত অবস্থায় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আমরা বুঝিতে পারি, কেবল নিজ নিজ স্বার্থের মুখ চাহিতে গেলে পরস্পরের বিরোধে কাহারও স্বার্থই সাধিত হয় না,

জীবন সংগ্রামকে জীবন সখ্যে পরিণত করা জ্ঞানলাভের একটি উদ্দেশ্য।

---

[১] *Cambridge University Calendar* for 1903-4, page 556 দ্রষ্টব্য।

[২] মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব ৯৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[৩] Wheaton's *International Law*, 3rd Eng. Ed., Pt. 4, Ch. II, এবং Sidgwick's *Politics*, p. 255 দ্রষ্টব্য।

এবং অসংযত স্বার্থের উত্তেজনা খর্ব্ব হইয়া সংগ্রামপ্রবৃত্তি প্রশমিত হয়, অপর দিকে তেমনই দেখিতে পাই অন্যের স্বার্থের প্রতি কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখিলে পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ স্বার্থ ও অনেকদূর সাধিত হয়, এবং সখ্যভাবের উদয় হয়। একদিকে যেমন নিতান্ত স্বার্থপরতার অপকারিতা বুঝিতে পারা যায়, অপরদিকে তেমনই সেই কথা বুঝিতে পারার ফলে আমাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার এরূপ হইয়া আসে যে নিতান্ত স্বার্থপরতার প্রয়োজন কমিয়া যায়।

স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়।

এই কথাই আর একভাবে দেখা যাইতে পারে। যেমন আমরা স্বার্থপরতা-বৃত্তিদ্বারা নিজের হিতসাধনে উত্তেজিত তেমনি আবার আমরা দয়াদাক্ষিণ্য-উপচিকীর্ষাদি বৃত্তি দ্বারা পরের হিতসাধনেও উৎসাহিত। এবং যিনি যতদূর পরহিতে রত, তিনি ততদূর পরের সাহায্য প্রাপ্ত হন, ও নিজ স্বার্থসাধনে নির্ব্বিঘ্নে বিরত থাকিতে পারেন।

একদিকে মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের অপূর্ণ অবস্থায় পূর্ণ নিঃস্বার্থ-পরতা যেমন সম্ভবপর নহে, তেমনই শুভকরও নহে। আমাদের বর্ত্তমান দেহাবচ্ছিন্ন অপূর্ণ অবস্থায় কতকগুলি স্বার্থ বিসর্জন করা অসাধ্য, এবং সেই স্বার্থসাধন-নিমিত্ত আমরা নিজে যত্নবান্ না হইলে সমাজ এত উন্নত হয় নাই যে অন্যে তন্নিমিত্ত যত্নবান্ হইবে। পক্ষান্তরে, আমরা নিতান্ত স্বার্থপর হইতে গেলে অন্যের স্বার্থের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া নিজ স্বার্থসাধন অসাধ্য হইয়া পড়িবে। কতদূর নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিলে ও পরের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সাধ্যমত উচ্চমাত্রায় স্বার্থলাভ হইতে পারে, প্রকৃত নিজহিতার্থীকে এই সমস্যা নিরন্তর পূরণ করিয়া চলিতে হইবে। এরূপ স্থলে পূর্ব্বকথিত গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের কথা স্মরণ রাখিয়া চলা আবশ্যক।

প্রকৃত স্বার্থ পরার্থের বিরুদ্ধ নহে।

আমাদের প্রকৃত স্বার্থ অন্যের প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধ নহে। যাহা কিছু বিরোধ আছে তাহা আমাদের অপূর্ণতা ও দেহাবচ্ছিন্নতা-নিবন্ধন। যে ব্যক্তি ও যে জাতি স্বার্থের ও পরার্থের এই বিরোধ মীমাংসা করিয়া জীবন-সংগ্রামের ও জীবের সখ্যভাবের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারে, এবং পরার্থ একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থলাভের দুরাকাঙ্ক্ষা কেবল অসাধু-নহে, তাহা জগতের নিয়মানুসারে অপূরণীয়, এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করিতে পারে, সেই জাতি বা ব্যক্তিই যথার্থ যোগ্যতম, এবং তাহারই জয়লাভ হয়। লোকে শুনুক বা না শুনুক, প্রকৃতজ্ঞান স্পষ্ট করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিরন্তর এই কথা বলিতেছে। ব্রহ্ম উপলব্ধি দ্বারা জ্ঞানলাভের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক আর না হউক, সাংসারিক সুখের অনিত্যতাবোধ ও আত্মোৎকর্ষ সাধনে আনন্দ, জ্ঞানার্জ্জনের এই দুই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হউক আর না হউক, এসকল উচ্চ কথা ছাড়িয়া দিয়া, অন্ততঃ উপরি উক্ত স্বার্থ ও পরার্থের সামান্য জমা খরচ বুঝিয়া চলিতে শিখিলে, ভবের হাটে আসিয়া লাভ না হইলেও নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিতে হয় না।

জ্ঞান ইহলোক ও পরলোক উভয়দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলে। ইহলোকের ভিতর দিয়াই পরলোকের পথ।

যাঁহারা পরকাল মানেন তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য জগতের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ও ব্রহ্ম উপলব্ধি। সেই চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে সর্ব্বদা ঠিক পথে চলা যায়। আর সেই চরম লক্ষ্য বিস্মৃত হইলে সংসারযাত্রায় মধ্যে মধ্যে পথ হারাইতে হয়। অনেকে মনে করেন সেই চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা জীবনের শেষ অবস্থায় বিধি, প্রথম অবস্থায় এই কর্ম্মক্ষেত্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্মী হওয়াই আবশ্যক। তাঁহারা বলেন এই চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে গিয়া এদেশের লোক অকর্ম্মণ্য হইয়াছে এবং অতি হীন অবস্থায় পড়িয়াছে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে এ আপত্তি সঙ্গত নহে। দূরস্থ চরম লক্ষ্য মনে রাখিতে হইলে যে নিকটস্থ বর্ত্তমান লক্ষ্য ভুলিতে হইবে একথা কেহ বলে না। সত্য বটে অল্পবুদ্ধি মানব একদিক্ দেখিতে গেলে অন্যদিক্ ভুলিয়া যায়, কিন্তু সেই জন্যই চরম লক্ষ্য মনে রাখিতে বলা আবশ্যক, কারণ নিকটের লক্ষ্য সহজেই মনে থাকিবে। তবে একাগ্রতার সহিত কেবল সেই চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাওয়া বিধিসিদ্ধ নহে। যদিও পরলোক ও মুক্তিলাভের সঙ্গে তুলনায় ইহলোক ও বৈষয়িক ব্যাপার অতি তুচ্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছবিষয়ে সাধনার পর সেই উচ্চবিষয়ে অধিকার জন্মে। ইহলোকের ভিতর দিয়াই পরলোকে যাইবার পথ। এবং বৈষয়িক ব্যাপারে কর্ত্তব্যপালনের অভ্যাসই মুক্তিলাভের উপায়। ইহা বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম। ইহাই আর্য্যঋষিদিগের এক আশ্রমের পর আশ্রমান্তর গ্রহণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা। এই নিয়ম লঙ্ঘন করায়, ও নিম্নস্তরের শিক্ষার পূর্ব্বেই উচ্চস্তরের শিক্ষার যোগ্য মনে করায়, এবং বিজ্ঞান চর্চ্চা অবহেলাপূর্ব্বক দর্শনালোচনায় নিবিষ্ট থাকায়, আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। অতীতের এই শিক্ষা মনে রাখিয়া, যে সকল ভ্রম হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া চলা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু তথাপি বলিতেছি, এই ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়া যেন আর একটি গুরুতর ভ্রমে পতিত না হই, এবং সেই চরম লক্ষ্য যেন না ভুলি। যাঁহারা সেই চরম লক্ষ্য ভুলিয়া ইহলোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জীবনের পরম লক্ষ্য মনে করেন, তাঁহারা সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের অসীম ভোগলালসাজনিত অশান্তি ও তাঁহাদের অসংযত স্বার্থপরতানিবন্ধন নিরন্তর কলহ ও পরস্পরের ভীষণ অনিষ্ট চেষ্টার প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে তাঁহাদিগকে কখনই সুখী বলা যায় না।

দ্বিতীয় ভাগ

কর্ম্ম

উপক্রমণিকা

জ্ঞান ও কর্ম্ম অসম্বন্ধ নহে—একের কথায় অন্যের কথা আইসে।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে জ্ঞানসম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় ভাগে কর্ম্মবিষয়ক কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জ্ঞান ও কর্ম্ম অসম্বদ্ধ নহে ইহারা পরস্পরাপেক্ষী। একের কথা (যথা জ্ঞানবিভাগে জ্ঞাতার কথা) বলিতে গেলে অপরটির কথা (যথা কর্ম্মবিভাগে কর্ত্তার কথা) অনেক স্থলে প্রকারান্তরে আসিয়া পড়ে, ও সেই সঙ্গে না বলিলে সে কথাটি অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট থাকে। এই কারণে প্রথম ভাগে জ্ঞানসম্বন্ধীয় আলোচনায় দ্বিতীয় ভাগে বলিবার কথা স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা পুনরায় এই ভাগে যথা স্থানে না বলিলেও চলিবে না, কারণ তাহা না বলিলে সেই স্থানের কথাগুলি অস্পষ্ট থাকিবে। এই জন্য এই দ্বিতীয় ভাগে যে কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি ঘটিবে, পাঠক সে দোষ মার্জনা করিবেন।

এই ভাগে আলোচ্য বিষয়।

কর্ম্মশব্দ জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অর্থাৎ মানবের কার্য্য এই অর্থে গৃহীত হইবে। কর্ত্তা ভিন্ন কর্ম্ম হয় না, সুতরাং কর্ম্মের আলোচনায় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তার কথা উঠে। আর কর্ত্তার কথা উঠিলে, তাঁহার স্বাতন্ত্র্য আছে, কি অবস্থাদ্বারা তিনি যেরূপে চালিত হয়েন সেইরূপে কার্য্য করিতে বাধ্য?—এই প্রশ্ন উঠে। এবং প্রাসঙ্গিক ভাবে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ?—এ প্রশ্নও উঠে। উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের আলোচনার পরেই, কর্ম্মের প্রধান ভাগের অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্যের লক্ষণ কি?—ও সঙ্গে সঙ্গে, কর্ত্তব্যতার লক্ষণ কি?—এই দুইটি প্রশ্ন উঠে। তদনন্তর কএকটি বিশেষবিধ কর্ম্মের আলোচনা বাঞ্ছনীয়। সেগুলি এই—পারিবারিক-নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, সামাজিকনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, এবং ধর্ম্মনীতি-সিদ্ধ কর্ম্ম। এবং সর্ব্বশেষে,—কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি?—এই প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া আবশ্যক। অতএব (১) কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ, (২) কর্ত্তব্যতার লক্ষণ, (৩) পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, (৪) সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, (৫) রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, (৬) ধর্ম্ম-নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম, (৭) কর্ম্মের উদ্দেশ্য, এই সাতটি বিষয় যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে এই দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হইবে।

প্রথম অধ্যায়

কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না—কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ

কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না, এই প্রশ্ন অনাবশ্যক নহে।

কর্ম্মের আলোচনায় সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তার কথা উঠে, কারণ কর্ত্তা ভিন্ন কর্ম্ম হয় না। এবং কর্ত্তার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে—কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না ?—এই প্রশ্ন প্রথমেই উঠে। এই প্রশ্ন অনাবশ্যক নহে, কেননা কর্ত্তার ও তাঁহার কর্ম্মের দোষগুণ নিরূপণ, ও কর্ত্তার সৎকর্ম্ম শিক্ষার ও ভাবী উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ, এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করে। যদি কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা থাকে, তবে তাঁহার কর্ম্মের জন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী, ও তাঁহার দোষগুণ তাঁহার কর্ম্মের দোষগুণের দ্বারা নিরূপিত হইবে। এবং তাঁহার সৎকর্ম্ম শিক্ষার ও ভাবী উন্নতির নিমিত্ত তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা যাহাতে সংযত ও শুভকর হয় সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আর যদি তাঁহার স্বতন্ত্রতা না থাকে, এবং তিনি অবস্থাদ্বারা সম্পূর্ণরূপে চালিত হন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্মের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা যায় না, ও তাঁহার দোষগুণ তাঁহার কর্ম্মের দোষগুণের দ্বারা নিরূপিত হইবে না। এবং তাঁহার সৎকর্ম্মশিক্ষার ও ভাবী উন্নতির নিমিত্ত, যে অবস্থার দ্বারা তিনি চালিত হন তাহারই এরূপ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে তিনি সুপথে চালিত হইতে পারেন।

কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না—এই প্রশ্ন, কর্ম্ম ও কর্ত্তার পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ, এই প্রশ্নের সহিত জড়িত, এবং শেষোক্ত প্রশ্ন, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ, এই সাধারণ প্রশ্নের একটি বিশেষ অংশ। অতএব প্রথমে এই সাধারণ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। ন্যায়দর্শন-প্রণেতা গৌতম ও বৈশেষিকদর্শনপ্রণেতা কণাদ উভয়েরই মতে কার্য্য ও কারণ পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং এই মতে যদিও কারণগুলি পূর্ব্ব হইতে আছে, কার্য্য পূর্ব্বে ছিল না, অর্থাৎ কার্য্য অসৎ। সাংখ্যদর্শনের মতে কার্য্য কারণের রূপান্তরমাত্র, সুতরাং এই মতে কার্য্য পূর্ব্ব হইতে কারণে অব্যক্ত ভাবে ছিল, অর্থাৎ কার্য্য সৎ। এ সকল মতামতের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।[১] এ স্থলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখন কোন কার্য্যের সমস্ত কারণের

---

১ এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রণীত 'মায়াবাদ' দ্রষ্টব্য।

মিলন হইলেই সেই কার্য্য অবশ্যই হইবে, তখন কার্য্য তাহার কারণ-সমষ্টির রূপান্তর বা ভাবান্তর মাত্র, এবং সেই কারণ-সমষ্টিতে অব্যক্তভাবে ছিল, তাহা না হইলে কোথা হইতে আসিল। কোন কার্য্য আপনা হইতে হইল, কোন বস্তু আপনা হইতে আসিল, ইহা আমরা মুখে বলিতে পারি বটে, কিন্তু সে বৃথা শব্দ প্রয়োগমাত্র, তাহা কিরূপে ঘটিবে তাহা মনে অনুমান বা কল্পনা করিতে পারি না। আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, সে কারণ আবার তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন কারণের কার্য্য, সুতরাং সে কারণেরও কারণ আছে, আবার তাহারও কারণ আছে, এই রূপে পরম্পরাক্রমে কারণশ্রেণি অন্তর্গত হইয়া পড়ে। এইত গেল একটি কার্য্যের কথা। কিন্তু জগতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে অসংখ্য কার্য্য চলিতেছে। অতএব এরূপ অনন্ত কারণশ্রেণির সংখ্যাও অসীম হইয়া পড়িবে, যদি সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন কারণশ্রেণি মিলিত হইয়া তাহাদের আদিতে এক বা একাধিক কিন্তু অল্পসংখ্যক মূল কারণে অবসান প্রাপ্ত না হয়। সাধারণ লোকের সামান্য যুক্তি, ও প্রায় সর্ব্বদেশের মনীষিগণের চিন্তার উক্তি, এই কারণবাহুল্য পরিহারপূর্ব্বক জগতের আদিকারণ এক অথবা দুইমাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে। অদ্বৈতবাদীর মতে সেই আদিকারণ এক ও তাহা ব্রহ্ম অথবা জড়, এবং দ্বৈতবাদীর মতে সেই আদিকারণ দুই, পুরুষ ও প্রকৃতি বা চৈতন্য ও জড়। চৈতন্য ও জড়ের আপাতপার্থক্য দৃষ্টে দ্বৈতবাদীরা বলেন চৈতন্য ও জড় উভয়ই অনাদি, এবং এই দুইটি জগতের আদিকারণ। জড়বাদীরা বলেন জড় হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি। ইহারা এক প্রকার অদ্বৈতবাদী। এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীরা বলেন জগতের আদি কারণ এক ব্রহ্ম। জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং চৈতন্য হইতে জড়ের সৃষ্টি যুক্তিসিদ্ধ, একথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা এই পুস্তকের প্রথম ভাগে[১] বর্ণিত হইয়াছে, এখানে আর সে সকল কথা পুনরায় বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটি কথা এখানে তৎসম্বন্ধে বলা যাইবে। মায়াবাদীর

'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপর'

'ব্রহ্মসত্য, জগৎমিথ্যা, জীবব্রহ্ম ভিন্ন নয়।'

এই কথা বলিবার হেতু বোধ হয় এই যে, জগতের আদিকারণ ব্রহ্ম নিরাকার-নির্ব্বিকার; কিন্তু জগৎ সাকার-সবিকার, অতএব জগৎ সত্য হইতে পারে না, আমাদের ভ্রমবশতঃ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কেননা নিরাকার-নির্ব্বিকার হইতে সাকার-সবিকার আসিতে পারে না। একথার মূলে এই কথা রহিয়াছে যে, কারণ যেরূপ তাহার কার্য্যও সেইরূপ। কিন্তু এই শেষোক্ত কথা কিয়দ্দুর মাত্র সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রথমতঃ কারণের সহিত কার্য্যের কতকটা সাম্য থাকিতে পারে, কিন্তু কার্য্য যখন কারণের রূপান্তর বা ভাবান্তর, তখন

---

[১] প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সে সাম্য সম্পূর্ণ সাম্য হইতে পারে না, তাহার সহিত অবশ্যই কিছু বৈষম্যও থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ এইকথা বলিতে গেলে জগতের আদিকারণের অসীম শক্তির উপর সীমা আরোপ করা হয়। সত্য বটে জ্ঞানের কএকটি অলঙ্ঘ্য নিয়ম (যথা, কোন বস্তু একস্থানে একই কালে থাকিতে ও না থাকিতে পারে না) অনন্তশক্তিও যে অতিক্রম করিতে পারেন ইহা অনুমান করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে সেরূপ কোন নিয়মের অতিক্রম হইতেছে না। যদি কেহ বলেন নিরাকার ও সাকার, বা নির্ব্বিকার ও সবিকার ভাব এরূপ বিরুদ্ধগুণ যে তাহারা একাধারে (অথবা তত্তুল্যক্ষেত্রে অর্থাৎ একটি গুণ কারণে ও অপরটি তাহার কার্য্যে) থাকিতে পারে না, তাহার উত্তর এই যে, যদিও একই বস্তু একদা নিরাকার ও সাকার, বা নির্ব্বিকার ও সবিকার হইতে পারে না, কিন্তু ব্রহ্ম ও জগৎ সেরূপ একই বস্তু নহে। ব্রহ্ম অনন্ত, জগৎ (অর্থাৎ জগতের যে টুকু আমাদের নিকটে প্রতীয়মান) অন্তবিশিষ্ট। ব্রহ্ম অখণ্ড, প্রতীয়মান জগৎ খণ্ড মাত্র। অতএব আদিকারণ ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্ব্বিকার হইলেও তাঁহার আংশিক কার্য্য অর্থাৎ প্রতীয়মান জগৎ যে সাকার ও সবিকার হইতে পারে ইহা এতদূর যুক্তিবিরুদ্ধ নহে যে, জগৎকে একেবারে মিথ্যা, ও জগৎবিষয়ক জ্ঞানকে একেবারে ভ্রম বলিতে হইবে। জগৎকে আমরা অপূর্ণজ্ঞানে যেরূপ দেখি তাহা জগতের ঠিক স্বরূপ না হইতে পারে, এবং আমাদের জগৎবিষয়ক জ্ঞান পূর্ণজ্ঞান নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া জগৎ একেবারে মিথ্যা, ও আমাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান একেবারে ভ্রম, এ কথা বলা যায় না। দৃশ্যমান জগৎ পরিবর্ত্তনশীল ও সেই জগতের সুখদুঃখ অস্থায়ী, এবং একথা ভুলিয়া জগতের বস্তু ও তজ্জনিত সুখদুঃখ স্থায়ী মনে করা ভ্রান্তি, এই অর্থে জগৎ মিথ্যা ও আমাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান ভ্রম বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেকথা একপ্রকার অলঙ্কারের উৎপ্রেক্ষামাত্র।

সংক্ষেপে বলিতে হইলে কার্য্যকারণসম্বন্ধের মূল তত্ত্ব এই—

১। কোন কার্য্যই বিনাকারণে হইতে পারে না।

২। কার্য্য মাত্রই তাহার কারণের অর্থাৎ কারণসমষ্টির মিলনের ফল, ও সেই সকল কারণের রূপান্তর বা ভাবান্তর। এবং সেই মিলনের পূর্ব্বে তাহা কারণ-সমষ্টিতে অব্যক্ত ভাবে নিহিত।

৩। সকল কারণের আদি কারণ এক অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম। ব্রহ্মই নিজের সত্তার কারণ, এবং সকল কার্য্যই মূলে সেই ব্রহ্মের শক্তি বা ইচ্ছা-প্রণোদিত।

এই কথার উপর একটি কঠিন প্রশ্ন উঠিতে পারে। সকল কার্য্যের আদিকারণ যদি এক অনাদি কারণ, এবং কার্য্য যদি কারণ-সমষ্টির মিলনের ফল ও তাহার রূপান্তর বা ভাবান্তর মাত্র, তবে সেই মিলন নিত্য নূতন নূতনরূপে কেন হয় ও কে ঘটায়, এবং কারণ-সমষ্টির সেই রূপান্তর বা ভাবান্তরই বা কিরূপে হয়? অর্থাৎ সেই আদি কারণ একবার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কেন ক্ষান্ত থাকে না,

এবং কারণই বা কিরূপে কার্য্য সম্পন্ন করে? এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া আমাদের অপূর্ণজ্ঞানের ক্ষমতাতীত। অথচ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, আর যত কাল ইহার উত্তর না পাইব তত কাল জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি হইবে না। অতএব এই অনুমান অসঙ্গত নহে যে, যে অপূর্ণ জ্ঞান এ প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারে না তাহা পূর্ণজ্ঞানেরই আপাততঃ বিচ্ছিন্ন অংশ, এবং সেই পূর্ণ জ্ঞানের সহিত পুনর্মিলন হইলেই আমাদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি ও পূর্ণানন্দলাভ হইবে।

উপরের প্রশ্নটির প্রথমভাগ জিজ্ঞাসা করিতেছে, আদি কারণ একবার কার্য্য করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া কেন নিরন্তর নূতন নূতন কার্য্য করিতেছে, ও নূতন কার্য্যের নিমিত্ত কারণসমূহের নিত্য নূতন মিলন কে ঘটায়? ইহার উত্তরে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে, কার্য্যকারণপরম্পরার এই অস্থির ও নিত্য নূতন ভাব সেই আদিকারণের শক্তির ও ইচ্ছার ফল। এই বিরাট বিশ্বের প্রত্যেক অণুতে সেই শক্তি নিহিত আছে, ও তাহার বলে নিরন্তর ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে সে গতিশীল রহিয়াছে। আদিকারণের শক্তির বা ইচ্ছার ফল তাহার বিকার বলা যায় না, তাহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যই বলিতে হইবে।

প্রশ্নটির দ্বিতীয় ভাগের প্রকৃত উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। আমাদের স্থূল দৃষ্টি কার্য্যের বা কারণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং কারণ হইতে কার্য্য কিরূপে ঘটে তাহা আমরা জানিতে পারি না। তবে কোন্ কার্য্যের নিমিত্ত কোন্ কোন্ কারণের কি ভাবে মিলন আবশ্যক, ও কি উপায়ে কারণ-সমষ্টির সেইরূপ মিলন ঘটে—এবং কি নিয়মে (অর্থাৎ যেখানে কার্য্য ও কারণ পরিমেয় সেখানে) কি পরিমাণ কারণ কি পরিমাণ কার্য্যে পরিণত হয়, এই সকল বিষয় যত্ন করিলে আমরা জানিতে পারি।

কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না?

এক্ষণে—কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না?—কর্ম্মক্ষেত্রের এই প্রধান প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

অস্বতন্ত্রতাবাদের অনুকূল যুক্তি।

একটা সামান্য কথা আছে—'কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম'। বিদ্রূপচ্ছলেই ইহার প্রয়োগ হয়, কিন্তু এই পরিহাসসূচক কথায় কিঞ্চিৎ সত্যও আছে। কর্ত্তার ইচ্ছাই কর্ম্মের সাক্ষাৎসম্বন্ধীয় ও সন্নিহিত কারণ। কিন্তু সেই ইচ্ছা স্বতন্ত্র কি অন্যকারণপরতন্ত্র একথার সিদ্ধান্ত না হইলে কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না বলা যায় না। আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র কি না এ বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত আপনার অন্তরেই অগ্রে অনুসন্ধান করিতে হয়, আত্মাকেই অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। আত্মার অবিবেচিত উত্তর স্বতন্ত্রতার অনুকূল হইবে। আত্মা অনায়াসেই বলিবে, আমার ইচ্ছা স্বতঃপ্রবৃত্ত, এবং যদিও যাহা করিতে ইচ্ছা করি সকল স্থলে তাহা করিতে পারি না, কিন্তু যাহা না করিতে ইচ্ছা তাহা করিতে কেহই বাধ্য করিতে পারে না। কিন্তু আত্মার এই সাক্ষ্যবাক্য স্বীকার করিয়া লওয়ার পূর্ব্বে সাক্ষীকে একটি কূট প্রশ্ন করা আবশ্যক—আমি কোন কর্ম্ম করিতে কিংবা না করিতে যে ইচ্ছা করি, সে ইচ্ছা কি আমার ইচ্ছাধীন, না আমার পূর্ব্বস্বভাব, পূর্ব্ব শিক্ষা,

ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার ফল? অর্থাৎ আমার ইচ্ছাই কি আমার ইচ্ছার কারণ, না তাহা অন্য কারণের কার্য্য?—একটু ভাবিয়া উত্তর দিলে আত্মাকে অবশ্যই বলিতে হইবে, আমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছাধীন নহে, তাহা নানা কারণের কার্য্য। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা আরও স্পষ্ট হইবে। আমি এখন এখান হইতে উঠিয়া যাইব কি না এ বিষয়ে আমার ইচ্ছা কি, এবং কেনই বা তাহা ঐরূপ হয়?—ভাবিতে গেলে দেখিতে পাইব, আমার বর্ত্তমান কর্ম্ম ও যে কর্ম্মানুরোধে উঠিবার কথা মনে হইল এতদুভয়ের প্রয়োজনীয়তার ও হৃদয়গ্রাহিতার তারতম্য, আমার এই মুহূর্ত্তের দেহের অবস্থা ও তদনুসারে স্থিতি কি গতির প্রতি অনুরাগের ন্যূনাধিক্য, এবং দূরসম্বন্ধে আমার পূর্ব্বস্বভাব ও পূর্ব্বশিক্ষা যদ্দ্বারা আমার হৃদয়ের বর্ত্তমান অবস্থা অর্থাৎ কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তার ও হৃদয়গ্রাহিতার তারতম্যবোধের শক্তি ও গতি বা স্থিতির দিকে প্রবৃত্তির ন্যূনাধিক্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই সমস্ত কারণদ্বারা আমার ইচ্ছা নিরূপিত হয়। আমার ইচ্ছা সেই সমস্ত কারণের কার্য্য। পূর্ব্বে কার্য্যকারণসম্বন্ধের যে মূল তত্ত্বত্রয়ের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার প্রথম তত্ত্ব অনুসারেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। আমার ইচ্ছা বিনাকারণে আপনা হইতে হইল একথা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি।

কর্ত্তার সম্বন্ধে স্বতন্ত্রতাবাদীরা ইহার বিরুদ্ধে এই কথা বলেন যে, আত্মা যখন জিজ্ঞাসামাত্রই উত্তর দেয়, আমার ইচ্ছা স্বাধীন, তখন আত্মার সেই সাক্ষ্যবাক্যই গ্রহণযোগ্য, এবং তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া যে বলে আমার ইচ্ছা নানা কারণাধীন, সে কথা গড়াপেটা সাক্ষীর কথার ন্যায় অগ্রাহ্য। আর কার্য্যকারণসম্বন্ধবিষয়ক যে তত্ত্বের উল্লেখ হইয়াছে তদনুসারে, যেমন বিনা কারণে কার্য্য হয় না একথা স্বীকার করিতে হয়, তেমনই আবার সকল কারণের আদি কারণ অপর কোন কারণের কার্য্য নহে, একথাও স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং সেইরূপে মনুষ্যের ইচ্ছা অন্য কার্য্যের কারণ, কিন্তু নিজে কোন কারণের কার্য্য নহে একথা বলা যায়।

তাহার খণ্ডন।

এই সকল তর্ক যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। আত্মার প্রথম উত্তর অবিবেচনার ও অহঙ্কারের ফল। দ্বিতীয় উত্তর বিবেচনার ও প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা লব্ধ, ও তাহাই প্রকৃত উত্তর। এই স্থলে

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।"[১]

"প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম্ম চলে।
অহঙ্কারে মুগ্ধ আত্মা 'আমি কর্ত্তা' বলে॥"

এই অমূল্য গীতাবাক্য স্মরণীয়। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে আত্মার প্রথম উত্তর সকল সময়ে ঠিক হয় না। একটি সামান্য উদাহরণ

[১] গীতা ৩।২৭।

দিব। চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদি আত্মাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কি দেখিলাম?—আত্মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, 'চন্দ্র দেখিলাম'। কিন্তু সকলেই জানেন আমরা চন্দ্র দেখি না, চন্দ্রের যে প্রতিবিম্ব চক্ষুতে পড়ে তাহাই মাত্র দেখি, এবং চক্ষুর কোন দোষ থাকিলে চন্দ্রকে তদনুসারে বিকৃত দেখায়,—যথা দর্শক পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইলে চন্দ্র তাহার চক্ষে পাণ্ডুবর্ণ দেখায়।

মনুষ্যের ইচ্ছাই নিজের কারণ তাহা অন্য কোন কারণের কার্য্য নহে, একথা বলিতে গেলে প্রত্যেক মনুষ্যের ইচ্ছা এক একটি স্বাধীন কারণ হইবে, এবং তাহা হইলে জগতের এক আদিকারণ ভিন্ন, আরও বহুসংখ্যক স্বাধীন কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এরূপ কারণবাহুল্যের কল্পনা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, আত্মা যে চিন্ময় পূর্ণ ব্রহ্মের অপূর্ণ অংশ, আত্মার স্বাধীনতাবোধ সেই পূর্ণব্রহ্মের স্বতন্ত্রতার অস্ফুট বিকাশ হইলেও হইতে পারে।

আর একটি আপত্তি।

স্বতন্ত্রবাদীরা কর্ত্তার পরতন্ত্রতাবাদের বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত করেন। তাঁহারা বলেন, যদি কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা না থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তা নিজকর্ম্মের জন্য দায়ী নহেন, এবং কর্ত্তার দোষগুণ থাকে না, সুতরাং পাপপুণ্য ও তজ্জন্য দণ্ড পুরস্কার উঠিয়া যায়। এ আপত্তি অবশ্যই বিবেচনার সহিত পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য।

তাহার খণ্ডন।

কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা না থাকিলে কর্ত্তা কর্ম্মের জন্য দায়ী হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলেই যে পাপ পুণ্য ও দণ্ড পুরস্কার উঠিয়া যাইবে একথা স্বীকার করা যায় না। কর্ম্মের জন্য কর্ত্তার দোষ গুণ নাই বলিয়া কর্ম্মের দোষগুণ ও ফলাফল লুপ্ত হয় না। কর্ম্মের জন্য কর্ত্তা দায়ী হউন আর নাই হউন, পাপ-কর্ম্ম দোষের ও পুণ্যকর্ম্ম গুণের বলিয়া গণ্য হইবে, এবং কর্ম্মের ফলাফল অবশ্যই ফলিবে, ও সে ফলাফল কর্ত্তাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ কর্ম্মের দোষগুণ যে কর্ত্তার দায়িত্বের অভাব বা সদ্ভাবের উপর নির্ভর করে না একথা বোধ হয় সহজেই অনেকে স্বীকার করিবেন কর্ত্তা জানিয়াই করুন আর না জানিয়াই করুন, তাঁহার কৃত ভাল কর্ম্ম ভাল ও মন্দ কর্ম্ম মন্দ বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত হইবে। তবে তাহাতে কর্ত্তার দোষ গুণ আছে কি না, বিচার করিতে হইলে তাঁহার স্বতন্ত্রতা আছে কি না তাহা দেখিতে হইবে, এবং তাঁহার স্বতন্ত্রতা না থাকিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, দোষ গুণ সাধারণতঃ যে অর্থে গৃহীত হয়, সে অর্থে তাঁহার কর্ম্মের জন্য তাঁহার দোষ গুণ নাই, তাঁহার নিন্দা বা যশ নাই।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাউক কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা না থাকিলে কর্ম্মের ফলাফল তাহার সম্বন্ধে ফলিবে কি না, ও সেই ফলাফল ও তৎসহ দণ্ডপুরস্কার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে কি না। কর্ম্মের জন্য কর্ত্তা দায়ী হউন বা না হউন, ভাল কর্ম্মের ভাল ফল, মন্দ কর্ম্মের মন্দ ফল, অবশ্যই ফলিবে। আমি যদি কোন দরিদ্রকে একটা আদুলি দিব মনে করিয়া ভুলে একটি সভরেন্ দি তাহা হইলেও গ্রহীতার

স্বর্ণমুদ্রালাভের ফল হইবে, অথবা আমি যদি কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে গিয়া দৈবাৎ কোন ব্যক্তিকে আঘাত করি, তাহাতেও আহত ব্যক্তির আঘাতজনিত বেদনা হইবে। তবে দান করার নিমিত্ত সুখ বা আঘাত করার নিমিত্ত দুঃখ জানিয়া করিলে যেরূপ হইত সেরূপ হইবে না। তথাপি গ্রহীতার শুভ হইয়াছে বলিয়া সুখ বা আহত ব্যক্তির অশুভ হইয়াছে বলিয়া দুঃখ এস্থলেও হইবে ও হওয়া উচিত। কিন্তু আমার স্বতন্ত্রতা নাই, আমি অবস্থার দাস ও অবস্থাদ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্মাকর্ম্ম করিলাম, তাহার শুভাশুভ, তাহার পুরস্কার ও দণ্ড, আমাকে ভোগ করিতে হইবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সহজে স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। একথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যদি কেহ আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক আমাকে আমার পীড়িত অবস্থায় কোন ঔষধ খাওয়াইয়া দেয় তাহাতে কি আমার রোগশান্তি হয় না? অথবা যদি কেহ আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক আমাকে কোন বিষাক্ত বস্তু খাওয়াইয়া দেয় তাহাতে কি আমার স্বাস্থ্যহানি হয় না? তবে অবস্থা দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া তাহার ফলাফল ভোগ করা ন্যায়সঙ্গত নহে, একথা কেন বলি? বোধ হয় ইহার কারণ এই যে, আমাদের জড়জগতের কর্ম্ম (যথা দেহের উপর ঔষধ ও বিষের ক্রিয়া) অন্ধ প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মাধীন বলিয়া মনে করি, আর সজ্ঞান জীবজগতের কর্ম্ম সেরূপ মনে করি না, এবং সে কর্ম্মের ফলদাতা ন্যায়বান্ মনে করিয়া তাঁহার নিকট স্বতন্ত্রতাবিহীন কর্ত্তার কর্ম্মফল-ভোগের বিধান অন্যায় মনে করি। যদি স্বতন্ত্রতাবিহীন কর্ত্তার দুষ্কর্ম্মের ফল অনন্ত দুঃখ বলিয়া মানিতে হয়, তবে তাহা অন্যায় বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কর্ত্তা স্বতন্ত্রই হউন বা পরতন্ত্রই হউন, তাঁহার দুষ্কর্মের ফল যে অনন্ত দুঃখ, একথা কেন স্বীকার করিব? একথা স্বীকার করিতে গেলে কর্ত্তা স্বতন্ত্র হইলেও কর্ম্মফলদাতার ন্যায়পরতা রক্ষা হয় না। কারণ অনন্ত দুঃখের কথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা অবশ্যই অনন্ত শক্তিমান্ ও অনন্ত-জ্ঞানময় ঈশ্বর মানেন, এবং সেই ঈশ্বর যে জীব অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে তাহাকে অনন্ত দুঃখের ভোগী হইবে জানিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, একথাও মানিতে হয়। তাহা হইলে এরূপ সৃষ্টি ন্যায়সঙ্গত কিরূপে বলা যায়? কেহ কেহ এই আপত্তি খণ্ডনার্থে অনন্তজ্ঞানময় ঈশ্বরকেও তাঁহারই সৃষ্ট জীবের ভবিষ্যৎ কর্ম্মাকর্ম্ম ও শুভাশুভ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন।[১]

কিন্তু এ কথা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ বলা যায় না। যদি দুষ্কর্ম্মের ফল দণ্ডস্বরূপ অনন্ত দুঃখ না হইয়া, কর্ত্তার সংস্কার ও উন্নতিসাধনের উপায় স্বরূপ পরিমিত কালব্যাপী দুঃখভোগ হয়, ও তাহার পরিণাম অনন্ত সুখলাভ হয়, তাহা হইলেই ত সকল আপত্তির খণ্ডন হয়। তাহা হইলে কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা না থাকিলেও পাপপুণ্যের প্রভেদ ও দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত দুঃখভোগের বিধান অক্ষুণ্ণ

১ Dr. Martineau's Study of Religion, Vol. II, p. 279 দ্রষ্টব্য।

রহিল, অথচ তজ্জন্য কর্ত্তার প্রতি অন্যায় হইল না। কেননা তাঁহার দুষ্কর্ম্ম জন্য দু:খভোগ পরিণামে অনন্তকাল সুখলাভের উপায় মাত্র, এবং সেই পরিমিত কালের দু:খ, অনন্তকালের সুখের তুলনায়, কিছুই নহে বলিলেও বলা যায়।

কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফল ভোগ পুরস্কার বা দণ্ড নহে, কর্ত্তার শিক্ষা ও সংশোধনের উপায়।

কর্ম্মাকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ যদি পুরস্কার বা দণ্ড স্বরূপ না ভাবিয়া তাহা কর্ত্তার শিক্ষা ও সংশোধনের উপায় বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে কর্ত্তা স্বতন্ত্র হউন আর না হউন, সেই ফলভোগের বিধান তাঁহার প্রতি অবিচার বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ থাকে না।

অস্বতন্ত্রতাবাদ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অসৎকর্ম্মে নিবৃত্তির হ্রাস করে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন এ সমস্ত সত্য হইলেও কর্ত্তার অস্বতন্ত্রতাবাদের একটি অবশ্যম্ভাবিফল এই যে, মনুষ্য নিজের দুষ্কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে এ ধারণা জন্মিলে, দুষ্কর্ম্ম করিতে ভয় ও সৎকর্ম্ম করিতে আগ্রহ কমিয়া যাইবে। এ আশঙ্কা অমূলক। কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা না থাকিলেও যখন কর্ম্মের দোষগুণ রহিল, এবং কর্ত্তাকে যখন কর্ম্মাকর্ম্মের শুভাশুভ কিঞ্চিৎকাল ভোগ করিতে হইবে, এবং অবস্থাদ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করা সত্ত্বেও যখন তাহার শুভাশুভ ভোগ জন্য আত্মপ্রসাদ ও আত্মগ্লানি হইবে, তখন দুষ্কর্ম্মে ভয় ও সৎকর্ম্মে আগ্রহ কমিবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

আর একটি কথা আছে। কর্ম্মের দোষগুণ জন্য কর্ত্তার দোষগুণ নাই এ কথা মানিলে, যেমন দুষ্কর্ম্মের জন্য আত্মগ্লানি কমিবে, তেমনই সৎকর্ম্মের জন্য আত্মগৌরবেরও হ্রাস হইবে। সেই আত্মগ্লানি কয়জনই বা কতটুকু অনুভব করে, তাহা কয়জনকেই বা সৎপথে আনে, এবং সেই আত্মগৌরব কত লোককে উন্মত্ত করিয়া কত অনিষ্ট উৎপাদন করে, তাহা ভাবিতে গেলে বোধ হয় জমা খরচে মোটের উপর অস্বতন্ত্রতাবাদ স্বতন্ত্রতাবাদ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর হইতে পারে না।

অস্বতন্ত্রতাবাদের আর একটি অশুভ ফল মানুষকে নিশ্চেষ্ট করা, কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন। তাঁহারা বলেন, কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা নাই, তিনি অবস্থাদ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করেন, এ ধারণা জন্মিলে আমরা কোন কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিব না, ক্রমশ: নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িব। এ আশঙ্কা অমূলক। অস্বতন্ত্রতাবাদ একথা বলে না যে কর্ত্তার চেষ্টার প্রয়োজন নাই, কর্ম্ম আপনা হইতে হইবে। অস্বতন্ত্রতাবাদ কেবল ইহাই বলে যে, কর্ত্তার ইচ্ছা স্বাধীন নহে। সে ইচ্ছাই তাহার নিজের কারণ নহে, কিন্তু তাহা কর্ত্তার পূর্ব্ব স্বভাব, পূর্ব্ব শিক্ষা, ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার ফল। সেই পূর্ব্বশিক্ষা ও পূর্ব্বস্বভাব ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা কারণ স্বরূপ হইয়া তাহাদের কার্য্য অবশ্যই করিবে, এবং তাহার ফলে কর্ত্তাকে যতটুকু চেষ্টা করিতে হইবে ততটুকু চেষ্টা না করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। আর এই অস্বতন্ত্রতাবাদ যখন কর্ত্তা নিজ কর্ম্মাকর্ম্মের শুভাশুভফলভোগী বলিয়া মানিতেছে, এবং শুভফললাভের ও অশুভফলপরিত্যাগের চেষ্টা যখন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তখন মানুষ অস্বতন্ত্রতাবাদী হইলেই যে নিশ্চেষ্ট হইবে ইহা কখন সম্ভবপর নহে।

উপরি উক্ত অস্বতন্ত্রতাবাদে দৈব ও পুরুষকারের[১] সামঞ্জস্য আছে, অর্থাৎ তাহা কর্ত্তার পূর্ব্বের কর্ম্মফল ও বর্ত্তমান চেষ্টা উভয়েরই কার্য্যকারিতা স্বীকার করে। ইহা অদৃষ্টবাদ বলিয়া দূষিত হইতে পারে না। অদৃষ্টবাদ বলিলে যদি এরূপ বুঝায় যে, আমি কোন বাঞ্ছিত কর্ম্মের নিমিত্ত যতই চেষ্টা করি না কেন, অদৃষ্ট অর্থাৎ আমার অজ্ঞাত কোন অলঙ্ঘ্য শক্তি সে চেষ্টা বিফল করিয়া দিবে, সে অদৃষ্টবাদ মানিতে পারা যায় না, কেননা তাহা কার্য্যকারণসম্বন্ধবিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধ। কিন্তু অদৃষ্টবাদের অর্থ যদি এই হয় যে, কার্য্যকারণপরম্পরা-ক্রমে যাহা ঘটিবার, এবং যাহা ঘটিবে বলিয়া পূর্ণজ্ঞানময় ব্রহ্মের জ্ঞানগোচর ছিল, আমার চেষ্টা সেই দিকেই যাইবে, অন্যদিকে যাইবে না, তাহা হইলে সে অদৃষ্টবাদ না মানিয়া থাকা যায় না, কেননা তাহা কার্য্যকারণসম্বন্ধবিষয়ক অলঙ্ঘ্য নিয়মের ফল।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার।

পূর্ব্বোক্ত অস্বতন্ত্রতাবাদ মানিতে গেলে, যখন দেখা যাইতেছে কর্ত্তার ইচ্ছা স্বাধীন নহে, তাঁহার পূর্ব্বস্বভাব, পূর্ব্বশিক্ষা, ও চতুষ্পার্শ্বস্থঅবস্থার দ্বারা তাহা চালিত, তখন কর্ত্তার ইচ্ছা যাহাতে সৎপথে গমনে বলবতী হয়, বর্ত্তমানে কেবল সেইরূপ নীতি শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে না, ভাবী কর্ম্মীদিগের পূর্ব্বস্বভাব, পূর্ব্বশিক্ষা ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা যাহাতে তাহাদের ইচ্ছাকে সৎপথগামী করিবার উপযোগী হয় সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এই জন্যই বালক ভবিষ্যতে ভাল হইবে আশা করিতে গেলে তাহার পিতামাতার সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হওয়া, তাহার বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা পাওয়া, তাহাকে সাত্ত্বিক আহার ও সাত্ত্বিক আমোদ প্রমোদ দেওয়া, এবং তাহাকে সৎসঙ্গ সাধুপরিবার ও সাধুপ্রতিবেশী পরিবেষ্টিত রাখা আবশ্যক। আমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম-ফলভোগ সম্বন্ধে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, আমাদের জন্মের পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে কর্ম্ম করেন তাহার ফল যে আমাদের ভোগ করিতে হয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও দেহবন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ ভিন্ন পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ হয় না।

আমরা যতদিন সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকিব, যতদিন দেহাবচ্ছিন্ন থাকায় আমাদের বহির্জগতের ক্রিয়ার অধীন থাকিতে হইবে, এবং যতদিন প্রকৃত হিতাহিত বিষয়ে অজ্ঞানতানিবন্ধন আমরা অন্তর্জগতের অসংযত প্রবৃত্তির অধীনতা পরিত্যাগ করিতে পারিব না, ততদিন আমাদের স্বতন্ত্রতালাভের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান যেমন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে ও পূর্ণতা লাভ করিতে থাকিবে, এবং আমাদের প্রকৃত হিতাহিত আমরা দেখিতে পাইব, সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি সকল সংযত হইয়া আসিবে ও আমাদের অন্তর্জগতের অধীনতা যাইবে। দুরাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হওয়াতে বহির্জগতের অধীনতারও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হইয়া আসিবে, তবে দেহের অভাবপূরণ নিমিত্ত তাহার কিঞ্চিৎ থাকিবে। এবং যখন সেই দেহবন্ধনও যাইবে, তখনই আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারিব।

---

[১] মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা লইয়া প্রায় সকল দেশেই অনেক আন্দোলন ও মতভেদ হইয়াছে। এদেশে অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকারবাদ[১] উভয় মতই আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ **স্বতন্ত্রতাবাদী**, কেহ বা নিয়তি অথবা **নির্ব্বন্ধবাদী**।[২]

বিষয়টি দুরূহ। এসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহার স্থূল মর্ম্ম সংক্ষেপে এই—

অস্বতন্ত্রতা-বাদের স্থূল মর্ম্ম।

১। কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা নাই, তাঁহার ইচ্ছা স্বাধীন নহে অর্থাৎ ইচ্ছাই ইচ্ছার কারণ নহে, তাহা তাঁহার পূর্ব্বস্বভাব, পূর্ব্বশিক্ষা ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার ফল। তবে তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে।

২। কর্ত্তাকে কর্ম্মাকর্ম্মের শুভাশুভ ফল, অর্থাৎ সৎকর্ম্মের জন্য আত্মপ্রসাদ ও পুরস্কারাদি, এবং অসৎকর্ম্মের জন্য আত্মবিষাদ ও দণ্ডাদি, ভোগ করিতে হয়। তবে সেই শুভাশুভ ফলভোগ তাঁহার সম্বর্দ্ধনার বা শাস্তির নিমিত্ত নহে, তাহা তাঁহার সংশোধন ও উন্নতির নিমিত্ত।

৩। কর্ত্তার কর্ম্মফলের পরিণাম অনন্তদুঃখ নহে, অনন্তসুখ। কর্ম্মফলভোগদ্বারা সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক কর্ত্তার ক্রমশঃ সংশোধন ও উন্নতিসাধন হইয়া পরিণামে মুক্তিলাভ হইবে।

চেষ্টা বা প্রযত্ন।

উপরে বলা হইল কর্ত্তার চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা নাই অথচ চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে ইহার অর্থ কি, এই সংশয় এস্থলে কাহার কাহার মনে উদিত হইতে পারে। অতএব তাহার নিরাকরণার্থে চেষ্টা বা প্রযত্ন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

জড়বাদীদিগের মতে চেষ্টা কেবল দেহের কার্য্য। তাঁহারা বোধ হয় বলিবেন—বহির্জগতের বিষয় কর্ত্তৃক স্পন্দিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াদ্বারা, অথবা মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত বহির্জগতের পূর্ব্বক্রিয়াজনিত কুঞ্চনদ্বারা, মস্তিষ্কচালিত হইলে, সেই চালনা স্নায়ুজালকে উত্তেজিত করে, ও তদ্দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, এবং সেই প্রবর্ত্তনাকে চেষ্টা বা প্রযত্ন কহে।

চৈতন্যবাদী ও অদ্বৈতবাদীরা চেষ্টাতে দেহের কিঞ্চিৎ কার্য্য আছে স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহাদের মতে চেষ্টা মূলে আত্মার কার্য্য, তাহা আত্মার ইচ্ছাসম্ভূত, এবং আত্মাই সেই কার্য্যে দেহকে পরিচালিত করে। স্বতন্ত্রতাবাদীরা বলেন সেই ইচ্ছা স্বাধীন, অর্থাৎ ইচ্ছাই ইচ্ছার কারণ, অস্বতন্ত্রতাবাদীদের মতে সে ইচ্ছা আত্মার অর্থাৎ কর্ত্তার পূর্ব্বস্বভাব, পূর্ব্বশিক্ষা ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার ফল। স্বতন্ত্রতাবাদ ও অস্বতন্ত্রতাবাদের এই মাত্র পার্থক্য। অতএব চেষ্টা যে কর্ত্তার

---

[১] দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[২] এ সম্বন্ধে Sidgwick's *Methods of Ethics*, BK. I, Ch. V, Green's *Prolegomena of Ethics*, Bk. II, Ch. I, ও Fowler and Wilson's *Principles of Morals*, Pt, II, Ch. IX দ্রষ্টব্য।

কার্য্য ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং কর্ত্তার স্বতন্ত্রতা থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। তবে কর্ত্তা চেষ্টা করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই স্বতন্ত্রতাবাদ ও অস্বতন্ত্রতাবাদের পার্থক্য লক্ষিত হয়।

আত্মা কি প্রকারে দেহকে আপন চেষ্টায় পরিচালিত করেন, আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানে তাহা আমরা জানিতে পারি না। দেহ ও আত্মার সংযোগ কিরূপ তাহা না জানিলে এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুজালই দেহকে কার্য্যে চালাইবার যন্ত্রস্বরূপ। সেই যন্ত্র বিকল হইলে আত্মা দেহদ্বারা কোন চেষ্টা সফল করিতে পারে না। তবে দেহ অবশ হইলেও আত্মা মনে মনে চেষ্টা করিতে পারে। ইহা দ্বারা চেষ্টা যে মূলে আত্মার কার্য্য একথা সপ্রমাণ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্ত্তব্যতার লক্ষণ

কর্ত্তব্যতার লক্ষণ আলোচনার প্রয়োজন।

কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য ইহা স্থির করা এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। তাহা যদিও অনেক স্থলে সহজ, কিন্তু অনেক স্থলে আবার সহজ নহে, এবং কোন কোন স্থলে অতি কঠিন। তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রত্যেক স্থলে নিজের কার্য্যের নিমিত্ত স্থির করিতে হইলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুরূহ হইত। কিন্তু সকল সভ্য দেশেরই পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র প্রণয়নদ্বারা সাধারণ লোকের পথ অনেক সহজ করিয়া দিয়াছেন, এবং লোকে সেই সকল শাস্ত্রের বাক্য স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিলে প্রায়ই কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইতে পারে। তবে যে সকল স্থলে মতভেদ আছে, সেখানে আমাদের নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হয়। আর কর্ম্মক্ষেত্র এত বিশাল ও বিচিত্র, এবং তাহার সঙ্কটস্থল সকল এত দুর্গম ও নিত্যনূতন যে, তথায় পথিক কেবল পথপ্রদর্শকের নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না, পথিকের নিজের পথ চিনিয়া লইবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। সুতরাং কেবল নীতি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত জানা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না, প্রয়োজন মত কোন কথার অনুকূলপ্রতিকূল যুক্তিতর্ক বিচার করিয়া আমাদের নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যোগ্য হওয়া কর্ত্তব্য। সেই জন্য কর্ত্তব্যতার লক্ষণ কি, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে সকলেরই জানা উচিত, এবং সেই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনা এই খানে হইবে।

কর্ত্তব্যতার লক্ষণ কি তদ্বিষয়ে অনেক মতামত আছে। সুখবাদ।

কর্ত্তব্যতার লক্ষণ কি তদ্বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। জীব নিরন্তর সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত, সুতরাং ইহা বিচিত্র নহে যে কাহার কাহার মতে যাহা সুখকর তাহাই কর্ত্তব্য। এই মতকে **সুখবাদ** বলা যাইতে পারে। ইহার অনেক প্রকার অবান্তর বিভাগ আছে। ইহার নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাচীন গ্রীসের এপিকিউরসের মত। তাহার মূল উপদেশ, "আহারকর, পানকর আমোদকর।"

ধর্ম্মপরায়ণ প্রাচীন ভারতে এ মত অবিদিত ছিল না। চার্ব্বাক সম্প্রদায়ের এই মত ছিল। তাঁহারা বলেন—

> "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।"[১]

---

[১] সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, চার্ব্বাক দর্শন।

"সুখে থাক যতদিন আছে এ জীবন।
মৃত্যুকে এড়াতে নাহি পারে কোন জন॥
পুড়িয়া এ দেহ যবে হয়ে যাবে ছাই।
তারপর আসিবার সম্ভাবনা নাই॥"

এই নিকৃষ্ট প্রকার সুখবাদের অসারতা লোকে সহজেই বুঝিতে পারে। এই জন্য ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত কাজে এই মতানুসারে চলিলেও লোকলজ্জাবশতঃ কথায় ইহা মানিতে অনেকেই প্রস্তুত নহে।

তবে নিজের বৈষয়িকসুখলালসা নিন্দনীয় হইলেও পরের বৈষয়িকসুখকামনা প্রশংসনীয়। এবং যাহা সাধারণের অর্থাৎ অধিকাংশলোকের সুখকর, তাহাই কর্ত্তব্য, এইমত অনেক ধীমান্ পণ্ডিতের অনুমোদিত। ইহা একপ্রকার সুখবাদ। ইহাকে **হিতবাদ** বলিলেও বলা যায়। কেহ একটি মিথ্যা কথা কহিলে তাহার দেনা উড়িয়া যায় ও সর্ব্বস্ব রক্ষা হয়, এস্থলে নিকৃষ্ট হিতবাদ হয়ত সেই মিথ্যা কথা বলা কর্ত্তব্য বলিবে। কিন্তু তাহাতে দেনাদারের সর্ব্বস্ব রক্ষা হইলেও সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদারের গুরুতর ক্ষতি হয়, এবং মিথ্যাবাদীর মঙ্গল দৃষ্টে অনেকে মিথ্যা কথা কহিতে উৎসাহ পাওয়ায় ভবিষ্যতে আরও অনেকের ক্ষতি হইতে পারে, সুতরাং হিতবাদী এরূপ স্থলে মিথ্যা বলা অকর্ত্তব্য মনে করিবে। যেখানে একটি মিথ্যা বলিলে অনেকের, এমন কি একটা সম্প্রদায়ের বা সমাজের, হিত হয়, এবং কাহারও স্পষ্ট অহিত হয় না, সেখানে হিতবাদ সেই কার্য্য কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য বলিবে ঠিক বলা যায় না। কর্ত্তব্য বলিলে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, এবং তাহাতে ভাবি অনিষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় বোধ হয় অকর্ত্তব্যই বলিবে। সুখবাদ ও হিতবাদ উভয় মতেই কর্ত্তব্য প্রবৃত্তিপ্রণোদিত। অতএব উভয় মতকে এক কথায় **প্রবৃত্তিবাদ** বলা যাইতে পারে।

হিতবাদ।

প্রবৃত্তিবাদ।

পক্ষান্তরে অনেকে বলেন প্রবৃত্তি আমাদিগকে কুপথগামী করে, নিবৃত্তি সৎপথে রাখে, অতএব প্রবৃত্তি প্রণোদিতকর্ম্ম অকর্ত্তব্য, নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মই কর্ত্তব্য। ভোগ বিলাসিতা ও কামনা সংসৃষ্টকর্ম্ম অকর্ত্তব্য, বৈরাগ্য কঠোরতা ও নিষ্কামভাব বিশিষ্ট কর্ম্মই কর্ত্তব্য। এই মত **নিবৃত্তিবাদ** নামে অভিহিত হইতে পারে।

নিবৃত্তিবাদ।

হিতবাদ কর্ত্তার আপনার হিতের প্রতি অল্পদৃষ্টি ও পরের হিতের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখে, এবং নিবৃত্তিবাদ প্রবৃত্তিকে নিতান্ত খর্ব্ব করে। কিন্তু নিজের হিতের প্রতিও যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখা উচিত, এবং প্রবৃত্তিকে একেবারে খর্ব্ব করা অনুচিত। আর নিজের হিত ও পরের হিত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক, এই ভাবিয়া অনেকে বলেন, স্বার্থ ও পরার্থের এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের মতকে **সামঞ্জস্যবাদ** বলা যাইতে পারে।[১]

সামঞ্জস্যবাদ।

---

[১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ন্যায়বাদ।

প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, ও সামঞ্জস্যবাদ, উপরি উক্ত এই মতত্রয়ই কর্ত্তব্যতাকে কর্ম্মের মৌলিকগুণ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহা কর্ম্মের ফল হইতে, অথবা কর্ম্মের প্রবর্ত্তনার মূল হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই ত্রিবিধ মত ভিন্ন আর একটি মত আছে। তদনুসারে বাহ্য বস্তু যেমন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, স্থাবর বা জঙ্গম, বর্ণ যেমন শুক্ল বা কৃষ্ণ বা পীত ইত্যাদি, কর্ম্ম তেমনি কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য। অর্থাৎ বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব যেমন বস্তুর মৌলিকগুণ, অন্য গুণের, যথা স্থাবরত্ব বা জঙ্গমত্বের, ফল নহে,—শুক্লত্ব, কৃষ্ণত্ব বা পীতত্ব যেমন বর্ণের মৌলিকগুণ, অন্যগুণ হইতে, যথা উজ্জ্বলতা বা ম্লানতা হইতে, উৎপন্ন নহে,—কর্ত্তব্যতা বা অকর্ত্তব্যতা, অর্থাৎ ন্যায় বা অন্যায়, তেমনই কর্ম্মের মৌলিকগুণ, অন্য গুণের, যথা, সুখকারিতা বা অসুখকারিতার, ফল নহে, বা তদ্রূপ অন্যগুণ হইতে উৎপন্ন নহে। এবং বস্তুর বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব, ও বর্ণের শুক্লত্ব বা কৃষ্ণত্ব, যেমন প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞেয়, কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বা অকর্ত্তব্যতা, অর্থাৎ ন্যায় বা অন্যায়, তেমনই বিবেক দ্বারা জ্ঞেয়। এই মতকে **ন্যায়বাদ** বলা যাইতে পারে।

সহানুভূতিবাদ

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি মত আছে, তাহার বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই, কারণ একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহারা উপরি উক্ত মতচতুষ্টয়ের কোন না কোন একটির অন্তর্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তন্মধ্যে কেবল একটি মতের নাম করিব, কারণ খৃষ্টীয়ধর্ম্মের একটি মূল উপদেশের সহিত তাহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মতটি সংক্ষেপে এই—ভাল মন্দ আমি যেরূপ বোধ করি অপরেও সেইরূপ বোধ করে, সুতরাং অপরের কার্য্য আমি যে ভাবে দেখি, আমার কার্য্যও অপরে সেই ভাবে দেখিবে। অতএব অন্যের যেরূপ কার্য্য আমি অনুমোদন করি, আমার সেইরূপ কার্য্যই অনুমোদনযোগ্য ও কর্ত্তব্য। এই মতকে **সহানুভূতিবাদ** বলা যাইতে পারে।[১] ইহা খৃষ্টের বিখ্যাত উপদেশ—'তোমার প্রতি অপরে যেরূপ ব্যবহার করুক ইচ্ছা কর, অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই তোমার কর্ত্তব্য'।[২] এই কথার সারভাগ নিম্নের শ্লোকার্দ্ধে আছে।

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ"

সবারে আপন সম যে দেখিতে পারে।
সেই জন সুপণ্ডিত জেনো এ সংসারে॥

এই মত এক প্রকার প্রবৃত্তিবাদ, কারণ এ মতে কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রবৃত্তিপ্রণোদিত।

প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, সামঞ্জস্যবাদ, ন্যায়বাদ, ইহার মধ্যে কোন্ মত যুক্তিসিদ্ধ?

অতএব উপরি উক্ত মতগুলি চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—যথা,—প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, সামঞ্জস্যবাদ ও ন্যায়বাদ। এই চতুর্বিধ মতের কোন্‌টি যুক্তিসিদ্ধ তাহা এক্ষণে নিরূপণীয়। প্রথমোক্ত মতত্রয়

---

১ Adam Smith's *Moral Sentiments* দ্রষ্টব্য।

২ Matthew VII, 12 দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তব্যতাকে কর্ম্মের মৌলিকগুণ বলিয়া স্বীকার করে না, কর্ম্মের অন্যগুণদ্বারা তাহা নির্ণেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ন্যায়বাদ কর্ত্তব্যতাকে কর্ম্মের একটি মৌলিকগুণ বলিয়া মানে। অতএব কর্ত্তব্যতা কর্ম্মের মৌলিকগুণ কি অন্য গুণের ফল, ইহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। এই বিচারকার্য্যে ন্যায়বাদ বাদী, সুখবাদ ও হিতবাদ এই দুই শ্রেণির প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, ও সামঞ্জস্যবাদ প্রতিবাদী, আত্মা প্রধান সাক্ষী, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের কতকগুলি কার্য্যকলাপ আনুষঙ্গিক প্রমাণ, এবং বুদ্ধি বিচারক।

অগ্রে দেখা যাউক এ স্থলে আত্মার সাক্ষ্যবাক্য কিরূপ। সাধারণতঃ কর্ত্তব্যতা ও অকর্ত্তব্যতার অর্থাৎ ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ যে বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের বা গুরুত্ব ও কৃষ্ণত্বের প্রভেদের মত মৌলিক, ইহা জিজ্ঞাসা মাত্র আত্মা স্পষ্টরূপে বলিতেছে, এবং একথা কোন কূটপ্রশ্নদ্বারা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের প্রভেদের মত মৌলিক হইলে তাহা স্থির করা এত কঠিন হইয়া উঠে ও তাহা লইয়া এত মত-ভেদ ঘটে কেন?—তাহার উত্তর এই যে, ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ স্থির করা সর্ব্বত্র কঠিন নহে, তবে অনেক স্থলে কঠিন বটে, কিন্তু বৃহত্ত্ব ক্ষুদ্রত্বের প্রভেদও স্থির করা অনেক স্থলে কঠিন, যথা একটি গোল ও একটি চতুষ্কোণ প্রায় তুল্য পরিমাণের বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি বড় কোন্‌টি ছোট দেখিবামাত্র সহজে বলা যায় না। যদি সুখবাদ বা হিতবাদ প্রশ্ন করেন,—সুখ বা হিত ন্যায্য কর্ম্মের ও অসুখ বা অহিত অন্যায্য কর্ম্মের নিরবচ্ছিন্ন ফল, একথা কি সত্য নহে?—এবং একথা সত্য হইলে সুখকারিতা ও অসুখকারিতা, অথবা হিতকারিতা ও অহিতকারিতা কি কর্ত্তব্যতার ও অকর্ত্তব্যতার নামান্তর মাত্র বলা যায় না?—তাহার উত্তর এই যে,—প্রথমতঃ সুখ বা হিত ন্যায্যকর্ম্মের, ও অসুখ বা অহিত অন্যায্যকর্ম্মের নিশ্চিতফল নহে। অনেক স্থলে ন্যায্যকর্ম্মের ফল সুখ বা হিত এবং অন্যায্যকর্ম্মের ফল দুঃখ। কিন্তু অনেক স্থলে আবার তদ্বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায়। মিথ্যা কথা বলা অন্যায়, কিন্তু এমত দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায় যেখানে মিথ্যাবাদী নিজের বা অন্যের সুখসাধন করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ সুখকারিতা বা হিতকারিতা ন্যায্যকর্ম্মের নিশ্চিত ফল হইলেও তাহা ন্যায় ও কর্ত্তব্যতার নামান্তর হইতে পারে না। একই বস্তুর দুইটি মৌলিক গুণ থাকিলে যে তাহার একটি অপরটির নামান্তর একথা সঙ্গত নহে। জল তরল ও স্বচ্ছ, কিন্তু তাই বলিয়া স্বচ্ছতা তরলতার নামান্তর কে বলিবে? কর্ত্তব্য-কর্ম্মের ফল হিতকর বলিয়া যে কর্ত্তব্যতা ও হিতকারিতা একই গুণ একথা যুক্তিসিদ্ধ নহে। একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয় কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে বুঝান যাইতে পারে। অনেক বৃহৎ বস্তু স্থিতিশীল এবং অনেক ক্ষুদ্র বস্তু গতিশীল দেখা যায়, কিন্তু তাহা দেখিয়া যদি কেহ বলেন বৃহত্ত্ব ও স্থিতিশীলতা, বা ক্ষুদ্রত্ব ও গতিশীলতা এক প্রকারের গুণ, সে কথা যেরূপ অসঙ্গত, সুখকারিতা ও কর্ত্তব্যতা কর্ম্মের এক প্রকারের গুণ একথা তদপেক্ষা অল্প অসঙ্গত নহে।

তাহার পর দেখা যাউক জগতের কার্য্যকলাপ হইতে এ বিষয়ের কি আনুষঙ্গিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ ও সামঞ্জস্যবাদ মতাবলম্বীরা বলিবেন বৃহত্ত্ব ক্ষুদ্রত্বাদি বস্তুর যেরূপ মৌলিক গুণ, ন্যায় অন্যায় যদি কর্ম্মের সেরূপ গুণ হইত, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে এত মতভেদ থাকিত না। তাঁহারা দেখাইবেন, অতি অসভ্যজাতির মধ্যে ন্যায়ান্যায় প্রভেদজ্ঞান আদৌ নাই বলিলেও বলা যায়, অথচ তাহাদের মধ্যে সুখ দুঃখের প্রভেদজ্ঞান নিতান্ত তীব্র। তাঁহারা যে কথা বলিতেছেন সে কথা সত্য বলিয়া মানিলেও, কেবল জগতের একভাগের কার্য্য দেখিয়া কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অন্যদিকের কার্য্যকলাপও দেখা আবশ্যক, এবং আমাদের ক্ষীণবুদ্ধির যতদূর সাধ্য ততদূর সমগ্র জগতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে সিদ্ধান্ত সঙ্গত বোধ হয় তাহাই গ্রাহ্য। জীবের জ্ঞানের বিকাশ ক্রমশঃ হইতেছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। উচ্চশ্রেণির জীবের যেসকল জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, অতি নিম্নশ্রেণির জীবে তাহা সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন কোন শ্রেণির জীবের শ্রবণেন্দ্রিয় বা দর্শনেন্দ্রিয় নাই বলিয়া ধ্বনির বা বর্ণের প্রভেদ মৌলিক নহে বলা যায় না। সেইরূপ অতি অসভ্যজাতির মধ্যে ন্যায় অন্যায় বোধ নাই বলিয়া যে ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ মৌলিক নহে একথা বলা যায় না। বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞানসম্বন্ধে জীবশ্রেণির মধ্যে যেরূপ ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হয়, অন্তর্জগৎবিষয়ক জ্ঞানসম্বন্ধে মানবজাতির মধ্যেও সেইরূপ ন্যূনাধিক্য আছে। ক্রমবিকাশের নিয়ম সর্ব্বত্রই প্রবল। মানুষের অন্তর্জগৎবিষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে। অসভ্যজাতির মধ্যে কেবল ন্যায় অন্যায়ের বোধ কেন, আরও অনেক বিষয়ের বোধ, যথা—গণিতের স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ববোধও, অতি অস্পষ্ট। তারপর অতি অসভ্যজাতির মধ্যে ন্যায় অন্যায় বোধ যে একেবারে নাই, একথাও স্বীকার করা যায় না। সে বোধ দুর্ব্বল বা অস্ফুট হইতে পারে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অভাব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের অনেক দুষ্প্রবৃত্তির ভিতরেও এই ন্যায় অন্যায় বোধ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে। বৈরনির্য্যাতন নিমিত্ত যখন কোন শত্রুকে কেহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তখন যদিও আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনিষ্টকারীর নিকট প্রতিশোধগ্রহণ সে কার্য্যের স্পষ্ট উত্তেজক বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু শত্রু অনিষ্ট করিয়াছে সে অন্যায়কার্য্য এবং ন্যায়ানুসারে তাহার প্রতিশোধ তাহার নিকট প্রাপ্য—এই ভাব ভিতরে ভিতরে অস্ফুটভাবে থাকে, ইহা আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে আত্মার উক্তিতে, এবং অনেক স্থলে বৈরনির্য্যাতনকারীর নিজের উক্তিতে জানা যায়। প্রবৃত্তিবাদীরা বলিতে পারেন একথা দ্বারা সুখবাদ বা হিতবাদই সপ্রমাণ হইতেছে, এবং যে কার্য্য সুখকর বা হিতকর তাহাই ক্রমে ন্যায্য বলিয়া অভিহিত ও গৃহীত হয়। এ কথা কিয়ৎপরিমাণে যথার্থ, সম্পূর্ণ যথার্থ নহে। সত্য বটে মানুষ নিরন্তর সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত, এবং সুখের অন্বেষণ করিতে করিতেই ক্রমে ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে, কারণ,

এই বিশ্বের বিচিত্র নিয়মানুসারে, যাহা ন্যায্য তাহাই প্রকৃত সুখকর। নিজের সুখের নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে ভালবাসিতে প্রথমে শিক্ষা করিয়া শেষে পরের সুখের নিমিত্ত বিশ্বজনীন প্রেমের অধিকারী হই। যাহা শ্রেয় তাহাই প্রকৃত প্রেয়, এই জন্য প্রেয় অন্বেষণে গিয়া ক্রমে শ্রেয় প্রাপ্ত হই। ইহা সৃষ্টির বিচিত্র কৌশল। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা সুখের তাহাই কর্ত্তব্য, যাহা প্রেয় তাহাই শ্রেয় একথা ঠিক নহে।

আর একটি কথা আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে[১] মানুষের অপূর্ণ তাহেতু আমাদের জ্ঞাতরূপই যে জ্ঞেয় পদার্থের প্রকৃতরূপ তাহা নহে। তবে জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকৃত রূপের উপলব্ধি হয়। অসভ্য মনুষ্য কর্ম্মের সুখকারিতা গুণ হইতে পৃথক্‌রূপে কর্ত্তব্যতার গুণ দেখিতে পায় না। কিন্তু সভ্য মনুষ্য বর্দ্ধিতজ্ঞানদ্বারা সেই কর্ত্তব্যতা পৃথক্‌রূপে স্পষ্ট উপলব্ধি করে, ইহা বিচিত্র নহে, এবং ইহাতে কর্ত্তব্যতা বা ন্যায়ের পৃথক্ অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি কেহ বলেন সভ্য মানুষ কর্ত্তব্যতার যে পৃথক্ উপলব্ধি করে, তাহা অসভ্য মনুষ্যের অনুভূত সুখকারিতাগুণের ক্রমবিকাশ, তাহাতে আপত্তি নাই, যদি তিনি স্বীকার করেন যে বর্দ্ধিত জ্ঞানে কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাগুণের যে উপলব্ধি হয় তাহাই সেই গুণের প্রকৃতস্বরূপ। কিন্তু যদি তিনি বলিতে চাহেন যে সুখকারিতা গুণই কর্ম্মের একটি প্রকৃত গুণ, এবং ক্রমবিকাশ দ্বারা অনুভূত কর্ত্তব্যতাগুণ প্রকৃতগুণ নহে, কল্পিতগুণ, সে কথা কোনমতে স্বীকার করা যায় না। অন্ধকার গৃহে যে সকল বস্তু আছে তাহার অস্ফুট ছায়া মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, পরে আলোক জ্বালিলে সেই সকল বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়। যাহা দেখা যায় তাহা পূর্ব্বানুভূত ছায়ার বিকাশ, একথা বলিলে দোষ নাই। কিন্তু তাহা গৃহস্থিত বস্তুর কল্পিত রূপ, এবং পূর্ব্বানুভূত ছায়াই সেই সকল বস্তুর প্রকৃত রূপ, একথা বলা কখনই সঙ্গত হইবে না।

ন্যায়বাদই যুক্তিসিদ্ধ।

অতএব বিচার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ন্যায়বাদই যুক্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা বা ন্যায়পরায়ণতা কর্ম্মের একটি মৌলিকগুণ, তাহা সুখকারিতা বা হিতকারিতা বা অন্য কোনগুণের ফল নহে।

এই মূলকথার মীমাংসার পর কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আর দুইটি প্রশ্ন আলোচ্য রহিল—

১। সাধারণতঃ কর্ত্তব্যতা-নির্ণয়ের বিধান কি ?

২। সঙ্কটস্থলে কর্ত্তব্যতা-নির্ণয়ের বিধান কি ?

এই প্রশ্নদ্বয়ের ক্রমানুয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

কর্ত্তব্যতা-নির্ণয়ের সাধারণ বিধান।

কর্ত্তব্যতা যখন কর্ম্মের মৌলিকগুণ বলিয়া স্থির হইল, তখন তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত কোন বিধানের প্রয়োজন কি, যেমন আকার বর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয়-

---

[১] প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গ্রাহ্য মৌলিকগুণ প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায়, তেমনই অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য কর্ত্তব্যতা-গুণ অন্তর্দ্দৃষ্টি দ্বারা জানা যাইবে, এইরূপ আপত্তি অনেকের মনে উঠিবে। এবং অনেকেই বলেন, যেমন রূপ, শব্দ, গন্ধাদিগুণ জানিবার নিমিত্ত চক্ষু, কর্ণ, নাসাদি বহিরিন্দ্রিয় আছে, তেমনই কর্ত্তব্যতাগুণ জানিবার নিমিত্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের অর্থাৎ মনের বিবেক নামে এক বিশেষ শক্তি আছে, সেই বিবেক আমাদিগকে বলিয়া দেয় কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে অনেকে এরূপ বলিতে পারেন, কর্ত্তব্যতা কর্ম্মের মৌলিকগুণ হইলেও তাহা নির্ণয় করা অবশ্যই কঠিন, তাহা না হইলে তৎসম্বন্ধে এত মতভেদ হইয়াছে কেন। প্রকৃত কথা এই যে, অন্যান্য মৌলিকগুণের মত কর্ত্তব্যতাও স্বতঃপ্রতীয়মান, এবং বহির্জগতবিষয়ক মৌলিকগুণ যেমন প্রত্যক্ষদ্বারা জানা যায়, অন্তর্জগতবিষয়ক এই মৌলিকগুণ, কর্ত্তব্যতা তেমনই অন্তর্দ্দৃষ্টিদ্বারা জানা যায়। জ্ঞাতার যে শক্তিদ্বারা এই গুণের উপলব্ধি হয়, তাহা বুদ্ধির একটি পৃথক্ শক্তি বলিয়া অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ সেই শক্তিকে বিবেক বলেন, তবে তাহা বুদ্ধির নামান্তর মাত্র। সাধারণতঃ সকল স্থলে বুদ্ধি কোনরূপ পরীক্ষা ব্যতীত অবিলম্বে কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিতে পারে। কিন্তু এমন অনেক জটিলস্থল আছে যেখানে তাহা সম্ভাব্য নহে, কর্ত্তব্যতা-নির্ণয়ার্থ পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনার প্রয়োজন। যে যে বিষয় দ্বারা এই পরীক্ষা করা যায়, তত্তদ্বিষয় কর্ত্তব্যতার পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত না হইয়া কর্ত্তব্যতার উপাদান বলিয়া কখন কখন অনুমিত হইয়াছে। যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রায়ই হিতকর, এই জন্য কোন কর্ম্মবিশেষ সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে বুদ্ধি-কল্পনায় পরীক্ষা করিয়া দেখে সেই কর্ম্ম হিতকর কি না। এবং তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কর্ত্তব্যতা হিতকারিতা উপাদানে গঠিত এবং হিতকারিতার নামান্তর মাত্র। যদি কোন কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা-নির্ণয়ার্থে তাহা হিতকর কি না স্থির করা কঠিন হয়, তবে বুদ্ধি অন্য পরীক্ষা প্রয়োগ করে। যথা, যাহা কর্ত্তব্য তাহাতে প্রায়ই স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য থাকে, অতএব বুদ্ধি-কল্পনা দ্বারা দেখে উপস্থিত কর্ম্মে সে সামঞ্জস্য আছে কি না। এবং তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন কর্ত্তব্যতা স্বার্থ-পরার্থের সামঞ্জস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই রূপে হিতবাদসামঞ্জস্যবাদাদি ভিন্ন ভিন্ন মতের উৎপত্তি হইয়াছে।

মনু কহিয়াছেন—

> "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
> এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥"[১]

> (বেদ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মতুষ্টি, চারি।
> ধর্ম্মের লক্ষণ এই জানিবে বিচারি ॥)

---

[১] মনু ২।১২।

বেদ ও স্মৃতি এবং সাধুদিগের আচারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মতুষ্টি ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করাতে মনুর মতেও বিবেক যে ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা নিরূপণের উপায় তাহার আভাস পাওয়া যায়।

মহাভারতের বনপর্ব্বে যক্ষের "কঃ পন্থাঃ" 'পথ কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির শাস্ত্র ও মুনিগণের মতভেদ উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" "সেই পথ, যে পথেতে যায় মহাজন"। এ স্থলে মহাজন শব্দের অর্থ জনসাধারণ বা জনসমূহ। জনসাধারণ যে পথে যায় সে পথ একের বুদ্ধির দ্বারা নহে (তাহা ভ্রান্ত হইতে পারে), দশের বুদ্ধির দ্বারা নিরূপিত। সুতরাং তাহা প্রকৃত পথ হওয়াই সম্ভাব্য। ইহাতেও একপ্রকার বলা হইতেছে আমাদের বুদ্ধিই কর্ত্তব্যতার শেষ পথপ্রদর্শক।

কর্ত্তব্যতা নিরূপণের যে দুর্গমতার কথা বলা হইল, সেরূপ দুর্গমতা অন্যান্য অপেক্ষাকৃত সহজ মৌলিকগুণ নিরূপণেও ঘটে। যথা, আয়তনের ন্যূনাধিক্য প্রত্যক্ষের বিষয় ও সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দুইটি প্রায় সমান আয়তনের বস্তুর একটি গোল ও একটি চতুষ্কোণ হইলে, কোন্‌টি বড়, দৃষ্টি মাত্র বলা যায় না। দুইটিকে একত্র রাখিয়াও বোধ হয় তাহাদের আয়তনের ন্যূনাধিক্য স্থির করা যায় না। একটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অপরটির সহিত মিলাইলে তবে সেই ন্যূনাধিক্য ঠিক জানা যায়।

উপরে যে সকল কথার উল্লেখ হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে, যদিও প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ ও সামঞ্জস্যবাদ, কর্ত্তব্যতা-নির্ণায়ক নহে, তথাপি তাহারা কর্ত্তব্যতার পরিচায়ক, এবং কর্ত্তব্যতা-নির্ণায়ক ন্যায়বাদের সহায়তা করিতে পারে।

সুখকারিতা কর্ত্তব্যতার অনিশ্চিত লক্ষণ।

সুখাভিলাষ ও হিতাভিলাষ এই স্বপ্রবৃত্তির অনুসরণ, নিবৃত্তি-মার্গানুসরণ, স্বার্থ ও পরার্থের তথা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামঞ্জস্যকরণ, এবং ন্যায়পথানুসরণ, এ সকলই কর্ম্মের সদ্‌গুণ, তবে কর্ত্তার অপূর্ণতানিবন্ধন ইহারা ক্রমান্বয়ে উচ্চ হইতে উচ্চতর বলিয়া বোধ হয়। ন্যায়পথানুসরণ সকলের উচ্চ এবং সুখান্বেষণ সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণির।

দেহাবচ্ছিন্নতা-প্রযুক্ত আমাদের কতকগুলি অভাবপূরণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই জন্য, এবং অপূর্ণতা-প্রযুক্ত আমাদের প্রকৃত সুখ কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, সেই জন্য, সুখের অন্বেষণ অনেক সময় আমাদিগকে কুপথে লইয়া যায়। আমরা বর্ত্তমানের ক্ষণিক সুখের লালসায় ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী সুখের কথা ভুলিয়া যাই, এবং এমত কার্য্য করি যদ্দ্বারা সেই চিরস্থায়ী সুখের আশা অন্ততঃ কিছুকালের নিমিত্ত নষ্ট হয়। এই জন্য অসংযত সুখের অন্বেষণ এত নিন্দনীয়। তাহা না হইলে প্রকৃত সুখের অভিলাষ দোষ নহে। সুখলাভের প্রবৃত্তি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, তাহার উদ্দেশ্য আমাদের উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া, এবং সেই প্রবৃত্তিই সকল জীবকে প্রকৃত বা কল্পিত সুখ-লালসায় কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছে। সেই কর্ম্মফলে জীবগণ কেহ বা

উন্নতির, কেহ বা অবনতির পথে গমন করিতেছে। যাহারা কুপথে গিয়া পড়িতেছে তাহারা আবার শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক সে পথে প্রকৃত সুখ না পাইয়া পুনরায় সুখান্বেষণে ফিরিয়া আসিতেছে। কেবল সুখলাভের প্রবৃত্তির নহে, প্রবৃত্তিমাত্রেরই সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে। হিংসা-দ্বেষাদি যে সকল প্রবৃত্তিকে নিকৃষ্ট বলা যায়, তাহাদেরও মূল উদ্দেশ্য নিতান্ত অসাধু নহে, কারণ, তাহাদের সংযত কার্য্য স্বার্থরক্ষা, পরার্থহানি নহে। তবে বিশ্বের বিচিত্র নিয়ম এই যে, প্রবৃত্তিমাত্রই সহজে অসংযত হইয়া উঠে, এবং ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। এই জন্য প্রবৃত্তি দমনের এত প্রয়োজন। এই জন্য প্রবৃত্তি এত অবিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক। এবং এই জন্যই কর্ত্তার সুখকারিতা কর্ম্মের কর্ত্তব্যতার এত অনিশ্চিত লক্ষণ।

হিতকারিতা অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য।

প্রবৃত্তির একমাত্র নিয়ন্তা বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির একমাত্র বল জ্ঞান। জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধি সহজেই দেখিতে পায় যে কর্ত্তার সুখকারিতা কর্ম্মের কর্ত্তব্যতার নিশ্চিত লক্ষণ নহে। তবে অপরের সুখকারিতা বা সাধারণের হিতকারিতা পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্তির প্রাবল্য ততটা থাকা সম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু সাধারণের হিতের মধ্যে কর্ত্তার হিত রহিয়াছে, কারণ, কর্ত্তা সাধারণের মধ্যে একজন, সুতরাং সে পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্তি একেবারে নির্ব্বাক নহে, তৎসহ প্রবৃত্তির প্রচুর সংস্রব রহিয়াছে। অধিকন্তু আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা-প্রযুক্ত সেই পর্য্যালোচনা অতি কঠিন কার্য্য। কোন্ কর্ম্মের হিতকারিতা ও অপকারিতা কতদূর, তাহার পরিণামফল কি, তাহা স্থির করা অনেকস্থলে অতি কঠিন।[১] এই জন্য যদিও হিতকারিতা কর্ত্তব্যতার পরিচায়ক ও সুখকারিতা অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য লক্ষণ, তথাপি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে।

নিবৃত্তি-মার্গানুসারিতা অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

প্রবৃত্তির দোষগুণের কথা উপরে বলা হইয়াছে। প্রবৃত্তির গুণ এই যে, মূলে উহা সদুদ্দেশ্যের সহিত হিতকর কার্য্যে আমাদিগকে প্রবলভাবে প্রণোদিত করে। দোষ এই যে, সহজেই উহা ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া উঠে, ও মূল উদ্দেশ্য সাধু হইলেও শেষে আমাদিগকে অসৎপথে লইয়া যায়। কর্ম্মের স্থান কর্ম্মীর সম্মুখে, কর্ম্মের কাল বর্ত্তমান। সুতরাং কর্ম্মকুশল ব্যক্তিগণের পক্ষে অদূরদর্শিতা একপ্রকার অপরিহার্য্য ও কিয়ৎপরিমাণে মার্জ্জনীয়। এইরূপ অদূরদর্শী কর্ম্মকুশল ব্যক্তিরা প্রবৃত্তিমার্গের পক্ষপাতী, এবং তাঁহারা প্রবৃত্তি-মার্গানুসারিতা একপ্রকার কর্ত্তব্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সুদূরদর্শী মনীষী নীতিশিক্ষকেরা প্রবৃত্তিমুখ অপেক্ষা নিবৃত্তিমুখ কর্ম্মেরই অধিক প্রশংসা করিয়াছেন ও নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের নিমিত্তই উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে নিবৃত্তি-মার্গানুসারিতাই কর্ত্তব্যতার অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য

১ Victor Hugo's Les Miserables উপন্যাসের যে অংশে নায়ক Jean Valjeans নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন কি না মনে মনে উৎকট তর্কবিতর্ক করিতেছেন সেই অংশ এ স্থলে দ্রষ্টব্য।

লক্ষণ। এ মতের অনুকূলে সামান্য জ্ঞানে এই কথা বলা যাইতে পারে, প্রবৃত্তি সহজেই এত প্রবল যে প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম্ম করিতে কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার ও নিবৃত্তির পথে যাইবার নিমিত্তই শিক্ষা ও উপদেশ আবশ্যক। তবে ইহাতে বাধা আছে। কর্ম্মস্থল কঠিন হইলে নিবৃত্তিমার্গগামী কখনই অকর্ম্ম করিবে না একথা সত্য, কিন্তু অনেক সময় সৎকর্ম্মে বিরত থাকিতে পারে এ আশঙ্কা সঙ্গত।

স্বার্থ পরার্থের সামঞ্জস্য-কারিতা আরও অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

উপরে বলা হইয়াছে, বুদ্ধিই প্রবৃত্তির একমাত্র নিয়ন্তা এবং জ্ঞানই বুদ্ধির একমাত্র সহায়। আরও বলা যাইতে পারে বুদ্ধি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির, স্বার্থ-পরার্থের একমাত্র সামঞ্জস্যকারক, এবং এ কার্য্যেও জ্ঞানই বুদ্ধির একমাত্র সহায়। প্রবৃত্তির যে কেবল দোষ ভিন্ন গুণ নাই এবং নিবৃত্তি যে একেবারে দোষশূন্য একথা ঠিক নহে, তাহার আভাস উপরেই দেওয়া হইয়াছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে স্বার্থ ও পরার্থ সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ কথা খাটে। আমাদের প্রকৃত স্বার্থ যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহার অন্বেষণ দোষের নহে। কিন্তু আমাদের অপূর্ণতা প্রযুক্ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া কল্পিত স্বার্থের নিমিত্ত আমরা ব্যস্ত হই, এবং অন্যের হিতাহিতের দিকে একেবারে অন্ধ হই। এইজন্য স্বার্থপরতা এত অনিষ্টের মূল এবং এত নিন্দনীয়। স্বার্থের দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা আত্মরক্ষার্থ আবশ্যক। এবং কেবল তাহা নহে, স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে পরার্থ অর্থাৎ জনসাধারণের হিতও অবশ্যই সাধিত হইবে। কারণ আমাদের প্রকৃত স্বার্থ পরার্থের বিরোধী নহে, বরং পরার্থের সহিত সম্পূর্ণ মিলিত। এবং স্বার্থ কিঞ্চিৎ সাধিত না হইলে আমরা পরার্থসাধনে সমর্থ হইতে পারি না। আমি স্বয়ং অসুখী ও অসন্তুষ্ট থাকিলে আমার দ্বারা অপরে সুখী ও সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে।[১] তবে একবার স্বার্থের দিকে দেখিতে আরম্ভ করিলে স্বার্থপরতা এত বাড়িয়া উঠে যে, আর তাহাকে সহজে শাসন করা যায় না। এই জন্যই নীতিশিক্ষকেরা স্বার্থপরতা দমন করিতে এত উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য করিয়া চলা অত্যাবশ্যক, এবং যে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য আছে তাহা ন্যায়সঙ্গত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভাব্য। কিন্তু প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতা সর্ব্বদা এত প্রবল, এবং সেই সামঞ্জস্য করা অনেক সময়ে এত কঠিন যে, কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত কেবল তাহারই উপরে নির্ভর করা চলে না।

ন্যায়ানুসারিতাই কর্ত্তব্যতার নিশ্চিত লক্ষণ।

এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিলে জানা যায় যে যদিও সুখকারিতা, হিতকারিতা আদি কর্ম্মের অন্যান্য সদ্‌গুণ কর্ত্তব্যতার পরিচায়ক, এবং কোন বিশেষ কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা পরীক্ষার্থে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু

---

[১] Herbert Spencer's Data of Ethics, Chapters XIII and XIV এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

সে সকল গুণ কর্ত্তব্যতার লক্ষণ নহে, এবং ফলাফল চিন্তা না করিয়া সর্ব্বাগ্রেই কর্ম্মের ন্যায়ানুসারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ন্যায়ানুসারিতাই কর্ত্তব্যতার নিত্য ও নিশ্চিত লক্ষণ। এবং বুদ্ধি বা বিবেক প্রায়ই সহজে বলিয়া দিতে পারে কোন কর্ম্ম ন্যায়ানুগত বটে কি না। কেবল সংশয়স্থলে উপস্থিতকর্ম্মে উপরি উক্ত অন্য কোন সদ্‌গুণ আছে কি না তাহা বিবেচ্য।

যদি আমরা দেহাবচ্ছিন্নতাপ্রযুক্ত অবশ্যপূরণীয় কতকগুলি অভাব-পূরণে বাধ্য না হইতাম, এবং যদি আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত সুখ, প্রকৃত হিত ও প্রকৃত স্বার্থ জানিতে ও তাহার অনুসরণ করিতে পারিতাম। তখন স্বার্থ ও পরার্থের, প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির কোন বিরোধ থাকিত না। এবং সে অবস্থায় যাহা নিজসুখকর তাহাই পরের হিতকর, যাহা স্বার্থপর তাহাই পরার্থপর, যাহা প্রবৃত্তি-প্রণোদিত তাহাই নিবৃত্তি-অনুমোদিত হইত। কাহারও সহিত কাহারও সামঞ্জস্য করিবার প্রয়োজন থাকিত না। সকল কার্য্যই ন্যায়ানুগত হইত। এবং সুখবাদ, হিতবাদ আদি প্রবৃত্তিবাদ ও নিবৃত্তিবাদ ও সামঞ্জস্যবাদ ন্যায়বাদের সহিত একত্র মিলিত হইত। সুদূরে আমাদের পূর্ণাবস্থায় এই বাদচতুষ্টয়ের এইরূপ মিলনের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই, এই অপূর্ণাবস্থায় আমরা সেই মিলনের অস্ফুট আভাস পাইয়া কখন একটিকে কখনও অপরটিকে প্রকৃত মত বলিয়া মানি। আবার সেই মিলন অতি দূরস্থিত বলিয়াই, প্রথমোক্ত বাদত্রয়ের উপর নির্ভর করিতে মনে মনে শঙ্কিত হই। পক্ষান্তরে, কর্ত্তব্যতা অর্থাৎ ন্যায়ানুসারিতা কর্ম্মের মৌলিক লক্ষণ ও তাহা বিবেকদ্বারা নিরূপণীয় হইলেও, আমরা এই অপূর্ণাবস্থায় স্বার্থ ও প্রবৃত্তিদ্বারা এত বিমোহিত হই যে, বিবেক সেই মৌলিক নিত্যগুণ অনেক স্থলে দেখিতে পায় না, এবং সুখকারিতা হিতকারিতা আদি অনিত্যগুণের দ্বারা কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে বাধ্য হয়। এইস্থানে একটি কথা বলা আবশ্যক। যদিও ন্যায়বাদই কর্ত্তব্যতানির্ণয় সম্বন্ধে প্রশস্ত মত, ও তদনুসারে চলাই শ্রেয়, তথাপি আমাদের অপূর্ণ অবস্থায় অনেকেই সে মত অনুসরণে অনধিকারী। যাঁহারা বৈষয়িক বাসনায় নিরন্তর ব্যাকুল, এবং বহির্জগতের স্থূল পদার্থের আলোচনাই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ কার্য্য ও জ্ঞানের শেষ সীমা মনে করেন, তাঁহাদের বাসনাবিবর্জ্জিত আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন হইতে, ও অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্বের অর্থাৎ ফলাফলসংস্রবরহিত নীরস কর্ত্তব্যতার অনুশীলনে ব্যাপৃত হইতে প্রবৃত্তি হয় না, এবং প্রবৃত্তি হইলেও পূর্ব্ব অভ্যাস ও পূর্ব্বশিক্ষা বশতঃ সে চিন্তারও সে তত্ত্বানুশীলনের ক্ষমতা হয় না। অতএব যেমন স্থূলদর্শী লোকের পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা অপেক্ষা সাকার দেবতার উপাসনা বিধেয়, তেমনই তাঁহাদের পক্ষে ন্যায়বাদ অপেক্ষা ক্রমশঃ সুখবাদ, হিতবাদ ও সামঞ্জস্যবাদ অবলম্বনীয়।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা সাধারণ স্থলে কর্ত্তব্যতানির্ণয়-বিষয়ক। এখন সঙ্কটস্থলে কর্ত্তব্যতানির্ণয় সম্বন্ধে কএকটি কথার উল্লেখ করা যাইবে।

সঙ্কটস্থলে কর্ত্তব্যতা নির্ণয়।

কর্ম্মক্ষেত্র অতি বিশাল ও সঙ্কটাকীর্ণ, এবং তাহার সঙ্কটস্থলগুলিও অতি দুর্গম। সকল সঙ্কটস্থলের আলোচনা, বা কোন সঙ্কটস্থল হইতে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইবার উপায় উদ্ভাবন করিবার আশা রাখি না। কেবল নিম্নের লিখিত নিরন্তর উথিত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। প্রশ্নচারিটি এই—

১। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর ন্যায়ানুগত?
২। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর ন্যায়ানুগত?
৩। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর ন্যায়ানুগত?
৪। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর ন্যায়ানুগত?

১। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ।

১। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর ন্যায়ানুগত?

এই প্রশ্নের উত্তর সকলে ঠিক একভাবে দিবে না। অসভ্য অশিক্ষিত জাতির নিকট এই উত্তর পাওয়া যাইবে—যতদূর সাধ্য অনিষ্টকারীর অনিষ্ট করা উচিত। কিন্তু সভ্য শিক্ষিত মনুষ্য এরূপ কথা বলিবে না।

"अरावप्युचितं कार्य्यमातिथ्यं गृहमागते ।
छेत्तुमप्यागते च्छायां नोपसंहरते द्रुमः ॥"
(অরিও আসিলে গৃহে তুষিবে আদরে।
ছেত্তাকেও তরু ছায়া বঞ্চিত না করে।।)

মহাভারতের[১] এই বাক্য, এবং 'অনিষ্টের প্রতিরোধ করিও না'[২] শৈলশিখর হইতে খৃষ্টের এই উপদেশ এ স্থলে স্মরণীয়।

বধ করিতে উদ্যত আততায়ীকে আত্মরক্ষার্থে বধ করা প্রায় সকল দেশের সর্ব্বকালের দণ্ডবিধির অনুমোদিত। মনু কহিয়াছেন—

"नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन"[৩]
(আততায়িবধে হন্তা দোষী কভু নহে।)

ভারতের বর্ত্তমান দণ্ডবিধিও এ কথা বলে। তবে মনে রাখিতে হইবে দণ্ডবিধির মূল উদ্দেশ্য সমাজ রক্ষা করা, নীতিশিক্ষা দেওয়া নহে, সুতরাং দণ্ডবিধির কথা সর্ব্বত্র সুনীতি অনুমোদিত না হইতেও পারে।

প্রাণনাশ বা তত্তুল্য গুরুতর অপূরণীয় ক্ষতির আগমন আশঙ্কাস্থলে অনিষ্টকারীর যে পরিমাণ অনিষ্ট করা সেই ক্ষতিনিবারণের নিমিত্ত আবশ্যক তাহা বোধ হয় ন্যায়ানুগত বলিতে হইবে। যেখানে ক্ষতিনিবারণের উপায়ান্তর আছে সেস্থলে, এবং অল্প ক্ষতির আশঙ্কাস্থলে, অনিষ্টকারীর অনিষ্ট না করিয়া উপায়ান্তর অবলম্বনই ন্যায়সঙ্গত। যদি পলায়নদ্বারা অনিষ্টনিবারণ হয়,

---

[১] মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব, ৫৫২৮।
[২] 'Resist not evil' এই কথার অনুবাদ। Matthew, V. 39 দ্রষ্টব্য।
[৩] মনু ৮।৩৫১।

ভীরুতাপবাদভয়ে সে উপায়াবলম্বনে বিরত হইয়া অনিষ্টকারীকে আঘাত করা সুনীতিসিদ্ধ নহে। অনেকে বলেন, অনিষ্ট বা অবমাননাকারীর স্বহস্তে শাসন না করিতে পারিলে তাহার সমুচিত প্রতিশোধ এবং মনুষ্যোচিত কার্য্য হয় না এবং যিনি তাহা না পারেন তিনি ভীরু ও আত্মগৌরববোধশূন্য। যদি কেহ নিজের অনিষ্টের ভয়ে অনিষ্টকারীর শাসনে বিরত হয় তাহার প্রতি একথা কতকটা খাটে। কিন্তু তথাপি একথা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নহে। নিজের অনিষ্টনিবারণ কর্ত্তব্য, কিন্তু উপরি উক্ত সঙ্কটস্থল ভিন্ন অন্য কোন স্থলে পরের অনিষ্টকরণ সুনীতিসঙ্গত নহে। অনিষ্ট বা অবমাননাকারীর উপর ক্রোধ হওয়া মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এবং সেই ক্রোধভরে অনিষ্টকারীকে আক্রমণ, শারীরিক বলের পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু মানসিক বলের বিশেষ পরিচয় দেয় না। বরং সেই ক্রোধ সম্বরণ করাই বিশেষ মানসিকবলের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে অন্যের অনিষ্ট বা অবমাননা করে, সে মানবনামধারী হইলেও পাশবপ্রকৃতি, এবং ব্যাঘ্রভল্লুক বা ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরকে লোকে যেমন পরিত্যাগ করে, সেও সেইরূপ পরিহর্ত্তব্য, সুতরাং তাহাকে শাস্তি না দিয়া যদি কেহ চলিয়া যায় তাহাতে তাহার গৌরবের বা স্পর্দ্ধার কথা নাই। তবে তদ্দ্বারা তাহাকে কিঞ্চিৎ প্রশ্রয় দেওয়া হয়, একথা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে জনসাধারণের বিবেচনার ত্রুটিই সেই প্রশ্রয়ের কারণ। বলের ও সাহসের কার্য্যে স্বার্থত্যাগের কিঞ্চিৎ সংস্রব থাকে, ও তদ্দ্বারা অনেক সময়ে লোকের হিতসাধন হয়, এই জন্য ঐরূপ কার্য্য কাব্যে ও সাধারণের নিকটে বীরোচিত বলিয়া ব্যখ্যাত ও আদৃত, এবং যে ঐরূপ কার্য্যে বিরত সে নিন্দিত ও অনাদৃত হয়। সুতরাং কেহ ক্ষমা করিয়া অপকারকের শাস্তিবিধান না করিলে, তিনি দুই চারি জনের নিকট প্রশংসাভাজন হইতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকের নিকট অনাদৃত হয়েন, এবং তাঁহার সেই অনাদর অপকারকের প্রশ্রয়ের কারণ হয়।

ক্ষমাশীলতা ভীরুতা নহে।

যতদিন সাধারণের সেই সংস্কার পরিবর্ত্তিত না হয়, ততদিন ক্ষমাশীলের এই দশা ঘটিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপকারকের অমার্জ্জনীয় অত্যাচার ক্ষমা করিতে সমর্থ, তিনি সাধারণের মার্জ্জনীয় অনাদর অনায়াসেই সহ্য করিতে পারেন। যদি কেহ বলেন তাঁহার এ ক্ষমা অন্যায়, এবং অপকারকের শাস্তি-বিধানই কর্ত্তব্য, তাহার অখণ্ডনীয় উত্তর আছে। অপকারকের শাস্তিবিধান আশুপ্রতিকারের উপায়মাত্র, এবং তাহা অপকৃত ব্যক্তির প্রেয়। তদ্দ্বারা অপকারক ও অপচিকীর্ষাপরতন্ত্র ব্যক্তিরা ভীত হইতে পারে, ও কিছুকাল অপকর্ম্মে ক্ষান্ত থাকিতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের সংশোধন ও কুপ্রবৃত্তি-দমন হইয়া তাহাদের কর্ত্তৃক অনিষ্টসম্ভাবনার মূলচ্ছেদন হয় না, এবং তাহাদের শাস্তিতে অপকৃত ব্যক্তির ও জনসাধারণের প্রতিহিংসাদি কুপ্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়। পক্ষান্তরে, ক্ষমাশীলের কার্য্য তাঁহার পক্ষে নিশ্চিত হিতকর, পরন্ত সাধারণের পক্ষে এবং অপকারকের পক্ষেও তাহার হিতকারিতা অল্প নহে।

ক্ষমাশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই কাব্যের অন্যায় প্রশংসাবাদ, সাধারণের কুসংস্কার, এবং অপকারকের কঠিন হৃদয় পরিবর্ত্তিত করিবার একমাত্র নিশ্চিত উপায়। সে পরিবর্ত্তনের গতি ধীর কিন্তু ধ্রুব। আর উপরে যে কাব্যের উক্তি ও সাধারণের সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে তাহা মানবজাতির একপ্রকার বাল্যের প্রথম সদুদ্যমের ব্যাপার, তাহা মানবের চিরন্তন ধর্ম্ম নহে। এক সময় সাহিত্যের ও সাধারণের উক্তি এই ছিল যে অপমানকারীর রক্তে ভিন্ন অপমানের কলঙ্ক আর কিছুতেই ধৌত হইতে পারে না। কিন্তু এখন আর একথা কেহ বলিবে না। বরং ক্রমে লোকে ইহাই বলিবে যে একথার এত গৌরব মানবজাতির একপ্রকার কলঙ্ক।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা কেবল নিরীহ, নিরুৎসাহ, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর কথা নহে। রাজশাসনে দণ্ডিতেরও দণ্ড যে তাহাকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত উচিত নহে, তাহার সংশোধনোপযোগী হওয়া উচিত, একথা উদ্যমশীল বলবিক্রমশালী পাশ্চাত্যপ্রদেশেও প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এবং ক্ষমাশীলতার ফলে যে মহাপাপাচারীরও সংশোধন হইতে পারে তাহারও অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কল্পনাপ্রসূত। সুবিখ্যাত ভিক্টর হিউগো রচিত "লে মিজারেবল্‌স্" নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নায়ক জঁ ভাল্ জিন্স সেই দৃষ্টান্ত।

অতএব অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কেবল উপরি উক্ত সঙ্কটস্থলে, যেখানে অতি গুরুতর অপূরণীয় ক্ষতিনিবারণের উপায়ান্তরাভাব সেইখানে, ন্যায়ানুগত বলা যাইতে পারে।

২। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ।

২। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর ন্যায়ানুগত, এ প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্নের আলোচনার পর অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বোধ হইবে।

অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ আত্মরক্ষার্থ যতদূর ন্যায়সঙ্গত, পরহিতার্থ অন্ততঃ ততদূর অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হইবে। এবং তাহা কতদূর সে কথা উপরে বলা হইয়াছে। বাকি থাকিতেছে এই কথা, আত্মরক্ষার্থে যতদূর যাওয়া যায়, পরহিতার্থে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূর যাওয়া যায় কি না। এবং এই কথার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, অন্যের ক্ষতির আশঙ্কাস্থলে আমার নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত হইবে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, শঙ্কিত ক্ষতি যদি অপূরণীয় হয় ও তাহা নিবারণের উপায়ান্তর না থাকে, তবে তাহা নিবারণনিমিত্ত আত্মরক্ষার্থে যেরূপ পরহিতার্থে সেইরূপ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ ন্যায়ানুগত। কিন্তু তাহা নিবারণের উপায়ান্তর থাকিলে সেই উপায়ান্তর অবলম্বনীয়। এবং তাহা পূরণীয় হইলে রাজপ্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে তাহার পূরণ প্রার্থনীয়। রাজ্যের, অর্থাৎ প্রজাসমষ্টির বা প্রজাবিশেষের হিতার্থে রাজা বা রাজপুরুষ কর্ত্তৃক অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদূর ন্যায়সঙ্গত, এই প্রশ্নও এখানে উঠে। ইহা রাজনীতির আলোচ্য বিষয়। এখানে এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণের ন্যায্য অধিকার প্রজা অপেক্ষা রাজার অধিক পরিমাণে থাকা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, রাজার সেই অধিকার

আছে বলিয়া প্রজা অনেক স্থলে অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণে বিরত থাকে, ও অনিষ্টের প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণ পাইবার আশায় তাঁহার নিকট বা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে আবেদন করে। কিন্তু রাজার সেই অধিকারেরও সীমা আছে। অতীত অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ ও ভাবী অনিষ্টের নিবারণনিমিত্ত অনিষ্টকারীর যতটুকু অনিষ্ট করা আবশ্যক তদতিরিক্ত অনিষ্টকরণে রাজার ন্যায্য অধিকার নাই। এবং দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ড তাহার যথাসম্ভব সংশোধনোপযোগী হওয়া উচিত, তাহার কেবল নিগ্রহের নিমিত্ত হওয়া উচিত নহে।

৩। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর ন্যায়ানুগত? —ইহা কঠিন প্রশ্ন। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা স্পষ্টরূপে দেখা যাইবে। যদি কোন ব্যক্তি দস্যুহস্তে পতিত হইয়া, প্রাণরক্ষার্থে তাহাকে অর্থ দিয়া অথবা অর্থ দিবার অঙ্গীকারে, এবং তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, নিষ্কৃতি পান, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা কতদূর পালনীয়? যদি দস্যুকে প্রদত্ত অর্থ পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত অথবা অঙ্গীকৃত অর্থ দিবার দায় এড়াইবার নিমিত্ত সেই ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে চাহেন, তাহা হইলে সে কার্য্য ন্যায়ানুমোদিত বলা যায় না। কোন কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রবেত্তার[১] মতে এরূপ স্থলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে দোষ নাই, কারণ সত্য বলা ও প্রতিজ্ঞাপালন করা কর্ত্তব্য হইলেও, যখন ঐ কর্ত্তব্যতার মূল এই যে, আমাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া অপরে কার্য্য করে এবং তাহা নির্ভরযোগ্য না হইলে সমাজ চলে না, তখন যে ব্যক্তি সমাজের শান্তির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে এবং সমাজ যাহাকে শত্রু বলিয়া বর্জন করে, সে ব্যক্তি সেই কর্ত্তব্যতার ফলভোগী হইতে পারে না, বরং তাহাকে সে ফল হইতে বঞ্চিত করাই উচিত। এ মতের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন না করিয়াও ইহা সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সত্য বলা আত্মাকে সুব্যক্ত করা। অপূর্ণতাপ্রযুক্ত যদিও তাহা সর্ব্বদা করিতে আমরা অক্ষম, সেই অক্ষমতা অন্ততঃ স্বীকার করা উচিত, তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করা অবিধি। আর, সূর্য্যরশ্মি যেমন কে পবিত্র কে অপবিত্র বিচার না করিয়া সকলকেই আলোকিত এবং অপবিত্রকে পূত করে, সত্যের জ্যোতিও তেমনই কি সমাজান্তর্গত, কি সমাজবহিষ্কৃত, কি সদাচারী, কি দুরাচারী, সকলেরই সেব্য, এবং দুরাচারী ও তমসাচ্ছন্নমতি সেই বিমল জ্যোতিতে কখন কখন আলোকিত হইতে পারে। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন অনেক স্থলে ঘটিতে পারে, যেখানে উক্তরূপ প্রতিজ্ঞাপালন গর্হিত হইয়া পড়ে, যথা—তদ্দ্বারা যদি প্রতিজ্ঞাকারীকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় এবং তাহার আশ্রিতগণের ভরণপোষণ অচল হয়। সেরূপ স্থলে দুর্ব্বল মানবকে বোধ হয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা ভাল কার্য্য হইল মনে না করিয়া কাতরভাবে

৩। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ।

---

১ Martineau's Types of Ethical Theory, Pt. II, Bk. 1 Ch. VI, 12, ও Sidgewick's Methods of Ethics Bk. III Ch. VII দ্রষ্টব্য।

সন্তপ্তচিত্তে নিজের অপূর্ণতার ফলভোগ হইতেছে বলিয়া বোধ করা উচিত। যদি আমাদের পূর্ণতা থাকিত, তাহা হইলে অসাবধানতায় যে বিপদে পড়িয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম সাবধানে চলিয়া সে বিপদ এড়াইতে, অথবা বিপদে পড়িয়াও শত্রুকে অনিষ্টকরণে অসমর্থ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতাম।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। দস্যুকে ধরাইয়া দিব না, এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাতে সমাজের প্রতি কর্তব্যতা লঙ্ঘন করা হয় কি না। এ একটি কর্তব্যতার বিরোধ স্থল, এবং এরূপ স্থলে বোধ হয় সমাজের প্রতি কর্তব্যতাই প্রবল বলিয়া গণনীয়। তবে এ স্থলে দস্যুর প্রতি অসত্যাচরণ পরিহিতার্থে, এবং এ প্রশ্ন উপরে উল্লিখিত ৪র্থ প্রশ্নের অন্তর্গত, ঠিক একথা বলা যায় না। প্রতিজ্ঞা করিবার সময় যদি না ভাবিয়া এবং তাহা রক্ষা করিব মনে করিয়া কার্য্য করা হইয়া থাকে, এবং পরে বুঝিয়া সমাজের হিতার্থে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বিবেচ্য বিষয় ৪র্থ প্রশ্নের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিবার সময় যদি তাহা রক্ষা করিব না স্থির করিয়া কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য আত্মরক্ষার্থ দস্যুর প্রতি অসত্যাচরণ, ও ৩য় প্রশ্নের অন্তর্গত বলিতে হইবে। এবং তজ্জন্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে নিজ অপূর্ণতা-নিবন্ধন অবশ্যই সন্তপ্তচিত্তে থাকিতে হইবে।

৪। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ।

পরহিতার্থে অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর ন্যায়ানুগত?—এ প্রশ্নও নিতান্ত সহজ নহে। একটি দৃষ্টান্ত লইলে তাহা বুঝা যাইবে। কোন পলায়িত ব্যক্তির পশ্চাৎ ধাবমান একজন সশস্ত্র-বধোদ্যত আক্রমণকারী নিভৃত স্থানে যদি কোন লোককে জিজ্ঞাসা করে, সে ব্যক্তি কোন্‌দিকে পলাইয়াছে, এবং না বলিলে জিজ্ঞাসিতের প্রাণ সংহার করিতে চাহে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির পক্ষে তাহাকে মিথ্যাকথা বলিয়া নিজের ও আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করা উচিত কি না? এই প্রশ্নের "হাঁ উচিত" এই উত্তর দিতে বোধ হয় কেহই সঙ্কুচিত বোধ করিবেন না। কর্মক্ষেত্রে যদিও এই উত্তর বোধ হয় সকলেই দিবেন ও তদনুসারে কার্য্যও করিবেন, তথাপি চিন্তাক্ষেত্রে কথাটা একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য জিজ্ঞাসককে হত বা আহত না করিয়া নিরস্ত্র ও পাপকার্য্য হইতে নিরস্ত করা। এ বিষয়ে কোন মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু এ কার্য্যকরণে বিশেষ বল ও কৌশল আবশ্যক, এবং অনেকেরই তাহা নাই। আক্রমণকারীকে হত বা আহত করিয়া নিরস্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তাহাতে কর্তব্যতার বিরোধ আইসে —একদিকে পলায়িতের প্রাণরক্ষা কর্তব্য, অপর দিকে যথাসাধ্য আক্রমণকারীর প্রাণ নষ্ট ও দেহ আহত না করাও কর্তব্য। আর সে যাহা হউক, আক্রমণকারীকে এ প্রকারে নিরস্ত করাও সকলের সাধ্য নহে। তাহা না পারিলে উত্তর দিব না বলাই জিজ্ঞাসিতের কর্তব্য। কিন্তু তাহাতেও বিপদ, কারণ তাহাতে নিজের প্রাণ যায়, এবং নিজের প্রাণরক্ষা করাও কর্তব্য। সত্য উত্তর দিলে নিজের প্রাণ বাঁচে কিন্তু অন্যের প্রাণ যায়, তাহাও ঘোরতর কর্তব্যতা-

বিরোধের স্থল। মিথ্যা উত্তর দিলে উভয়ের প্রাণরক্ষা হইতে পারে, কিন্তু সত্যরক্ষা হয় না। সুতরাং একদিকে বা অপর দিকে কর্ত্তব্যতাভঙ্গ হয়। অতএব এক কর্ত্তব্যের অনুরোধে আর এক কর্ত্তব্য অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য বিচার করিয়া যেটি গুরুতর কর্ত্তব্য তৎপালনেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এবং এই বিবেচনায় উক্ত দৃষ্টান্তে মিথ্যা উত্তর দেওয়া ন্যায়ানুগত বলিয়া স্থির হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, তাহা অগতির গতি। আমাদের পূর্ণ বল থাকিলে তাহা করিতে হইত না, আমরা আক্রমণকারীকে নিরস্ত্র ও নিরস্ত করিতে পারিতাম। অথবা আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে এরূপ সঙ্কটাপন্ন স্থানে যাইতাম না। আমাদের অপূর্ণতাপ্রযুক্ত এরূপ কর্ত্তব্যতাবিরোধে পতিত হইতে হয়, এবং উভয় কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিলাম না, একটির উপেক্ষা করিতে হইল, এই জন্য সন্তপ্তচিত্তে থাকিতে হয়।

কর্ত্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য নিরূপণ।

উপরের প্রশ্নচতুষ্টয়ের আলোচনায় দেখা গেল কর্ত্তব্যতার বিরোধস্থলে গুরুতর কর্ত্তব্যানুরোধে অপেক্ষাকৃত লঘুতর কর্ত্তব্য উপেক্ষা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তাহাতে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—কর্ত্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য নিরূপণ কিরূপে হইবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যেমন আয়তনাদি মৌলিকগুণ প্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞেয়, এবং তাহাদের তারতম্যও প্রত্যক্ষদ্বারা নিরূপণীয়, তেমনই কর্ত্তব্যতা কর্ম্মের মৌলিক গুণ বিবেকদ্বারা জ্ঞেয়, এবং দুই পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ত্তব্যতার তারতম্যও বিবেকদ্বারা নির্ণেয়। একথা সত্য, কিন্তু আয়তনের তারতম্য নিরূপণার্থে প্রত্যক্ষ যেমন পরিমাণের সাহায্য লয়, কর্ত্তব্যতার তারতম্য নির্ণয়ার্থে বিবেক সেইরূপ কি লক্ষণের সাহায্য লইবে ?

নিবৃত্তিমার্গমুখ বা পরার্থসেবি কর্ত্তব্য প্রবৃত্তিমার্গমুখ বা স্বার্থসেবি কর্ত্তব্যাপেক্ষা প্রবল—তুল্য শ্রেণির কর্ত্তব্য মধ্যে অধিকতর হিতকর কর্ত্তব্য পালনীয়।

একথার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, দুইটি বিরুদ্ধ কর্ত্তব্যের মধ্যে যেটি প্রবৃত্তিমার্গমুখ বা স্বার্থপ্রণোদিত তদপেক্ষা যেটি নিবৃত্তিমার্গমুখ বা পরার্থপ্রণোদিত তাহাই অধিকতর প্রবল গণ্য করিতে হইবে। এবং দুইটিই যদি এক শ্রেণির অর্থাৎ উভয়েই নিবৃত্তিমার্গমুখ ও পরার্থপ্রণোদিত অথবা উভয়েই প্রবৃত্তিমার্গমুখ ও স্বার্থপ্রণোদিত হয়, তাহা হইলে যেটি অধিকতর হিতকর সেইটিই পালনীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম

মানুষের পরস্পর সম্বন্ধ নানাবিধ।

পৃথিবীতে যদি একজন মাত্র মনুষ্য থাকিত, তাহা হইলে তাহার ন্যায্য অন্যায্য কর্ম্ম কেবল নিজের সম্বন্ধে ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে থাকিত, এবং নীতিশাস্ত্র অতি সহজ হইত। অথবা মনুষ্য যদি সংখ্যায় একের অধিক হইয়াও সম্বন্ধে পরস্পর একভাবে আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলেও তাহাদের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম একই প্রকারের হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতে মনুষ্য সংখ্যায় অনেক, প্রকারে নানাবিধ, এবং অবস্থাভেদে পরস্পর অতি ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রথমতঃ, মনুষ্য স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই মূল শ্রেণিতে বিভক্ত। তাহার পর তাহারা নানা প্রকৃতির, নানা জাতীয়, নানা দেশবাসী। এবং তাহার উপর আবার তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ও শিক্ষিত, অশিক্ষিত আদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন। এই সকল কারণে মনুষ্যদিগের পরস্পরের সম্বন্ধজাল অতি বিচিত্র ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের পরস্পরের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ণয় করাও অতি দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

পারিবারিক সম্বন্ধ সকল সম্বন্ধের মূল।

মানবগণ যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তন্মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ, এবং অপর সকল সম্বন্ধের ও মানবজাতির স্থায়িত্বের মূল। মনুষ্য ক্রমোন্নতির প্রথম অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে আবদ্ধ হয়, পরিবার-সমষ্টি লইয়া সমাজ হয়, সমাজ-সমষ্টিতে জাতি গঠিত হয়, এবং কতকগুলি জাতি লইয়া সাম্রাজ্যস্থাপন হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। পারিবারিক সম্বন্ধ স্ত্রী-পুরুষসম্বন্ধের উপর সংস্থাপিত, এবং বিবাহ বন্ধন এই শেষোক্ত সম্বন্ধের মূল গ্রন্থি। পারিবারিক নীতিসিদ্ধকর্ম্মের কিঞ্চিৎ আলোচনা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। সেই আলোচনা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে।

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

১। বিবাহ—বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বিবাহ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা।

২। পুত্রকন্যার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা।

৩। পিতামাতার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা।

৪। জ্ঞাতি-বন্ধুআদি অন্যান্য স্বজনবর্গের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা।

১। বিবাহ।

১। **বিবাহ।** বিবাহ সংস্কারের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ কিরূপে হইয়াছে সেই প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান এক্ষণকার উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমানকালে নানাদেশে নানাসমাজে বিবাহপ্রথা কি ভাবে প্রচলিত আছে, এবং তাহা কিরূপ হওয়া উচিত ইহাই এস্থলে আলোচ্য।

বিবাহসম্বন্ধ নানারূপ।

বিবাহসম্বন্ধের প্রধান লক্ষণ স্ত্রীর উপর পুরুষের অধিকার ও পুরুষের উপরও স্ত্রীর তত্তুল্য না হউক কিঞ্চিৎ অধিকার। এ সম্বন্ধের স্থিতিকাল কোথাও উভয়ের আজীবন, কোথাও একের আজীবন, কোথাও বা নির্দ্ধারিত সময়ের নিমিত্ত। ইহার বন্ধন কোথাও বা একেবারে অচ্ছেদ্য, কোথাও বা উভয় পক্ষের স্বেচ্ছাচ্ছেদ্য, কোথাও একপক্ষের (পুরুষের) স্বেচ্ছাচ্ছেদ্য, অপর পক্ষের স্বেচ্ছাচ্ছেদ্য নহে, কোথাও বিশেষ কারণ (যথা ব্যভিচার) থাকিলে ছেদ্য। এক পুরুষের এক স্ত্রীই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কোথাও এক পুরুষের বহু পত্নী থাকিতে পারে, এবং ক্বচিৎ এক পত্নীর বহু পতিও থাকিতে পারে।

বিবাহসম্বন্ধজনিত অধিকার প্রায় সর্ব্বত্রই পুরুষের অধিক, স্ত্রীর অপেক্ষাকৃত ন্যূন। ইহার একটি কারণ, পুরুষই প্রবলপক্ষ ও নিয়মকর্ত্তা। কিন্তু বোধ হয় এই অধিকার-বৈষম্যের মূলে আরও একটি নিগূঢ় কারণ আছে, এবং তাহা নিতান্ত অসঙ্গত কারণও নহে। সন্তানের মাতা কে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না, কিন্তু সন্তানের পিতা কে, তদ্বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ অনিয়মিত থাকিলে, সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় অন্যের সহিত সংসর্গ ও যথেচ্ছ বিচরণবিষয়ে পুরুষ যতদূর স্বাধীনতা লইয়া থাকে, স্ত্রীকে লোকে ততদূর স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করে না। এসঙ্গে একথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যেখানে এক স্ত্রীর বহু স্বামী থাকা প্রচলিত, সে সকল স্থলে লোকের পরস্পর সম্বন্ধ মাতৃমূলক, পিতৃমূলক নহে।

তাহা কিরূপ হওয়া উচিত।

উপরে সংক্ষেপে বলা হইল বিবাহসম্বন্ধ নানাদেশে নানারূপ। তাহার বাহুল্য বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে তাহা কিরূপ হওয়া উচিত ইহাই আলোচ্য। এই আলোচনায় বিবাহসম্বন্ধের উৎপত্তি, স্থিতি, ও নিবৃত্তি এই তিনটি বিষয় দেখা আবশ্যক।

বিবাহসম্বন্ধ উৎপত্তি পক্ষদিগের ইচ্ছাধীন। তাহাদের অভিভাবকের ইচ্ছাধীন হওয়া উচিত কি না? বাল্যবিবাহ উচিত কি না?

প্রথমতঃ **বিবাহসম্বন্ধের উৎপত্তি**। এ সম্বন্ধ ইচ্ছাধীন, ইহা পিতাপুত্র বা ভ্রাতাভগিনী সম্বন্ধের মত পূর্ব্বনিরূপিত নহে। 'কাহার ইচ্ছাধীন?'—এই প্রশ্নের সহজ উত্তর অবশ্যই 'যাহারা এই সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে তাহাদের'—এই হওয়া উচিত। এবং তাহারা বা তাহাদের মধ্যে একপক্ষ অল্পবয়স্ক বলিয়া যদি নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে অনুপযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের পিতা-মাতা বা অন্য অভিভাবকের ইচ্ছার উপর তাহাদের বিবাহসম্বন্ধ নির্ভর করিবে। কিন্তু এরূপ গুরুতর সম্বন্ধ, যাহার ফলাফল দুইটি মনুষ্যের জীবন সুখময় বা দুঃখময় করিতে পারে, পক্ষদ্বয়ের ভিন্ন অন্য কাহারও ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত কি না, এই প্রশ্ন এ স্থলে অবশ্যই উঠিতে পারে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্যবিবাহ উচিত কি না সে প্রশ্নও উঠিবে। এ দুইটী প্রশ্ন জড়িত, কিন্তু ঠিক এক নহে। কারণ বাল্যবিবাহ অনুচিত হইলেও, যদি বিবাহের উপযুক্ত বয়স এরূপ স্থির হয় যে, পক্ষগণের তখনও বুদ্ধি পরিপক্ক হওয়া সম্ভাবনীয় নহে, তাহা হইলেও তাহাদের বিবাহ তাহাদের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের নিতান্ত অমতে হওয়া

উচিত হইবে না। অতএব বিবাহ কত বয়সে হওয়া উচিত ইহাই প্রথম বিবেচ্য।

পাশ্চাত্যদেশের লোকের, এবং এ দেশের সমাজ-সংস্কারকদিগের মতে বিবাহ পূর্ণ যৌবনের পূর্ব্বে হওয়া উচিত নহে। আইন অনুসারে বিবাহের ন্যূন বয়স ইয়ুরোপে সাধারণতঃ পুরুষের চতুর্দ্দশ ও স্ত্রীর দ্বাদশ বর্ষ, এবং ফরাসি দেশে পুরুষের অষ্টাদশ ও স্ত্রীর পঞ্চদশ বর্ষ, কিন্তু সচরাচর ঐ সকল দেশে বিবাহ তাহা অপেক্ষা অধিক বয়সেই হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে এই পর্য্যন্ত ন্যূন সীমা পাওয়া যায় যে, দ্বিজ-জাতির মধ্যে অষ্টম বর্ষে উপনয়নের পর অন্ততঃ নববর্ষ ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়নান্তে বিবাহ কর্ত্তব্য,[১] এবং তাহা হইলে সপ্তদশ বর্ষ ন্যূনতম বয়স হইতেছে। স্ত্রীর পক্ষে কোথাও প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া বিধি, কোথাও বা অষ্টম বর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহের বয়স বলিয়া লিখিত আছে।[২] প্রচলিত ব্যবহারানুসারে হিন্দু-সমাজে পুরুষের সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ বর্ষ ন্যূনতম বয়স, ও স্ত্রীর পক্ষে দশ কি নয় বৎসর নিম্নসীমা ও দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ উচ্চ সীমা। ভারতবর্ষে লৌকিক বিবাহের বয়সের ন্যূন সীমা ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে পুরুষের পক্ষে অষ্টাদশ বর্ষ, স্ত্রীর পক্ষে চতুর্দ্দশ বর্ষ।

বাল্যবিবাহের প্রতিকূল যুক্তি।

যাঁহারা বাল্যবিবাহের অর্থাৎ অল্প বয়সে বিবাহের বিরোধী তাঁহারা নিজ মত সমর্থনার্থে এই তিনটি কথা বলেন—

১। বিবাহসম্বন্ধ যেরূপ গুরুতর এবং তাহার ফলাফল যেরূপ দীর্ঘকাল-স্থায়ী তাহা ভাবিয়া দেখিলে, বুদ্ধি পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও সেরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নহে।

২। বিবাহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন, অতএব অল্প বয়সে অর্থাৎ দেহ ও বুদ্ধি অপরিপক্ক থাকা কালে বিবাহ করা উচিত নহে, কারণ জনকজননীর দেহ ও মন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে সন্তান সবলকায় ও প্রবলমনা হইতে পারে না।

৩। সংসারে জীবনসংগ্রাম যেরূপ কঠিন হইয়া আসিতেছে, তাহাতে অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলে, লোকে আত্মোন্নতির নিমিত্ত সমুচিত চেষ্টা করিতে পারে না।

এই যুক্তিত্রয় এতই সঙ্গত ও প্রবল যে, শুনিলেই মনে হয় ইহার উত্তর নাই। এবং যে সকল দেশে অল্প বয়সে বিবাহ প্রচলিত নাই সেই সকল দেশের বৈষয়িক উন্নত অবস্থা বাল্যবিবাহপ্রথানুগামী ভারতের বৈষয়িক হীনাবস্থার সহিত তুলনা করিলে ঐ যুক্তির অনুকূলে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেল বলিয়া মনে

---

[১] মনু, ৩। ১-৪, ২। ৩৬।

[২] মনু, ৯। ৮৯, ৯৪।

হয়। সুতরাং ঐ যুক্তির প্রতিকূলে বিজ্ঞলোকেও কোন কথা বলিতে চাহিলে তাঁহাকে নিতান্ত ভ্রান্ত, ও তাঁহার কথা একেবারে শুনিবার অযোগ্য, বলিয়া বোধ হয়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। কিছু কাল পূর্ব্বে এক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের যে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলিত হয়, তাহাতে প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সুপণ্ডিত ও সুলেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "পারিবারিক প্রবন্ধ" নামক গ্রন্থ হইতে বাল্যবিবাহশীর্ষক প্রবন্ধ বা তাহার কিয়দংশ গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে এরূপ কোন কথা নাই যে তাহা পাঠের অযোগ্য। কি আছে পাঠক নিজে দেখিয়া লইবেন। কিন্তু তাহা লইয়া এত আপত্তি উপস্থিত হয় যে, সঙ্কলিত পাঠ্য পুস্তকের সে অংশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। বাল্যবিবাহ এদেশে একসময় যে ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহাতে অনেক দোষ ছিল ও তাহা হইতে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, সুতরাং তাহার উপর যে লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিবে ইহা স্বভাবসিদ্ধ। তার পর এদেশের বৈষয়িক হীনাবস্থাজনিত কষ্ট অল্পবিস্তর সকলকেই ভোগ করিতে হইতেছে ও তাহা সহজেই দেখা যায়, এবং তাহা এ দেশের প্রাচীন রীতিনীতির ফল বলিয়াই (কথাটা সত্য হউক আর না হউক) অনেকের বিশ্বাস। সেই রীতিনীতির সুফল থাকিলে তাহা বৈষয়িক নহে, তাহা আধ্যাত্মিক, ও তাহা লোকে তত সহজে অনুভব করিতে পারে না, ও দেখে না। এতদ্ব্যতীত সমাজ সংস্কারকগণ তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধ রীতিনীতির দোষ অহরহঃ কীর্ত্তন করিয়া লোকের মন এতই অধীর করিয়া তুলেন যে তাহারা সে রীতিনীতির গুণ থাকিলেও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চাহে না। ইহাও স্বভাবসিদ্ধ। প্রাচীন রীতিনীতি সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনযোগ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং সংস্কারকেরা লোকহিতার্থেই তাহা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। এবং সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সকল কথার ভাল মন্দ বিচার করিয়া চলিলে অতি ধীরে চলিতে হয়, এই জন্য তাঁহারা একদেশদর্শী হইয়া সবেগে সংস্কারাভিমুখ হইয়া চলেন। তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য করিতেছেন ও করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। তাঁহাদের নিকট আমার কেবল এই বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন প্রাচীন রীতিনীতির দোষানুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার গুণের দিকে একেবারে অন্ধ না হয়েন। সংসার নিরন্তর গতিশীল সন্দেহ নাই। কিছুই স্থির নহে। কেহ সম্মুখে, কেহ পশ্চাতে, কেহ সুপথে, কেহ কুপথে, জগতের সকল পদার্থই চলিতেছে। সুতরাং পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধ হওয়া চলে না। কিন্তু যদি কেহ কোন বস্তু সুপথে চালাইতে ও তাহার গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কেবল তাহার গতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলেই হইবে না, তাহার গতির দিক স্থির রাখিতে হইবে। সুদক্ষ চালক অশ্বকে কেবল কশাঘাত করে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বল্গাকর্ষণও করে। সুতরাং সংস্কারকের কেবল সম্মুখে চাহিয়া ব্যস্ত

হইলে চলিবে না, অগ্র-পশ্চাৎ ও চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া সাবধানে চলা আবশ্যক।

এতগুলি কথা বলিলাম কেবল এই আশায় যে, তাহা স্মরণ রাখিয়া পাঠকগণ অল্পবয়সে বিবাহের অনুকূলেও যাহা বলিবার আছে তৎপ্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিবেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রেই বলা উচিত, কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশে সময়ে সময়ে যেরূপ বাল্যবিবাহের দৃষ্টান্ত দেখা যাইত—যথা, পাঁচ কি ছয় বৎসরের বালিকার সহিত দশ কি বার বৎসরের বালকের বিবাহ—তাহার অনুমোদন আমি করি না, একালে কেহই করে না, এবং যখন তাহা কথঞ্চিৎ চলিত ছিল, তখনও বোধ হয় লোকে প্রয়োজনানুরোধে সেরূপ বিবাহ দিত, তদ্ভিন্ন তাহার অনুমোদন কেহ করিত না। আমি যেরূপ বাল্যবিবাহের অনুকূলে কথা আছে বলিতেছি তাহা ওরূপ বাল্যবিবাহ নহে, তাহাকে অল্পবয়সে বিবাহ বলা উচিত। এবং সেই অল্পবয়স, কন্যার পক্ষে দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ, বরের পক্ষে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ বর্ষ।

এরূপ বিবাহকেও বাল্যবিবাহ বলা যাইতে পারে, তবে তাহা না বলিয়া ইহাকে অল্পবয়সে বিবাহ বলিলেই ভাল হয়। স্ত্রীর চতুর্দ্দশ বর্ষের পর ও পুরুষের অষ্টাদশ বর্ষের পর বিবাহকে কেহ বাল্যবিবাহ বলিয়া দোষ দেন না, এবং সেরূপ বিবাহ ভারতের লৌকিক বিবাহের আইনের অননুমোদিত নহে।

রজোদর্শন না হইলে কন্যার দ্বাদশ বর্ষে বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলা যায় না। মনু কহিয়াছেন—

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।"[১]

অল্প বয়সে বিবাহের অনুকূল যুক্তি।

(ত্রিংশৎবর্ষের পুরুষ, মনোহারিণী দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা বিবাহ করিবে।)

উপরি উক্তপ্রকার অল্পবয়সে বিবাহের প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে ক-একটি অনুকূল কথা আছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। উল্লিখিত প্রথম প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা উচিত, যেরূপ অল্পবয়সে বিবাহের কথা বলা যাইতেছে, সে বয়সে বালক-বালিকারা বিবাহ সম্বন্ধ কি ও বিবাহের গুরুত্ব কত বড়, ইহা যে একেবারে বুঝিতে পারে না একথা বলা যায় না।

পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট তাহাদের পাঠ্যবিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় কেহই এরূপ মনে করেন না। তবে তখন তাহাদের জীবনের চিরসঙ্গিনী বা চিরসঙ্গী বাছিয়া লইবার ক্ষমতা হয় নাই, একথা নিঃসন্দেহ। কিন্তু আর দুই চারি বৎসর অপেক্ষা করিলেই কি তাহাদের সে ক্ষমতা জন্মিবে? কত দিনই বা অপেক্ষা করিতে বলিবেন? যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী, তাঁহারাও যৌবনবিবাহের বিরোধী নহেন, হইলেও চলিবে না। ইংরাজ, রাজপুরুষগণও [লৌকিকবিবাহ আইনে অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বিবাহযোগ্য বয়সের

---

[১] মনু ৯।৯৪।

ন্যূনসীমা পুরুষের অষ্টাদশ বর্ষ ও স্ত্রীর চতুর্দ্দশ বর্ষ ধার্য্য করিয়াছেন। অতএব বিবাহের সম্ভবমত কাল যাহাই স্থির হউক, বর-কন্যার পরস্পরনির্ব্বাচন কেবল তাঁহাদের নিজের উপর নির্ভর করিতে দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ হইবে না। তদ্বিষয়ে তাঁহাদের পিতামাতা বা অন্য নিকট-অভিভাবকের পরামর্শ লওয়ার আবশ্যকতা থাকিবে। পরন্তু বিবাহকাল উল্লিখিত অল্পবয়স অপেক্ষা দুই চারি বৎসর অধিক হইলে যেমন একদিকে অনেক বিষয়ে সুবিধা হইতে পারে, অন্যদিকে আবার তেমনই অনেকগুলি অসুবিধা আছে। অল্পবয়সে আমাদের প্রকৃতি ও মনের ভাব যেরূপ কোমল, পরিবর্ত্তনযোগ্য ও গুরুজনের ইচ্ছানুগামী থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর সেরূপ থাকে না, ক্রমশঃ কঠিন, অপরিবর্ত্তনীয় ও স্বেচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া উঠে। সুতরাং যৌবনবিবাহে পাত্র-পাত্রী-নির্ব্বাচনে গুরুজনের উপদেশের প্রয়োজন যথেষ্ট থাকে, অথচ সে উপদেশ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলে তাহা গ্রহণে অনিচ্ছা, অতি প্রবল হইয়া উঠে, এবং অনেক স্থলে সেই প্রয়োজনের উপলব্ধি হইতে দেয় না।

এতদ্ব্যতীত আর একটি গুরুতর কথা আছে। যৌবনবিবাহে পাত্র-পাত্রী পরস্পরের নির্ব্বাচনে কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হইলেও, যদি তাহাদের ভুল হয়, অর্থাৎ যদি বিবাহের নির্ব্বাচনের পরে স্বামী ও স্ত্রী বুঝিতে পারে যে, তাহাদের এতই প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে যে তাহারা পরস্পরের উপযোগী হইতে পারে না, সে ভুল সংশোধনার্থ বিবাহ-বন্ধন ছেদন ভিন্ন অন্য উপায় আর তাহাদের থাকে না। বাল্যবিবাহেও ঐরূপ ভুল হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। তবে প্রথমতঃ যৌবনবিবাহে যত, তত নহে। কারণ যৌবনবিবাহে, যুবক-যুবতীই আপন আপন প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করে, এবং সে সময় সে অবস্থায় প্রবৃত্তি ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু বাল্যবিবাহে, উদ্ধতপ্রবৃত্তি-প্রণোদিত যুবক-যুবতীর স্থলে সংযতপ্রবৃত্তিযুক্ত সদ্বিবেচনাচালিত প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, জনক-জননী নির্ব্বাচনের ভারগ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদের ভুল হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প। আর দ্বিতীয়তঃ, অল্প বয়সে প্রকৃতির ও চরিত্রের কোমলতা ও পরিবর্ত্তনশীলতাপ্রযুক্ত, বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ বালক-বালিকা পরস্পরের উপযোগী হইয়া তাহাদের প্রকৃতি ও চরিত্র গঠিত করিয়া লইতে যেরূপ পারে, তাহাতে তাহাদের নির্ব্বাচনে ভুল হইয়াছিল এ অনুতাপ করিবার কারণ প্রায় হয় না। একথাগুলি যে কাল্পনিক নহে, প্রকৃত, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, যে সকল দেশে অধিক বয়সে বিবাহ প্রচলিত, সে সকল দেশে বিবাহ-বিভ্রাট, এবং বিবাহ-বন্ধন-ছেদনের আবেদন যত হয়, বাল্যবিবাহ প্রথানুগামী ভারতে তাহার কিছুমাত্রই নাই বলিলেও বলা যায়। অতএব বাল্যবিবাহের সম্বন্ধে প্রথম প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি অনুকূল কথা আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

২। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে উল্লিখিত দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, তাহা উপযুক্ত সন্তান উৎপাদনের বাধাজনক। কিন্তু এ আপত্তি অখণ্ডনীয় নহে।

বিবাহ হইবামাত্র যে দম্পতি পূর্ণ সহবাসযোগ্য হয়, একথা কেহ বলে না। পিতামাতা যদি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাঁহারা অল্পবয়সে বিবাহিত পুত্র-কন্যার স্বাস্থ্যের ও সন্তানোৎপাদনযোগ্য কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের সহবাস এরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া দিতে পারেন যে, তাহার কেবল হিতকর ফলই ফলিবে, কোন অহিতকর ফল ফলিবে না। এবং তাহা হইলে তাহাদের সহবাসে পরস্পরের প্রণয়সঞ্চার ও ইন্দ্রিয়সেবার সংযমশিক্ষা, উভয় ফলই লাভ হইবে।

পক্ষান্তরে বিবাহ দিতে অধিক বিলম্ব করিলে তাহার কি ফল হয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংসর্গলিপ্সা প্রায়ই চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষে উদ্দীপিত হয়। সেই প্রবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট পাত্রে ন্যস্ত করিয়া তাহাকে নিবৃত্তিমুখী করা, এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার বিধিসঙ্গত ও নিয়মিত উপায় উদ্ভাবনদ্বারা তাহার অবৈধ ও অসংযত স্বেচ্ছাচার নিবারণ করা যদি বিবাহের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই বোধ হয় সেই উদ্দেশ্য-সাধনের প্রশস্ত পথ। অসামান্য পবিত্র ও সংযতচিত্ত লোকের কথা বলিতেছি না,—সেরূপ লোকের সংখ্যা অধিক নহে—কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে উক্ত প্রবৃত্তির উদয় হইলে, সত্বর তাহার নির্দ্দিষ্ট-পাত্রমুখী হইবার ব্যবস্থা না করিলে, তাহা কাল্পনিক যথেচ্ছ ব্যভিচারে অথবা বাস্তবিক অপবিত্র বা অনৈসর্গিক চরিতার্থতালাভে রত হয়। এবং বলা বাহুল্য, সেরূপ কাল্পনিক ও বাস্তবিক ব্যভিচার উভয়ই দেহ ও মনের পক্ষে সমান অহিতকর। যদি কেহ বলেন যে, প্রবৃত্তি এতই প্রবল তাহা নির্দ্দিষ্ট পাত্রে অর্পিত করিয়া দিলেই যে সংযত থাকিবে তাহার সম্ভাবনা কি?—তাহার উত্তর এই যে, কোন ভোগ্যবস্তুর অভাব যেরূপ আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে, তাহা পাইলে আর ভোগলালসা সেরূপ তীব্র থাকে না, ইহা সাধারণতঃ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

৩। বাল্যবিবাহসম্বন্ধে উপরের তৃতীয় আপত্তি এই যে, তদ্দ্বারা লোকে অল্পবয়সে স্ত্রী-পুত্রকন্যার পালনভারাক্রান্ত হইয়া নিজ উন্নতিসাধনে যত্ন করিবার অবসর পায় না। কিন্তু এ কথার বিরুদ্ধেও যে কিছু বলিবার নাই এমত নহে। বিবাহ হইলেই স্বামী অবশ্য স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্তু পুত্রকন্যা-পালনের ভার তাহাদের জন্মের পূর্ব্বে বহন করিতে হয় না, এবং তাহাদের জন্মকাল বিলম্বিত করিবার ক্ষমতা পিতার হস্তে। অতএব যাহার স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার যতদিন সে ক্ষমতা না হয়, ততদিন অবশ্যই বিবাহ করা উচিত নহে। কিন্তু অন্য কারণে বিবাহ বিহিত হইলে কেবল সন্তান জন্মিবার আশঙ্কায় তাহা রহিত করার প্রয়োজন দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন, বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও স্ত্রীর সঙ্গলাভ-লালসা, নিজের বিদ্যা বা অর্থলাভের নিমিত্ত যথেচ্ছ বিচরণের বাধা জন্মাইতে পারে। হিন্দু পরিবারভুক্ত স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। এবং একদিকে যেমন স্ত্রীর সঙ্গলাভ-লালসা

অন্যত্র গমনের বাধাজনক হইতে পারে, অপরদিকে তেমনই স্ত্রীর সুখসন্তোষ-বর্দ্ধনেচ্ছা নিজের কৃতী হইবার চেষ্টা উৎসাহিত করে। যাহাকে স্ত্রীর ও পুত্রকন্যার ভরণপোষণার্থে যে কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ উপার্জন করিতে বাধ্য হইতে হয়, সে যে আপন উন্নতিসাধন নিমিত্ত ইচ্ছামত চেষ্টা করিতে পারে না, ইহা সত্য বটে। কিন্তু আবার যাহার অভাবপূরণার্থে উপার্জন করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই সে ব্যক্তিরও উন্নতিসাধন নিমিত্ত সমধিক চেষ্টা করিবার সম্যক্ উত্তেজনা থাকে না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বক্তা ও বিচারক আর্স্কিনের কথা স্মরণীয়। তিনি স্ত্রী-পুত্রপালনের উপায়াভাবে প্রপীড়িত অবস্থায় ব্যবহারাজীবশ্রেণিভুক্ত হইয়া প্রথমে যে মোকদ্দমায় নিযুক্ত হন, তাহাতে বক্তৃতা-কালে তাঁহার একটি বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে বলিয়া প্রধান বিচারপতি ম্যানস্‌ফিল্‌ড্ তাঁহাকে তদুল্লেখে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করাতেও, তিনি সেই ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া তেজের সহিত সেই বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করেন, এবং তাঁহার বক্তৃতা এত প্রবল ও হৃদয়গ্রাহী হয় যে, তদ্দ্বারা তিনি সেইদিন হইতে নিজ ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। বক্তৃতান্তে তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ম্যানস্‌ফিল্‌ডের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত প্রধান বিচারপতির আদেশ তিনি কোন্ সাহসে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। তাহাতে আর্স্কিন উত্তর করেন, "আমি তখন মনে করিতেছিলাম, ক্ষুধার্ত্ত শিশুসন্তানেরা যেন আমাকে করুণস্বরে বলিতেছে, পিতঃ! এই সুযোগে যদি আমাদের অন্নের সংস্থান করিতে পারেন, তবেই হইবে, নতুবা নহে।"[১]

অতএব দেখা যাইতেছে যে অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে উপরে যে তিনটি প্রবল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ খণ্ডন না হউক তাহার বিপরীত যুক্তিও আছে। অল্প বয়সে যেমন বিবাহের গুরুত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক উপযুক্ত চিরসঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্ব্বাচনের ক্ষমতা জন্মে না, আবার অধিক বয়সে নির্ব্বাচন অভ্রান্ত হইবে নিশ্চিত বলা যায় না, অথচ সেই নির্ব্বাচনে ভুল হইলে তখনকার বয়সে স্ত্রী-পুরুষের আপন আপন প্রকৃতি পরস্পরের উপযোগী করিয়া গঠিত করিবার আর সময় থাকে না। অল্প বয়সে বিবাহে যেমন ভাবী পুত্রকন্যা সবলদেহ প্রবলমনা হইবার পক্ষে আশঙ্কা থাকে অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে আবার বর্ত্তমান বালক-বালিকাদের শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে যেমন লোকে সংসারপালন-ভারাক্রান্ত হইয়া নিজ নিজ উন্নতিসাধনের সাধ্যমত চেষ্টা করিতে অক্ষম হয়, তেমনই আবার অল্প বয়সে বিবাহ না হইলে লোকে স্বাধীন থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আত্মোন্নতির নিমিত্ত চেষ্টার পক্ষে উত্তেজনাও অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে।

---

১ Campbell's *Lives of the Chancellors*, Vol. VIII, P. 249 দ্রষ্টব্য।

যুক্তি অপেক্ষা দৃষ্টান্ত প্রবলতর প্রমাণ, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বিষয়ে প্রায়ই পাশ্চাত্ত্য দেশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক, ইউরোপের উন্নত অবস্থা এবং এদেশের হীনাবস্থা কতদূর বিবাহ-বিষয়ক প্রচলিত প্রথার ফল। বঙ্গদেশে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও সেই প্রথা প্রচলিত, কিন্তু সে দেশের স্বাস্থ্য এদেশের মত হীন নহে, এবং ইউরোপের স্বাস্থ্য অপেক্ষা ন্যূন নহে। সুতরাং বঙ্গের শারীরিক দৌর্ব্বল্যের কারণ সম্ভবতঃ বাল্যবিবাহ নহে, তাহার অন্য কারণ আছে, যথা ম্যালেরিয়া। তারপর এদেশের পারিবারিক কুশল ও শান্তি, পাশ্চাত্ত্য দেশের অপেক্ষা অল্প ত নয়ই, বরং অধিক বলিয়াই বোধ হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। তবে বৈষয়িক উন্নতিতে অবশ্যই এদেশ পাশ্চাত্ত্য দেশ অপেক্ষা অনেক ন্যূন। কিন্তু সেই ন্যূনতা যে বাল্য-বিবাহের ফল একথা নিশ্চিত বলা যায় না, কেন-না তাহার অন্য কারণও থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। এদেশে প্রকৃতি পূর্ব্বকাল হইতে অতি সদয়-ভাবে লোকের অল্প-পরিশ্রমলভ্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিধান করিয়া দিতেছিলেন, এবং প্রায়ই লোককে তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া ভীত ও উৎকণ্ঠিত করেন নাই। তাহাতে লোকে শান্তিপ্রিয় ও বৈষয়িক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ব্যাপারের চিন্তায় অধিকতর নিমগ্ন হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় মধ্যযুগের রণকুশল বিদেশীয়গণ এদেশের রাজ্যাধিকার করায়, অথচ দেশবাসীদিগের সামাজিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখায়, সেই শান্তিপ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতা ক্রমে আলস্যে পরিণত হয়। সুতরাং প্রকৃতির আদরের সন্তান হইয়াই আমরা কতকটা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। পক্ষান্তরে, যাহাদিগকে প্রকৃতি সেরূপ সদয়ভাবে পালন করেন নাই, যাহাদিগকে তিনি মধ্যে মধ্যে ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন, যাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, এবং যাহাদিগকে নৈসর্গিক বিপ্লবে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতে ও আত্মরক্ষার্থে নিকটবর্ত্তী জাতির সহিত সংগ্রামে সজ্জিত থাকিতে হইয়াছে, তাহারা অবশ্যই ক্রমশঃ অধিকতর রণনিপুণ ও কর্ম্মকুশল হইয়া উঠিয়াছে, ও বৈষয়িক উন্নতিলাভ করিতেছে।

বিবাহকাল সম্বন্ধে স্থূল সিদ্ধান্ত।

সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে বাল্যবিবাহের, অর্থাৎ উল্লিখিত প্রকার অল্প বয়সে বিবাহের প্রতিকূলে যেমন অনেকগুলি যুক্তি আছে, তাহার অনুকূলেও তেমনই অনেকগুলি কথা আছে। এবং বাল্যবিবাহের যেমন দোষ আছে, তেমনই তাহার কএকটি গুণও আছে। আর যৌবন বা প্রৌঢ় বিবাহের যেমন গুণ আছে, তেমনই তাহার কতকগুলি দোষও আছে। এই উভয়দিকে সঙ্কট-স্থলে কোন্ পথ অবলম্বনীয়? প্রকৃত কথা এই যে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের অন্যান্য সঙ্কটস্থলের ন্যায় বিবাহকালনির্ণয়ও একটি কঠিন সঙ্কটস্থল। এক-দিকের অধিক সুফলের প্রত্যাশা করিতে গেলে, অন্যদিকের সুফলের আশা কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিতে ও সেদিকের কুফলের ভাগ লইতে হয়। এরূপ স্থলে

এমন কোন সিদ্ধান্ত নাই যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, ও যদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ সুফল লাভ করা যায়। উদ্দেশ্য ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। যদি একদল সবল, রণকুশল সৈনিক, বা সুদূর অর্ণবযাত্রায় নির্ভীক্ নাবিক, বা সাহসী, উদ্যমশীল বণিক্ সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা হইলে অল্প বয়সে বিবাহ-প্রথা পরিত্যাজ্য। কিন্তু যদি শিষ্টশান্ত, ধর্ম্মপরায়ণ, সংযতপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট গৃহস্থ সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা হইলে পুত্রকন্যার উপরের লিখিত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই ভাল। তবে আর্থিক অবস্থা কিঞ্চিৎ অনুকূল না হইলে, যতদিন স্ত্রীপুত্রপালনের সঙ্গতি না হয়, ততদিন বিবাহ করা উচিত নহে। এবং যেখানে বিদ্যার্জ্জনাদি অন্য উচ্চতর উদ্দেশ্যে পাত্রের মন একান্ত নিবিষ্ট আছে, ও সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কুপথে যাইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানেও তাহার বিবাহকাল বিলম্বিত হইলেই ভাল হয়। বিবাহকাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইহাই স্থূল সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম সংস্থাপন, অথবা একথা লইয়া সমাজসংস্কারক ও সংস্করণনিবারক এই দুইদলের অনর্থক বিবাদ বাঞ্ছনীয় নহে।

বাল্যবিবাহে বালবৈধব্যের আশঙ্কা আছে, এবং বিধবাবিবাহ যদি নিষিদ্ধ হয়, তবে সে আশঙ্কা অতি গুরুতর বিষয়, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ইহা একটি কঠিন আপত্তি, এবং তাহার খণ্ডনের উপায়ও দেখা যায় না। তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, সংসারে কোন বিষয়ই নিরবচ্ছিন্ন শুভকর নহে, সর্ব্বত্রই শুভাশুভ মিশ্রিত, এবং যাহাতে মঙ্গলের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক তাহাই গ্রহণীয়।

পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন কে করিবে ও কি দেখিয়া?

বিবাহসম্বন্ধ-উৎপত্তিবিষয়ক প্রথম কথার, অর্থাৎ বিবাহকাল নির্ণয়ের আলোচনায় যখন দেখা গেল, অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা একেবারে পরিত্যাজ্য নহে, তখন দ্বিতীয় কথা এই উঠিতেছে, পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন কাহার কর্ত্তব্য, এবং সেই নির্ব্বাচনে কি বিষয় দেখা আবশ্যক?

বিবাহের ন্যূন বয়স উপরে যাহা স্থির করা হইয়াছে সে বয়সে পাত্র-পাত্রী পরস্পরের নির্ব্বাচনে সমর্থ নহে, তবে একেবারে অক্ষমও নহে। অতএব তাহাদের পিতামাতার বা অন্য অভিভাবকের প্রথম কর্ত্তব্য, তাঁহাদের নিজ নিজ বিবেচনানুসারে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী মনোনীত করা। এবং তাঁহাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, সেই মনোনীত পাত্র বা পাত্রীর দোষগুণ তাঁহাদের কন্যা বা পুত্রকে জ্ঞাত করা ও তাঁহাদের মনোনীতকরণের কারণ বুঝাইয়া দেওয়া, এবং কন্যা বা পুত্রকে তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করা। লজ্জাশীলতা সে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে বাধা দিবে। যদি কেহ উত্তর দেয়, পিতামাতার সদ্বিবেচনার উপর দৃঢ়বিশ্বাস থাকায় তাঁহারা যাহা ভাল মনে করেন তাহাই করিবেন, এই পর্য্যন্ত উত্তর পাওয়া যাইবে। তৎকালে পুত্রের বিবাহের অনিচ্ছা থাকিলে সে তাহা প্রকাশ করিবে, এবং বর কু-রূপ বা অধিকবয়স্ক হইলে কন্যা ইঙ্গিতে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ জানাইবে। যাহা হউক পুত্রকন্যাকে বুঝাইয়া তাহাদের

মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিতে বলা, ও সেই ভাব বুঝিয়া লওয়া, এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা, পিতামাতার কর্ত্তব্য।

পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনে কি কি দোষগুণ দেখিতে হইবে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। মানুষ চেনা বড় কঠিন, বিশেষ যখন তাহার দেহের ও মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। তবে দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতেরা কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিজ্ঞ পিতা-মাতা যত্ন করিলে অনেক দোষগুণ নিরূপণ করিতে পারেন। পাত্র বা পাত্রীর দেহ সুগঠিত ও সুস্থ কি না, তাহার পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে কোন পূর্ব্বপুরুষের কোন উৎকট রোগ ছিল কি না, তাহাদের নিজের ও পিতামাতার স্বভাব কিরূপ, ও তাহাদের উভয়কুলে কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি ছিল কি না, এই সমস্ত বিষয় বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।[১] তাহা করিলে দোষ-গুণের অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ অনুসন্ধানে কোন গুরুতর দোষ জানা গেলে সেই দোষসংসৃষ্ট পাত্র বা পাত্রী পরিত্যাজ্য। আক্ষেপের কথা এই যে, এ সকল গুরুতর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অনেকে অপেক্ষাকৃত লঘুতর বিষয় লইয়া ব্যস্ত হয়। একটি সামান্য শ্লোক আছে—

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ ॥"

(কন্যা চাহে রূপ তার মাতা চান ধন।
পণ্ডিত জামাতা পিতা চান অনুক্ষণ।
কুটুম্বেরা বরের কৌলীন্য মাত্র খোঁজে।
অপরে মিষ্টান্ন চাহে বিবাহের ভোজে ॥)

রূপ অবশ্য অগ্রাহ্য করিবার বস্তু নহে,—যদি প্রকৃত রূপ হয়। কন্যা কেন, কন্যার পিতা, মাতা, কুটুম্ব ও অপর সকলেই রূপ দেখিয়া তুষ্ট হয়। এবং বরের পক্ষেও ঠিক এই কথা খাটে। কিন্তু রূপের অর্থ কেবল গৌর বর্ণ বা শুক্ল বর্ণ নহে। একবার একজন ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর মতে তাঁহাদের ভাবী পুত্রবধূর একটি চক্ষু না থাকিলেও অগত্যা চলিবে, কিন্তু গৌরাঙ্গী হওয়া আবশ্যক। এ কথা সহসা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া যখন দেখা যায় বহুদর্শী মানবতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব-বিশারদ বড় বড় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরও বর্ণজ্ঞানানুসারে বর্ণভেদই মনুষ্যের বল, বুদ্ধি, নীতি, প্রকৃতির প্রধান পরিচায়ক, তখন অদূরদর্শিনী, অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু রমণীর এই কথা তত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, অঙ্গসৌষ্ঠব, দেহের সুস্থতাজনিত উজ্জ্বল লাবণ্য, এবং মনের পবিত্রতা ও প্রফুল্লতাপ্রসূত নির্ম্মল মুখকান্তিই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ

---

[১] মনু ৩।৬—১১ দ্রষ্টব্য।

অবশ্যই করিতে হইবে। তদতিরিক্ত রূপ, পাইলে ভাল, না পাইলে বিশেষ ক্ষতি নাই। ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য, রূপের আদর বিবাহের পর নূতন নূতন দিনকয়েক, গুণের আদরই চিরদিন।

রূপ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। অতিশয় রূপ, গুণদ্বারা সংশোধিত না হইলে, সর্ব্বত্র বাঞ্ছনীয় নহে। সৌন্দর্য্যান্বিত অসংযতপ্রবৃত্তিসম্পন্ন নরনারী, তুল্যরূপ পত্নী কি পতি না পাইলে প্রথমে অসন্তুষ্ট ও পরিণামে প্রলোভনে পতিত হইয়া কুপথগামী হইবার আশঙ্কা আছে।

রূপ অপেক্ষা গুণ অধিক মূল্যবান্, এবং গুণের দিকে কিঞ্চিৎ অধিক দৃষ্টিরাখা উভয় পক্ষেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাত্রের কিঞ্চিৎ ধন আছে কি না ও স্ত্রী ও পুত্রকন্যা পালন করিবার সংস্থান আছে কি না তাহা দেখা, কন্যার মাতার কেন, কন্যার পিতারও নিতান্ত কর্ত্তব্য। তবে ধনের অনুরোধে নির্গুণ পাত্রে কন্যা প্রদান করা কাহারও উচিত নহে। নির্গুণের ধনেও সুখ নাই, এবং সে ধন অতি সহজে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

পাত্রীর ধন আছে কি না দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। থাকে ভালই, না থাকিলে ক্ষতি নাই। পীড়ন করিয়া কন্যাপক্ষ হইতে অর্থ বা অলঙ্কারাদি গ্রহণ করা অতি গর্হিত কার্য্য। পিতামাতা স্নেহবশতঃই কন্যাকে ও জামাতাকে সাধ্যমত অলঙ্কারাদি দিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহার অতিরিক্ত লইবার চেষ্টা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। একথা সকলেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কার্য্যকালে অনেকেই একথা ভুলিয়া যান। এ কু-প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত বা চিরপ্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা আধুনিক। এবং যখন সকলেই ইহার নিন্দা করে, তখন আশা করা যায় ইহা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইবে।

পূর্ব্বপ্রচলিত কৌলীন্যপ্রথা এখন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, এবং লোকে ইদানীং পাত্র সৎকুলজাত ও সদ্‌গুণযুক্ত কি না এই কথার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য রাখে, সুতরাং কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

বহুবিবাহ অবিহিত

পাত্র বা পাত্রীর পত্নী বা পতি জীবিত থাকিতে তাহার পুনরায় বিবাহ হওয়া গর্হিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে এক সময়ে একাধিক পতি প্রায় সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ। কেবল সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে ও তিব্বতে তাহার ব্যতিক্রম আছে। পুরুষের পক্ষে এক সময়ে বহু পত্নী খৃষ্টান্ ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। হিন্দু ও মুসলমানদিগের শাস্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ নহে। ইহা ন্যায়তঃ অনুচিত, লোকতঃ নিন্দিত, ও কার্য্যতঃ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, বহুবিবাহের অনৌচিত্য সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। অতএব এই গতপ্রায় প্রথার বিষয়, আর অধিক কিছু না বলিয়া ইহাকে নীরবে বিলুপ্ত হইতে দিলেই ভাল হয়।

বিবাহের সমারোহ

বিবাহসম্বন্ধ উৎপত্তিবিষয়ে শেষ কথা বিবাহের সমারোহ। বিবাহ মানবজীবনের প্রধান সংস্কার। ইহাদ্বারা আমাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী জীবনের চিরসঙ্গিনী বা চিরসঙ্গী লাভ করি। ইহা হইতে স্বার্থপরতাসংযম

ও পরার্থপরতাশিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয়। ইহাই দাম্পত্যপ্রেম, অপত্যস্নেহ ও পিতৃমাতৃভক্তির মূল। অতএব বিবাহের দিন মানবজীবনের একটি অতি পবিত্র ও আনন্দের দিন, এবং সেই দিনের মাহাত্ম্য সমুচিতরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বিবাহ-উৎসব যথাসম্ভব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সে সমারোহে অসঙ্গত বহ্বাড়ম্বর ও অনর্থক ব্যয়বাহুল্য অবিধি। বরের বেশভূষা ও যান সুন্দর ও সুখকর হওয়া উচিত। কিন্তু বরকে পুরাতন শতজনের পরিহিত ভাড়াকরা রাজবেশ পরাইয়া দোদুল্যমান ত্রাসজনক চতুর্দ্দোলে বসাইয়া এক প্রকার সং সাজাইয়া লইয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

আড়ম্বর সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। যাঁহারা বিপুল বিভবশালী, যাঁহাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা আছে, এবং যাঁহাদের অনুকরণ অসাধ্য জানিয়া লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না, তাঁহারা যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত কার্য্য করুন, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ অবস্থাপন্ন নহেন, অথচ অক্লেশে কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে অতিরিক্ত ব্যয়ে আড়ম্বরের সহিত কার্য্য করা অনুচিত। কারণ, প্রথমতঃ তাঁহাদের সেরূপ অর্থব্যয় নিজের ক্ষতিকর, কেননা তাঁহাদের এত অধিক অর্থ নাই যে টাকা জলে ফেলিয়া দিতে পারেন। এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের সেরূপ কার্য্য অন্যের অনিষ্টকর, কেননা তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের সমশ্রেণির অথচ অপেক্ষাকৃত অল্পসঙ্গতিসম্পন্ন লোকে অনুকরণ করিতে চাহে এবং কষ্ট করিয়াও অনুকরণ করে, আর তাহা না করিতে পারিলে মনে মনে আরও কষ্ট পায়।

বিবাহ-উৎসব অতি পবিত্র ধর্ম্মকার্য্য। তাহাতে বারবিলাসিনী নর্ত্তকীর নৃত্যগীত ও নট-নটীর অভিনয়াদি কোন অপবিত্র আমোদ-প্রমোদের সংস্রব থাকা অনুচিত।

বিবাহসম্বন্ধের স্থিতিকাল ও কর্ত্তব্যতা।

স্ত্রীকে সম্মান করা।

বিবাহসম্বন্ধের স্থিতিকাল পতি-পত্নীর আজীবন। সেই কালে স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীকে আদর ও সম্মান করা, এবং উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সুশিক্ষা দেওয়া। স্ত্রী সুখদুঃখের, জীবনের চিরসঙ্গিনী, অতি আদরের বস্তু, কেবল বিলাসের দ্রব্য নহে, সম্মান পাইবার অধিকারিণী। মনু কহিয়াছেন—

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥"[১]

(নারীর আদর যথা সন্তুষ্ট দেবতা।
সকলি নিষ্ফল যথা নারী অনাদৃতা॥)

---

[১] মনু ৩।৫৬।

স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া স্বামীর নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ স্ত্রীর সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রের উপর স্বামীর, তাহার নিজের, তাহাদের সন্তানের, এবং সমস্ত পরিবারের, সুখস্বচ্ছন্দ নির্ভর করে। *স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া।*

'শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা'।[১]

(পতির অর্দ্ধাংশে জায়া শাস্ত্রের বচন।
পুণ্যাপুণ্যফলভোগে তুল্য দুই জন।।)

এই বৃহস্পতিবাক্য কেবল স্ত্রীর স্তুতিবাদ নহে, ইহা অমোঘ সত্য। স্ত্রীর পাপপুণ্যের ফল স্বামীকে ও স্বামীর পাপপুণ্যের ফল স্ত্রীকে ভোগ করিতে হয়, ইহা সামান্য জ্ঞানে সকলেই জানেন। অতএব স্বামী যদি নিজে সুখী হইতে চাহেন তবে স্ত্রীকে সুশিক্ষা দেওয়া তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক। তিনি যদি স্ত্রীর শুভকামনা করেন তাহা হইলেও স্ত্রীকে সুশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রী সুশিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা না হইলে অপর্য্যাপ্ত বস্ত্রালঙ্কার দিয়া ও নিরন্তর আদর করিয়া স্বামী তাহাকে সুখী করিতে পারিবেন না। তারপর সন্তানের শিক্ষার নিমিত্তও স্ত্রীর শিক্ষা আবশ্যক। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, সন্তানের শিক্ষা পিতা দিবেন তজ্জন্য মাতার শিক্ষার প্রয়োজন কি। এরূপ মনে করা ভ্রম। আমাদের প্রকৃত শিক্ষক, অন্ততঃ চরিত্রগঠন-বিষয়ে, মাতা। আমাদের শিক্ষা, বিদ্যালয়ে যাইবার বহুপূর্ব্বে, জননীর অঙ্কে আরব্ধ হয়। এবং তাঁহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক মুখভঙ্গি আমাদের শৈশবের কোমলচিত্তে নূতন নূতন ভাব চিরাঙ্কিত করিয়া দেয়। আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে আমাদের প্রকৃতি গঠিত হইতে থাকে। তারপর স্বামীর সমস্ত পরিবারের সুখই স্ত্রীর চরিত্রের উপর নির্ভর করে। তিনি প্রথমে গৃহের বধূ, কিছুদিন পরে গৃহের কর্ত্রী, এবং তাঁহারই গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্যের ও সকলের সহিত মিলিয়া চলিবার কৌশলের দ্বারা গৃহস্থের মঙ্গল সাধিত হয়।

স্ত্রীর শিক্ষা কেবল বিদ্যাশিক্ষা নহে, কেবল শিল্পশিক্ষা নহে। সে সকল শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল, কিন্তু স্ত্রীর অত্যাবশ্যক শিক্ষা কর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা। সে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বামীকে কর্ম্মিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক হইতে হইবে, এবং উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্তদ্বারা সেই শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা না হইলে কেবল উপদেশবাক্য সম্পূর্ণ কার্য্যকারক হইবে না।

স্ত্রীকে সাধ্যমত সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্ষমতা থাকিলেও স্ত্রীকে বিলাসপ্রিয় না করা তুল্য কর্ত্তব্য স্বামী যদি স্ত্রীর প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী হন তাহা হইলে তিনি কখনই স্ত্রীকে বিলাসপ্রিয় হইতে দিবেন না। *স্ত্রীকে সাধ্যমত সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা, কিন্তু বিলাসপ্রিয় না করা।*

সংসার কঠোর কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে বিলাসপ্রিয় হইলে কর্ত্তব্যপালনে বিঘ্ন ঘটে, এবং যে সুখের নিমিত্ত বিলাসলালসা করা যায় তাহাও পাওয়া যায় না। একথা প্রথমে অতিশয় কটু বলিয়া বোধ হইতে পারে। কেহ কেহ

---

[১] দায়ভাগ ১১।১।১।

মনে করিতে পারেন, স্ত্রী সহধর্মিণীও বটে, আনন্দদায়িনীও বটে, তিনি যদি মধ্যে মধ্যে একটু আধটু আমোদপ্রমোদদ্বারা স্বামীর আনন্দবিধান না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কর্ত্তব্যপালন নিমিত্ত কঠোর ভাব ধারণ করিয়া থাকেন, তবে সংসার অসহ্য স্থান হইয়া পড়িবে। কিন্ত এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সময়ে সময়ে আমোদ আহ্লাদ করিতে স্ত্রীর কেন, স্বামীর পক্ষেও কোন নিষেধ নাই। তবে আমোদ আহ্লাদ করা আর বিলাসপ্রিয় হওয়া এক নহে। আনন্দলাভের নিমিত্তই লোকে বিলাসের অনুসন্ধান করে, কিন্ত তাহাতে প্রকৃত আনন্দ হয় না। কারণ, প্রথমতঃ, বিলাসের দ্রব্য আহরণ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, তাহার সংগ্রহ হইলেও তাহাতে তৃপ্তি হয় না, দিন দিন নূতন নূতন ভোগবাসনা জন্মে, ও তাহার তৃপ্তি হওয়া ক্রমে কঠিন হইয়া উঠে, এবং তাহা তৃপ্ত না হইলেই ক্লেশ হয়। তৃতীয়তঃ, বিলাসের দিকে একবার মন গেলে ক্রমশঃ শ্রমসাধ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে অনিচ্ছা জন্মে। এবং চতুর্থতঃ, মনের দৃঢ়তার হ্রাস হয় ও কোন অবশ্যম্ভাবী অশুভ ঘটিলে তাহা সহ্য করিবার শক্তি থাকে না। এই জন্যই বিলাসপ্রিয়তা নিষিদ্ধ, এবং যাহাতে প্রকৃত আনন্দ লাভ হয় তাহারই অনুসন্ধানে তৎপর থাকা কর্ত্তব্য। বিলাসিতা পরিণামে দুঃখজনক হইলেও প্রথমে সুখকর ও হৃদয়গ্রাহী, এবং প্রকৃত ও স্থায়ী আনন্দলাভের নিমিত্ত যে সংযমশিক্ষা আবশ্যক তাহা প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্টকর। কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলে এবং বিলাসী ও সংযমী উভয়ের সুখদুঃখের জমাখরচ কাটিলে, সুখের ভাগ যে সংযমীরই অধিক তাহাতে সন্দেহ থাকিবে না। কারণ, সংযমীর কষ্ট যদিও প্রথমে একটু অধিক, অভ্যাসদ্বারা ক্রমশঃ তাহার হ্রাস হইয়া আইসে, ও তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে সংসার-সংগ্রামে জয়লাভযোগ্য বলসঞ্চয়জনিত আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে। এবং তাঁহার মন ক্রমে এরূপ সবল ও দৃঢ় হইয়া উঠে যে তিনি আর কোন অশুভ ঘটিলে বিচলিত হন না। যে-স্বামী স্ত্রীর চরিত্র এইরূপে গঠিত করিতে পারেন তিনি যথার্থই ভাগ্যবান্, ও তাঁহার স্ত্রীই যথার্থ ভাগ্যবতী।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য। অকৃত্রিম প্রেম অবিচলিত ভক্তি।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রেম ও অবিচলিত ভক্তি থাকা কর্ত্তব্য। স্ত্রীর নিকট অকৃত্রিম প্রেম পাইবার অভিলাষী সকলেই। তবে স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধ অনেকের মতে যেরূপ সমানে সমানে সম্বন্ধ, তাহাতে বোধ হয় একের প্রতি অন্যের ভক্তি সঙ্গত বলিয়া তাঁহাদের মনে হইবে না। কিন্ত এই পতিভক্তি কোন অনুদার প্রাচ্যমতের কথা নহে। উদার পাশ্চাত্ত্য কবি মিল্‌টন্ মানব-জননী ইভের মুখে স্বামিসম্বোধনে এই কথা বলাইয়াছেন—

"ঈশ্বর তোমার বিধি, তুমি হে আমার,
তব আজ্ঞা বিনা কিছু জানিব না আর,
এই মোর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এ মোর গৌরব।"[১]

---

[১] " God is thy law, thou mine ; to know no more
Is woman's happiest knowledge and her praise."
Paradise Lost, Bk, IV.

স্বামীর ইচ্ছানুগামী হইয়া চলা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে উভয়ের একত্র থাকা অসম্ভব। দুই জনের ইচ্ছা সকল বিষয়ে ঠিক এক হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং একজন অপরের ইচ্ছানুগামী না হইলে বিবাদ অনিবার্য্য। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছায় চলিবেন, ইহাই সঙ্গত বোধ হয়। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ অধিকতর সবলদেহ বা প্রবলমনা বলিয়া একথা বলিতেছি না। স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের দেহের বল অধিক বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পুরুষ স্ত্রীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে ইহা কার্য্যত: অনিবার্য্য হইলেও ন্যায়ত: কর্ত্তব্য নহে। পুরুষের মনের বল স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক হইলে তাঁহার প্রাধান্য ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু সে আধিক্য সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন, এবং সে সন্দেহ ভঞ্জন করা কঠিন, ও এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে, নৈসর্গিক নিয়মানুসারে স্ত্রীকে গর্ভধারণ ও সন্তান পালনার্থে মধ্যে মধ্যে কিছুদিনের নিমিত্ত অন্য কর্ম্মে অক্ষম থাকিতে হয়। পুরুষ সকল সময়েই কর্ম্মক্ষম থাকে। সুতরাং অন্তত: এই কারণে পারিবারিক কার্য্যে পুরুষকেই প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক।

যথেচ্ছা গমনাগমন সম্বন্ধে স্বামীর অপেক্ষা স্ত্রীর স্বাধীনতা অল্প। এ বিষয়ে স্ত্রীকে স্বামীর মতে চলা নানা কারণে কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, স্ত্রীর হিতাহিত স্বামীই অনেক স্থলে ভাল বুঝিবেন। এই স্বাধীনতার বৈষম্য সম্ভবমত সীমার মধ্যে থাকিলে কোন পক্ষের অনিষ্টকর না হইয়া সকলেরই হিতকর হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্বাধীনভাবে বাহিরে বাহিরে বেড়াইলে গৃহকর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক দেখা শুনা হইতে পারে না, এবং কর্ম্ম ভাগ করিয়া লইতে গেলে বাহিরের কর্ম্মের ভার স্বামীর উপর ও গৃহকর্ম্মের ভার স্ত্রীর উপর থাকাই যথাযোগ্য ব্যবস্থা। স্ত্রীকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্ত:পুরে একবারে অবরুদ্ধ রাখা যেমন অন্যায় তেমনই নিষ্ফল। মনু যথার্থই বলিয়াছেন।

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈ রাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥"[১]

(সে নহে রক্ষিতা গৃহে রুদ্ধ রাখে যারে।
সুরক্ষিতা সেই ত যে রক্ষে আপনারে॥)

ধর্ম্মকার্য্যে (যথা তীর্থাদিতে গমনে) ও গৃহকার্য্যে (যথা অতিথি আদির সেবায়) হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নিষেধ নাই, এবং তাঁহারা উপস্থিত হইয়া থাকেন। তবে আমোদ-প্রমোদার্থে তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে বাহির হন না, এবং সে প্রথা নিতান্ত অন্যায়ও বলা যায় না।

---

১ মনু ৯।১২।

আমোদ-প্রমোদ আত্মীয়স্বজনের সম্মুখে সাজে। তাহা যার তার নিকট ও যথা তথা, স্ত্রীলোকের পক্ষে কেন পুরুষের পক্ষেও বিধেয় নহে। তাহাতে চিত্তের ধীরতা নষ্ট হয়, এবং প্রবৃত্তিসকল অসংযত হইয়া উঠে।

বিবাহসম্বন্ধের নিবৃত্তি।

একণে বিবাহসম্বন্ধের নিবৃত্তি কোন্ অবস্থায় হইতে পারে, বা কখনও হওয়া উচিত কি না, এই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

ইচ্ছামত হওয়া অনুচিত।

ভাবিয়া না দেখিলে প্রথমে মনে হইতে পারে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন বাধা নাই। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে এরূপ গুরুতর সম্বন্ধের সেরূপ নিবৃত্তি কোন মতে ন্যায়-সঙ্গত হইতে পারে না। তাহা হইলে দুর্নিবার ইন্দ্রিয়ের সংযত তৃপ্তি, সন্তান উৎপাদন ও পালন, দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যস্নেহ হইতে ক্রমশঃ স্বার্থপরতা ত্যাগ ও পরার্থপরতা অভ্যাস, প্রভৃতি বিবাহসংস্কারের সদুদ্দেশ্য-সাধন ঘটে না। কারণ তাহা হইলে প্রকারান্তরে যথেচ্ছা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রশ্রয় পাইবে, জনকজননীর বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইলে সন্তানেরা পালনকালে হয় পিতার না হয় মাতার, কখন বা উভয়েরই, যত্ন হইতে বঞ্চিত হইবে, দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যস্নেহ পশুপক্ষী অপেক্ষা মনুষ্যের অধিক আছে বলিয়া আর গৌরব করিবার অধিকার থাকিবে না, এবং স্বার্থপরতা, ত্যাগ ও পরার্থপরতা অভ্যাস স্থলে তদ্বিপরীত শিক্ষালাভ হইবে। যদিও পাশ্চাত্ত্য নীতিবেত্তা বেন্থামের[১] মতে বিবাহবন্ধন উভয় পক্ষের স্বেচ্ছায় ছেদ্য হওয়া উচিত, কিন্তু সে মত অনুযায়ী প্রথা সভ্যসমাজে কোথাও প্রচলিত হয় নাই।

যথেষ্ট কারণে হওয়া নানা-দেশে বিধিসিদ্ধ, কিন্তু তাহা উচ্চাদর্শ নহে।

কেবল পক্ষদিগের ইচ্ছায় না হউক, উপযুক্ত কারণে বিবাহবন্ধন ছেদ্য হওয়া উচিত, অনেকেরই এই মত, এবং অনেক সভ্যসমাজের প্রচলিত প্রথা সেই মতানুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এ মত ও এ প্রথা উচ্চাদর্শের বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বটে উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, যদি অতি গর্হিত হয় তাহা হইলে তাহাদের একত্র থাকা অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু যেখানে তাহারা জানে যে ঐরূপ অবস্থায় তাহারা বিবাহবন্ধনমুক্ত হইতে পারে সেখানে সেই মুক্তিলাভের ইচ্ছাই কতকটা সেরূপ ব্যবহারের উত্তেজক হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে, যেখানে তাহারা জানে যে তাহাদের বন্ধন অচ্ছেদ্য, সেখানে সেই জ্ঞান ঐরূপ ব্যবহারের প্রবল নিবারকের কার্য্য করে। হিন্দুসমাজই এ কথার প্রমাণ। আমি বলিতেছি না যে হিন্দুসমাজে বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য বলিয়া স্ত্রীপুরুষের গুরুতর বিবাদ ঘটে না। কিন্তু ঘটিলেও তাহা এত অল্প স্থলে ও এরূপভাবে ঘটে যে, তজ্জন্য সমাজের বিশেষ বিঘ্ন হয় না, এবং

---

[১] **Bentham's *Theory of Legislation*, Principles of the Civil Code, Part III, Ch. V, Sec. II** দ্রষ্টব্য।

বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের বিধিসংস্থাপনের প্রয়োজন আছে বলিয়া এখনও কেহ মনে করেন না।

যে স্থলে একপক্ষের ব্যবহার অপর পক্ষের প্রতি অত্যন্ত গর্হিত ও কলুষিত, সে স্থলে বিবাহবন্ধন হইতে শেষোক্ত পক্ষের মুক্তিলাভ অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া অনেকেই মনে করিতে পারেন। যে ব্যক্তি নিজে নির্দ্দোষ এবং কেবল অন্যের দোষে কষ্ট পান, অবশ্যই সকলে তাঁহার জন্য দুঃখিত, ও তাঁহার ক্লেশ-নিবারণে চেষ্টিত হইতে পারে। কিন্তু বিবাহবন্ধন-মুক্ত হইয়া তাঁহার যে শান্তি ও সুখলাভ হয় তাহা জীবনসংগ্রামে বিজয়ীর সুখশান্তি নহে, তাহা সেই সংগ্রামে অশক্ত হইয়া পলায়নদ্বারা যে নিষ্কৃতিলাভ হয় তদ্ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব বিবাহবন্ধনমোচন নির্দ্দোষ পক্ষের সুখকর ও গৌরবজনক নহে। এবং তদ্দ্বারা দোষী পক্ষের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে। পাপভারাক্রান্ত ব্যক্তি পুণ্যাত্মার সহিত মিলিত থাকিলে কোন প্রকারে কষ্টে সঙ্গীর সাহায্যে সংসারসিন্ধুতরণসমর্থ হইতে পারে, কিন্তু সঙ্গীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে একা তাহার পার হইবার উপায় থাকে না। যাহার সহিত চিরকাল একত্র থাকিবার ও সুখদুঃখের সমভাগী হইবার অঙ্গীকারে বিবাহগ্রন্থিবন্ধন হইয়াছিল, তাহাকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পরিত্যাগ করা অতি নিষ্ঠুরের কার্য্য। সত্য বটে প্রণয়ে প্রতারণার যন্ত্রণা অতি তীব্র, সত্য বটে পাপের সংসর্গ অতি ভয়ানক। কিন্তু যাহারা পরস্পরকে সুপথে রাখিবার ভার আপন আপন শিরে লইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন কুপথে গেলে অপরের তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে। বরং তাহার দোষ নিবারণের উপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই বলিয়া সন্তপ্ত হওয়া, এবং সে দোষ কতকটা নিজ কর্ম্মফল বলিয়া মনে করা উচিত। পার্থিব প্রেম প্রতিদানাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু প্রণয় আদৌ স্বর্গীয় বস্তু, নিষ্কাম ও পবিত্র, এবং পাপস্পর্শে কলুষিত হইবার ভয় রাখে না, বরং সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নিজ পবিত্র তেজে অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া লয়। পবিত্র প্রেমের অমৃতরস এতই প্রগাঢ় মধুর যে, তাহা হিংসাদ্বেষাদির কটুতিক্ত রসকে আপন মধুরতায় একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। দাম্পত্য প্রেমের আদর্শও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। এক পক্ষ হইতে পবিত্র প্রেমের সুধাধারা অজস্র বর্ষিত হইলে, অপর পক্ষ যতই নীরস হউক তাহাকে আর্দ্র হইতে হইবে, যতই কটু হউক তাহাকে মধুর হইতে হইবে, যতই কলুষিত হউক তাহাকে পবিত্র হইতে হইবে। এ সকল কথা কাল্পনিক নহে। সকল দেশেই দাম্পত্য প্রেমের এই মধুময় পবিত্র ফল ফলিয়া থাকে, এবং অনেকেই অনেক স্থানে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। ভারতে হিন্দুসমাজে আর যতই দোষ থাকুক, দাম্পত্য প্রেমের অতি উচ্চাদর্শই সমস্ত দোষসত্ত্বেও হিন্দু পরিবারকে এখনও সুখের আবাস করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই সমাজে বিবাহবন্ধন-ছেদনের প্রয়োজনীয়তা কাহাকেও অনুভব করিতে দেয় নাই। অতএব উপযুক্ত কারণে বিবাহবন্ধন ছেদ্য হওয়ার প্রথা নানাদেশে প্রচলিত থাকিলেও তাহা উচ্চাদর্শ নহে।

একপক্ষের মৃত্যুতেও বিবাহবন্ধন ছিন্ন হওয়া বিবাহের উচ্চাদর্শ নহে।

একপক্ষের মৃত্যুতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হওয়া উচিত কি না ইহা বিবাহ-বিষয়ক শেষ প্রশ্ন। মৃত্যুতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়, এইমত প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত, কেবল পজিটিভিষ্ট্ সম্প্রদায়ের[১] মধ্যে এবং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহা অনুমোদিত নহে। যদিও হিন্দুশাস্ত্রমতে এক স্ত্রী বিয়োগের পর স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে প্রথম স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধনিবৃত্তি বুঝায় না, কারণ প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমানেও হিন্দু স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও হিন্দুশাস্ত্রে তাহা সমাদৃত নহে।[২] স্ত্রীর যেমন পতিবিয়োগের পর অন্য পতি গ্রহণ অনুচিত, স্বামীর পক্ষেও তেমনই স্ত্রীবিয়োগের পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ অনুচিত, কম্‌টির এই মত যে বিবাহের উচ্চাদর্শ অনুযায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সেই উচ্চাদর্শ অনুসারে জনসাধারণ চলিতে পারিবে এখনও এ আশা করা যায় না। প্রায় সকল দেশেই ইহার বিপরীত রীতি প্রচলিত, এবং হিন্দুসমাজে সেই উচ্চাদর্শানুযায়ী প্রথা যতদূর প্রচলিত আছে তাহা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের অধিক অনুকূল, এই পক্ষপাত দোষ-জন্য সে প্রথা অন্য সমাজের লোকের নিকট এবং হিন্দুসমাজের সংস্কারকদিগের নিকট সমাদৃত নহে, বরং তাহা অতি অন্যায় বলিয়া নিন্দিত।

চিরবৈধব্য বিধবাজীবনের উচ্চাদর্শ।

কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, যদি দেশের অর্দ্ধেক লোক কোন উচ্চাদর্শানুযায়ী প্রথা পালন করে, অপরার্দ্ধ তাহা পালন না করিলে তাহারাই নিন্দনীয়, প্রথা নিন্দিত হইতে পারে না। চিরবৈধব্য উচ্চাদর্শের প্রথা হইলে, পুরুষেরা পত্নীবিয়োগের পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে বলিয়া, সে প্রথা রহিত করা কর্ত্তব্য নহে। বরং পুরুষেরা যাহাতে সেই উচ্চাদর্শানুসারে চলিতে পারে তদ্বিষয়ে যত্ন করাই সমাজসংস্কারকদিগের উচিত। অতএব মূল প্রশ্ন এই যে, পুরুষেরা যাহাই করুক না কেন, স্ত্রীলোকদিগের চিরবৈধব্য-পালন জীবনের উচ্চাদর্শ বটে কি না।

এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে, বিবাহের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বিবাহের প্রথম উদ্দেশ্য অবশ্যই সংযতভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধন এবং সন্তান-উৎপাদন ও সন্তানপালন। কিন্তু তাহাই বিবাহের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নহে। বিবাহের দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যস্নেহ হইতে ক্রমশঃ চিত্তের সৎপ্রবৃত্তিবিকাশ ও তদ্দ্বারা মনুষ্যের স্বার্থপরতাক্ষয়, পরার্থপরতাবৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ। যদি প্রথম উদ্দেশ্য বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, সন্তান জন্মাইবার পূর্ব্বে পতিবিয়োগ হইলে দ্বিতীয় পতিবরণে বিশেষ দোষ থাকিত না। তবে সন্তান জন্মাইবার পর দ্বিতীয়

[১] Comte's *System of Positive Polity*, Vol. II, Ch. III, p. 157 দ্রষ্টব্য।

[২] Colebrooke's *Digest of Hindu Law*, Bk. IV, 51, 55; Manu III, 12, 13 দ্রষ্টব্য।

পতিগ্রহণে সে সন্তানপালনের ব্যাঘাত হইত, সুতরাং সে স্থলে চিরবৈধব্য, কেবল উচ্চাদর্শ কেন, প্রয়োজনীয় হইত। কিন্তু বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চিরবৈধব্যপালনই যে উচ্চাদর্শ তৎপ্রতি কোন সন্দেহ থাকে না।

যে পতিপ্রেমের বিকাশ ক্রমশঃ পত্নীর স্বার্থপরতাক্ষয়ের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির হেতু হইবে, তাহা যদি পতির অভাবে লোপ পায়, এবং আপনার সুখের নিমিত্ত যদি পত্নী তাহা অন্য পতিতে ন্যস্ত করেন, তাহা হইলে আর স্বার্থপরতা-ক্ষয় কি হইল? ইহার উত্তরে কখন কখন বিধবাবিবাহের অনুকূল পক্ষদিগের নিকট এই কথা শুনা যায় যে, যাঁহারা বিধবাবিবাহ নিষেধ করেন তাঁহারা বিবাহ কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত আবশ্যক মনে করেন, ও বিবাহের উচ্চাদর্শ ভুলিয়া যান। বাস্তবিক বিধবার বিবাহ করা যে কর্ত্তব্য তাহা কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত নহে, তাহা পতিপ্রেম, অপত্যস্নেহাদি উচ্চবৃত্তি সকলের বিকাশার্থ। একথা একটু বিচিত্র বটে। বিধবাবিবাহের নিষেধ বিধবার আধ্যাত্মিক উন্নতির বাধাজনক, ও বিধবাবিবাহের বিধি সেই উন্নতিসাধনের উপায়, দেখা যাউক এ কথা কতদূর সঙ্গত। পতিপ্রেম, একদাই সুখের আকর ও স্বার্থপরতাক্ষয়ের উপায়। কিন্তু তাহা সুখের আকর বলিয়া, অর্থাৎ বৈষয়িক ভাবে, অধিক আদৃত হইলে, তদ্দ্বারা স্বার্থপরতাক্ষয়ের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাববিকাশের সম্ভাবনা অল্প। বিধবার আধ্যাত্মিক ভাবে পতিপ্রেম অনুশীলনার্থ দ্বিতীয় পতিবরণ নিষ্প্রয়োজন, পরন্তু বাধাজনক। তিনি প্রথম পতি পাইবার সময়ে তাঁহাকেই পতিপ্রেমের পূর্ণ আধার মনে করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার মৃত্যুর পর স্মৃতিতে স্থাপিত তাঁহার মূর্ত্তি জীবিত রাখিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম অবিচলিত রাখিতে পারিলে তাহাই নিঃস্বার্থ প্রেমের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধন। সে প্রেমের অবশ্যই প্রতিদান পাইবেন না, কিন্তু উচ্চাদর্শের প্রেম প্রতিদান চাহে না। পক্ষান্তরে বিধবার পত্যন্তরগ্রহণে তাঁহার পতিপ্রেমানুশীলনের গুরুতর সঙ্কট অবশ্যই ঘটিবে। যে প্রথম পতিতে পতিপ্রেমের পূর্ণাধার বলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভুলিতে হইবে, হৃদয়ে অঙ্কিত তাঁহার মূর্ত্তি মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এবং তাঁহাতে অর্পিত প্রেম তাঁহা হইতে ফিরাইয়া লইয়া অন্য পাত্রে ন্যস্ত করিতে হইবে। এ সকল কার্য্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনের গুরুতর বাধাজনক ভিন্ন কখনই তদুপযোগী হইতে পারে না। সত্য বটে মৃতপতির মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তৎপ্রতি প্রেম ও ভক্তি অবিচলিত রাখা অতি কঠিন কার্য্য, কিন্তু তাহা যে অসাধ্য বা অসুখকর নহে, হিন্দু বিধবার পবিত্র জীবনই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সকলেই যে চিরবৈধব্যপালনে সমর্থ এ কথা বলি না। যিনি অক্ষম তাঁহার জন্য হৃদয় অবশ্যই ব্যথিত হয়, এবং তিনি যদি পত্যন্তর গ্রহণ করেন তাঁহাকে মানবীই বলিব, কিন্তু যিনি পবিত্র ভাবে চিরবৈধব্যপালনে সমর্থ, তাঁহাকে দেবী বলিতে হইবে, এবং তাঁহার জীবনই বিধবাজীবনের উচ্চাদর্শ অবশ্যই বলা কর্ত্তব্য।

বিধবাবিবাহের প্রথার অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি।

চিরবৈধব্য উচ্চ আদর্শ ইহা স্বীকার করিয়াও অনেকে বলেন, সে উচ্চাদর্শ সাধারণের পক্ষে অনুসরণযোগ্য নহে, এবং সাধারণের পক্ষে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে অনুকূল যুক্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

এই আলোচনার পূর্ব্বেই কএকটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলা কর্ত্তব্য। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিতেছিলাম তাহা হিন্দুশাস্ত্রের কথা নহে, সামান্য যুক্তির কথা। এবং বলা আবশ্যক, এখনও যে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাও কেবল যুক্তিমূলক আলোচনা, হিন্দুশাস্ত্রমূলক আলোচনা নহে। সুতরাং বিধবাবিবাহ কখনও হওয়া উচিত কি না ? এ প্রশ্ন এখানে উঠিতেছে না। চিরবৈধব্যপালন উচ্চাদর্শ হইলেও সে আদর্শানুসারে সকলেই যে চলিতে পারে এরূপ মনে করা যায় না। বৈধব্য যে দুর্ব্বলদেহধারিণী মানবীর পক্ষে প্রথম অবস্থায় কষ্টকর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই কষ্ট কখন কখন, যথা বালবৈধব্যস্থলে, মর্ম্মবিদারক, এবং বিধবার কষ্টে সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইবে। যিনি আধ্যাত্মিক বলে সে কষ্ট অকাতরে সহ্য করিয়া ধর্ম্মব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাঁহার কার্য্য অবশ্যই প্রশংসনীয়। যিনি তাহা করিতে অক্ষম, তাঁহার কার্য্য প্রশংসনীয় নহে, তবে সে কার্য্যের নিন্দা করাও উচিত নহে। কারণ আমরা অবস্থার অধীন, আমাদের দোষগুণ সংসর্গজাত। পিতামাতার নিকট হইতে যেরূপ দেহ ও মন প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও নিত্য আহার-ব্যবহার দ্বারা সেই দেহ ও মন যেরূপ গঠিত হইয়াছে, তাহারই উপর আমাদের কার্য্যাকার্য্য নির্ভর করে। সুতরাং যদি কেহ চিরবৈধব্যপালনে অক্ষম হন, তাঁহার অক্ষমতার জন্য দায়িত্ব কেবল তাঁহার নহে, সে দায়িত্ব তাঁহার পিতামাতার উপর, তাঁহার শিক্ষাদাতার উপর, এবং তাঁহার সমাজের উপরও বর্ত্তে। তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই, এবং সে বিবাহ, হিন্দুশাস্ত্র যাহাই বলুন, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বিধিবদ্ধ ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন অনুসারে সিদ্ধ। অতএব প্রয়োজন হইলে বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত কি না, এ প্রশ্ন অন্য সমাজের ত কথাই নাই, হিন্দুসমাজেও আর উঠিতে পারে না। এক্ষণকার প্রশ্ন এই যে, বিধবাবিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রথা হওয়া, এবং চিরবৈধব্যপালন উচ্চাদর্শ হইলেও তাহা সেই প্রথার ব্যতিক্রমস্বরূপ থাকা উচিত, কি চিরবৈধব্যপালনই প্রচলিত প্রথা হওয়া, ও বিধবাবিবাহ তাহার ব্যতিক্রমস্বরূপ থাকা উচিত। এই প্রশ্নের সদুত্তর কি তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

যে সকল দেশে বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে সেখানে যে তাহা উঠিয়া যাইবে এ সম্ভাবনা নাই। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত কম্‌ট অনেকদিন হইল চিরবৈধব্যপালনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথায় পাশ্চাত্ত্য প্রথার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তবে অধুনা পাশ্চাত্ত্য স্ত্রীলোকেরা

আপনাদের স্বাধীনতাসংস্থাপন নিমিত্ত যেরূপ দৃঢ়ব্রত ও বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহাতে বিধবা কেন কুমারীরাও বোধ হয় ক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক হইবেন, এবং তাহা হইলে হয়ত তাঁহাদের সেই দৃঢ়ব্রতের একটি ফলস্বরূপ, পাশ্চাত্য দেশের পবিত্র চিরবৈধব্যের উচ্চাদর্শ সংস্থাপিত হইতে পারিবে। কিন্তু সে সকল দূরের কথা। এক্ষণে নিকটের কথা এই যে হিন্দুসমাজে যে চিরবৈধব্যপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা উঠিয়া যাওয়া উচিত কিনা।

এই প্রথার প্রতিকূলে যে সকল কথা আছে তাহা এই। প্রথমতঃ ইহা বলা হয় যে, এ প্রথার ফল স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি অতি বিসদৃশ। এ আপত্তির উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ আলোচনা পূর্ব্বে হইয়াছে। পুরুষেরা স্ত্রীবিয়োগের পর পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন বলিয়াই যে স্ত্রীলোকেও পতিবিয়োগের পর পত্যন্তর গ্রহণ করিবেন, ইহা অসঙ্গত প্রতিহিংসা। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে স্ত্রীপুরুষের অধিকারবৈষম্য অনিবার্য্য। সন্তান-উৎপাদন ও সন্তানপালনে প্রকৃতিকর্ত্তৃকই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর উপর অধিক ভার ন্যস্ত। ভ্রূণের বাসস্থান মাতৃগর্ভে, শিশুর আহার মাতৃবক্ষে। স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় বা সন্তানের শৈশবাস্থায় পতিবিয়োগ হইলে পত্যন্তর গ্রহণে অবশ্যই বিলম্ব করিতে হইবে। তার পর এ সকল দেহের কথা ছাড়িয়া দিয়া, মনের ও আত্মার কথা দেখিতে গেলেও স্ত্রীপুরুষের অধিকারবৈষম্য অবশ্যই থাকিবে, এবং সে কথা পুরুষের পক্ষপাতী হইয়া বলিতেছি না, স্ত্রীর পক্ষপাতী হইয়াই বলিতেছি। পুরুষকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থে অনেক সময় কঠোর ও নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে হয়, এবং তজ্জন্য হৃদয় ও মন নিষ্ঠুর হইয়া যায়, ও আত্মার পূর্ণ বিকাশের বাধা জন্মে। স্ত্রীকে তাহা করিতে হয় না। সুতরাং তাঁহার হৃদয় ও মন কোমল থাকে। তদ্ভিন্ন স্বভাবতঃই বোধ হয় সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার মতি স্থিতি-শীল ও নিবৃত্তিমার্গমুখী, তাঁহার সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগশক্তি ও পরার্থপরতা, পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং তাঁহার পক্ষে স্বার্থত্যাগের নিয়ম যদি পুরুষের সম্বন্ধীয় নিয়মাপেক্ষা কঠিনতর হইয়া থাকে, তিনি তাহা পালনে সমর্থ বলিয়াই সেরূপ হইয়াছে, এবং সেই নিয়মবৈষম্য তাঁহার গৌরব ভিন্ন লাঘবের বিষয় নহে। এই জন্য এস্থলে তাঁহার প্রতিহিংসা অসঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এবং যাঁহারা তাঁহাকে সেই অসঙ্গত প্রতিহিংসায় প্রোৎসাহিত করেন তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রকৃত বন্ধু বলিতে সন্দেহ হইতেছে।

চিরবৈধব্যপ্রথার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ইহা অতি নির্দ্দয় প্রথা, ইহা বিধবাদিগের দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণার প্রতি দৃক্‌পাতও করে না। বিধবার দৈহিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে এ আপত্তি অতি প্রবল বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিধবার দৈহিক কষ্টের জন্য ব্যথিত না হয় এরূপ নির্দ্দয় হৃদয় অতি অল্পই আছে। কিন্তু মানুষ কেবল দেহী নহে, মানুষের মন ও আত্মা দেহ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্, অধিক প্রবল। দেহরক্ষার নিমিত্ত

কতকগুলি অভাব অবশ্য পূরণীয়। কিন্তু মনের ও আত্মার উপর দেহের প্রভুত্ব অপেক্ষা দেহের উপর মনের ও আত্মার প্রভুত্ব অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এবং দেহের কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিলে যদি মনের ও আত্মার উন্নতি হয়, তবে সে কষ্ট কষ্ট বলিয়া গণ্য নহে। দেহের কষ্ট স্বীকার করিয়া বুদ্ধিদ্বারা প্রবৃত্তির শাসন, ও ভাবী অধিক সুখের উদ্দেশে বর্ত্তমান অল্প সুখের লোভ সম্বরণই মানবজাতির পশু হইতে শ্রেষ্ঠত্বের ও উত্তরোত্তর ক্রমোন্নতির কারণ। পশু ক্ষুধার্ত্ত হইলে আত্মপর বিচার না করিয়া সম্মুখে যে খাদ্যদ্রব্য পায় তাহাই ভক্ষণ করে। অসভ্য মনুষ্য প্রয়োজন হইলে আত্মপর বিচার না করিয়া নিকটে যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য পায় তাহাই গ্রহণ করে। সভ্য মনুষ্য সহস্র প্রয়োজন হইলেও পরস্বাপহরণে পরাঙ্মুখ থাকে। বিধবা যদি কিঞ্চিৎ দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়া চিরবৈধব্যপালনদ্বারা সমধিক আত্মোন্নতি ও পরহিতসাধনে সমর্থ হন, তবে সে কষ্ট তাঁহার কষ্ট নহে, এবং যাঁহারা তাঁহাকে সে কষ্ট স্বীকার করিতে উপদেশ দেন, তাঁহারা তাঁহার মিত্র ভিন্ন শত্রু নহেন। চিরবৈধব্য পালন করিতে গেলে অন্যান্য সৎকর্ম্মের ন্যায় তাহার নিমিত্তও শিক্ষা ও সংযম আবশ্যক। বিধবার আহার-ব্যবহার সংযত ও ব্রহ্মচর্য্যোপযোগী হওয়া আবশ্যক। মৎস্যমাংসাদি শারীরিকবৃত্তি, উত্তেজক আহার ও বেশভূষা বিলাসবিভ্রমাদি মানসিক প্রবৃত্তি উত্তেজক ব্যবহার, পরিত্যাগ না করিলে চিরবৈধব্যপালন কঠিন। এই জন্য বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা। ব্রহ্মচর্য্যপালনে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর আহারবিহারাদি কিঞ্চিৎ দৈহিক সুখভোগ পরিত্যাগ করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নীরোগ, সুস্থ, সবল শরীর ও তজ্জনিত মানসিক স্ফূর্ত্তি ও সহিষ্ণুতা, এবং তৎফলে বিশুদ্ধ স্থায়ী সুখ পাওয়া যায়। অতএব ব্রহ্মচর্য্য আপাততঃ কঠোর বোধ হইলেও তাহা বাস্তবিক চিরসুখের আকর। না বুঝিয়া অদূরদর্শীরা ব্রহ্মচর্য্যের নিন্দা করে, এবং না জানিয়াই ভারতব্যবস্থাপকসভার একজন মনস্বী সভ্য বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ভয়াবহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন কথা আছে। বিধবা কন্যা বা পুত্রবধুকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইতে হইবে, পিতামাতা বা শ্বশুর-শ্বশ্রূকেও আহার-ব্যবহারে সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়। কিন্তু তাহা তাঁহাদের পক্ষে, আপাততঃ অসুখকর হইলেও, পরিণামে শুভকর, এবং কন্যা বা পুত্রবধূর চিরবৈধব্যপালনজনিত পুণ্যের ফল বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যপালনে দীক্ষিত হইয়া সুস্থসবল শরীরে বিধবা নানা সৎকর্ম্মে দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন, যথা—পরিজনবর্গের শুশ্রূষা, পরিবারস্থ শিশুদিগের লালনপালন ও রোগীর সেবা, ধর্ম্মচর্চ্চা, নিজের শিক্ষালাভ ও পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাপ্রদান। এইরূপে তীব্র কিন্তু দুঃখজড়িত বৈষয়িক সুখে না হউক, প্রশান্ত নির্ম্মল আধ্যাত্মিক সুখে, বিধবার পরহিতে নিয়োজিত জীবন কাটিয়া যায়। ইহা কাল্পনিক চিত্র নহে। এই শান্তিময় জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র চিত্র এখনও ভারতে অনেক গৃহ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমার অযোগ্য

লেখনী তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিতে অক্ষম। যে প্রথার ফল বিধবার পক্ষে ও তাঁহার পরিজনবর্গের পক্ষে পরিণামে এত শুভকর, তাহার আপাততঃ কঠোরতা দেখিয়া তাহাকে নির্দ্দয় বলা উচিত নহে।

চিরবৈধব্যপ্রথার প্রতিকূলে তৃতীয় আপত্তি এই যে, এ প্রথার অনেক কুফল আছে, যথা গুপ্তব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা। এরূপ কুফল যে কখনও ফলে না একথা বলা যায় না। কিন্তু তাহার পরিমাণ কত? দুই একটা স্থলে এরূপ ঘটে বলিয়া প্রথা নিন্দনীয় হইতে পারে না। বিধবার মধ্যে কেন, সধবার মধ্যেই কি ব্যভিচার নাই? কিন্তু এ বিষয় লইয়া অধিক কথা বলা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন, কারণ বিধবার বিবাহ এক্ষণে আইন অনুসারে সিদ্ধ, এবং যিনি চিরবৈধব্যপালনে অক্ষম তিনি ইচ্ছা করিলেই বিবাহ করিতে পারেন। তাঁহার নিমিত্ত প্রথা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।

চিরবৈধব্যপ্রথার বিরুদ্ধে চতুর্থ ও শেষ কথা বোধ হয় এই যে, এ প্রথা যতদিন প্রচলিত থাকিবে ততদিন বিধবারা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে, বা তাঁহাদের পিতামাতা ইচ্ছামত তাঁহাদের বিবাহ দিতে সাহস করিবেন না। কারণ, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সকলেই সঙ্কুচিত হয়, এবং সেইরূপ কার্য্য জনসমাজে নিন্দিত অথবা অত্যন্ত অনাদৃত হয়। অতএব আন্দোলন-দ্বারা লোকের মত পরিবর্ত্তন করিয়া, যাহাতে এ প্রথা উঠিয়া যায় তাহা করা সমাজসংস্কারকদিগের কর্ত্তব্য।

এই জন্যই বোধ হয় বিধবাবিবাহ এক্ষণে আইন সিদ্ধ হইলেও, এবং তাহাতে বাধা দিতে কাহার কোন অধিকার না থাকিলেও, বিধবাবিবাহের অনুকূলপক্ষগণ চিরবৈধব্যপ্রথা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত এত যত্নবান্। যদিও তাঁহারা অথবা তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি স্বীকার করেন, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চিরবৈধব্যপালন উচ্চাদর্শ, তথাপি তাঁহারা চাহেন যে, সেই উচ্চাদর্শ পালন, প্রথা না হইয়া প্রথার ব্যতিক্রম স্বরূপ থাকে, এবং বিধবাবিবাহই প্রচলিত প্রথা হয়। যখন ইচ্ছা করিলেই বিধবার বিবাহ অবাধে হইতে পারে, তখন কেন যে তাঁহারা স্বীকৃত উচ্চাদর্শানুযায়ী প্রথা উঠাইয়া দিয়া বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে চাহেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহারা চির-কৌমারব্রতের ভুরি প্রশংসা করেন, অথচ চিরবৈধব্যপ্রথা উঠাইবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর, ইহা বিচিত্র বলিয়া বোধ হয়। যদি এ প্রথা প্রয়োজন বা ইচ্ছামত বিধবাবিবাহের বাধাজনক হইত তাহা হইলে তাহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টার কারণ থাকিত। কিন্তু সমাজবন্ধন এখন এত শিথিল, ও সমাজের শক্তি এখন এত অল্প যে, সমাজের প্রথা কাহারও ইচ্ছার গতি রোধ করিতে পারে না। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যদিও উক্ত প্রথা বিধবার বিবাহে ইচ্ছা জন্মিলে তাহাকে বাধা দিতে পারে না, কিন্তু সেই ইচ্ছা জন্মাইবার প্রতি-বন্ধকতা করে। আর সেই জন্যই যদিও অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিককাল বিধবা-বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অদ্যাপিও হিন্দুবিধবার বিবাহসম্বন্ধে

সাধারণতঃ পূর্ব্বরূপ অনিচ্ছার পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহা হইলে কথাটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে, হিন্দুবিধবাদিগের বিবাহে অনিচ্ছা রহিত করিয়া তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মানই সমাজসংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্যসাধনের ফল কি? তাহাতে বিধবাদিগের কিঞ্চিৎ ক্ষণভঙ্গুর ঐহিক সুখ হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা না তাহাদের কোন স্থায়িসুখ, না সমাজের কোন বিশেষ মঙ্গল হইবে। পক্ষান্তরে, পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে, চিরবৈধব্যপালনে তাহাদের স্থায়ী নির্ম্মলসুখ ও সমাজের প্রভূত শুভ সম্পাদিত হয়। আত্মসংযম, স্বার্থ ত্যাগ, পরার্থপরায়ণতা প্রভৃতি উচ্চগুণের বিকাশ অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্যের ক্রমোন্নতির লক্ষণ বলিয়া আমরা স্বীকার করি, কিন্তু বিধবার বিবাহ বিষয়ে তদ্বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহি, ইহার কারণ বুঝা ভার। হয়ত কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন, পাশ্চাত্ত্যদেশে বিধবাবিবাহপ্রথা প্রচলিত, ও সেই সকল দেশেই বৈষয়িক উন্নতি অধিক, অতএব আমাদের দেশেও সেই প্রথা প্রচলিত হইলে সেইরূপ উন্নতিলাভ হইবে। কিন্তু একথা আদৌ যুক্তিসিদ্ধ নহে। বাল্যবিবাহের সহিত দেশের অবনতির কার্য্যকারণসম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু চিরবৈধব্যপালনের সহিত দেশের অবনতির কি সম্বন্ধ বুঝা যায় না। যদি একথা ঠিক হইত যে, সমাজে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অধিক, এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হইলে অনেক পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হয়, আর তজ্জন্য দেশের লোকসংখ্যা সমুচিত বৃদ্ধি হইতেছে না, তাহা হইলেও একথা বুঝা যাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরুষ সংখ্যায় স্ত্রী অপেক্ষা অল্প, সুতরাং বিধবার বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলে সকল কুমারী স্বামী পাইবেন না। অতএব পাশ্চাত্ত্যদেশের রীতিনীতি সমস্তই অনুকরণীয়, ইহা স্বীকার না করিলে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টার কারণ উপলব্ধি হয় না।

শীতোষ্ণময় জড়জগতে তাহাকেই সবলদেহ বলি যে অক্লেশে রোগাক্রান্ত না হইয়া শীতোষ্ণ সহ্য করিতে পারে। তেমনই এ সুখদুঃখময় সংসারে তাঁহাকেই সবলমনা বলা যায় যিনি সমভাবে সুখদুঃখ ভোগ করিতে পারেন, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে বিগতস্পৃহ থাকিতে পারেন। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, দুঃখের ভাগ সকলকেই লইতে হয়, সুতরাং সেই শিক্ষাই শিক্ষা যদ্দ্বারা শরীর ও মন এমন ভাবে গঠিত হয় যে দুঃখভারবহনে কোন কষ্ট হয় না। সুখাভিলাষ করিতে গেলে সেই সুখের কামনা করিতে হয় যাহার হ্রাস নাই ও যাহাতে দুঃখের কালিমা মিশ্রিত নাই। পতি গেলে পত্যন্তর সম্ভাব্য, কিন্তু পুত্র কি কন্যা গেলে তাহার অভাব কিসে পূরণ হইবে? যে পথে গেলে সকল অভাব পূরণ হয়, অর্থাৎ অভাবকে অভাব বলিয়া বোধ হয় না, সেই নিবৃত্তিমুখ পথ প্রেয় না হইলেও শ্রেয়। সেই পথে যাঁহারা বিচরণ করেন তাঁহারা নিজে প্রকৃত সুখী, এবং নিজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তদ্বারা অন্যেরও দুঃখভার একেবারে মোচন না করুন তাহার অনেকটা লাঘব করেন। হিন্দুবিধবাগণ ব্রহ্মচর্য্য ও

সংযমদ্বারা পরিশোধিত দেহ ও মন লইয়া সেই নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণ করেন। সেই সুপথ হইতে ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করা, না তাঁহাদের পক্ষে না সাধারণ সমাজের পক্ষে হিতকর। হিন্দুবিধবার দুঃসহ কষ্টের কথা ভাবিতে গেলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু তাঁহার অলোক-সামান্য কষ্টসহিষ্ণুতা ও তাঁহার অসাধারণ স্বার্থত্যাগের প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে মন যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়। হিন্দুবিধবাই সংসারে পতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল ছবি নানা দুঃখতমসাচ্ছন্ন হিন্দুগৃহকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার দীপ্তিমান্ দৃষ্টান্ত হিন্দু-নরনারীর জীবনযাত্রার পথপ্রদর্শক স্বরূপ রহিয়াছে। তাঁহার পবিত্র জীবন পৃথিবীর দুর্লভ পদার্থ। তাহা যেন কখন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয়। হিন্দু-বিধবার চিরবৈধব্যপ্রথা হিন্দুসমাজের দেবীমন্দির। হিন্দুসমাজে সংস্কারের অনেক স্থান আছে, সংস্কারকগণের অনেক কার্য্য আছে। অনেক স্থান বর্ত্তমান কালের ও অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে হইবে। কিন্তু বিলাসভবন নির্ম্মাণার্থে যেন তাঁহারা সেই দেবীমন্দির ভগ্ন না করেন, ইহাই আমার সানুনয় নিবেদন।

আমি উপরে অল্প বয়সে বিবাহের অনুকূলে কএকটি কথা বলিয়াছি এবং এখানে চিরবৈধব্যপালনপ্রথার অনুকূলে অনেকগুলি কথা বলিলাম, ইহাতে যেন কেহ আমাকে সমাজসংস্কারবিরোধী না মনে করেন। আমি প্রকৃত সংস্কারের বিরোধী নহি। আমি জানি সমাজ পরিবর্ত্তনশীল, কখনই স্থির থাকিতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি জগৎ নিরন্তর গতিশীল এবং সে গতি মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, পরিণামে উন্নতিমুখী। আমার একান্ত ইচ্ছা সমাজসংস্কারের লক্ষ্য প্রকৃত উন্নতির অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অবিচলিত থাকে। এবং সেই জন্যই যিনি যাহা বলুন, আমি সমাজসংস্কারক মহাশয়দিগকে এত কথা বলিলাম।

২। পুত্রকন্যার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা

২। পুত্রকন্যার প্রতি কর্ত্তব্যতা। প্রথমতঃ তাহাদের শরীর-পালন।

পুত্রকন্যার প্রতি প্রথম কর্ত্তব্য তাহাদিগকে এরূপে লালন পালন করা যে তাহারা সুস্থ ও সবল দেহ হইতে পারে। তাহা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য, কিন্তু যদি আমরা বৃথা বড়মানুষের মত ব্যবহার করিতে বিরত হই, তাহা হইলে অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

শিশুসন্তানের আহারের নিমিত্ত মাতৃস্তন্যদুগ্ধ নিতান্ত আবশ্যক, এবং তাহার পর ভাল গব্য দুগ্ধ। ক্রমে বালক-বালিকারা একটু বড় হইলে, অন্ন রুটি ও লুচি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে ভাল ঘৃত দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং ঘৃতপক্ব দ্রব্য অধিক দেওয়া উচিত নহে।

শিশুর পরিচ্ছদ সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকা আবশ্যক। সাদা সুতার কাপড়ই ভাল, তাহা ধৌত করা সহজ ও ধৌত করিলে বিবর্ণ হয় না। রেশমী বা পশমী বা লাল রঙ্গের কাপড়ের তত প্রয়োজন নাই।

শিশুর শয্যায় মলমূত্র লাগার সম্ভাবনা, সুতরাং তাহা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, সর্ব্বদা ধৌত করা ও মধ্যে মধ্যে একেবারে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। তাহাতে গদি বা তোষক থাকা উচিত নহে, কেননা তাহা ধৌত করা যায় না, এবং তাহার তুলাতে মূত্রাদি ক্লেদ প্রবেশ করিলে থাকিয়া যায়। শুনিয়াছি নবাবেরা নিত্যনূতন তোষক ব্যবহার করিতেন। যাঁহারা সেরূপ অর্থশালী এবং শিশুর শয্যায় প্রত্যহ নূতন তোষক দিতে পারেন, তাঁহারাই শিশুকে তোষকে শয়ন করাইবার ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু তাঁহাদেরও সেরূপ ইচ্ছা করা এবং বৃথা অর্থব্যয় করা উচিত নহে। অর্থ থাকিলেও অর্থ বৃথা নষ্ট করা অবৈধ। অর্থের অনেক প্রয়োজনীয় ব্যবহার আছে। এতদ্ভিন্ন শিশুর পক্ষে কোমল শয্যা তত উপযোগী নহে, কিছু কঠিন শয্যাই উপকারী, কারণ তাহাতে শয়নদ্বারা পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড সরল হয় ও দেহ সুগঠিত হয়।

দাসদাসীর উপর নির্ভর অকর্ত্তব্য।

সন্তানপালন ও গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধান উভয়বিধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা অন্যের সাহায্য বিনা পিতামাতার পক্ষে অনেক স্থলেই অসম্ভব, এজন্য দাসদাসীর প্রয়োজন। কিন্তু সুনিয়মে চলিলে অনেক দাসদাসীর প্রয়োজন হয় না, অল্পেই কার্য্য চলে। এবং শিশুপালনের ভার দাসদাসীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া পিতামাতার অকর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, দাসদাসী অর্থানুরোধে অল্প দিনের নিমিত্ত কার্য্য করে, পিতামাতা স্নেহবশতঃ শিশুর পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করেন, সুতরাং দাসদাসী কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলেও তাহাদের যত্ন জনক-জননীর যত্ন অপেক্ষা অবশ্যই অল্প হইবে। দাসদাসীর অযত্ন দেখিয়া পিতা-মাতা যখন বিরক্ত হয়েন, তখন তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, তাঁহারা অপত্য-স্নেহসত্ত্বেও যদি পরের উপর ভার দিয়া নিজে শিথিলপ্রযত্ন হইতে পারেন, তবে কেবল বেতনানুরোধে যাহারা কার্য্য করে তাহাদের যত্ন যে মধ্যে মধ্যে শিথিল হইবে ইহা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ যে শ্রেণির লোক হইতে দাসদাসী পাওয়া যায় তাহাদের বুদ্ধিবিবেচনা প্রায়ই তাদৃশ অধিক নহে, সুতরাং পিতামাতার তত্ত্বাবধান নিতান্ত আবশ্যক। এবং তৃতীয়তঃ জনক-জননী স্বয়ং সর্ব্বদা সন্তানপালন বা তৎপালনের তত্ত্বাবধান করিলে সন্তানেরও তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সত্য বটে মাতৃপিতৃস্নেহ স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু অবস্থাভেদে তাহার হ্রাসবৃদ্ধিও হয়। উচ্চ প্রকৃতির কথা বলিতেছি না, কিন্তু সাধারণের পক্ষে সংসারে সকল বিষয়ই আদানপ্রদানের নিয়মাধীন, এবং পুত্রকন্যার ভক্তি ও পিতামাতার স্নেহ সে নিয়মের বাহিরে নহে। লোকের পিতৃমাতৃভক্তির অভাব দেখিয়া যখন কেহ ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন, "এখনকার ছেলেরা কলিকালের ছেলে, কত ভাল হবে," আমি তখন মনে মনে বলি, "এখনকার পিতামাতারা কি কলিকালের পিতামাতা নহেন? তাঁহারা আর কত অধিক

আশা করেন?" পিতামাতা যদি সন্তানকে শৈশবে ভৃত্যের লালনপালনে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, তাহা হইলে সন্তানেরা তাঁহাদিগকে বার্দ্ধক্যে ভৃত্যের সেবায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

রোগে চিকিৎসা ও সেবা।

পুত্রকন্যা পীড়িত হইলে যথাযোগ্য চিকিৎসা ও সেবা আবশ্যক। অপত্যস্নেহই তদ্বিষয়ে যথেষ্ট উত্তেজক ও পথপ্রদর্শক, সুতরাং এস্থানে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে যে দুই একটি কথা লইয়া লোকের সহজেই ভ্রম হইতে পারে, কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। অনেকস্থলে রোগ প্রথমে অতি সামান্য ভাব ধারণ করিয়া পরে গুরুতর হইয়া উঠে। অতএব রোগকে কখন সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে। প্রথম হইতেই যথাশক্তি সুচিকিৎসককে দেখান, এবং তাঁহার ব্যবস্থানুসারে চলা উচিত।[১] কিন্তু ব্যস্ত হইয়া অকারণ অধিক ঔষধপ্রয়োগও উচিত নহে। একদিকে যেমন রোগের আরম্ভ হইতে সতর্কতা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনই রোগের সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সতর্ক থাকা আবশ্যক।

কোন্ রোগে কোন্ চিকিৎসককে দেখাইব ইহা গৃহস্থের পক্ষে অতি কঠিন প্রশ্ন। চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য, এবং সকলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসককে দেখাইতে পারে না। সঙ্গতি অনুসারে চিকিৎসক ডাকিতে হয়। তারপর, কবিরাজী, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি নানা প্রণালীর চিকিৎসা আছে, কোন্ প্রণালীর চিকিৎসা অবলম্বন করা যাইবে, ইহাও অতি কঠিন সমস্যা। যে রোগ উপস্থিত, নিকটের আর পাঁচজনে তাহার কিরূপ চিকিৎসা করাইতেছে ও সেই চিকিৎসার ফল কিরূপ হইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করাই সদ্যুক্তি। কারণ যেরূপ চিকিৎসায় একজনের উপকার হইয়াছে, তাহাতে নিকটস্থ আর একজনের সেইরূপ রোগের উপশম হওয়া সম্ভাবনীয়।

পীড়া বৃদ্ধি হইলে এবং যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোন ফল না হইলে, চিকিৎসক বা চিকিৎসাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য কি না, ইহা গৃহস্থের পক্ষে অতি গুরুতর প্রশ্ন। চিকিৎসকেরা প্রায়ই পরিবর্ত্তনের বিরোধী। কিন্তু গৃহস্থ তত স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। বিজ্ঞ চিকিৎসক-মহাশয়দিগের সে অধীরতা মার্জ্জনা করা উচিত। চিকিৎসক পরিবর্ত্তনে অনেক অসুবিধা আছে। যিনি প্রথম হইতে দেখিতেছেন তিনি রোগের গতি যেরূপ অবগত হইয়াছেন, পরে যিনি দেখিবেন তাঁহার সেরূপ অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ দুইজন চিকিৎসককে দেখানও সকলের সাধ্য হয় না। যাহার ক্ষমতা আছে তাহার কর্ত্তব্য, দ্বিতীয় চিকিৎসক ডাকিলেও প্রথমে যিনি দেখিতেছিলেন তাহাকে সঙ্গে রাখা। চিকিৎসা সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। চিকিৎসক-মহাশয়েরা তাঁহাদের পরামর্শকালে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা রোগীকে ও রোগীর অভিভাবকগণকে জানিতে দেন না। রোগী সে সকল কথা শুনিলে অধিক

---

[১] এ সম্বন্ধে চরকসংহিতার ১১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চিন্তিত হইতে পারে, এবং তাহার দুশ্চিন্তা রোগ উপশমের বাধা জন্মাইতে পারে। কিন্তু তাহার অভিভাবককে সমস্ত কথাই স্পষ্টরূপে জানান চিকিৎসক-মহাশয়দিগের কর্ত্তব্য। যদি তাঁহাদের মতভেদ হয়, সে কথাও রোগীর অভিভাবককে জানান উচিত, তাহা হইলে অভিভাবক তাঁহার নিজের কর্ত্তব্যতা উপযুক্তরূপে স্থির করিতে পারিবেন। আইনব্যবসায়ীরা যিনি উপদেশ চাহেন তাঁহার নিকট তাঁহাদের মতামত গোপন রাখেন না। চিকিৎসক-মহাশয়েরা রোগীর অভিভাবকের নিকট তাঁহাদের পরামর্শের কথা কেন গোপন রাখেন বুঝিতে পারা যায় না। এরূপ না হইলেই ভাল হয়।

দ্বিতীয়তঃ তাহাদের শিক্ষা।

পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত সন্তানের কেবল পালন করিবে, তাহার পর তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে। চাণক্য কহিয়াছেন—

"लालयेत् पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्।
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत्॥"

"পঞ্চবর্ষ সন্তানের করিবে লালন।
তারপর দশবর্ষ শিক্ষা প্রয়োজন॥
যখন ষোড়শবর্ষ বয়স হইবে।
তদবধি মিত্রভাবে পুত্রকে দেখিবে॥"

একথা স্থূলতঃ যুক্তিসিদ্ধ। পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাহাতে শিশুর শরীর সুগঠিত ও সবল হয় তৎপ্রতিই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিবে। সে সময়ে যে তাহাকে একেবারে কোন শিক্ষা দিবে না, কি তাহার একটুও শাসন করিবে না, একথা ঠিক নহে, তবে শিশুর যাহাতে ক্লেশ বা শ্রমবোধ হয়, এরূপ কোন শিক্ষা সে সময় দিবে না। ছয় হইতে পনেরবৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে শাসনে রাখিবে, অর্থাৎ তাহার বিদ্যাশিক্ষা ও চরিত্রগঠনের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, তবে সে সময় যে তাহার লালন করিবে না একথা সঙ্গত নহে। এবং ষোড়শবর্ষ বয়স হইলেই যে পুত্রকে আর শিক্ষা দিবে না একথাও ঠিক নহে, তবে সেই সময় হইতে তাহাকে আর শাসনভাবে শিক্ষা দিবে না, উপদেশভাবে শিক্ষা দিবে। শিক্ষা যে কেবল পুত্রকে দিতে হয় তাহা নহে কন্যাকেও শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে শিক্ষা যখন জীবনযাত্রার সম্বল, তখন যাহাকে যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহার শিক্ষা তদুপযোগী হওয়া আবশ্যক, এই কথা মনে রাখিয়া পুত্রকন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষা ত্রিবিধ, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।

পুত্রকন্যার শিক্ষা সম্বন্ধে মনে রাখা কর্ত্তব্য, শিক্ষার অর্থ কেবল বিদ্যাশিক্ষা নহে। উপরে বলা হইয়াছে শিক্ষা জীবনযাত্রার সম্বল। জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ যে কিছু আয়োজন আবশ্যক সেই সমস্ত আয়োজনেরই উপায় শিক্ষা। শরীর, মন ও আত্মা তিনই প্রথমে অপূর্ণ থাকে, এবং তিনেরই পূরণ আবশ্যক। অতএব শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ শিক্ষা

দেওয়াই কর্ত্তব্য। এবং তাহাদের আবশ্যকতার তারতম্য অনুসারে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি যত্ন করা পিতামাতার কর্ত্তব্য।

শরীর রক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। অতএব শরীর রক্ষার নিমিত্ত যে শিক্ষা আবশ্যক তৎপ্রতি যত্ন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তদতিরিক্ত ব্যায়ামাদি তত প্রয়োজনীয় নহে। মন শরীর অপেক্ষা উচ্চ, ও কিঞ্চিৎ মানসিক শিক্ষা সকলেরই আবশ্যক, অতএব শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার পরই মানসিকশিক্ষার প্রতি যত্নবান্ হওয়া উচিত। আত্মা সর্ব্বোপরি, এবং আত্মার উন্নতি অত্যাবশ্যক, অতএব কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিকশিক্ষা শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেরই প্রয়োজনীয়।

পুত্রকন্যার শরীরপালনের ভার ভৃত্যের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া পিতামাতার যেমন অকর্ত্তব্য, তাহাদের মন ও চরিত্র গঠনের ভার শিক্ষকের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াও তাঁহাদের পক্ষে তদ্রূপ অকর্ত্তব্য। সত্য বটে, শিক্ষক, ভৃত্য অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণির ব্যক্তি, এবং শিক্ষাকার্য্যে পিতামাতা অপেক্ষা অনেক স্থলেই অধিকতর যোগ্য। কিন্তু তথাপি পিতামাতার তত্ত্বাবধানের ভার কমে না। বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে পিতামাতার বিদ্যা না থাকিলে শিক্ষকের উপর নির্ভর অনিবার্য্য, তবে সে স্থলেও সন্তানের কিরূপ উন্নতি হইতেছে তাহার যথাসাধ্য অনুসন্ধান করা পিতামাতার কর্ত্তব্য। কিন্তু মন ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। পুত্রকন্যার কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, সে হিতাহিত জ্ঞান শিক্ষক অপেক্ষা পিতামাতার অল্প নহে, এবং তাঁহাদের শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানের অভাব থাকিলেও স্নেহপ্রণোদিত ব্যগ্র শুভানুধ্যান সে অভাব পূরণ করিয়া দেয়।

কেহ কেহ বলেন বাসোপযোগী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকা গৃহে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে থাকা অপেক্ষা চরিত্র গঠনের পক্ষে অধিক উপকারক। ছাত্রের অতি অল্প বয়সে তাহা কোন মতে সম্ভবপর নহে। এবং কোন বয়সেই যে তাহা সম্ভবপর এ বিষয় বিলক্ষণ সন্দেহের স্থল। অনেকে বলেন, প্রাচীন ভারতে ছাত্রের গুরুগৃহে বাস যে অতি সুফলপ্রদ হইত তাহা কেহই সন্দেহ করে না, এবং তাহা হইলে বর্ত্তমানকালেই বা সেরূপ কেন না ঘটিবে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে বাসের প্রথা এবং বর্ত্তমানকালের বিদ্যালয়ে বাসের প্রণালীর মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই যে, তখন ছাত্র ভক্তির বিনিময়ে গুরুর স্নেহ ও তাঁহার গৃহে অবস্থিতির অনুমতি লাভ করিত, এখন ছাত্র অর্থের বিনিময়ে ছাত্রনিবাসে থাকিতে পায়। ভক্তি ও স্নেহের পরস্পর বিনিময়ের ফলের সঙ্গে অর্থ ও খাদ্যাদি বস্তুর বিনিময়ের ফল তুলনীয় নহে। স্বগৃহ-বাসে যেরূপ চিত্তবৃত্তির স্বাধীনভাবে বিকাশ, ও সংসারযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষালাভ হয়, ছাত্রনিবাসে বাসদ্বারা তাহা কখনই হইতে পারে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে, কেবল আপনাদের নিত্য তত্ত্বাবধানের পরিশ্রমনিবারণার্থে পুত্রকন্যাকে ছাত্রনিবাসে রাখা পিতামাতার কর্ত্তব্য নহে।

শারীরিক শিক্ষা।

উপরে বলা হইয়াছে শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সে শিক্ষার মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম আইসে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্যায়াম নহে। কতকগুলি শারীর-নিয়মের স্থূল তত্ত্ব ও তাহা লঙ্ঘনের কুফল, কিঞ্চিৎ জানান সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। আহার যে কেবল রসনাতৃপ্তির নিমিত্ত নহে, তাহা দেহরক্ষা ও পুষ্টির নিমিত্ত আবশ্যক, অতএব খাদ্য কেবল মুখপ্রিয় হইলেই হইবে না, তাহা নির্দ্দোষ ও পুষ্টিকর হওয়া উচিত, এবং নিদ্রা ও বিশ্রাম যে কেবল সুখের নিমিত্ত নহে, তাহা স্বাস্থ্যের নিমিত্ত আবশ্যক, অতএব তাহা যথাসময়ে ও যথাপরিমাণে হওয়া উচিত, এই সকল কথা পুত্রকন্যার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা করিতে পারিলে অতিভোজন ও আলস্য এবং তজ্জনিত নানাবিধ রোগ ও কষ্ট হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে।

শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি কঠিন কথা আছে। যৌবনের প্রারম্ভে যে ইন্দ্রিয় অতি প্রবল ভাব ধারণ করে তাহার তৃপ্তির নিমিত্ত অনেক স্থলে যুবকেরা অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, ও তাহার ফল অতীব অনিষ্টকর। সেই অনিষ্টনিবারণনিমিত্ত পিতামাতার কি কর্ত্তব্য? সে বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দেওয়ার পক্ষে যে কেবল লজ্জা ও শিষ্টাচার বাধাজনক তাহা নহে, সদ্‌যুক্তিও তাহার বিরোধী। কারণ, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে গেলে যে সকল কথার উল্লেখ করিতে হয়, তাহাও কিয়ৎপরিমাণে চিত্ত বিচলিত ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতে পারে। এই গুরুতর অনিষ্টনিবারণের বোধ হয় দুইটি সদুপায় আছে।

প্রথমতঃ, সাধারণ দেহতত্ত্ববিষয়ক সরল ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ যুবকদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া। এবং এইরূপ গ্রন্থ যদি যুবকদিগের বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকের শ্রেণিভুক্ত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। একটি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ শুনাতে, বা গ্রন্থবিশেষ বা গ্রন্থাংশবিশেষ পাঠ করাতে সেই ইন্দ্রিয়ের দিকে মন যেরূপ আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সাধারণ দেহতত্ত্ব-বিষয়কগ্রন্থ পাঠে, এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া সেই গ্রন্থ পাঠে, সেরূপ আশঙ্কা থাকে না। আর সেরূপ গ্রন্থে ইন্দ্রিয়ের অবৈধ কুফল যদি সামান্যভাবে বর্ণিত থাকে, তাহা পাঠ করা লজ্জাকর বা অন্য কোনরূপ বাধাজনক বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, যুবকদিগকে একদিকে ব্যায়ামে অপরদিকে পাঠাভ্যাসে ও অন্যান্য কার্য্যে এরূপে নিযুক্ত রাখিবে যে, তাহারা অবৈধ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চিন্তা করিতে সময় না পায়। এবং তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রবৃত্তি উত্তেজক কোন নাটক, উপন্যাস আদি গ্রন্থ পাঠ, বা কোন নৃত্যাদি অভিনয় দর্শন করিতে দেওয়া উচিত নহে। যুবকদিগের বিলাসিতাবর্জন এবং একটু কঠোর হইলেও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন বিধেয়।

মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম ভাগে 'জ্ঞানলাভের উপায়' শীর্ষক অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত আর কিছু এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা —নীতিশিক্ষা।

আধ্যাত্মিক শিক্ষার দুই ভাগ, নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা। নীতিশিক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন মতামত নাই। তবে সে শিক্ষা কি প্রণালীতে দেওয়া কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। সে সকল মতামতের সমালোচনা করা এক্ষণকার উদ্দেশ্য নহে। পুত্রকন্যার নীতিশিক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় তৎসম্বন্ধীয় স্থূল কথা দুই চারিটি এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

পুত্রকন্যার নীতিশিক্ষার্থ পিতামাতার প্রথম কর্ত্তব্য, দৃষ্টান্তস্বরূপে পবিত্রভাবে নিজ নিজ জীবনযাপন।

পুত্রকন্যার নীতিশিক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা এমন ভাবে জীবনযাপন করিবেন যে তাঁহাদের দৃষ্টান্তই নীতিশিক্ষা দিবে। তাহা না হইলে তাঁহাদের বা অপর শিক্ষকের মুখের উপদেশ বিশেষ কার্য্যকর হয় না। অনেক স্থলে নানা কারণে পরিণামে পুত্রকন্যা পিতামাতা অপেক্ষা ভাল হয় বা মন্দ হয়। কিন্তু প্রায়ই প্রথমে তাহারা পিতামাতার রীতিনীতি অনুসারে চলিতে শিখে, আর সেই রীতিনীতি উচ্চাদর্শের হইলে তাহাদের সুনীতিশিক্ষা সুগম হয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিব। কোন সময় এক গৃহস্থের বাটিতে একজন কাঠের মুটে তাহার মোট ফেলিয়া উঠানে একটি ফল-ভারে অবনত লেবুগাছ দেখিয়া বাটির কর্ত্রীকে বলিল, "মা ঠাক্‌রুণ, গাছটিতে খুব নেবু হয়েছে, আমি একটি নেব?" কর্ত্রী পরম ধর্ম্মপরায়ণা ও অতি কোমল-হৃদয়া ছিলেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ সে সময় একটু বিরক্তভাবে থাকাতে, কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরে উত্তর করিলেন, "হাঁরে বাপু, ভিখিরি আসে সেও নেবু চায়, মুটে আসে সেও নেবু চায়।" তাহাতে সেই মুটে আর কিছু না বলিয়া তাহার মোটের পয়সা লইয়া দুঃখিতভাবে চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সেই বিরক্তিভাব গেলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলেন, "কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হইল, মুটেকে কেন মিছে ভর্ৎসনা করিলাম, একটি নেবু নিলে কি ক্ষতি হইত?" আর তারপর দুই তিন দিন এই কথা বলিতে থাকেন, এবং তাঁহার বালকপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "ইস্কুলে যাইবার সময় পথে সেই মুটেকে দেখিতে পাওয়া যায় না? যদি দেখিতে পাও তাহাকে নেবু লইয়া যাইতে বলিও।" একজন সামান্য লোককে একটি কর্কশকথা বলাতে মাতার এইরূপ আন্তরিক কাতরতা হইয়াছে দেখিয়া সেই বালকের মনে অবশ্যই ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছিল যে, কাহাকেও কটুকথা বলা উচিত নহে। সেরূপ ধারণা কখনই যাইবার নহে, এবং কেবল উপদেশ দ্বারা নীতিশিক্ষায় তাহা জন্মিবারও নহে। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, অন্যের প্রতি পিতামাতার যেরূপ সদ্ব্যবহার কর্ত্তব্য, পুত্রকন্যার প্রতিও তাঁহাদের সেইরূপ সদ্ব্যবহার কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে মিথ্যাভয় বা মিথ্যালোভ দেখাইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করা উচিত নহে। তাহা করিলে মিথ্যা ব্যবহারের উপর তাহাদের সমুচিত অশ্রদ্ধা জন্মে না। পুত্রকন্যাকে কোন দ্রব্য দিব বলিলে, তাহা যথাসময়ে দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য, নতুবা পিতামাতার কথার প্রতি তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকিবে না।

তাঁহাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধন।

দ্বিতীয়তঃ, পুত্রকন্যার দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করা পিতামাতার কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে, দোষ করা অভ্যাস হইয়া যায়, ও পরে তাহার সংশোধন কঠিন হইয়া উঠে। রোগের যেমন প্রথম উপক্রমেই চিকিৎসা করা আবশ্যক, তাহা না করিলে পরে রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে, দোষেরও তেমনই প্রথম হইতে সংশোধন না করিলে পরে তাহার সংশোধন দুঃসাধ্য হয়। তবে তীব্র তিরস্কারের সহিত দোষ সংশোধন করিতে যাওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে দোষী দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করিবে, ও দোষসংশোধন সুখকর মনে করিবে না। স্নেহের সহিত মিষ্ট উপদেশবাক্য দ্বারা দোষ সংশোধন করা কর্ত্তব্য, এবং যে দোষের ফল যেরূপ অশুভ তাহা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে দোষ করিতে নিবৃত্ত হওয়া কেবল পিতামাতার আদেশপালনার্থে আবশ্যক নহে, নিজের হিতার্থেও আবশ্যক, এই বিশ্বাস ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং সেই বিশ্বাসই অন্যায় কার্য্যে নিবৃত্তি বদ্ধমূল করিবার প্রধান উপায়।

এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, দোষ হইবামাত্র তাহার সংশোধন দ্বারা, ক্রমে মন্দ কার্য্য না করা ও ভাল কার্য্য করা, পুত্রকন্যার একবার অভ্যাস করিয়া দিতে পারিলে, পরে তাহারা সেই অভ্যাসের গুণে আপনা হইতেই সহজে মন্দ কার্য্যে নিবৃত্ত ও ভাল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আর তাহাদের অধিক কষ্ট হইবে না।

তৃতীয় কর্ত্তব্য, কএকটি প্রধান প্রধান নৈতিক তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া।

তৃতীয়তঃ, কয়েকটি প্রধান প্রধান নৈতিক বিষয়ে পুত্রকন্যার যথার্থ বোধ জন্মান পিতামাতার নিতান্ত কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে লোকে জানিয়া শুনিয়া মন্দ কার্য্য করে না, ভাল কার্য্য করিতেছি ভাবিয়া মন্দ কার্য্য করিয়া বসে। তাহা কেবল মূল নৈতিক বিষয়ে যথার্থ বোধ না থাকার ফল। সেই বিষয়গুলির মধ্যে কএকটির উল্লেখ নিম্নে করা যাইতেছে।

১। দেহ অপেক্ষা আত্মা বড়।

১। দেহ অপেক্ষা মন ও আত্মা বড়। এই কথা বালকবালিকাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এ কথাটি বুঝিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, দেহের সুখদুঃখ অপেক্ষা মনের সুখদুঃখের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। উত্তম আহার, উত্তম পরিচ্ছদ দেহের সুখকর বটে, কিন্তু তাহার নিমিত্ত অধিক যত্ন করিতে গেলে বিদ্যাশিক্ষাদি মনের সুখকর বা হিতকর কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, অতএব তাহা অকর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। অনেকে বলেন দেহের উপর যদি কেহ আঘাত করিতে উদ্যত হয়, মনুষ্যদেহের মর্য্যাদারক্ষার্থে সেই দেহের অবমাননাকারীকে আঘাত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, নিতান্ত আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন কেবল মানরক্ষার নিমিত্ত, আঘাতকরণে উদ্যত ব্যক্তিকেও আঘাত করাতে বিবেকশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যের পক্ষে মনের ও আত্মার অবমাননা করা হয়, এবং তাহা করিতে গেলে মনুষ্যের বিবেকের গৌরব নষ্ট হয়। সত্য বটে সাহিত্যে অনেক স্থলে প্রতিযোগীর প্রতি পাশববলপ্রয়োগ প্রশংসিত হইয়াছে। কিন্তু

সে সকল প্রায়ই মানবজাতির প্রথম বা বাল্যাবস্থার কথা। যা বাল্যে যাহা শোভা পাইয়াছে, মানবজাতির প্রৌঢ়াবস্থায় তাহা সঙ্গত নহে। আবার কাব্যেও উচ্চ আদর্শ চরিত্রে ভিন্নভাব দেখা যায়। যথা রামচরিতে একদিকে যেমন অতুলনীয় বলবিক্রম, অপর দিকে তেমনই আবার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিও অসামান্য সৌজন্য, কারুণ্য, ও বলপ্রয়োগে অনিচ্ছা।[১] এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান কালে যুদ্ধাদিতেও দৈহিক বলের কার্য্যকারিতা অতি অল্প, বুদ্ধিবলই প্রকৃত ফলপ্রদ। পরন্ত পণ্ডিতেরা বলেন, ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে পশুদেহ তীক্ষ্ণ নখদন্তাদি বিলোপে ক্রমে মনুষ্যাকারে পরিণত হইয়াছে। জীবদেহের যদি এরূপ ক্রমোন্নতি হইতে পারে, তবে মানবপ্রকৃতির কি এতটুকু ক্রমোন্নতির আশা করা যায় না যে, জিঘাংসা ও পাশব-বলপ্রয়োগেচ্ছা ক্রমে হ্রাস পাইবে? সবল-দেহ সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দেহের বল বিপন্নকে রক্ষার্থে ও অন্যান্য হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। বলদৃপ্ত হইয়া অপরের সহিত বিবাদ বাধাইয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত নহে।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। আক্রমণকারীকে প্রতিশোধ দিতে না পারা অনেকে ভীরুতার ও দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ মনে করেন। কিন্তু যে অন্যায় বলিয়া সেরূপ কার্য্যে বিরত থাকে তাহাকে ভীরু বলা অকর্ত্তব্য। এবং যে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির প্রবল প্ররোচনা সংযত করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারে, তাহার দেহের বল যেরূপই হউক, মনের বল অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

২। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ বড়। এই কথা পুত্রকন্যার যাহাতে হৃদয়ঙ্গম হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা পিতামাতার কর্ত্তব্য। স্বার্থের প্রতি অযত্ন হইলে পুত্রকন্যা সংসারে আপনাদের হিতসাধনে অক্ষম হইবে এরূপ আশঙ্কার প্রয়োজন নাই। স্বার্থপরতা এতই মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ও প্রবল প্রবৃত্তি যে, তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার আতিশয্য নিবারণ-নিমিত্তই শিক্ষা আবশ্যক। কেননা, কি ব্যক্তিবিশেষের, কি সামাজিক, কি জাতীয়, সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের মূলই অসংযত স্বার্থপরতা। সেই স্বার্থপরতা-সংযম যাহাতে অল্প বয়স হইতেই লোকে শিক্ষা করে তাহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। আমি যাহা চাহি তাহাই পাইব, এবং আমার ইচ্ছাই প্রবল হইবে, এরূপ আশা করা যে অতি অন্যায়, এবং এরূপ আশা সফল হওয়া যে অতি অসম্ভব, তাহা সকলেরই বুঝা উচিত। আমি যখন পৃথিবীতে একা নাই, আমার মত আরও অনেকে আছে, তখন আমি যাহা চাহি অন্যেও তাহা চাহিতে পারে, এবং আমি যাহা ইচ্ছা করি অন্যে তাহার বিপরীত ইচ্ছা করিতে পারে, আর, সেই পরস্পর আকাঙ্ক্ষার ও ইচ্ছার বিরোধ সামঞ্জস্য না হইলে সংসার চলিতে পারে না। এরূপ

২। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ বড়।

---

[১] সংস্কৃতভাষা অনভিজ্ঞ পাঠক এ সম্বন্ধে ভবভূতির "বীরচরিত" অবলম্বনে রামগতি ন্যায়রত্নরচিত "রামচরিত" পাঠ করিতে পারেন।

বিরোধের সম্ভাবনাস্থলে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীই যদি নিজের ন্যায্য অধিকার কতদূর তাহা স্থির ও সংযতভাবে দেখেন, তাহা হইলে আর বিরোধ উপস্থিত হয় না। এবং যদি কোন পক্ষ নিজের স্বার্থের কিঞ্চিৎ অপর পক্ষের অনুকূলে ছাড়িয়া দেন, তাহাতে তাঁহার যে টুকু ক্ষতি হয়, নির্ব্বিরোধে, সুতরাং সত্বর, কার্য্য সিদ্ধ হওয়াতে সে ক্ষতির প্রচুর পূরণ হয়। এবং তাহাতে মনের যে শান্তি ও সুখলাভ হয় তাহারও মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা এইরূপে কার্য্য করেন তাঁহারা সুখী ত বটেই, পরন্তু তাঁহাদের আর্থিকলাভও কম হয় না। আর যাঁহারা অন্যায্য স্বার্থের বশ হইয়া বিরোধ করেন, তাঁহাদের বিবাদ করায় যে বিকৃত উৎসাহ জন্মে তদ্ভিন্ন অন্য সুখ ত নাই, এবং লাভের হিসাব করিলে তাহাও যে সর্ব্বত্র অধিক হয় তাহা নহে।

৩। নিজের দোষ নিজে দেখা ও সহজে স্বীকার করা উচিত।

৩। নিজের দোষ অন্যে দেখাইয়া দিবার অপেক্ষা না করিয়া নিজে দেখা ও সহজেই নিজের দোষ স্বীকার করা উচিত। এই শিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়, এবং পুত্রকন্যাকে এই শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য। আমরা কেহই দোষ শূন্য নহি। তবে আত্মাভিমান নিজের দোষ দেখিতে দেয় না, এবং পরের দোষ দেখিলে এক প্রকার নিকৃষ্ট সুখ অনুভব করে। নিজের দোষ নিজে দেখিতে পাইবার অভ্যাস করিলে, তাহার সংশোধন সত্বর হয়, এবং তজ্জন্য অন্যের নিকট অপ্রতিভ হইতে হয় না। এ অভ্যাসের আর একটি ফল আছে। যাহার বিকৃত মানসচক্ষু, দোষ নিজে করিবার পর, সে দোষ দেখিতে দেয় না, এবং যাহার সত্যে অনাস্থা, নিজের দোষ দেখিতে পাইলেও, তাহা সহজে স্বীকার করিতে দেয় না, তাহার দোষ দেখিতে পাইবার অক্ষমতা, এবং দোষ অস্বীকার করিতে পারিবার সাহস, দোষপরিহারের পক্ষে বাধাজনক হইয়া উঠে। কিন্তু যে নিজের দোষ দেখিবার নিমিত্ত মানসচক্ষুকে অভ্যস্ত করে, ও যাহার সত্যনিষ্ঠা দোষ হইলে তাহা অস্বীকার করিতে দেয় না, তাহার সেই দোষ দেখিতে পাইবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও দোষ করিলে সত্যানুরোধে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এই ভয়, তাহাকে দোষ পরিহারকরণার্থে সর্ব্বদা সতর্ক রাখে। ফলতঃ, যে যত সহজে নিজের দোষ দেখিতে পায় ও স্বীকার করে, সে তত সহজে দোষ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে পারে।

৪। পরের দোষ ক্ষমা করা ভাল।

৪। নিজের দোষের প্রতি কঠোর দৃষ্টির যেমন সুফল, পরের দোষের প্রতি কোমল দৃষ্টিরও তেমনই সুফল। পরের দোষ ক্ষমা করা অভ্যাস করিলে পরার্থপরায়ণতার বৃদ্ধি ও নিজের চিত্তের উৎকর্ষলাভ হয়।

৫। অন্যের অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত না হইয়া তাহার কারণ নিরাকরণ উচিত। অর্থাৎ জগতের সহিত সদ্ভাব স্থাপন উচিত।

৫। অন্যের অন্যায় বা অহিতাচরণে বৃথা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ না হইয়া তাহার কারণ নিরূপণের ও সাধ্য হইলে তন্নিরাকরণের চেষ্টা করা উচিত। পুত্রকন্যাকে এই শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই শিক্ষা পাইলে তাহারা চিরসুখী হইবে। অন্যের অন্যায় ও অহিতকর আচরণ সকলকেই অল্লাধিক সহ্য করিতে হয়। তাহাতে বৃথা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলে কোন লাভ নাই বরং মনের অসুখ হয়, ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত

হইয়া অশেষ অমঙ্গল ঘটাইতে পারে। কিন্তু যদি আমরা স্থিরভাবে সেইরূপ আচরণের কারণ নিরূপণ করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, যতক্ষণ সে কারণ উপস্থিত থাকিবে ততক্ষণ তাহার কার্য্য অবশ্যই হইবে, এবং সেই কারণ নিরাকরণ করিতে পারিলেই কার্য্য নিবৃত্ত হইবে। আর যে স্থলে সে কারণ-নিরাকরণ অসাধ্য, সে স্থলে তাহার কার্য্য অনিবার্য্য বলিয়া তাহা সহ্য করিতে হইবে। এই জ্ঞানদ্বারা যেখানে সাধ্য সেখানে অনিষ্টনিবারণ হইতে পারিবে, যেখানে নিবারণ অসাধ্য সেখানেও বৃথা চেষ্টায় একপ্রকার বিরত হইয়া মনের শান্তি লাভ করা যাইতে পারে।

উপরে যে কথা বলা হইল তাহা অন্য কথায় এইরূপে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, পুত্রকন্যাকে সমস্ত জগতের সহিত সখ্যভাব স্থাপন করিতে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৬। জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য বৈষয়িক উন্নতি নহে, আধ্যাত্মিক উন্নতি, এবং জীবনের চরমলক্ষ্য সকাম কর্ম্মদ্বারা কিছুকাল ভোগ্য অর্থ সংগ্রহ নহে, নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা অনন্তকালস্থায়ি সুখলাভ। এই কথা ক্রমশঃ পুত্রকন্যার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য। এই বোধ একবার জন্মিলে আর কেহ নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা জীবনযাত্রার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না।

> ৬। জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য বৈষয়িক সুখ নহে, আধ্যাত্মিক উন্নতি।

৭। প্রত্যহ দিনান্তে নিজ দৈনিক কর্ম্মের দোষগুণের হিসাব করিতে শিক্ষা করা সকলেরই উচিত। তাহা হইলে নিজের দোষ সংশোধনের নিত্য উপায় হয়।

> ৭। প্রত্যহ দিনান্তে নিজ কর্ম্মের দোষ-গুণের হিসাব করা উচিত।

> ধর্ম্মশিক্ষা।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত ও তর্কের স্থল আছে। কেহ কেহ বলেন যখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এত মতভেদ রহিয়াছে, তখন বালক বালিকাদিগকে অল্প বয়সে কোন ধর্ম্মই শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে, ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদের মন অশিক্ষিত ও সংস্কারশূন্য রাখা উচিত। তাহাদের বয়স বৃদ্ধি হইলে ও বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে যে ধর্ম্ম তাহারা সত্য বলিয়া মনে করিবে, তাহাই তাহারা অবলম্বন করিবে। কিন্তু একথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পিতামাতা যে ধর্ম্মাবলম্বী পুত্রকন্যা অল্প বয়সে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়াতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না, বরং তাহা অনিবার্য্য ও উচিত বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের শরীর পালন পিতামাতার ইচ্ছানুসারে অবশ্যই চলিবে। তাহাদের মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাও অবশ্যই সেই ইচ্ছানুগামী হইবে। তবে তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষা, যাহা সকল শিক্ষার উপর, একেবারে বাকি থাকিবে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা বুঝা যায় না। অন্য শিক্ষা কেবল ইহকালের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু ধর্ম্ম মানিলে ধর্ম্মশিক্ষা ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। যিনি ধর্ম্ম মানেন না, তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষায় কেবল এই মাত্র দোষ যে বালক বালিকাদিগকে অকারণে ভ্রমশিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইতে পারে না, কেন না বালকবালিকারা বড় হইয়া ইচ্ছা করিলে আপন আপন মতানুসারে চলিতে

পারিবে। আর যদি বলেন ধর্ম্মবিষয়ে ভ্রমশিক্ষা দেওয়া অন্যায়, কোন্ বিষয়েই বা শিক্ষা অভ্রান্ত?

মানুষ কখনই অভ্রান্ত নহে। কোন কোন বিষয়ে অদ্য যে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে কিছুদিন পরে তাহা ভ্রম বলিয়া স্থির হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন বালকবালিকারা যখন পিতামাতার নিকটে থাকিবে, তখন ধর্ম্মবিষয়ে তাহাদের একেবারে অশিক্ষিত রাখা অসম্ভব। পিতামাতা যে ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা সেই ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিবেন, এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণও, নিয়মিতরূপে না হউক, দেখিয়া শুনিয়াই একপ্রকার সেই ধর্ম্মে সংস্কারাপন্ন হইয়া পড়িবে।

ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। অল্প বয়সে বালক বালিকাদিগকে অধিক সূক্ষ্মধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত ও সাধ্য নহে। ধর্ম্মের স্থূলতত্ত্ব প্রায় সকল ধর্ম্মেই সমান। তাহা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস এবং আত্মসংযমপূর্ব্বক সৎপথে থাকা, এই দুই কথা লইয়া। অগ্রে সেই দুই কথা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

পুত্রকন্যার বিবাহ।

উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্রী ও পাত্র স্থির করিয়া পুত্র ও কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বিবাহ সম্বন্ধে পুত্রকন্যাকে নিজ নিজ ইচ্ছামত চলিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এ বিষয়ে তাহাদের নিজের নির্ব্বাচন নানাকারণে ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে। অতএব এ সম্বন্ধে পিতামাতার উদাসীন থাকা উচিত নহে।

পুত্রের অল্প বয়সে বিবাহ দিলে পিতার একটি নূতন দায়িত্ব জন্মে, পুত্রবধূর যথাযোগ্য লালনপালন ও শিক্ষা দেওয়া।

এ সম্বন্ধে এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে—পুত্রবধূকে কন্যার অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক যত্ন করিবে, কেননা তাহাকে নিজ পিতামাতার যত্ন হইতে ছাড়াইয়া নূতন স্থানে আনা হয়, সুতরাং পিতামাতার নিকট সে যে যত্ন পাইত শ্বশুর শ্বশ্রূর নিকট তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক না পাইলে তাহার অভাবপূরণ হইতে পারে না।

পুত্রকন্যার ভরণপোষণও অপর কর্ত্তব্য পালননিমিত্ত অর্থ সঞ্চয়।

পিতামাতার আর একটি কর্ত্তব্যকার্য্য, পুত্রকন্যার ভরণপোষণ নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয়। পুত্র যে শীঘ্র বা বিলম্বে নিজের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে তাহার যখন নিশ্চয় নাই, তখন পিতার কর্ত্তব্য পুত্রের নিমিত্ত কিছু অর্থ সঞ্চয় করা। সঞ্চয়ের আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে। নিজের ও অন্যের অসময়ে উপকারে লাগে এরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ সকলেরই সঞ্চয় করা উচিত। কাহার কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করা উচিত তাহা প্রত্যেকের আয় ও আবশ্যক ব্যয়ের উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু কিছু সঞ্চয় করা সকলেরই উচিত, এবং সে সঞ্চয় ব্যয়ের পূর্ব্বে রাখা আবশ্যক, ব্যয়ের পরে নহে।

পুত্রকন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য, তবে তাহাদের কোন বিষয়ে ভ্রম দেখিতে পাইলে বন্ধুভাবে তাহা সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে সদুপদেশ দেওয়া উচিত।

৩। পিতামাতার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা

৩। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যতা।

পিতামাতাকে ভক্তি করা, অল্প বয়সে তাঁহাদের ইচ্ছামতে চলা, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদের কথার প্রতি শ্রদ্ধা করা, পুত্রকন্যার কর্ত্তব্য।

পিতামাতা যদি কোন স্পষ্ট অবৈধ কার্য্য করিতে বলেন, পুত্রকন্যা তাহা করিতে বাধ্য নহে, তবে তাহাদের বিনীত ভাবে সেই কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের উপর অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। কারণ পিতামাতার প্রতি ভক্তি তাঁহাদের গুণের জন্য নহে, তাঁহাদের সহিত সম্পর্কের জন্য। যাহার পিতামাতা সদ্‌গুণযুক্ত, তাহার পিতামাতার প্রতি ভক্তি সম্পর্ক ও গুণ উভয়ের জন্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহার পিতামাতা নির্গুণ বা অসদ্‌-গুণযুক্ত, তাহার ভক্তি কেবল সম্পর্কানুরোধে, কিন্তু তথাপি তাহার তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করা কর্ত্তব্য।

অল্প বয়সে পিতামাতার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ পুত্রকন্যার পক্ষে অবিধি।

কখন কখন অপ্রাপ্ত ব্যবহার সন্তান পিতামাতার ধর্ম্মপালন অবিহিত ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বন উচিত মনে করে। সে স্থানে তাহার কি কর্ত্তব্য? প্রশ্নটি আপাততঃ একটু কঠিন।

এক পক্ষে বলা যাইতে পারে, ধর্ম্ম যখন মনুষ্যের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধের উপরে নির্ভর করে, এবং সে সম্বন্ধ যখন সকল পার্থিব সম্বন্ধের উপর, তখন এরূপ স্থলে সন্তান পিতামাতার ধর্ম্মে থাকিতে বাধ্য নহে, নিজের যে ধর্ম্মে বিশ্বাস সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য। পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে, প্রথমতঃ অল্প বয়সে বুদ্ধি অপরিপক্ক থাকা কালে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বোধগম্য হয় না, সুতরাং সে অবস্থায় ধর্ম্মপরিবর্ত্তন অকর্ত্তব্য। এবং দ্বিতীয়তঃ যখন সকল ধর্ম্মেরই স্থূল কথা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস এবং আত্মসংযমপূর্ব্বক সৎপথে থাকা, এবং যখন ধর্ম্মের প্রভেদ সূক্ষ্ম কথা লইয়া, তখন বুদ্ধি পরিপক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মপরিবর্ত্তনে ক্ষান্ত থাকাতে কাহারও বিশেষ অনিষ্ট হওয়া সম্ভাব্য নহে। এতদ্ভিন্ন অল্প বয়সে পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে গেলে স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমশঃ প্রশ্রয় পাইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। অতএব অনুকূল প্রতিকূল যুক্তির আলোচনা করিয়া দেখিলে, অপ্রাপ্ত-ব্যবহার সন্তানের ধর্ম্মপরিবর্ত্তন অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

যাঁহারা বালক বালিকাগণকে পিতামাতার ধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণের উপদেশ বা উৎসাহ দেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রণোদিত হইলেও তাঁহাদের কার্য্য নানারূপে অনিষ্টকর। যাহাদিগকে ধর্ম্মপরিবর্ত্তনে প্রবৃত্তি দেওয়া হয় তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পায়। তাহাদের পিতৃমাতৃভক্তি নষ্ট না হউক, খর্ব্ব হওয়াতে তাহাদের ভক্তিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশের বাধা জন্মায়। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। এবং তাহাদের পিতা-মাতার নানাবিধ অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত হয়। হিন্দু বালকদিগের পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তির যে অভাব বা হ্রাস এক্ষণে লক্ষিত হয়,

তাহার একটা কারণ বোধ হয় তাহাদের পিতামাতার ধর্ম্মে, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মে, অশ্রদ্ধাপ্রবর্ত্তক শিক্ষা।

বলা বাহুল্য, সন্তানেরা উপযুক্ত হইলে তাহাদের সাধ্যমত পিতামাতার হিতসাধনে রত থাকা কর্ত্তব্য।

৪। জ্ঞাতিবন্ধু আদি স্বজনবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যতা।

৪। জ্ঞাতিবন্ধু আদি অন্যান্য স্বজনবর্গের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা

এ বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে—সম্পর্কের ও ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতা অনুসারে যাঁহার যতদূর ভক্তি বা স্নেহ এবং কায়িক ও আর্থিক সাহায্য পাইবার ন্যায্য আশা হইতে পারে, সাধ্যমত তাঁহার সেই আশা ততদূর পূরণ করা কর্ত্তব্য। নিজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে, এরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য যে, স্বজনবর্গের মধ্যে কেহই গর্ব্বিত বলিয়া না ভাবেন। নিজের অবস্থা মন্দ হইলে, এরূপ ব্যবহার করা উচিত যে, কেহ অসঙ্গত উপকার প্রত্যাশী বলিয়া না মনে করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম

সমাজ বন্ধনের মূল।

মনুষ্যের অধিকাংশ কর্ম্ম সামাজিক নীতিদ্বারা অনুশাসিত। সেই সকল কর্ম্মের আলোচনার নিমিত্ত সমাজ ও সমাজনীতি কি, তাহা স্থির করা আবশ্যক। সামাজিক নীতি নির্ণীত হইলে সেই নীতিসিদ্ধ কর্ম্মও সঙ্গে সঙ্গে নির্ণীত হইবে, তাহার আর পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন থাকিবে না। জীবজগতে সমাজ অতি বিচিত্র বস্তু। কেবল মনুষ্য নহে, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকাদি কীট পতঙ্গ, কাক বকাদি পক্ষী, এবং মেষ মহিষাদি পশুও দলবদ্ধ হইয়া থাকে। জগতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই দুই শক্তি সর্ব্বত্র প্রতীয়মান। জীবজগতে, জীবের সমাজ সেই আকর্ষণ শক্তির ফল, ও জীবের স্বাতন্ত্র্য সেই বিপ্রকর্ষণশক্তির কার্য্য।

সামাজিক নীতি নির্ণীত হইলেই সেই নীতিসিদ্ধ কর্ম্মও নির্ণীত হইবে।

মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বোধ হয় নিকটবর্ত্তী পরিবারসমষ্টি লইয়া সমাজের সৃষ্টি হয়। ক্রমে নানাবিধ সমাজের উৎপত্তি হয়। এবং বর্ত্তমানকালে সভ্য-জগতে সমাজ এত অশেষ প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজের শ্রেণিবিভাগ অতি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। একস্থানবাসী ও একধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি লইয়াই সমাজ প্রধানতঃ গঠিত হয়। কিন্তু বাষ্পযানদ্বারা গমনাগমনের সুবিধাপ্রযুক্ত দূরত্বের একপ্রকার লোপ হওয়ায়, এবং সুশিক্ষার ফলে মত-বৈষম্যের শনতাপ্রযুক্ত ধর্ম্মবিরোধের অনেকটা লাঘব হওয়ায়, নানাস্থানবাসী ও নানাধর্ম্মাবলম্বী লোকেও, কার্য্য বিশেষে একমত হইলে, একসমাজ বা এক-সমিতিভুক্ত হইতেছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইলে, একপরিবারস্থ ব্যক্তিগণও ভিন্ন ভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়া থাকেন। এক রাজার শাসনাধীনে থাকাও এক সমাজভুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নহে। বিদ্যানুশীলনাদি অনেক কার্য্যে, ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রজারা এক সমাজভুক্ত হইয়া থাকেন।[১] অতএব সমাজশব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে না লইয়া বিস্তীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিলে, সমাজবন্ধনার্থে, এক বংশে জন্ম, বা এক স্থানে বাস, বা এক ধর্ম্মে বিশ্বাস, বা এক রাজশাসনাধীনে অবস্থিতি, ইহার কিছুই নিতান্ত

---

[১] "Association of all Classes of all Nations" নামে এক সভা Robert Owen কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। Socialism শব্দ তাহার কার্য্যপ্রণালীতে প্রথমে ব্যবহৃত হয়। Encyclopædia Britannica, 9th Ed., Vol. XXII, Article Socialism দ্রষ্টব্য।

প্রয়োজনীয় নহে। আবশ্যক কেবল সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের উদ্দেশ্যের সহিত ঐকমত্য এবং সমাজের অন্তর্গত হইবার ইচ্ছা।

সমাজবন্ধন যখন সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তখন সামাজিক নিয়মও স্পষ্টরূপে বা প্রকারান্তরে অবশ্যই সেই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কারণ সেই নিয়ম যদি কাহারও ইচ্ছাবিরুদ্ধ হয়, তিনি মনে করিলেই সমাজ ছাড়িয়া দিতে পারেন। তবে সমাজের পরিসর সংকীর্ণ না হইলে, সমাজের নিয়ম ও নীতি ন্যায়ানুবর্ত্তী হওয়াই সম্ভাব্য, কেন না তদ্বিপরীত হইলে তাহা বহুসংখ্যক লোকের অনুমোদিত হইতে পারে না। সমাজবন্ধন ও সামাজিক নিয়ম লোকের ইচ্ছানুবর্ত্তী বলিয়াই জনসাধারণের নিকট তাহা এত সম্মানিত।

সামাজিক নীতি

সামাজিক নীতি নানা সমাজে নানারূপ। তন্মধ্যে কতকগুলি সকল সমাজেই গ্রাহ্য, এবং তাহাদিগকে **সাধারণ সমাজনীতি** বলা যাইতে পারে, আর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমাজের গ্রাহ্য, এবং তাহাদিগকে **বিশেষ সমাজনীতি** বলা যায়। সাধারণ সমাজনীতি, মানুষে মানুষে পরস্পর ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিতে গেলে যে সকল নিয়ম অনুসারে চলা উচিত, সেই সকল নিয়মের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ সমাজ-নীতি।
১। গুরুতর অনিষ্ট-নিবারণার্থ ভিন্ন অনিষ্টকর কার্য্য নিষিদ্ধ।

১। অন্যের অনিষ্ট করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। তবে কাহারও গুরুতর অনিষ্টনিবারণার্থে অনিষ্টকারীর কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক হইলে সে স্থলে সেইটুকু অনিষ্ট নিষিদ্ধ নহে।

এ কথার প্রথম ভাগ সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধেও বোধ হয় কাহার বিশেষ আপত্তি থাকিবে না।

২। নিজের ন্যায্য হিত-সাধনে অন্যের অহিত হইলে তাহাতে আপত্তি অকর্ত্তব্য।

২। সাধ্যমত নিজের ও অন্যের ন্যায্য হিতসাধন কর্ত্তব্য, তাহাতে কাহারও অহিত হইলে তজ্জন্য আপত্তি করা কর্ত্তব্য নহে।

একথাটি তত স্পষ্ট হইল না। ইহা বিশদ করিবার নিমিত্ত আরও কিছু বলা আবশ্যক। প্রথমোক্ত কথাটির উদ্দেশ্য অনিষ্টনিবারণ। এবং স্থল-বিশেষে অনিষ্টকর কার্য্য নিষিদ্ধ নহে যে বলা হইয়াছে, তাহাও গুরুতর অনিষ্টনিবারণার্থ। দ্বিতীয় কথাটির উদ্দেশ্য লোকের হিতকর কার্য্যে উত্তেজনা। যেমন অনিষ্টনিবারণের প্রয়োজন, তেমনই হিতসাধনেরও প্রয়োজন। যদি আমরা অনিষ্টকর কার্য্যে বিরত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে হিতকর কার্য্যেও বিরত হই এবং (কল্পনা করা যাউক) নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকি, তবে অকার্য্যও হইবে না কার্য্যও হইবে না, এবং অল্প দিন পরেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে, কার্য্যাকার্য্য কিছুই করিবার লোকও থাকিবে না। অনাহারে মানবজাতি পৃথিবী হইতে তিরোধান হইবে। কিন্তু তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ আমাদের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে, পরস্পরের অনিষ্ট করিয়াও আমরা নিজ নিজ রক্ষার চেষ্টা করি। আত্মরক্ষার চেষ্টার সঙ্গেই

আবার আত্মবিনাশের সম্ভাবনা জড়িত থাকে। এই জন্য উপরি উক্ত নিবর্ত্তক ও প্রবর্ত্তক দুইটি নীতির ও তদানুষঙ্গিক প্রতিষেধের প্রয়োজন।

যে কার্য্য অনিষ্টকর তাহা কেবল গুরুতর অনিষ্টনিবারণার্থে ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই অন্যায় ও নিষিদ্ধ। কিন্তু যে কার্য্য হিতকর, তাহা যে সর্ব্বত্র বিধিসিদ্ধ এমত বলা যায় না। রামের ধন শ্যাম লইলে শ্যামের হিত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া রামের ধন শ্যামের লওয়া বিধিসিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্য কেবল ন্যায্য হিতসাধন কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, ন্যায্য হিতসাধন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর নিতান্ত সহজ নহে।

প্রথমতঃ যে কার্য্য এক ব্যক্তির হিতকর এবং অন্য কাহারও অহিতকর নহে, তাহা অবশ্যই ন্যায্য হিতকর। এবং সে কার্য্য করা ন্যায্য হিতসাধন বলা যাইতে পারে। অন্তর্জগতের বা আধ্যাত্মিক জগতের সকল হিতকর কার্য্যই ন্যায্য বলা যায়, কারণ তদ্দ্বারা কাহারও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। একজন যদি জ্ঞানানুশীলন বা ধর্ম্মানুশীলন করেন, তাহাতে তাঁহার হিত আছেই, ও তাঁহার কার্য্য ও দৃষ্টান্তদ্বারা অন্যের হিতও হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা কাহারও অহিত হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম যাহা তিনি চাহেন তাহা অসীম, তিনি লইলে তাহা ফুরাইবে না, জগতের সকল জীবে যত চাহে, লইলেও তাহা কমিবে না বরং বাড়িবে। কিন্তু বহির্জগতের বা জড়জগতের কার্য্য সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন পৃথিবী বিপুলা বটে, কিন্তু অনেক প্রসিদ্ধ কর্ম্মীরা পৃথিবী ক্ষুদ্র মনে করেন, সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্য লাভেও তাঁহারা সন্তুষ্ট হন না। সামান্য কথায়, অনেকে একটু ক্ষমতাবান্ হইলেই এই ধরাটাকে সরা খানার মত দেখেন। এই পৃথিবীর ভোগ্যবস্তুর পরিমাণ প্রচুর হইলেও তাহাতে লোকের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। এবং এক বস্তু অনেকে চাহিলে বিবাদ অনিবার্য্য। এইজন্যই সুধীগণ ধনজনসম্পদাদি পার্থিববস্তুকামনায় নিবৃত্তি, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম এই অপার্থিব-বস্তুতে প্রবৃত্তি, প্রকৃতসুখের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি পার্থিববস্তু, যথা গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থান, মনুষ্যের দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা না পাইলে দেহ রক্ষা হয় না, এবং যে জাতির বা যে সমাজের মধ্যে সেই সকল বস্তুর অভাবের উপযুক্ত পূরণ না হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য, সংখ্যা ও সমৃদ্ধির, ক্রমশঃ হ্রাস হয়।

দ্বিতীয়তঃ গ্রাসাচ্ছাদন বাসস্থানাদি সংস্থানার্থে অন্যের স্পষ্ট অনিষ্ট না করিয়া যে সকল নিজের হিতকর কার্য্য করিতে হয়, তাহা ন্যায্য হিতকর কার্য্য বলিতে হইবে, এবং তদ্দ্বারা কাহার কিঞ্চিৎ অহিত হইলেও আপত্তি করা অকর্ত্তব্য।

বহির্জগতে একের হিতের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কিঞ্চিৎ অহিত অনিবার্য্য বলিলেও বলা যায়। মানবের জগতে আগমনই এইরূপ অহিতের সহিত জড়িত। জন্মমাত্রই মানব অনেক স্থলে অপরের শত্রু হয়। সে অপর আবার

আর কেহ নহে, তাহার অগ্রজ সহোদর। এবং সে শত্রুতাও সামান্য শত্রুতা নহে, তাহা সেই অগ্রজকে তাহার শ্রেষ্ঠ আহার মাতৃস্তন্য হইতে, ও তাহার শ্রেষ্ঠ আবাস মাতৃঅঙ্ক হইতে, কিয়ৎপরিমাণে বঞ্চিত করা। কিন্তু সেই শৈশবের বৈরভাব যেমন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃস্নেহে পরিণত হয়, আশা করা যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে গ্রাসাচ্ছাদন-বাসস্থানের বস্তু লইয়া বিরোধ তেমনই সভ্যজগতের সাধারণ ও বাত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রভাব ধারণ করিবে। মানুষে মানুষে এবং জাতিতে জাতিতেও একপ্রকার ভ্রাতৃসম্বন্ধ, সকলেই সেই পরমপিতার সন্তান।

সকল লোকেরই যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসের সংস্থান হয়, এই উদ্দেশ্যে সভ্যজগতে নানাবিধ সভাসমিতির সৃষ্টি, এবং নানাপ্রকার সামাজিক, বাত্তিক, ও রাজনৈতিক মতের প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদয়কে সামাজিকত্ব[১] নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে যে কোনপ্রকার সভাসমিতি, নিয়ম ও মত সংস্থাপিত হউক না কেন, তাহার সকলেরই মূলমন্ত্র এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতি যে সকল নিজ নিজ ন্যায্য হিতকর কার্য্য করে, অর্থাৎ যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদন ও বাস সংস্থানের নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করে, তাহাতে অন্য ব্যক্তি বা অন্য জাতির যে কিছু অহিত হয় তজ্জন্য আপত্তি করা অকর্ত্তব্য। ফল কথা, সমগ্র মানবজাতির হিতের নিমিত্ত প্রত্যেক মানবেরই নিজের হিতাকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই মানবজাতির মধ্যে মৈত্রভাব স্থাপিত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মানবজাতির মধ্যে মৈত্রভাব হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন মনুষ্য সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন, সকলেই পৃথিবীর ভোগ্যবস্তুতে তুল্যাধিকারী, এবং যে সকল নিয়ম তদ্বিপরীত তাহা অগ্রাহ্য। এই মতকে সামাজিকত্ব বা সাম্যবাদ বলা যায়।

আর এক সম্প্রদায়ের মতে সকল মনুষ্য ও সকল জাতিই বিভিন্ন প্রকৃতির, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কার্য্য করে, ও ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে সেই সকল শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং জীবনসংগ্রামে পরিণামে যোগ্যতমের জয় হয়। যে ব্যক্তি ও যে জাতি যোগ্যতম তাহারাই শেষে বাঁচিয়া যায়, অপরে সকলে বিধ্বস্ত বা পরাস্ত হয়। এই মতকে ব্যক্তিগত বৈষম্যবাদ বলা যায়।

এই দুই বিরুদ্ধ মতের কোনটিই যুক্তিসিদ্ধ নহে। সকল মনুষ্য সমান নহে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নানাবিধ। কতকগুলি বিষয়ে, যথা শারীরিক স্বাধীনতায় ও গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসোপযোগীদ্রব্যে, সকলেরই তুল্যাধিকার আছে বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে, যথা অন্যের নিকট সম্মান, ভক্তি বা স্নেহ পাইতে, সকলের অধিকার তুল্য নহে, এবং অধিকার ন্যূনাধিক্যের নিয়ম না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না।

---

[১] Socialism ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ। ৩৪০ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

সকল মনুষ্যই সমান হউক ও সমান অধিকার প্রাপ্ত হউক, ইহা সকলেরই বাঞ্ছনীয়, এবং যাহাতে সকলে সমান হইতে পারে, সকলকে তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়া ও সর্বত্র তদুপযোগী ব্যবস্থা সংস্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যতদিন সকলের পূর্ণ জ্ঞান না জন্মে, ও সেই জ্ঞানের ও সদভ্যাসের ফলে সকলের স্বার্থপর নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর প্রবৃত্তি প্রশমিত না হয়, ততদিন সকল মনুষ্য সমান ও সকল বিষয়ে সমানাধিকারী বলা যাইতে পারে না। অতএব সাম্যবাদ সম্পূর্ণ সত্য নহে। বৈষম্যবাদও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সকল মনুষ্য সমান নহে সত্য। জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয়, ইহাও সত্য। কিন্তু যোগ্যতম কাহাকে বলে? জীবনসংগ্রামই বা কিরূপ, এবং তাহার ফলই বা কি? যখন এই পৃথিবীর জীববিভাগে আধ্যাত্মিকভাবের আবির্ভাব হয় নাই, তখনকার জীবমধ্যে দৈহিক বলে বলীয়ান্ ও আত্মরক্ষার্থে আবশ্যকমত আত্মগোপনে তৎপর হইলেই তাহাকে যোগ্য বলা যাইত। তখনকার জীবন-সংগ্রাম শত্রুবিনাশ। এবং তাহার ফল যোগ্যতমের বৃদ্ধি ও অযোগ্যের হ্রাস ও লোপপ্রাপ্তি। কিন্তু যখন পৃথিবীতে মানবজাতির, ও সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবের আবির্ভাব হইল, সেই সময় হইতে যোগ্যতার লক্ষণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।[১] শত্রুকে বিনাশ করিবার পাশববল অপেক্ষা, শত্রুকে রক্ষা করিবার, সংশোধন করিবার ও মিত্র করিয়া লইবার নিমিত্ত দয়া উপচিকীর্ষা প্রেমাদি উচ্চতর আধ্যাত্মিকশক্তিই যোগ্যতার প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, অর্থাৎ আত্মার পরিসর বৃদ্ধি ও আত্মপরভেদের হ্রাস হইয়া আসিতেছে। জীবনসংগ্রামও, অযোগ্যকে কেবল বলদ্বারা বিনাশ এই নৃশংস ভাব ধারণ না করিয়া, অযোগ্যকে গুণের দ্বারা পরাভব করা, ক্রমশঃ এই শান্তভাবে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়া আসিতেছে। এবং সেই সংগ্রামের ফল, যোগ্যতমের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যেতরের বিনাশ না হইয়া ক্রমশঃ তাহাদের রক্ষা ও যোগ্যতা লাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এখনও সেই সুদিন বহু দূরে, এখনও সে ভাবের বিস্তর ব্যতিক্রম রহিয়াছে, সত্য। সভ্য জগতে মধ্যে মধ্যে স্বার্থপরতার এরূপ প্রবল তরঙ্গ উঠিতেছে যে, সেই মঙ্গলের যে-টুকু সম্ভাবনা হইয়াছে তাহা ভাসাইয়া দিতে পারে, ইহাও সত্য। কিন্তু জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত সকল লোকে স্বার্থপরতা ত্যাগ ও পরার্থপরতা ব্রত অবলম্বন না করুক, নিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত সকলকে সেই পথ অনুসরণ করিবার প্রয়োজন শীঘ্রই হইয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির যুদ্ধ যখন কেবল ক্ষিতিতলে ও সাগরবক্ষে না হইয়া আকাশমার্গেও হইতে থাকিবে, তখন তাহা এরূপ ভীষণভাব ধারণ করিবে যে, যুদ্ধার্থীরাই তাহা হইতে ক্ষান্ত হইবেন। তদ্ভিন্ন স্বজাতীয়ের মধ্যেও অর্থী ও শ্রমীতে যেরূপ ঘোরতর বিরোধের উপক্রম হইয়া

---

[১] এ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিকরূপে Marshall's *Principles of Economics*, pages 302-3 দ্রষ্টব্য।

আসিতেছে, তাহাতে উভয় পক্ষকেই আত্মরক্ষার নিমিত্ত স্বার্থের দুরাকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই কারণে আশা করা যায়, অন্ততঃ নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত লোকে কিঞ্চিৎ পরার্থপর হইবে, এবং মানুষে মানুষে বৈরভাব গিয়া মৈত্রভাব স্থাপিত হইবে।

৩। যতক্ষণ অন্যের অনিষ্ট না হয়, ততক্ষণ সকলেই ইচ্ছামত চলিতে পারে।

৩। তৃতীয় সাধারণ সমাজনীতি এই যে, যতক্ষণ কাহারও অনিষ্ট না হয়, সকলেই আপন আপন ইচ্ছামত চলিতে পারেন। এবং একের ইচ্ছা অন্যের ইচ্ছার সহিত প্রতিঘাত হইলে উভয়েরই ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য, ও বিচার করিয়া যাঁহার ইচ্ছা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্থির হয় তাঁহাকেই ইচ্ছামত চলিতে দেওয়া উচিত। সেই বিচারকার্য্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিজে করিতে পারিলেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয়। তাহা না পারিলে উভয়েরই ক্ষান্ত থাকা অথবা কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির সাহায্যে বিরোধ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

৪। বাক্য বা কার্য্যদ্বারা অন্যের মনে যে আশা উৎপন্ন করা যায় তাহার পূরণ কর্ত্তব্য।

৪। নিজের বাক্য বা কার্য্য দ্বারা অন্যের মনে যে সঙ্গত আশা উৎপন্ন করা যায় তাহা পূরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আইন অনুসারে এরূপ আশা পূরণ করিতে লোকে সকল স্থলে বাধ্য নহে। কিন্তু সামাজিক নীতি অনুসারে তাহা পূরণ করা সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য। আইন ও সামাজিক নীতির পার্থক্যের কারণ এই যে, আইন কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে হস্তক্ষেপ করেন, সমাজনীতি তদতিরিক্ত স্থলেও হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন। আইন কেবল অনিষ্টনিবারণ নিমিত্ত, সমাজনীতি তদতিরিক্ত ইষ্টসাধন নিমিত্ত। আইন লোককে মন্দ হইতে নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত। সমাজনীতি লোককে মন্দ হইতে নিবারণ করিয়া ক্ষান্ত নহেন, ভাল হইতে উত্তেজনা করেন। আইন ও সমাজনীতির কার্য্যের পরিসরে যেমন পার্থক্য, শাসনেও তেমনই পার্থক্য। আইনের পরিসর সঙ্কীর্ণ কিন্তু শাসন কঠিন। সমাজনীতির পরিসর বিস্তীর্ণ কিন্তু শাসন কোমল। কেহ যদি বিনা বিনিময়ে অপরকে দুই দিন পরে কিছু অর্থ দিবেন বলেন, তিনি তাহা না দিলে আইন সে স্থলে হস্তক্ষেপ করিবেন না, সমাজ কিন্তু তাঁহাকে নিন্দনীয় করিবেন। আর যদি কোন বস্তুর বিনিময়ে সেই অর্থ দিবার অঙ্গীকার হয়, তবে আইন সে স্থলে হস্তক্ষেপ করিবেন, এবং সেই অর্থ যাহার প্রাপ্য তাহাকে আদায় করিয়া দিবেন।

৫। সামাজিক কার্য্য অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ী হওয়া কর্ত্তব্য।

৫। কোন সমাজের বা সমিতির কার্য্য সেই সমাজের বা সমিতির অন্তর্গত অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ী হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাই সমাজ বা সমিতির সাধারণ নিয়ম। তবে কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথা, যেখানে সমাজপতির বা সমিতির সভাপতির বা সমাজের কার্য্যকরী সভার দায়িত্ব অতি গুরুতর, অথবা সমাজান্তর্গত সকল ব্যক্তিরই সমান শিক্ষিত ও সুবিবেচক হওয়া সম্ভবপর নহে, সেই সকল স্থলে সমাজের বা সমিতির অধিকাংশ ব্যক্তির ইচ্ছামত পুরাতন নিয়ম রহিত বা নূতন নিয়ম চলিত করণ, সমাজপতি, সভাপতি বা কার্য্যকরী সভা নিষেধ করিতে পারেন। কিন্তু সমাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহারা নিজে পুরাতন নিয়ম রহিত বা নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে পারেন না।

সাধারণতঃ অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ী কার্য্য করিবার নিয়মের হেতু এই যে, প্রথমতঃ, যে কার্য্যদ্বারা সমগ্র সমাজের ক্ষতি-বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা সমাজের অন্ততঃ অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ী হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তির মত, পূর্ব্ব শিক্ষা ও পূর্ব্ব সংস্কারের ফল, ও তাহা ভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। এই জন্য আমাদের পরস্পরের মত এত বিভিন্ন। অতএব যে মত কোন সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির অনুমোদিত, তাহা ব্যক্তিবিশেষের কুশিক্ষা বা কুসংস্কার দ্বারা দূষিত হওয়া সম্ভাব্য নহে, এবং তাহা ভ্রান্ত হইবে না এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

বিশেষ সমাজ-নীতি।

এক্ষণে বিশেষ সমাজনীতি ও তদনুযায়ী কর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। যখন বিশেষ সমাজনীতি কেবল বিশেষ বিশেষ সমাজে গ্রাহ্য, তখন অগ্রে সমাজের শ্রেণিবিভাগ করিলে ভাল হয়।

সমাজের শ্রেণি-বিভাগ সমাজ সৃষ্ট হইবার নিয়মভেদে দ্বিবিধ, ইচ্ছা-প্রতিষ্ঠিত ও স্বতঃ-প্রতিষ্ঠিত।

সমাজ, সৃষ্ট হইবার নিয়মানুসারে, দ্বিবিধ। কতকগুলি সমাজ সমাজবদ্ধ ব্যক্তিগণের স্পষ্ট প্রকাশিত ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত, যথা পণ্ডিতসভা, ব্রাহ্মণসভা, কায়স্থসভা, বিজ্ঞানসভা ইত্যাদি। এবং আর কতকগুলি সমাজবদ্ধ ব্যক্তি-গণের কোন স্পষ্ট প্রকাশিত ইচ্ছানুসারে প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধ ইচ্ছা প্রকাশ না পাওয়ায়, তাঁহারা তদন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত, যথা হিন্দুসমাজ, নবদ্বীপসমাজ, বৈষ্ণবসমাজ ইত্যাদি। প্রথমোক্ত সমাজগুলি **ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত** ও শেষোক্তগুলি **স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত** বলিয়া সংক্ষেপে অভিহিত হইতে পারে।

উদ্দেশ্যভেদে তাহা নানাবিধ।

বিষয় বা উদ্দেশ্যভেদে সমাজ নানাবিধ, যথা ধর্ম্মানুশীলনার্থ, বিদ্যানু-শীলনার্থ, অর্থানুশীলনার্থ, অন্যান্য কর্ম্মানুশীলনার্থ।

এতদ্ভিন্ন তিনটি সম্বন্ধ আছে যাহার নীতি, আইন ও ধর্ম্মনীতির সহিত কিঞ্চিৎ সংস্পৃষ্ট হইলেও, সমাজনীতির সহিত বিশেষ সংস্রব রাখে। সেই তিনটি—গুরুশিষ্য সম্বন্ধ, প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ, দাতাগ্রহীতা সম্বন্ধ।

যে কএকটি বিশেষবিধ সমাজ বা সম্বন্ধ ও তাহার নীতি এবং সেই নীতিসিদ্ধ কর্ম্মের এস্থলে আলোচনা হইবে তাহা এই—

আলোচ্য বিষয়।

(১) জাতীয় সমাজ, (২) প্রতিবাসী সমাজ, (৩) একধর্ম্মাবলম্বী সমাজ, (৪) ধর্ম্মানুশীলনসমাজ, (৫) জ্ঞানানুশীলনসমাজ, (৬) অর্থানুশীলনসমাজ, (৭) গুরুশিষ্য সম্বন্ধ, (৮) প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ, (৯) দাতাগ্রহীতা সম্বন্ধ।

১। জাতীয় সমাজ ও তাহার নীতি

১। জাতীয় সমাজ ও তাহার নীতি।

জাতীয় সমাজ কি তাহা স্থির করিতে হইলে, জাতি কাহাকে বলা যায় অগ্রে স্থির করা আবশ্যক। জাতি শব্দ জন্ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন, সুতরাং তাহার যৌগিক অর্থ জন্মের সহিত সংস্রব রাখে। যাহারা মূলে এক পিতামাতা হইতে বা একদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা প্রায়ই একজাতীয়। তবে এ কথার অনেক ব্যতিক্রম আছে। খৃষ্টীয় ও ইহুদীয়

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে[১] সকল মনুষ্যই নোয়ার সন্তান, কিন্তু সকলে একজাতীয় নহে। সকলেই মানবজাতির অন্তর্গত বটে, কিন্তু মানবজাতি যে অর্থে একজাতি, জাতীয় সমাজ বলিতে গেলে সে স্থলে জাতি সে অর্থে ব্যবহার করা যায় না। একদেশে জন্ম হইলেও সকল স্থলে লোকে একজাতি হয় না। ভারতে বর্ত্তমান কালে ইংরাজ ও মুসলমান জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলে এক-জাতি নহেন। মূলে এক পিতামাতা হইতে যাহাদের জন্ম তাহাদিগকে একজাতীয় বলিতে বাধা অতি অল্পই দেখা যায়। একদেশজাত সকলকে একজাতি বলার পক্ষে বাধা তদপেক্ষা অধিক।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা জাতি শব্দের স্থূল অর্থ। কথাটা আর একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ভাল হয়। জাতি শব্দ প্রায় সকল পদার্থ সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যায়, এবং সেরূপ প্রয়োগস্থলে তাহার অর্থ, 'প্রকার' বা 'রকম'। সেই বিস্তৃত অর্থের সহিত বর্ত্তমান আলোচনার কোন সংস্রব নাই। মানব-সমষ্টির সম্বন্ধে জাতি শব্দ যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। সেই অর্থ প্রধানতঃ দুইটি। আকারপ্রকার, ভাষাব্যবহারাদি ভেদে মানবগণকে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় তাহাকে জাতি বলে, যথা আর্য্যজাতি, কাফ্রিজাতি, হিন্দুজাতি, ব্রাহ্মণজাতি ইত্যাদি। জাতিশব্দের এই একটি অর্থ। এবং একদেশে বা এক রাজার অধীনে যাহাদের বাস তাহাদিগকেও একজাতি বলে, যথা, ইংরাজজাতি। জাতি শব্দের এই আর একটি অর্থ। জাতিতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ প্রথমোক্ত অর্থে জাতি-বিভাগ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তদনুসারে আকার ও বর্ণের সাদৃশ্য একজাতিত্বের নিশ্চিত লক্ষণ। ভাষার সাদৃশ্যও একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু তত নিশ্চিত লক্ষণ নহে। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর সমস্ত মানব তিন প্রধান জাতিতে বিভক্ত, (১) ইথিওপিয়ান্ বা কৃষ্ণবর্ণ, (২) মঙ্গো-লিয়ান্ বা পীতবর্ণ, (৩) ককেসিয়ান্ বা শুক্লবর্ণ। ভারতের হিন্দুরা ইহার কোন্ বিভাগান্তর্গত, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। দুইজন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে হিন্দুরা তৃতীয় বিভাগভুক্ত। কিন্তু আর দুইজন (যাঁহারা এদেশে আসিয়াছেন) এ মত ঠিক বলিয়া মানেন না। তাঁহাদের মধ্যে একজন এতদূর গিয়াছেন যে, তাঁহার মতে, ভারতবাসীদিগের আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণিতে বিভাগ স্বীকারযোগ্য নহে, এবং 'বেনারস্ সংস্কৃত কলেজের উচ্চজাতীয় ছাত্রদিগকে ও রাস্তার ঝাড়ুদারদিগকে দেখিয়া তাহারা যে ভিন্নজাতীয়, একথা কেহ স্বপ্নেও মনে করিবেন না।'[২] কথাটা ঠিক হউক আর না হউক, ভাষাটা

---

১ *Genesis* X, 32 দ্রষ্টব্য।

২ Sir H. H. Risley's *The People of India*, Pages 20-25 দ্রষ্টব্য।

একটু সংযত হইলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া কাহারও বিরক্ত হইবার প্রয়োজন নাই। অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবমুখমণ্ডলের অবয়বের মোটামুটি পরিমাপ গোটাকতক লোকের মুখ হইতে লইয়া সমগ্র দেশের লোকের জাতিনির্দ্দেশের নিয়ম কতদূর সঙ্গত তাহা ঠিক বলিতে না পারিলেও, ইহা ঠিক বলা যায় যে ঘাতপ্রতিঘাতের নিয়ম জগতে অপ্রতিহত। সুতরাং যে উচ্চজাতীয় হিন্দুরা পাশ্চাত্যদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন, একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক ঝাড়ুদারের সহিত তাঁহাদের সমীকরণ নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। তবে একটু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিন্দুদিগের বর্ণভেদ, অর্থাৎ জাতিভেদ, যাঁহারা এত তীব্রভাবে নিন্দা করেন, তাঁহাদের মধ্যেই সেই বর্ণভেদজ্ঞান এত তীব্র। ফলতঃ, যে আত্মাভিমান এই বর্ণভেদ বা জাতিভেদের মূল তাহা ত্যাগ করা অতি কঠিন। অতএব এই আলোচনায় আনুষঙ্গিকরূপে এই নীতির উপলব্ধি হইতেছে যে—

কোন বর্ণ বা জাতির অন্য বর্ণ বা জাতিকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। জাতীয় সমাজের ইহা প্রথম নীতি বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

সমগ্র শুক্লবর্ণ, কি সমগ্র পীতবর্ণ, কি সমগ্র কৃষ্ণবর্ণ মানবমণ্ডল যে একজাতীয় সমাজভুক্ত হইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। প্রত্যেকেরই মধ্যে এত অবান্তর বিভাগ ও এত স্বার্থের অনৈক্য রহিয়াছে যে, কাহারও একতা ঘটন সহজ নহে।

স্বার্থের ও উদ্দেশ্যের ঐক্য না থাকিলে জাতীয় সমাজ গঠিত হইতে পারে না, কিন্তু সেই স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অসাধু হওয়া উচিত নহে। ইহা জাতীয় সমাজের দ্বিতীয় নীতি।

অসাধু স্বার্থ বা অসাধু উদ্দেশ্য সাধনার্থে জাতীয় সমাজ গঠিত হইলে তাহা সুফলপ্রদ বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না।

এইস্থলে ভারতের হিন্দুসমাজে জাতিভেদ, ও হিন্দু মুসলমানের জাতীয় বিরোধ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ।

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ সম্ভবতঃ প্রথমে বর্ণভেদ হইতে সৃষ্ট হয়। বর্ণ এখনও জাতির প্রতিশব্দ বলিয়া ব্যবহৃত। শুক্লবর্ণ আর্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রগণের সহিত সংঘর্ষণে আসিলে, আর্য্য ও শূদ্র এই জাতিবিভাগ বা বর্ণবিভাগ সহজেই ঘটিয়া থাকিবে, এবং শুক্লবর্ণ আর্য্যগণও কার্য্যানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকিবেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণে হিন্দুসমাজ বিভক্ত হয়। পূর্ব্বকালে বিদ্যায় বুদ্ধিতে ও নানা সদ্‌গুণে ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই জন্য তখনকার নিয়ম ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ অনুকূল ছিল। শূদ্রজাতি তৎকালে সেরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিল না, সেই জন্য তখনকার নিয়ম তাহাদের অনুকূল নহে। কিন্তু সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শূদ্রও প্রশংসনীয় হয়, ও পরকালে

স্বর্গলাভ করে, ইহা শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে।[১] গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন—

> ''বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
> শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥''[২]

> (গাভী হস্তী কুকুরকে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে।
> পণ্ডিতেরা সমভাবে দেখেন সকলে॥)

এবং রামচন্দ্র স্বয়ং গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। অতএব হীনজাতি বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে।

জাতিভেদ কতদূর রহিত করা যাইতে পারে।

জাতি বা বর্ণভেদ এক সময় সমাজের উন্নতির সহায়তা করিয়াছে।[৩] কিন্তু এ দেশের ও হিন্দুসমাজের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে নিম্নশ্রেণির জাতিরা অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে, সুতরাং তাহারা আদরের যোগ্য হইয়াছে। তাহাদের এখন পূর্ব্বমত অনাদর করিতে গেলে তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইবে, এবং সমাজেরও অপকার করা হইবে। কারণ তাহাতে বর্ণে বর্ণে বৈরভাব উপস্থিত হইয়া হিন্দুসমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। অতএব ন্যায়পরতা ও আত্মরক্ষা উভয়ের অনুরোধে হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উদারভাব ধারণ আবশ্যক। বিবাহ ও আহার বাদ রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ে নিম্নশ্রেণির জাতির সহিত আত্মীয়ভাবে ব্যবহার করা এক্ষণে উচ্চ হিন্দুজাতির কর্ত্তব্য। তাহাই উচ্চ হিন্দুপ্রকৃতির উপযুক্ত, এবং তাহাই উদার হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিবাহ ও আহার এই দুই বিষয়ই বা বাদ দেওয়া কেন? এ প্রশ্নের দুইটি সদুত্তর আছে। প্রথমতঃ, এই দুই বিষয় বাদ না রাখিলে চলিবে না। কারণ অসবর্ণ বিবাহ, কেবল হিন্দুশাস্ত্রে নহে, আদালতে প্রচলিত হিন্দু আইন অনুসারেও অসিদ্ধ, এবং লৌকিক বিবাহের আইন (১৮৭২ সালের ৩ আইন) হিন্দুদিগের পক্ষে খাটে না। আর নিম্নবর্ণের সহিত আহার শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও তাহাতে অধর্ম্ম হইবে বলিয়া অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, ও সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই দুই বিষয় বাদ রাখিলে সমাজের একতা বিধানের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবে না। সাধারণতঃ লোকের জীবনে একদিন একবার বিবাহ হয়, কাহার কোথায় বিবাহ হইতে পারে বা না পারে তাহা জানিতেও লোকে তত ব্যগ্র নহে। অতএব অসবর্ণ বিবাহ না চলিলেও, পরস্পরের দেখা, শুনা, বসা, দাঁড়ান, আলাপ-আপ্যায়িতকরণাদি প্রতিদিনের কার্য্যে, মনের ভিতর কাহার প্রতি কাহার ঘৃণা বা ঈর্ষা

---

[১] মনু ১০। ১২৭-৮।

[২] গীতা ৫।১৮

[৩] Marshall's *Principles of Economics*, p. 304 দ্রষ্টব্য।

না থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে আত্মীয়তা সংস্থাপনের কোন বাধা হইতে পারে না। আহার অবশ্যই প্রতিদিনের কার্য্য, এবং সকলে একত্র আহার না করিতে পারিলে একটু অসুবিধা হয়। আহার সম্বন্ধে জাতিভেদ ভ্রমণের পক্ষেও অসুবিধাজনক। কিন্তু সেই অসুবিধার সঙ্গে কিছু সুবিধাও আছে। ভোজনটা যত্রতত্র বা যদাতদা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তাহা হইতে গেলে ভোজনের সময় ও সামগ্রী উভয় বিষয়েই অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, ও তাহাতে স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। সকল লোকেরই যে স্বাস্থ্যের নিয়মের প্রতি সমান আস্থা একথা বলা যায় না, এইজন্য যাহার তাহার হস্তে আহার্য্যবস্তু গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এবং দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা এ বিষয়ে দৃঢ় নিয়ম পালন করিয়া চলেন তাঁহাদের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, ও তাঁহারা তত উৎকট রোগগ্রস্ত হন না।

ব্রাহ্মণসভা, কায়স্থসভা, বৈশ্যসভাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতির উন্নতির নিমিত্ত যে সকল সভা হইতেছে, তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজের হিত হইতে পারে। কিন্তু সেই সকল সভা যদি পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিজের বা হিন্দুসমাজের কাহারই কোন উপকার হইবে না।

হিন্দু, মুসলমানের বিবাদ।

হিন্দু, মুসলমান ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাহাদের বিবাদ করা উচিত নহে। কাহারও ধর্ম্ম অন্যের প্রতি অহিতাচরণ করিতে বলে না। এবং উভয়কেই যখন একত্র থাকিতে হইবে তখন পরস্পরের সদ্ভাব সংস্থাপন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। উভয়ে একটু বিবেচনা করিয়া চলিলে তাহা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে। মুসলমানেরা এদেশে অনেক দিন আছেন। তাঁহাদের প্রথম আগমন-কালে ও তাহার পর কিছু দিন হিন্দুদিগের সহিত তাঁহাদের অসদ্ভাব ছিল। কিন্তু সে সকল দিন গিয়াছে। এক্ষণে সেই বকেয়া হিসাব নিকাসের কোন প্রয়োজন নাই। ইদানীং অনেক দিন হইতে পরস্পরের সদ্ভাব হইয়া আসিতেছে। যাহাতে সেই সদ্ভাব বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

হিন্দু ও মুসলমান কখনও একজাতি হইবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্যাদির উন্নতি সাধনে তাঁহারা সকলেই অবাধে এক সমাজবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, অনেক স্থলে তাহা করেন, এবং সকল স্থলেই এইরূপ করা কর্ত্তব্য।

২। প্রতিবাসী সমাজ ও তাহার নীতি

২। প্রতিবাসী সমাজ ও তাহার নীতি।

আমাদের প্রতিবাসিগণের সহিত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রতিবাসীর ইষ্টানিষ্টের সহিত আমাদের নিজের ইষ্টানিষ্ট অনেক প্রকারে জড়িত। একজন প্রতিবাসীর বাটীতে কোন সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হইলে আমাদের নিজের ও অপর প্রতিবাসীর বাটীতে সেই পীড়া আসিবার সম্ভাবনা, সুতরাং প্রতিবাসীরা

সুস্থ থাকে ইহা আমাদের দেখা কর্ত্তব্য। কেবল আমার নিজের বাটী পরিষ্কৃত থাকিলেই যথেষ্ট নহে। কোন প্রতিবাসীর বাটী অপরিষ্কার থাকিলে তজ্জন্য তথায় রোগ প্রবেশ করিতে পারে, এবং সেই রোগ ক্রমে আমার পরিজনবর্গকে আক্রমণ করিতে পারে। আমার কোন প্রতিবাসীর বাটীতে কোন অমঙ্গল ঘটিলে তাহা দেখিয়া বা শুনিয়া আমার পরিজনবর্গ সন্তপ্ত ও সন্ত্রস্ত হইতে পারে, এবং সেই তাপ ও ত্রাস দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য ও উৎসাহ ভঙ্গ হইতে পারে। আবার আমার প্রতিবাসীরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে, তাহা দেখিয়া আমার পরিজনবর্গ উল্লসিত, উৎসাহিত ও সুখী হইতে পারে। অতএব সহানুভূতি, উপচিকীর্ষাদি পরার্থপরায়ণ প্রবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রকৃত স্বার্থপরতার অনুরোধে প্রতিবাসীর দুঃখমোচনে ও সুখসম্পাদনে আমাদের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

যাঁহার অবস্থা ভাল তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা প্রতিবাসীদিগের যথাসাধ্য উপকার করা কর্ত্তব্য। এবং তাঁহার কখন এমন কোন কার্য্য করা উচিত নহে যদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিবাসীদিগের মনে কষ্ট হয়।

কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। আমরা যেমন নিজের সুখ চাহি, অপর সকলেও সেইরূপ তাহাই চাহে। জগৎ সুখ চাহে, দুঃখ চাহে না। আমি ক্ষুদ্র হইলেও সেই জগতের এক অংশ। আমি জগতের সেই ইচ্ছার অনুকূল কার্য্য করিলেই আমার জগতে আসা ও জগতে থাকা সার্থক। এবং সে ইচ্ছার প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাকে সহজে ছাড়িবে না। আমি কাহারও মনে কষ্ট দিলে সেই কষ্ট বিদ্বেষভাবে পরিণত হইবে, এবং সেই বিদ্বেষের ফল অশেষবিধ অশান্তি ও অনিষ্ট হইতে পারে।

সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কোন কার্য্যই অমিত ও অসংযত আড়ম্বরের সহিত করা উচিত নহে। তাহাতে অকারণ অনেক অর্থ ব্যয় হয়, সে অর্থ থাকিলে অনেক ভাল কার্য্যে লাগিতে পারে। এবং সেরূপ দৃষ্টান্তের ফলও অহিতকর। যাহাদের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে তাহারা দেখাদেখি, কষ্ট হইলেও, সেইরূপ আড়ম্বরের সহিত কার্য্য করিতে চেষ্টা করে, ও পরে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করে। যাহাদের সঙ্গতি নাই তাহারা সেরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না বলিয়া কষ্ট পায়। আমাদের সমাজে বিবাহাদি অনেক কার্য্যের অতিরিক্ত ব্যয় এইরূপে দুই চারি জনের দৃষ্টান্তের দেখাদেখি ঘটিয়া উঠিয়াছে। আমি একজন সম্ভ্রান্ত ধনবান্ ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, তাঁহার পিতার নিয়ম ছিল, কন্যার বিবাহে অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়া বিবাহের পরে কন্যাকে কিছু স্থায়ী বিষয় দেওয়া। আর একজন প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী ধীমান্ যুবক বলিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীকে তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন, সাধারণ নিমন্ত্রণে, যেখানে অনেক স্ত্রীলোক সমবেত হইবার সম্ভাবনা, তিনি যেন সামান্য অলঙ্কার বস্ত্র পরিয়া যান, কারণ বহুমূল্য মণিমুক্তাদিযুক্ত অলঙ্কার পরিয়া গেলে নিজের মনে গর্ব্ব ও অন্যের মনে ক্ষোভ জন্মিতে পারে, এবং শেষোক্ত প্রকার অলঙ্কার মাতা ভগ্নী প্রভৃতি স্বজনবর্গ যাঁহারা দেখিয়া সুখী হইবেন, কেবল তাঁহাদের সম্মুখে

পরা উচিত। এই দুই ব্যক্তিরই কথা অতি সমীচীন, ও সকলের স্মরণ রাখিবার যোগ্য।

যাঁহার অবস্থা ভাল নহে তাঁহার কোন সম্পন্ন প্রতিবাসীর অবস্থা দেখিয়া ক্ষোভ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে তাঁহার কোন লাভ নাই, বরং নিজের দুরবস্থার জন্য যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন তাহা আরও তীব্র বোধ হইবে। পরন্ত নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। তাহা না করিয়া সাধ্যমত আপন অবস্থা ভাল করিতে চেষ্টা করা, এবং প্রতিবাসীদিগের সুখে সুখানুভব করিতে অভ্যাস করা, উচিত। তাহা হইলে নিজের চেষ্টায় ও পরের শুভকামনায় তাঁহার মঙ্গল হইবে। অন্যের, বিশেষতঃ প্রতিবাসীদিগের, প্রীতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা নিতান্ত তুচ্ছ পদার্থ নহে। তাহার কোন অনৈসর্গিক ফল আছে একথা বলিতেছি না। কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মেই তাহার সুফল আছে। যাহাকে প্রতিবাসীরা ভাল বাসে ও যাহার ভাল হইলে তাহারা সুখী হয়, সকলেই সাধ্যানুসারে তাহার উপকার করে, ও সময়ে অসময়ে সকলেই তাহার গুণ গায়, এবং সেই গুণগানের রব সুযোগমত তাহার উপকারে আইসে।

প্রতিবাসিসমাজের কথার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসমাজের দলাদলিসম্বন্ধীয় দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। হিন্দুসমাজবন্ধন শিথিল হওয়ায় দলাদলির আড়ম্বর ও উৎসাহের অনেক হ্রাস হইয়াছে। দলাদলির প্রবল অবস্থায় তদ্দারা একটি উপকার এই হইত যে, কতকগুলি সামাজিক অপরাধ সমাজকর্ত্তৃক শাসিত হইত, তজ্জন্য আদালতের আশ্রয় লইতে হইত না। এবং মোকদ্দমায় লিপ্ত হইলে প্রভূত অর্থনাশ উত্তরোত্তর বিবাদবৃদ্ধি আদি যে সকল গুরুতর অনিষ্ট ঘটে তাহা ঘটিত না। কিন্তু সামাজিকশাসন স্বেচ্ছাশাসন হইলেও, সময়ে সময়ে সবলে দুর্ব্বলে বিরোধস্থলে, অন্যায় ও অসহ্য হইয়া উঠে। সামাজিকশাসনের মধ্যে পংক্তিভোজনে বর্জ্জিত হওয়া তত অসহ্য নহে, কিন্তু পুরোহিত ও ধোপা নাপিত বারণ অতি কষ্টকর। ধোপা নাপিত বারণ কেবল অপরাধীকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মতঃ তাহার কোন প্রয়োজন নাই, এবং বর্ত্তমানকালে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। অপরাধী ধর্ম্মে পতিত হইলে পুরোহিত বারণ শাস্ত্রসঙ্গত হইতে পারে, তবে তাহাও এখন তত কষ্টকর নহে, কারণ পুরোহিতের প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে, এবং প্রয়োজন হইলে যেমন তেমন পুরোহিত সকলেই পাইতে পারে, ও তাহা পাইলেই লোকে সন্তুষ্ট হয়। পংক্তিভোজনে বর্জ্জিত করা এক্ষণে দলাদলির একমাত্র অস্ত্র ও সমাজের একমাত্র শাসন হইয়াছে। সে শাসন হইতে নিষ্কৃতির পথ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত থাকিলে সেই প্রায়শ্চিত্ত করা। সামাজিক অপরাধ যতই প্রায়শ্চিত্তদ্বারা ক্ষালনীয় হয়, ও সেই প্রায়শ্চিত্ত যতদূর যুক্তিসঙ্গত হয়, ততই মঙ্গল। শাস্তি সামাজিক হউক আর রাজনৈতিক হউক, ভাবী অপরাধ নিবারণের নিমিত্ত ভিন্ন অপরাধীকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত বিহিত নহে। অতীত অপরাধের যাহাতে সংশোধন হয় তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সমাজের পবিত্রতারক্ষার্থে দোষকে ঘৃণা করা আবশ্যক, কিন্তু লোকের

সংপ্রবৃত্তি বর্দ্ধনার্থে দোষীকে দয়া করা উচিত, এবং যাহাতে তাহার সংশোধন হয় সেই পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

প্রতিবাসী সমাজসম্বন্ধে আর একটি কথা সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক। সমাজের অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি যত বড়ই হউন না, সমাজ তাঁহার অপেক্ষা বড় এবং তাঁহার নিকট সম্মানার্হ। একথায় কাহারও আত্মাভিমানের ব্যাঘাত হইতে পারে না, কারণ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন সমাজ তাঁহাকে ও আরও পাঁচজনেকে লইয়া, সুতরাং সমাজ তাঁহার অপেক্ষা অবশ্যই কিছু বড়।

৩। এক-ধর্ম্মাবলম্বী সমাজ ও তাহার নীতি।

৩। একধর্ম্মাবলম্বী সমাজ ও তাহার নীতি

একধর্ম্মাবলম্বী সকল ব্যক্তিই কল্পনায় একসমাজ-ভুক্ত। তবে সেরূপ ব্যক্তির সংখ্যা অত্যধিক ও তাঁহাদের বাসস্থান অতি দূরবর্ত্তী হইলে, তাঁহারা একসমাজ-ভুক্ত বলায় কোন ফল নাই, কারণ সেরূপ বিস্তীর্ণ সমাজ কোন বিশেষ কার্য্য করিতে পারে না। কেবল ধর্ম্মবিষয়ক বড় বড় উৎসবে বা মেলায় (যথা, কুম্ভমেলায়) এরূপ বিস্তীর্ণ সমাজের লোকেরা একত্র হইতে পারেন। সচরাচর একধর্ম্মাবলম্বীদিগের সমাজ, একগ্রাম বা নিকটবর্ত্তী দুই চারি গ্রামবাসী লইয়া গঠিত হইয়া থাকে। একধর্ম্মাবলম্বীদিগের সমগ্র সমাজের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকে না, থাকাও সম্ভবপর নহে। হিন্দু সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, মুসলমান সমাজ, খৃষ্টান সমাজ প্রভৃতি এইরূপ সমাজের দৃষ্টান্ত।

৪। ধর্ম্মানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি।

৪। ধর্ম্মানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি

ধর্ম্মানুশীলনার্থে লোকে অনেক স্থলে সমাজবদ্ধ হয়। সেরূপ সমাজও প্রায়ই একধর্ম্মাবলম্বী লোক লইয়া গঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ সমাজ ও ইহার পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সমাজের প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত প্রকারের সমাজ স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত, এবং শেষোক্ত প্রকারের সমাজ ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত। ভারতধর্ম্ম-মণ্ডল, বঙ্গধর্ম্মমণ্ডল, আদি ব্রাহ্ম সমাজ, নববিধান সমাজ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

উপরে বলা হইয়াছে, এরূপ সমাজ প্রায়ই একধর্ম্মাবলম্বী লোক লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু বিদ্বেষভাবাপন্ন না হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর একত্র ধর্ম্মচর্চ্চা করা অসম্ভব নহে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মেরই মূল কথায় অধিক বিরোধ নাই, এবং যে সকল বিষয়ে বিরোধ আছে, সে সকল বিষয়েরও শান্তভাবে আলোচনা চলে। আর সে আলোচনার ফলে আলোচনাকারীদিগের ধর্ম্মপরিবর্ত্তন না হউক পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসংস্থাপন হইতে পারে।

এরূপ সমাজের প্রধান ও অত্যাবশ্যক নীতি এই যে, কেহ কাহার ধর্ম্মের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করেন।

এইস্থলে বলা আবশ্যক, ধর্ম্মানুশীলনের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ হইতে পারে—প্রথমটি লৌকিক, দ্বিতীয়টি পারলৌকিক। প্রথম উদ্দেশ্য অনুসারে ধর্ম্মানুশীলনের ফল, ধর্ম্মবিষয়ে নিজের জ্ঞানলাভ ও সমাজে সুশৃঙ্খলাস্থাপন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে ধর্ম্মানুশীলনের ফল, নিজের ধর্ম্মানুষ্ঠানে দৃঢ়তা ও পরকালে সদ্‌গতির উপায়বিধান। প্রথম উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ইহলোকের সহিত, দ্বিতীয়টি প্রধানতঃ পরলোকের সহিত সম্বন্ধ রাখে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা প্রয়োজনমত 'ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম'শীর্ষক অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ বলা যাইবে। প্রথম উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা জ্ঞানলাভের নিমিত্তই বিধিসিদ্ধ, এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবার বা বিজিগীষা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অকর্ত্তব্য। কারণ সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে আলোচনা শান্তভাবে ও সত্যানুসন্ধানার্থে হইবে না, তাহাতে দাম্ভিকভাব ও কুতর্ক আসিয়া পড়িবে।

৫। জ্ঞানানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি

৫। জ্ঞানানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি।

জ্ঞানানুশীলন সমাজ সভ্যজগতে বহুসংখ্যক ও নানাবিধ, এবং তাহার নিয়মপ্রণালীও নানাবিধ। জ্ঞানানুশীলন সমাজের অধিকাংশই ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত, তবে কতকগুলি রাজপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় সর্ব্বত্রই রাজপ্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য বিদ্যালয়, পুস্তকালয়, ও জ্ঞানানুশীলন সভাসমিতি প্রায়ই ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত। রাজপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নিয়ম রাজা, বা রাজার আদেশমত সমাজ নির্দ্ধারিত করেন। ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত সমাজসকল নিজ নিজ অভিপ্রায়মত আপনাদের নিয়ম স্থির করেন। কিন্তু জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধিকরণ ও শিক্ষার সুপ্রণালীসংস্থাপন এই দুই বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে পরস্পরের প্রতিযোগিতা থাকা অনুচিত, এই সাধারণ নীতিসকল জ্ঞানানুশীলন সমাজের পালনীয়। বিদ্যালয়াদির প্রতিযোগিতা অনেক স্থলে অহিতকর হইয়া উঠে। যেখানে ছাত্রসংখ্যা অধিক নহে, সেখানে এক বিষয়ের একাধিক বিদ্যালয় থাকিলে কাহারও সুবিধা হয় না। প্রথমতঃ, সুশাসনের বাধা ঘটে। এক বিদ্যালয়ের নিয়ম দৃঢ়তর হইলে ছাত্ররা অপেক্ষাকৃত অল্পদৃঢ় নিয়মবিশিষ্ট অন্য বিদ্যালয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, একই কার্য্যের নিমিত্ত দুই বিদ্যালয় থাকাতে অকারণে এক গুণের স্থলে দ্বিগুণ অর্থ ও সামর্থ্যের ব্যয় হয়। প্রতিযোগিতার একটি সুফল আছে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী সাধ্যমত আপনার অবস্থা উত্তরোত্তর ভাল করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টায় সফলতা অর্থের উপর নির্ভর করে, এবং সেই অর্থের মূল যদি ছাত্রগণের বেতন ও স্থানীয় চাঁদা ভিন্ন আর কিছু না থাকে, ও তাহার পরিমাণ যদি দুইটি বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে এক স্থানে দুইটি বিদ্যালয় চালান সুযুক্তি নহে।

বিদ্যালয়সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, অন্যান্য জ্ঞানানুশীলন সমিতিসম্বন্ধেও তাহা খাটে।

প্রতিযোগিতা নিবারণনিমিত্ত কেহ কেহ এত ব্যগ্র যে, তাঁহাদের মতে অর্থের অভাব না থাকিলেও একস্থানে একপ্রকারের একাধিক জ্ঞানানুশীলন সমাজ থাকা অন্যায়। এ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এরূপ স্থলে উপরে দর্শিত প্রতিযোগিতার দোষ ঘটিবার আশঙ্কা নাই, এবং প্রতিযোগিতার উপরি উক্ত সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে।

জ্ঞানানুশীলন সমিতির সম্বন্ধে আর একটি সাধারণ নীতি এই যে, যাঁহারা ঐরূপ কোন সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হন, তাঁহাদের শান্তভাবে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। সভার সমস্ত কার্য্যই যে সকলের পক্ষে জ্ঞানপ্রদ বা চিত্তরঞ্জক হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া যিনি যখন ইচ্ছা করিবেন চলিয়া যাইবেন, এরূপ হইতে গেলে সভার কার্য্য সুচারুরূপে চলার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে মধ্যে উঠিয়া যাওয়ার গোলমালে, যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের সভার কার্য্যে মনোযোগ দিবার পক্ষে বাধা জন্মে। যদি কেহ বলেন অনিচ্ছায় সভায় বসিয়া থাকা কষ্টকর, তাঁহাদের সভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সে বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

সভাসমিতিতে উপস্থিত হওয়া না হওয়া যে সর্ব্বত্র সভ্যগণের ইচ্ছাধীন, একথাও বলা যায় না। কোন কার্য্যকরী সভার সভ্য হইতে গেলে, সাধ্যানুসারে সভার অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি হইল মনে করিতে হইবে। যিনি ঐরূপ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াও নিয়মমত উপস্থিত হইতে বিরত থাকেন, তাঁহার সভ্যপদ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অপর ব্যক্তি সেই পদে নিযুক্ত হইতে ও সভার কার্য্য চালাইতে পারেন।

সমিতিসংক্রান্ত পদের নিমিত্ত নির্ব্বাচনের বিধি।

জ্ঞানানুশীলন সমিতিসংক্রান্ত কোন পদে ব্যক্তিনির্ব্বাচনসম্বন্ধে কএকটি নীতি আছে তাহা সকলেরই পালনীয়।

(১) নির্ব্বাচনপ্রার্থীর আপন মনে নিজযোগ্যতা স্থির করা এবং যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ তিনি সমিতির নিমিত্ত কি বিশেষ কার্য্য করিতে পারিবেন, তাহা স্থির করা অগ্রে কর্ত্তব্য। প্রার্থিত পদের সম্মান অপেক্ষা দায়িত্ব গুরুতর, ও সেই দায়িত্বভার বহন করিতে না পারিলে সম্মানস্থলে লাঞ্ছনা, ইহাও তাঁহার মনে রাখা উচিত।

অনেকস্থলে লোকে নির্ব্বাচিত হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র, কিন্তু নির্ব্বাচিত হইলে পর কার্য্য করিবার নিমিত্ত কোন ব্যগ্রতা দেখান না। তাহা অতি অন্যায়।

(২) যেখানে নির্ব্বাচিত হইবার নিমিত্ত উদ্যোগ নিষিদ্ধ নহে, সেখানে সম্ভবমত উদ্যোগে, অর্থাৎ বিনয়ের সহিত নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেওয়াতে, দোষ নাই। কিন্তু সেই উদ্যোগ উপলক্ষে কোন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য্য বিশেষতঃ কোন প্রতিযোগীর নিন্দাবাদ নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, নির্ব্বাচিত হইবার নিমিত্ত কোন প্রার্থী কেবল যোগ্য ইহা দেখান যথেষ্ট নহে, কিন্তু যোগ্যতম ইহা দেখাইতে হইবে। এবং তজ্জন্য যেমন তাঁহার নিজের যোগ্যতা দেখান আবশ্যক, তেমনই তাঁহার প্রতিযোগীদের অযোগ্যতা দেখানও প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহা সদ্‌যুক্তি নহে। নিজের গুণকীর্ত্তনই অবৈধ, কারণ তাহাতে আত্মাভিমান বৃদ্ধি হয়। তাহার উপর আবার পরের দোষকীর্ত্তন, তাহা কেবল শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ নহে, প্রকৃত অনিষ্টকর, কারণ তদ্দ্বারা ঈর্ষাদ্বেষাদি কু-প্রবৃত্তিসকল প্রশ্রয় পায়। সেরূপ পন্থা অবলম্বনে লোকের পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মার অবনতি তাহার নিশ্চিত ফল।

একদিক হইতে দেখিলে বোধ হয় নির্ব্বাচিত হইবার নিমিত্ত যিনি যত অনুদ্যোগী, তিনিই তত যোগ্য। তবে যিনি অনুদ্যোগী তিনি নির্ব্বাচিত হইলে পদের কার্য্যকরণে কতদূর তৎপর হইবেন, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ ব্যক্তির কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপর নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর করা যাইতে পারে, এবং তাঁহার যে কর্ত্তব্যপালনে ঔদাসীন্য হইবে এ আশঙ্কা অমূলক।

(৩) নির্ব্বাচকগণের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, নির্ব্বাচনে মতপ্রকাশ করার অধিকার কেবল তাঁহাদের নিজ নিজ হিতার্থে নহে, সমস্ত সমিতির হিতার্থে। সুতরাং সেই অধিকার দায়িত্বের সহিত মিশ্রিত, এবং সেই মতপ্রকাশ যথেচ্ছ না হইয়া যথাকালে সমিতির হিতার্থে প্রার্থিগণের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তির অনুকূলে হওয়া উচিত।

নির্ব্বাচকগণমধ্যে অনেকে মনে করিতে পারেন যেখানে একাধিক পদের নিমিত্ত একসঙ্গে নির্ব্বাচন হইবে, ও পদ অপেক্ষা প্রার্থীর সংখ্যা অধিক, এবং প্রার্থীদিগের মধ্যে একজন অতীব যোগ্য বা তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, সেখানে কেবল প্রথম পদের নিমিত্ত তাঁহার অনুকূলে মত দিয়া অন্য কাহারও অনুকূলে মতপ্রকাশ না করাই ভাল, কারণ তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠ প্রার্থীর অনুকূলে অন্যের অপেক্ষা অধিক মত সংগ্রহ হইবে, ও তাঁহার নির্ব্বাচনের বাধা কমিয়া যাইবে, এবং দ্বিতীয় নির্ব্বাচিত ব্যক্তি যিনিই হউন তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এরূপ মনে করা অবিধি। নির্ব্বাচকদিগের কর্ত্তব্য, যথাজ্ঞানে যে যে পদের নিমিত্ত লোক নির্ব্বাচিত হইবে, সেই সকল পদের নিমিত্ত যোগ্যলোকের অনুকূলে মতপ্রকাশ করা। তাহা না করিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-পালন হয় না। উল্লিখিত কৌশলের ফলও যে কি হইবে কেহ পূর্ব্বে বলিতে পারে না। কৌশলকারীদিগের স্বীকার মতেই ত দ্বিতীয় পদের নিমিত্ত তাঁহারা কোন মতপ্রকাশ না করায় সে পদে অযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইতে পারে। এবং প্রথম পদও তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি না পাইয়া অপরে পাইতে পারেন।

যেখানে এক পদের দুই প্রার্থীই কোন নির্ব্বাচকের বন্ধু, সেরূপ স্থলে নির্ব্বাচক কখন কখন মনে করিতে পারেন, কাহারও অনুকূলে মত না দিয়া ক্ষান্ত থাকাই উচিত। কিন্তু ইহাও অবৈধ। যথাজ্ঞানে মতপ্রকাশ নির্ব্বাচকের কর্ত্তব্য, বন্ধুত্বরক্ষা সেস্থলে বিবেচ্য বিষয় নহে।

(৪) নির্ব্বাচনের প্রণালীসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এস্থলে দুইটি কথা অগ্রে স্থির করা আবশ্যক—প্রথম, নির্ব্বাচকদিগের মতের মূল্য তুল্য জ্ঞান করা হইবে, কি তাহাতে কোন ইতরবিশেষ থাকিবে। দ্বিতীয়, দুইজন প্রার্থীর অনুকূলে মতের সংখ্যা সমান হইলে কি করা যাইবে।

প্রথম কথাসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, নির্ব্বাচকদিগের মত প্রায় সর্ব্বত্রই তুল্যমূল্য জ্ঞান করা যায়। একজন বহুদর্শী, বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকের মতের মূল্য একজন অনভিজ্ঞ, অল্পবুদ্ধি, অল্পশিক্ষিত, স্বেচ্ছাচারীর মতের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলেও, সে মূল্যের ঠিক ন্যূনাধিক্য স্থির করিবার উপায় নাই, কারণ অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মপরায়ণতা সূক্ষ্মভাবে পরিমেয় নহে। সুতরাং যেখানে তারতম্যের পরিমাণ স্থির করা যায় না, সেখানে সকল নির্ব্বাচকের মতের মূল্য তুল্য গণ্য করিতেই হইবে। কেবল একস্থলে নির্ব্বাচকদিগের মতের মূল্য সমান গণ্য হয় না, এবং তাহার কারণ, সে স্থলে তাহার তারতম্য রাখা আবশ্যক, ও তাহা সহজে পরিমেয়। সে স্থলটি এই—যেখানে নির্ব্বাচিত ব্যক্তি নির্ব্বাচকদিগের সম্পত্তির উপর করসংস্থাপন আদি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। সেরূপ স্থলে অল্পবিত্তসম্পন্ন ও প্রভূতবিত্তশালী নির্ব্বাচকের মতের মূল্য তুল্য হইলে, যখন প্রথমোক্ত শ্রেণির নির্ব্বাচকের সংখ্যা অধিক, তখন সেই শ্রেণির লোকই নির্ব্বাচিত হওয়া সম্ভবপর, এবং তাহা হইলে নির্ব্বাচিত ব্যক্তির অনুমোদিত নিয়মাবলি অল্পবিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অনুকূল ও প্রভূত সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণের অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনা। এইজন্য এরূপ স্থলে কোন বিশেষ পরিমিতবিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির মতের মূল্য এক ধরিয়া, ক্রমানুয়ে তাহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ইত্যাদি পরিমাণ বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির মতের মূল্য দুই, তিন ইত্যাদি গণ্য করা যায়।

দ্বিতীয় কথার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দুইজন প্রার্থীর অনুকূলে নির্ব্বাচকদিগের মতের সংখ্যা সমান হইলে, নির্ব্বাচন যদি কোন সভায় হয়, সভাপতির অতিরিক্ত মতানুসারে নির্ব্বাচন স্থির হইয়া থাকে। অন্যত্র এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম থাকা আবশ্যক।

এক্ষণে নির্ব্বাচকগণ প্রার্থীদিগের অনুকূলে স্ব স্ব মত কি প্রণালীতে প্রকাশ করিবেন, তাহাই স্থির হওয়া বাকি আছে।

যেখানে নির্ব্বাচন একটি পদের নিমিত্ত, এবং প্রার্থী দুইজন মাত্র, সেখানে কোন গোল নাই। প্রত্যেক নির্ব্বাচক যে প্রার্থীকে যোগ্য মনে করেন, তাঁহার

অনুকূলে মত প্রকাশ করিবেন, এবং অধিকাংশ মত যাঁহার অনুকূলে হইবে, তিনিই নির্ব্বাচিত হইবেন।

যেখানে একটি পদের নিমিত্ত দুই অপেক্ষা অধিক প্রার্থী, সেখানে নিম্ন-লিখিত প্রণালীদ্বয়ের মধ্যে কোথাও প্রথমটি, কোথাও দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা যায়।

প্রথম। অনুমান করা যাউক প্রার্থী ৩ জন, ক, খ ও গ, নির্ব্বাচক ১৯ জন, এবং তাঁহাদের মত এইরূপ, যথা, ৮ জন ক'র অনুকূলে, ৬ জন খ'র অনুকূলে ও ৫ জন গ'র অনুকূলে। ক'র অনুকূলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশ মত হওয়াতে ক নির্ব্বাচিত হইবেন।

এ প্রণালীর অনুকূলে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, নির্ব্বাচকগণমধ্যে অধিকাংশের মতে ক প্রথম স্থান পাইবার যোগ্য, অতএব ক প্রার্থীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে এই আপত্তি আছে যে, যদিও ক ৮ জনের মতে প্রথম স্থান পাইলেন, আর খ ও গ কেহই ততগুলি নির্ব্বাচকের মতে প্রথম স্থানের অধিকারী হইলেন না, কিন্তু ক অপর ১১ জন নির্ব্বাচকের মতে তৃতীয় স্থানের অধিকারী মাত্র হইতে পারেন। আর তাঁহারা কেহ খ-কে প্রথম স্থানের ও গ-কে দ্বিতীয় স্থানের, ও কেহ গ-কে প্রথম স্থানের ও খ-কে দ্বিতীয় স্থানের যোগ্য মনে করেন, এবং খ ও গ-এর মধ্যে যদি কোন একজন প্রার্থী না হইতেন, তবে অপর জন ১১ জনেরই অনুকূল মত পাইতেন। সুতরাং প্রথম প্রণালীর এই বিচিত্র ফল হইতেছে যে, ক'র যদি একা খ'র সঙ্গে বা একা গ'র সঙ্গে প্রতিযোগিতা হইত তাহা হইলে তিনি নির্ব্বাচিত হইতেন না, কিন্তু একত্র তাঁহা অপেক্ষা যোগ্যতর দুইজন প্রতিযোগী থাকায় তিনি নির্ব্বাচিত হইতেছেন। এটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এবং এইজন্য অনেক স্থলে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করা গিয়া থাকে। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, যদি কোন প্রার্থী নির্ব্বাচকগণমধ্যে অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিকাংশের অনুকূল মত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত আপত্তি খাটে না।

দ্বিতীয়। প্রথম নির্ব্বাচনে যাঁহার অনুকূলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক মত প্রকাশ হইল, তাঁহাকে বাদ দিয়া বাকি প্রার্থীদিগের সম্বন্ধে মত গ্রহণ করা হইবে। তাহাতে যদি কোন প্রার্থী অর্দ্ধেক সংখ্যকের অধিক নির্ব্বাচকের অনুকূল মত প্রাপ্ত হন, তিনি নির্ব্বাচিত হইবেন। তাহা না হইলে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক অনুকূল মত পাইলেন, তাঁহাকে বাদ দিয়া অপর প্রার্থিগণসম্বন্ধে পূর্ব্ববৎ মত লওয়া যাইবে। এইরূপে ক্রমশঃ বাদ দিতে দিতে যখন দেখা যাইবে কোন প্রার্থীর অনুকূলে অর্দ্ধেকের অধিকসংখ্যক মত প্রকাশ হইল, তখন তিনিই নির্ব্বাচিত হইলেন বলিয়া স্থির করা যাইবে।

উপরের দৃষ্টান্তে দ্বিতীয় বারের মতপ্রকাশের ফল এইরূপ হইতে পারে—

ক'র	অনুকূলে	৮ জন
খ'র	অনুকূলে	১১ জন
	বা	
ক'র	অনুকূলে	৯ জন
গ'র	অনুকূলে	১০ জন

এবং প্রথমোক্ত স্থলে খ, দ্বিতীয়োক্ত স্থলে গ নির্ব্বাচিত হইবেন।

এই প্রণালীর বিরুদ্ধে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, যে স্থলে নির্ব্বাচকের সংখ্যা অধিক এবং তাঁহারা একত্র সমবেত হইয়া মতপ্রকাশ করেন না, সে স্থলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অন্যান্য বারের মতপ্রকাশ সহজ নহে, ব্যয়ও কষ্টসাধ্য। এইজন্য এ প্রণালী ন্যায়সঙ্গত হইলেও সর্ব্বত্র ইহা অবলম্বন করা কঠিন।

এই অসুবিধার আপত্তি বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিৎ লাপ্লাসের অনুমোদিত প্রণালীতে এড়ান যাইতে পারে। তাহাকে তৃতীয় প্রণালী বলা যাইবে।

তৃতীয়। মনে করা যাউক ৭ জন প্রার্থী আছেন। প্রত্যেক নির্ব্বাচক তাঁহার মতানুসারে প্রার্থীদিগের নাম গুণের তারতম্য-ক্রমে পর পর লিপিবদ্ধ করুন, ও তাঁহাদিগের নামের পার্শ্বে ক্রমানুয়ে ৭ হইতে ১ পর্য্যন্ত অঙ্ক লিখুন। এইরূপে সকল নির্ব্বাচকের মত গৃহীত হইয়া প্রত্যেক প্রার্থীর নামের পার্শ্বস্থ সমস্ত অঙ্কগুলি যোগ দিলে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা পাইবেন তিনিই নির্ব্বাচিত হইবেন।[১]

এ প্রণালী কল্পনায় একপ্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কিন্তু কার্য্যে চালান কঠিন। কারণ প্রার্থীর সংখ্যা একটু অধিক হইলে তাঁহাদিগকে গুণানুসারে পর পর যথাক্রমে সাজান সহজ নহে।

একের অধিক পদের নিমিত্ত একসঙ্গে নির্ব্বাচন করিতে হইলেও শেষোক্ত অর্থাৎ তৃতীয় প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে, এবং যে দুই-তিন ইত্যাদি প্রার্থী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা পাইবেন, তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু সে স্থলে উপরের কথিত গুণানুসারে সাজান অতি কঠিন। এই আপত্তি প্রবল, এবং সেইজন্য এরূপ স্থলে উপরের লিখিত প্রথম প্রণালীই অবলম্বন করা যায়।

নির্ব্বাচনসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা প্রায় সর্ব্বপ্রকার সমিতি-সংক্রান্ত নির্ব্বাচনেই খাটে।

---

[১] এ সম্বন্ধে Todhunter's *History of the Theory of Probability*, pp. 374, 433 and 547 দ্রষ্টব্য।

৬। অর্থানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি

৬। অর্থানুশীলন সমাজ।

অর্থানুশীলন ও অর্থোপার্জ্জনের সুবিধার নিমিত্ত লোকে নানাবিধ নিয়মে সমাজবদ্ধ হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাধীন, যথা, ব্যবহারাজীব সমাজ, এবং অধিকাংশই সমাজবদ্ধ ব্যক্তিদিগের ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাধীন।

অর্থানুশীলন সমিতির কার্য্যপ্রণালী ও হিসাবাদি অতি জটিল ব্যাপার। তাহা অনেকেই ভাল বুঝিতে পারেন না। আর অর্থলালসাও অতি প্রবল প্রবৃত্তি এবং সহজে লোককে কু-পথগামী করে। অতএব সেই সকল সমিতির কর্ত্তৃপক্ষদিগের দেখা কর্ত্তব্য যে, তাহার কার্য্যপ্রণালী ও হিসাব রাখিবার নিয়ম সাধ্যমত যতদূর সরল ও সাধারণের বোধগম্য করা যাইতে পারে তাহা করা হয়, এবং এমন কোন কার্য্য না করা হয় যাহার উপর সন্দেহের ছায়ামাত্রও পড়িতে পারে।

অর্থানুশীলন সমিতির নীতির কথা বলিতে গেলে, **অর্থী ও শ্রমীর সম্বন্ধ, শ্রমীর ধর্ম্মঘট,** অর্থীর **একচেটে** এবং **ব্যবহারাজীব ও চিকিৎসক সম্প্রদায়ের নিয়ম,** এই কএকটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

অর্থী ও শ্রমীর সম্বন্ধ

স্বার্থপরতা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি। তাহা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। তবে সংযত না হইলে তাহাতে আত্মরক্ষা না হইয়া তদ্বিপরীত ফল ঘটে। যে স্বার্থের নিমিত্ত অধিক উদ্বিগ্ন হওয়া যায়, তাহার অন্যায় অনুসরণে সেই স্বার্থেরই হানি হয়। ভবের হাটে সকলেই পূরা লাভ চাহে। কিন্তু একের অন্যায় লাভ অন্যের অন্যায় ক্ষতি না হইলে সম্ভাব্য নহে। কারণ দ্রব্য ও তাহার মূল্যের প্রায় সর্ব্বত্রই এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ক্রেতা দ্রব্য তদপেক্ষা অল্প মূল্যে লইতে গেলে, বা বিক্রেতা তদপেক্ষা অধিক মূল্য চাহিলে, উভয়ের মধ্যে এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। অর্থী অল্প মূল্যে শ্রম ক্রয় করিতে ও শ্রমী অধিক মূল্যে শ্রম বিক্রয় করিতে চাহে, এবং এক পক্ষের অন্যায় লাভ হইতে গেলে অপর পক্ষের অন্যায় ক্ষতি অনিবার্য্য।

আমাদের ভোগ্য বস্তুর অধিকাংশই অর্থী ও শ্রমী উভয়ের যোগে উৎপন্ন হয়। একই ব্যক্তি অর্থী ও শ্রমী, এরূপ অতি অল্প স্থলে দেখা যায়। এবং সে সকল স্থলে উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ অল্প।

অর্থী ও শ্রমীর বিরোধ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং সময়ে সময়ে রাজাও সেই বিরোধ নিবারণার্থে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, ও কল-কারখানায় শ্রমী কয় ঘণ্টার অতিরিক্ত কার্য্য করিবে না, তাহাও কখন কখন আইনদ্বারা স্থির করিয়া দিতেছেন। রাজার এরূপ হস্তক্ষেপণ কতদূর ন্যায়সঙ্গত বা মঙ্গলকর সে পৃথক্ প্রশ্ন। কিন্তু এরূপ হস্তক্ষেপণদ্বারা অর্থী ও শ্রমীর বিবাদ মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে। কোন বিশেষপ্রকার কার্য্যের নিমিত্ত দেশে কত শ্রমীর প্রয়োজন, ও সেইরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ কত শ্রমী দেশে আছে, এই দুই

প্রশ্নের উত্তরের উপর সেই শ্রেণির শ্রমীর শ্রমের মূল্য সচরাচর নির্ভর করে। শ্রমীদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতাই সেই মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। অর্থী স্বভাবতঃই সে মূল্যের অতিরিক্ত কিছুই দিতে চাহিবে না, এবং শ্রমীদিগের প্রতিযোগিতাই তাহাদের লাভের অন্তরায় ও তাহাদের কষ্টের কারণ হইয়া উঠে। সে কষ্টনিবারণ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মদ্বারা সম্ভবপর নহে, কারণ শ্রমী-দিগের প্রতিযোগিতা সকল নিয়ম অতিক্রম করিয়া তাহাদের শ্রমের মূল্যের ন্যূন পরিমাণ স্থির করিয়া দিবে। তাহাদের কষ্ট নিবারণের বোধ হয় একমাত্র উপায় অর্থীর সহৃদয়তা ও কিঞ্চিৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ, অর্থাৎ প্রকৃত স্বার্থপরতা, যাহা পরার্থপরতার বিরোধী নহে। অর্থীরা যদি শ্রমীদিগকে ন্যূনতম বেতনে খাটাইতে পারিয়াও সহৃদয়তাবশতঃ তাহাদের কষ্ট নিবারণার্থে কিঞ্চিৎ যত্নবান্ হয়, তাহা হইলে তাহারাও সুখী হইতে পারে, অর্থীদিগেরও কোন ক্ষতি হয় না। একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাইয়া শ্রমীরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শ্রম করিতে সমর্থ হয়, ও অর্থীদিগের কার্য্য ভালরূপে করিতে পারে, এবং অর্থীরা শ্রমীদিগের নিমিত্ত যেটুকু অতিরিক্ত ব্যয় করে তাহার বিনিময়ে পরিণামে ভাল কার্য্য পাইতে পারে।

আবার অর্থীদিগের পক্ষে যেমন সহৃদয়তা আবশ্যক, শ্রমীদিগের পক্ষে তেমনই সৌজন্য আবশ্যক, অর্থাৎ অর্থীদিগের কার্য্য যথাসাধ্য যত্নের সহিত করা উচিত। এইরূপ সহৃদয়তা ও সৌজন্যের আদান-প্রদান হইলেই সেই সহৃদয়তা স্থায়ী হইতে পারে, নতুবা অর্থীরা প্রতিদান না পাইয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যে অধিক দিন সহৃদয়তা দেখাইবে এমত আশা করা যায় না। মূলকথা এই যে, অর্থী ও শ্রমী দুই পক্ষের মধ্যে সদ্ভাব-সংস্থাপনের ও উভয়েরই হিত-বিধানের একমাত্র উপায়, উভয় পক্ষের অসংযত স্বার্থপরতা, জ্ঞান ও বিবেকদ্বারা সংযত করা। কোন পক্ষের স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন নাই, তাহা সম্ভবপরও নহে। কিন্তু উভয়েরই সেই স্বার্থের অনুসরণ কর্ত্তব্য, যাহা প্রকৃত স্থায়ী ও ন্যায্য, এবং যাহার সহিত ন্যায্যপরার্থের কোন বিরোধ নাই। সেই ন্যায়-পরতাবোধ অর্থী ও শ্রমীর অন্তরে না জন্মিলে, বাহিরের নিয়মদ্বারা তাহাদের বিরোধ-নিবারণ সম্ভাবনীয় নহে।

অতএব উভয়পক্ষের ও জনসাধারণের হিতার্থে, এবং অর্থীর ও শ্রমীর অর্থাগমের নিমিত্ত, কার্য্যদক্ষতাশিক্ষা যেমন আবশ্যক, অন্যায্যস্বার্থের সংযম এবং স্বার্থ-পরার্থের সামঞ্জস্যকরণার্থ নীতিশিক্ষাও তেমনই আবশ্যক।

ধর্ম্মঘট।

অর্থীদিগকে সুবিধামত নিয়ম করিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত শ্রমীরা সময়ে সময়ে ধর্ম্মঘট করিয়া থাকে, অর্থাৎ সকলে একযোগে প্রতিজ্ঞা করিয়া, কাজ করিতে বিরত হয়। সেরূপ ধর্ম্মঘট ন্যায়সঙ্গত কি না এ প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে এই—

যদি শ্রমীরা সকলেই আপন আপন ইচ্ছায় নিজের হিতার্থে শ্রমকরণে অস্বীকার করে, এবং অর্থীরা সুবিধামত নিয়ম না করিলে কার্য্য করিবে না

বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে, তাহা অন্যায় বলা যায় না। তবে শ্রমীদিগের কর্ত্তব্য অর্থীদিগকে যথাসময়ে তাহাদের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করা। কিন্তু ধর্ম্মঘট করিবার নিমিত্ত যদি শ্রমীদিগের মধ্যে কেহ অপর শ্রমীকে ভয় দেখাইয়া কার্য্য করিতে বিরত করে, কি বিরত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের কার্য্য অন্যায় বলিতে হইবে, কারণ সকলেরই আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিবার অধিকার আছে, এবং যে ব্যক্তি ভয় দেখাইয়া সে অধিকারের বাধা জন্মায় তাহার কার্য্য ন্যায়সঙ্গত নহে।

একচেটে ব্যবসায়।

শ্রমীদিগের পক্ষে যেমন নিজের সুবিধার নিমিত্ত কাহাকেও ভয় না দেখাইয়া আপন আপন ইচ্ছামত ধর্ম্মঘট করা অন্যায় নহে, অর্থীর পক্ষে তেমনই নিজের সুবিধার নিমিত্ত, অসদুপায় অবলম্বন না করিয়া, অপরকে বিশেষ কোন ব্যবসায় পৃথক্‌ভাবে করিতে নিবৃত্ত করিয়া, সেই ব্যবসায় একচেটে করা অন্যায় বলা যায় না। কারণ তদ্দ্বারা অপর ব্যবসায়ীর স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত জন্মে না। এবং একচেটে ব্যবসায়ীরা আপনাদের ব্যবসায় বিস্তৃতরূপে চালাইতে সমর্থ হইয়া সেই ব্যবসায়সম্বন্ধীয় কার্য্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে, ও সেই ব্যবসায়ের দ্রব্য অল্পব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। একচেটে ব্যবসায়ের এই একটি ফল সাধারণের হিতকর। কিন্তু একচেটে ব্যবসায়ী ইচ্ছামত দর চালাইতে ও তাহার ব্যবসায়ের বস্তুর পরিমাণ ইচ্ছামত কম বা বেশি করিতে পারে, এবং তাহাতে সাধারণের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। তদ্ভিন্ন একচেটে ব্যবসায়ী যদি ভয় দেখাইয়া বা অন্য কোন অসদুপায়ে অপরকে সেই ব্যবসায় পৃথক্‌রূপে চালাইতে নিবৃত্ত করে, তাহা অন্যের স্বাধীনতার ব্যাঘাতজনক। সেই সকল স্থলে একচেটে ব্যবসায় অন্যায় বলিতে হইবে।[১]

ব্যবহারাজীব সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যতা।

ব্যবহারাজীব সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে সময়ে সময়ে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি বিশেষবিবেচ্য :—

১। অপরাধীর বা অন্যায়কারীর পক্ষসমর্থন কতদূর ন্যায়সঙ্গত?

২। কোন মোকদ্দমার পূর্ব্ব অবস্থায় একপক্ষের কার্য্য করিয়া তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় অন্য পক্ষের কার্য্য করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত?

৩। কোন উকীলের এককালে একাধিক মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে কি কর্ত্তব্য?

৪। বৃতকর্ম্ম করিতে অক্ষম হইলে তজ্জন্য গৃহীত অর্থ প্রত্যর্পণ করা আবশ্যক কি না?

---

[১] ধর্ম্মঘট ও একচেটে সমন্ধে Sidgewick's *Political Economy*, Bk. II, Ch. X; Marshall's *Principles of Economics*, Bk. V, Ch. VIII, এবং *Encyclopaedia Britannica*, Vol. XXXIII, Article *Strikes* and *Trusts* দ্রষ্টব্য।

প্রথম প্রশ্নসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উকীল কি কাউন্সিল যদি কোন ব্যক্তিকে নিজজ্ঞানে অপরাধী বা অন্যায়কারী বলিয়া জানিয়া থাকেন, তবে সে ব্যক্তিকে সেই অপরাধের দণ্ড বা সেই অন্যায় কার্য্যের ফলভোগ হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তাহার পক্ষসমর্থনকরণে নিযুক্ত হওয়া, আইন অনুসারে নিষিদ্ধ না হইলেও, তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। কারণ সে অবস্থায় সে ব্যক্তির দোষক্ষালনের নিমিত্ত তাঁহার অন্তরের সহিত চেষ্টাকরণে সমর্থ হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে যদি সে ব্যক্তি নিজের অপরাধ বা অন্যায় কার্য্য স্বীকার করিয়া কেবল দণ্ড বা প্রতিশোধের পরিমাণলাঘবার্থ তাঁহার সাহায্য চাহে, সে স্থলে তাহার পক্ষে নিযুক্ত হওয়াতে কোন বাধা থাকিতে পারে না।

যে ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে চাহে তাহার অপরাধ বা অন্যায় কার্য্য, উকীল কি কাউন্সিল যদি নিজজ্ঞানে না জানিয়া, কেবল অনুমান করেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষসমর্থন অস্বীকার করা উচিত নহে। যে পর্য্যন্ত তাহার অপরাধ বা অন্যায় কার্য্য আদালতের বিচারে স্থির না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে দোষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অনুচিত। তবে যেখানে তাহার পক্ষসমর্থনের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প, সেখানে সে কথা তাহাকে বলা, ও মোকদ্দমা রফার যোগ্য হইলে তাহা রফা করিবার পরামর্শ দেওয়া, কর্ত্তব্য।

এই প্রথম প্রশ্নসম্বন্ধে একটি সঙ্কটস্থল আছে। উকীল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধী মনে করিয়া তাহার পক্ষসমর্থনে নিযুক্ত হইলে, পরে যদি সে ব্যক্তি তাঁহার নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করে, তখন তাঁহার কি কর্ত্তব্য? অনেক সুধীগণেরই এই মত যে, উকীলের তখন সে মোকদ্দমা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে বড় বিপদে পড়িতে হয়। এই মত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন, সে ব্যক্তি যখন নিজের স্বীকারমতই দোষী, তখন তাহার আর উকীলের অভাব নূতন বিপদ নহে, তাহার মোকদ্দমায় পরাজিত হওয়া ও দোষের প্রতিফল পাওয়াই ন্যায্য, এবং তাহা না হইলে সমাজের বিপদ বলিলেও বলা যাইতে পারে। এ সকল কথা সত্য বটে, কিন্তু তাহার দোষের প্রতিফল আমাদের বিবেচনানুসারে নিরূপিত হইবে না, আইন অনুসারে নিরূপিত হইবে, এবং সেই নিরূপিত প্রতিফল আমাদের বিবেচনায় অতি কঠিন হইতে পারে। যে আইন প্রতিফল বিধান করিতেছে, সেই আইনই যখন তাহাকে উকীলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করে না, বরং স্বীয় উকীলের নিকট দোষ স্বীকার তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তখন সেরূপ স্বীকার উক্তির জন্য তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যদিও অবস্থাবিশেষে পক্ষপরিবর্ত্তন উকীলের পক্ষে আইন অনুসারে নিষিদ্ধ না হউক, ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে তাহা বিধিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। কারণ মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় উকীল যাহার পক্ষে ছিলেন, সে ব্যক্তি মোকদ্দমা-সম্বন্ধীয় তাহার অনেক

গোপনীয় কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে জানান সম্ভবপর। সুতরাং পক্ষ-পরিবর্ত্তন করিলে উকীল সেরূপে পরিজ্ঞাত একপক্ষের গোপনীয় কথা তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারেন না, অথচ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা না করিলেও সময়ে সময়ে এমন ঘটিতে পারে যে তাহা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। যথা, যে স্থলে তিনি যে পক্ষের উকীল হইয়াছেন সেই পক্ষের বিরুদ্ধে কোন আপত্তির খণ্ডন সেই গোপনীয় কথার উপর সম্পূর্ণ নিভর করে, সে স্থলে সেই কথা মোঅক্কেলের অনুকূলে ব্যবহার না করিয়া ক্ষান্ত থাকা দোষ, আবার তাহা ব্যবহার করাও দোষ। এই উভয়সঙ্কট এড়াইবার নিমিত্ত পক্ষ পরিবর্ত্তন না করাই কর্ত্তব্য।

এরূপ স্থল অনেক আছে, যেখানে উক্ত প্রকার উভয়সঙ্কট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যথা, যদি কেহ আপীল আদালতে কোন মোকদ্দমায় উকীল নিযুক্ত হয়েন, এবং নথিস্থিত অর্থাৎ আদালতে উপস্থিত করা কাগজপত্র দৃষ্টিদ্বারা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কোন কথা জ্ঞাত না হয়েন, তাহা হইলে, সেই মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারার্থে নিম্ন আদালতে যাওয়ার পর পুনরায় যদি আপীল হয়, সে আপীলে তাঁহার ভিন্ন পক্ষে নিযুক্ত হওয়াতে বিশেষ বাধা দেখা যায় না। কিন্তু যখন আপীল আদালতেও মোকদ্দমার গোপনীয় কথা উকীলের জ্ঞাত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে, তখন পক্ষপরিবর্ত্তনের সাধারণ নিষেধ সর্ব্বত্র পালন করাই ভাল।

এ সম্বন্ধে মোকদ্দমার পক্ষগণ কখন কখন কিঞ্চিৎ অন্যায় ব্যবহার করে। অনেকের ইচ্ছা হয় মোকদ্দমায় আদালতের সকল ভাল উকীলকে স্বপক্ষে নিযুক্ত করি, অন্ততঃ বিপক্ষে যাইতে নিবারণ করি। এরূপ স্থলে যে উকীল পক্ষপরিবর্ত্তন করেন না বলিয়া খ্যাত, তাঁহাকে লোকে মোকদ্দমার একটু সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া মনে করে, তাঁহাকে ত আটক করা হইল, এখন অন্য উকীলকে মোকদ্দমায় নিযুক্ত করা যাউক। সুতরাং তিনি তখন অপর পক্ষে নিযুক্ত হইতে নিবৃত্ত থাকিলে তাঁহার আর্থিক ক্ষতি হয়। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার মন বিচলিত হওয়া উচিত নহে। এরূপ উচ্চ ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ আর্থিক ক্ষতি অতি তুচ্ছ বিষয়।

তৃতীয় প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, এককালে একাধিক মোকদ্দমা উঠিবার সম্ভাবনা থাকিলে উকীলের কর্ত্তব্য সে সমস্ত মোকদ্দমাতেই প্রস্তুত থাকা, এবং যে মোকদ্দমা সর্ব্বাগ্রে আরম্ভ হয় তাহাতেই উপস্থিত হওয়া। তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। যে আদালতে একের অধিক বিচারক আছেন এবং এককালে তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ অধিবেশন হয়, সে আদালতে অবশ্যই এককালে একাধিক মোকদ্দমার শুনানি হইবে, এবং কোন্ মোকদ্দমা কখন আরম্ভ হইবে তাহাও কেহ অগ্রে বলিতে পারে না। সুতরাং সে প্রকার আদালতের উকীলেরা যখন কোন মোকদ্দমায় নিযুক্ত হয়েন, তখন নিয়োগকারী অবশ্যই এই বিশ্বাসে কার্য্য করে যে, তিনি তাহার মোকদ্দমায় উপস্থিত হইবার

নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, কিন্তু একই কালে একের অধিক স্থানে কোন মতেই উপস্থিত হইতে পারিবেন না, এবং যে মোকদ্দমা অগ্রে আরম্ভ হইবে তাহাতেই উপস্থিত হইতে বাধ্য হইবেন।

কখন কখন এরূপ ঘটে যে, কোন উকীলের দুইটি মোকদ্দমা সম্ভবতঃ প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হইবে, এবং তন্মধ্যে যেটি অগ্রে আরম্ভ হইবে তাহাতে সেই উকীলের একজন উপযুক্ত সহকারী আছেন, ও সে মোকদ্দমা সহজ, আর যে মোকদ্দমা একটু পরে হইবে তাহাতে তাঁহার কোন উপযুক্ত সঙ্গী নাই, ও তাহা কঠিন। এমত স্থলে তাঁহার দ্বিতীয় মোকদ্দমায় উপস্থিত হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, যেখানে মোকদ্দমায় উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত উকীল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার সময় তিনি যে আদালতের উকীল সেই আদালতেই অন্য বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে ন্যায়তঃ গৃহীত টাকা ফেরত দিতে তিনি বাধ্য নহেন। কারণ এরূপ স্থলে তৃতীয় প্রশ্নের আলোচনায় বলা হইয়াছে, মোকদ্দমার পক্ষগণ এই বিশ্বাসে উকীল নিযুক্ত করে যে, তিনি মোকদ্দমায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সাধ্যমত যত্ন করিবেন, এবং তিনি যে আদালতের উকীল সেই আদালতে উপস্থিত থাকিয়াও যদি তথাকার অন্য বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত থাকা প্রযুক্ত কোন মোকদ্দমায় উপস্থিত হইতে না পারেন, তজ্জন্য তিনি দায়ী হইবেন না। কিন্তু যদি তিনি অন্য কোন আদালতে চলিয়া যান, এবং তজ্জন্য মোকদ্দমায় উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে মোয়াক্কেলের ইচ্ছানুসারে তাঁহার গৃহীত টাকা ফেরত দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্যবহারাজীবদিগের ব্যবসায় একটি অতি সাধু কার্য্য করিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করে, এবং সেই সুযোগমত কার্য্য করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। সেই সাধু কার্য্য, মোকদ্দমা আরম্ভের পূর্ব্বে ও পরে পক্ষগণকে রফা করিবার উপদেশ দেওয়া। সকল স্থলে সে উপদেশ তত প্রয়োজনীয় না হইতে পারে, এবং অনেক স্থলে তাহা নিষ্ফল হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু অনেক স্থল আবার এরূপ আছে যেখানে সে উপদেশ নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ও হিতকর। যথা, যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী অতি নিকটসম্পর্কীয় ব্যক্তি, অথবা মোকদ্দমার ফলাফল অতি অনিশ্চিত, সেখানে মোকদ্দমা চলিলে কেবল বিরোধবৃদ্ধি ও উভয় পক্ষের প্রভূত অর্থনাশ, এবং পরিণামে যিনি পরাজিত হইবেন তাহার মনস্তাপ। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষেরই কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিবাদ নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যতা।

চিকিৎসকের কার্য্য যেমন গৌরবযুক্ত তেমনই দায়িত্বপূর্ণ। তাঁহাদের হস্তে প্রায়ই প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করা যায়। আবার তাঁহাদের একবার ভ্রম হইলে তাহা সংশোধনের উপায় প্রায়ই থাকে না। ব্যবহারাজীবের বা বিচারকের

ভ্রম হইলে পুনর্ব্বিচারদ্বারা সে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, কিন্তু চিকিৎসকের ভ্রমসংশোধননিমিত্ত পুনর্ব্বিচারের স্থল নাই।

তারপর কএকটি কারণে চিকিৎসকের কার্য্য অতি কঠিন হইয়া উঠে।

প্রথমতঃ রোগীদের প্রকৃতি এত বিভিন্ন এবং রোগ এত বিভিন্ন প্রকার ধারণ করে যে, চিকিৎসকের পুস্তকলব্ধ বিদ্যার উপর নির্ভর করিলে কোন মতেই চলে না। প্রায় সর্ব্বত্র নিজের বুদ্ধি খাটাইতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ রোগীর শরীর কাতর, মনও অনেক স্থলে অস্থির, এবং তাহার আত্মীয়স্বজনগণও চিন্তাতে আকুল, সুতরাং যাহাদের নিকট রোগের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারা যায় তাহারা সম্যক্ সাহায্য করিতে অক্ষম, অথচ ব্যাকুলতা-প্রযুক্ত চিকিৎসককে বিরক্ত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ রোগীর আর্থিক অবস্থা অনেক সময় উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যয়-কুলানে অক্ষম।

চতুর্থতঃ রোগীর প্রয়োজন সময় অসময় মানে না, এবং অনেক স্থলে এরূপ অসময়ে চিকিৎসককে ডাকিবার আবশ্যকতা হয় যে, তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলা দুর্ঘট হইয়া উঠে।

এই সমস্ত কারণে চিকিৎসকের কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন উঠিতে পারে। যথা,—

১। চিকিৎসকের নিজের অপরিজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত ঔষধ প্রয়োগ কতদূর ন্যায়সঙ্গত?

২। চিকিৎসা রোগীর আর্থিক অবস্থার ও প্রবৃত্তির উপযোগী করা চিকিৎসকের কতদূর কর্ত্তব্য?

৩। রোগীকে বা তাহার আত্মীয়স্বজনকে রোগীর কিরূপ অবস্থা ও আরোগ্যলাভের কিরূপ সম্ভাবনা তাহা অবগত করা চিকিৎসকের কতদূর কর্ত্তব্য?

৪। রোগীকে দেখিবার আহ্বান রক্ষা করিতে চিকিৎসক কতদূর বাধ্য?

প্রথম প্রশ্নসম্বন্ধে চিকিৎসাশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির কিছু বলা ধৃষ্টতা। কিন্তু আবার চিকিৎসাশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মনেই ঐ প্রশ্ন অগ্রে উথিত হয়, ও বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞানবান্ তাঁহারা নূতন-ঔষধপ্রয়োগে যেরূপ সাহসী হইতে পারেন, যাহাদের সে জ্ঞান নাই তাহারা সেরূপ সাহস করিতে পারে না, ও দুশ্চিন্তায় পড়ে। প্লেগ্, ডিপ্থিরিয়া, সূতিকাজ্বর প্রভৃতি রোগে তত্তৎ রোগের বিষ রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া রোগনিবারণের চিকিৎসা এ দেশে যখন প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন অনেকেই তাহাতে ভীত হইয়াছিল, এবং সে ভয় যে অকারণ, বা তাহা যে এখনও সম্পূর্ণরূপে গিয়াছে, একথা বলা যায় না। সামান্যতঃ ঔষধপ্রয়োগ-সম্বন্ধে চিকিৎসকের উপর রোগীর ও তাহার আত্মীয়স্বজনের নির্ভর করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে চিকিৎসার নূতনত্ব বা উৎকটভাবপ্রযুক্ত তাহারা সেরূপ নির্ভর

করিতে পারে না, সেখানে চিকিৎসকের সেই নূতন প্রণালীর চিকিৎসা হইতে ক্ষান্ত থাকা বিধেয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে চিকিৎসা রোগীর অর্থসঙ্গতির অতীত বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। যেখানে রোগের উপশম তিন সপ্তাহের পূর্ব্বে সম্ভবপর নহে, সেখানে প্রথম সপ্তাহেই যদি রোগীর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, তাহা হইলে অপর দুই সপ্তাহের চিকিৎসার ব্যয় কোথা হইতে আসিবে? এরূপ স্থলে রোগীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, তাহার নিমিত্ত যথাসম্ভব অল্পমূল্যের ঔষধ ব্যবস্থা করা, এবং একদিন দেখিয়া দুই তিন দিনের ব্যবস্থা বলিয়া দেওয়া।

যেখানে রোগী প্রাণান্তেও আমিষ ভক্ষণ করিবে না (যথা, যেখানে রোগী ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা) সেখানে তাহার নিমিত্ত মাংসের রস ব্যবস্থা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

তৃতীয় প্রশ্নসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, রোগের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ও আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা কতদূর, তাহা রোগীকে বলায় তাহার দুশ্চিন্তা ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইতে পারে, এই নিমিত্ত তাহা রোগীকে বলা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজনকে তাহা অবগত করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং যেখানে একের অধিক চিকিৎসক একত্র পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করেন, সেখানে তাঁহাদের পরামর্শকালীন মতামত রোগীর আত্মীয়স্বজনকে জানিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ ঐ সকল বিষয় জানা তাঁহাদের আবশ্যক, এবং তাহা না জানিলে চিকিৎসাসম্বন্ধে তাঁহাদের আপনাদের কি কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা উপযুক্তরূপে স্থির করিতে পারেন না। তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে একেবারে অনভিজ্ঞ হইতে পারেন, এবং কিরূপ চিকিৎসার কি ফল, তাহা চিকিৎসক মহাশয়েরা তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণে ভাল বুঝেন। কিন্তু কোন্ চিকিৎসককে দেখাইলে সুফল হইবে তাহা স্থির করার ভার সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপর রহিয়াছে, ইহা সংসারের এক বিচিত্র প্রহেলিকা। অসাধ্য বা অচিকিৎস্য রোগে চিকিৎসক দেখান রোগীর রোগশান্তির নিমিত্ত হউক আর নাই হউক, তাহার আত্মীয়স্বজনের ক্ষোভশান্তির নিমিত্ত বটে। সুতরাং তাঁহাদের সে ক্ষোভ যাহাতে যায় সে উপায় অবলম্বনকরণে তাঁহাদের সহায়তা করা চিকিৎসকের উচিত।

চতুর্থ প্রশ্নের সদুত্তর সংক্ষেপে এই যে, রোগীর আহ্বানরক্ষার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। এদেশে একটা সাধারণ প্রবাদ আছে, যে সাপের মন্ত্র জানে, সর্পাহত রোগী দেখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কেহ ডাকিতে আসিলে, সময়েই হউক আর অসময়েই হউক তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে হইবে, না গেলে তাহার ঘোর অমঙ্গল ঘটিবে। কথাটি অতি সুন্দর, এবং ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন কঠিন পীড়ার চিকিৎসা জানেন, তাঁহাকে চিকিৎসার নিমিত্ত আহ্বান করিলে সে আহ্বান রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। চিকিৎসকের

ব্যবসায় সামান্য ব্যবসায় নহে। তিনি রোগীর নিকট অর্থ গ্রহণ করুন আর না করুন, সে তুচ্ছ কথা, কিন্তু তাঁহার নিকট যাহা পাইবার নিমিত্ত রোগীর স্বজনগণ ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকে, তাহা অমূল্য পদার্থ, তাহা প্রাণদান। কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়াই হউক আর না লইয়াই হউক, সেই অমূল্য পদার্থ প্রদান করা যাঁহার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, তিনি যেন কখন এরূপ না মনে করেন, আমি যখন আহ্বানকারীর অর্থ লইলাম না তখন তাহার আহ্বান রক্ষা করিতে বাধ্য নহি। তাঁহার নিকট যে অমূল্য প্রতিদান লোকে যাচ্ঞা করে, যথাসাধ্য কাহাকেও তাহা হইতে বঞ্চিত না করাই তাঁহার উচিত।

চিকিৎসাশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃক নানাবিধ উপকারের প্রলোভনবাক্যপূর্ণ ঔষধপ্রচারের বিজ্ঞাপন যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, তৎপ্রতি চিকিৎসকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। চরক[১] বলিয়াছেন অচিকিৎসকের ঔষধ ইন্দ্রের অশনি অপেক্ষাও ভয়ানক।

৭। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ও তাহার নীতি

৭। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ও তাহার নীতি।

গুরুশিষ্য সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয় ও অতি পবিত্র সম্বন্ধ। যিনি যত বুদ্ধিমান্ বা ক্ষমতাবান্ হউন না কেন, গুরু উপদেশ ভিন্ন তিনি কোন বিষয়েই সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে বা সুচারুরূপে কার্য্যদক্ষ হইতে পারেন না, এইজন্য গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয়। কাহারও নিকট কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বা কোন কার্য্যে দক্ষতালাভ করিতে গেলে, তিনি আন্তরিক স্নেহ বা যত্নের সহিত না শিখাইলে, শিক্ষা ফলদায়ক হয় না, এবং গুরুর সেই আন্তরিক স্নেহ বা যত্ন পাইবার নিমিত্ত শিষ্যের গুরুকে ভক্তি করা আবশ্যক। বর্ত্তমান কালে প্রায়ই অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান হয় বটে, কিন্তু তথাপি স্নেহ ও ভক্তির আদান প্রদান এই সম্বন্ধের মূল, এইজন্য ইহা অতি পবিত্র সম্বন্ধ।

কোন কোন বিশেষ স্থলে, যথা, ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশগ্রহণে, গুরুশিষ্য একধর্ম্মাবলম্বী হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন অন্যত্র গুরুশিষ্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হওয়াতে কোন নিষেধ নাই। বরং হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপ হওয়ার বিধি আছে। মনু কহিয়াছেন—

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যাং আদদীতাবরাদপি।"[২]

(শ্রদ্ধাবান্ শুভ বিদ্যা নীচ হতে লবে।)

---

[১] চরকের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[২] মনু ২। ২৩৮।

"লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥"[১]

(লৌকিক বৈদিক কিম্বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।
লভেছ যাঁ হতে তাঁর করিবে সম্মান॥)

অতএব যাঁহার নিকট কোন বিষয়ের শিক্ষালাভ করা যায় তিনি যে জাতীয় ও যে সম্প্রদায়ের হউন না কেন, তাঁহাকে সম্মান ও ভক্তি করা শিষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য। এবং শিষ্য যে জাতীয় ও যে সম্প্রদায়ের হউক না কেন, তাহাকে যত্ন ও স্নেহ করা গুরুর অবশ্যকর্ত্তব্য।

গুরু ও শিষ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইলে কখন কখন এরূপ ঘটিতে পারে, জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া, শিষ্য গুরুকে যথাযোগ্য সম্মান ও ভক্তি করিতে, বা গুরু শিষ্যকে যথোচিত যত্ন ও স্নেহ করিতে, বিরত হয়েন। কিন্তু সেরূপ হওয়া অতি অন্যায় ও দুঃখজনক, এবং তাহার ফল অতি অশুভকর। যাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে তাঁহার দোষ গুণের বিচার তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকারের পর আর চলে না, তখন তাঁহার দোষ গুণের বিচার না করিয়া তাঁহাকে ভক্তি, অন্ততঃ সম্মান, করা উচিত। তাহা না করিলে তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ সম্ভবপর নহে, কারণ তাহা হইলে তাঁহার কথার প্রতি আস্থা জন্মিবে না, ও সে কথা মনোযোগের সহিত শুনা হইবে না। আর যাহাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহার শিষ্য হইবার যোগ্যতার বিচার করা আর চলে না, সে বিচার অগ্রে করা উচিত ছিল। শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পরে তাহাকে স্নেহ অন্ততঃ যত্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা না করিলে সে শিক্ষার পূর্ণ ফললাভ করিতে পারিবে না। অধিকন্তু গুরু যদি শিষ্যকে অযোগ্য বলিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার, ও তাহার উন্নতিসাধনার্থ যত্ন করিবার, দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে শিষ্যের হিতার্থে শ্রম করিবার চেষ্টা অনেকটা শিথিল হইয়া যাইবে। সুতরাং শিষ্যের প্রতি যত্ন ও স্নেহের অভাব গুরুর কর্ত্তব্য পালনের অন্তরায় হইয়া উঠে।

উপরে বলা হইয়াছে গুরুশিষ্যসম্বন্ধ একবার সংস্থাপিত হইলে, পরস্পরের যোগ্যতা বিচার করিতে কাহার আর অধিকার থাকে না, তখন গুরুকে ভক্তি করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং শিষ্যকে যত্ন করা গুরুর পক্ষেও কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। অতএব গুরুশিষ্যসম্বন্ধ সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বেই শিষ্যের গুরুনির্ব্বাচন ও গুরুর শিষ্যনির্ব্বাচন কর্ত্তব্য। কিন্তু সে নির্ব্বাচন কঠিন, এবং অনেক স্থলেই অসম্ভব। প্রথমতঃ শিষ্য বুদ্ধির অপরিপক্বতা ও জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ গুরুনির্ব্বাচনে সমর্থ হইতে পারে না।

[১] মনু ২। ১১৭।

যদি বলা যায় তাহার পিতামাতা বা অন্য অভিভাবক তাহার নিমিত্ত গুরু নির্ব্বাচিত করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমান কালের বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে তাহা সম্ভবপর নহে। ছাত্র বা তাহার অভিভাবক বিদ্যালয় নির্ব্বাচিত করিতে পারেন, কিন্তু তথাকার শিক্ষকনির্ব্বাচনে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই। ছাত্র বা তাহার অভিভাবক উচ্চকল্পে সুনিয়মে পরিচালিত বিদ্যালয় নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। গুরু অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষকও আপন ইচ্ছামত ছাত্র নির্ব্বাচিত করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, গুরু শিষ্য উভয়েরই কর্ত্তব্য, চিত্ত স্থির করিয়া পরস্পরের প্রতি যথাবিধি ব্যবহার করা।

গুরুশিষ্য সম্বন্ধের আর একটি বিশেষত্ব আছে। শিষ্যকে শাসনদ্বারা কার্য্য করাইয়া লওয়া গুরুর পক্ষে যথেষ্ট নহে। গুরুর কর্ত্তব্য শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়া, তাহাকে শাসন করা নহে। শাসন ও শিক্ষার অনেক প্রভেদ। শাসনের উদ্দেশ্য, শাসিত ব্যক্তি, তাহার অন্তরে যাহাই থাকুক, বাহিরে কোন বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তরের দোষ সংশোধিত হইয়া তাহার উৎকর্ষ লাভ হয়। সুতরাং শাসন ভয় দেখাইয়া হইতে পারে, শিক্ষা ভক্তির উদ্রেক ভিন্ন হয় না।

৮। প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ ও তাহার নীতি

৮। প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ ও তাহার নীতি।

প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ সংসারযাত্রানির্ব্বাহার্থে অতি আবশ্যক। সংসারে অনেক কার্য্য আমরা নিজে করিতে সমর্থ নহি, অন্যের সাহায্যে তাহা নির্ব্বাহ করিতে হয়, এবং সেই সাহায্য পাইবার নিমিত্ত সাহায্যকারীকে বেতন দিতে হয়। যেখানে কার্য্য উচ্চশ্রেণির, সেখানে সাহায্যকারীকে ভৃত্য বলা যায় না, তাঁহাকে কর্ম্মচারী বা উপদেষ্টা বলা যায়।

প্রভুর কর্ত্তব্য ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার করা ও তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা। তাহা হইলেই তাহার নিকট বিনা তাড়নায় অনায়াসে পূর্ণমাত্রায় কার্য্য পাওয়া যায়। এবং ভৃত্যের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা যত্নের সহিত প্রভুর কার্য্য করা। তাহা হইলেই সে তাঁহার নিকট সদয় ব্যবহার পাইতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনে যত্নবান্ হইলে উভয়েই পরস্পরের কর্ত্তব্যপালনের সহায়তা করিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা উভয়েই বিশেষ উপকৃত হইতে পারে। যে প্রভু ভৃত্যের প্রতি সহৃদয়তাপ্রযুক্ত তাহাকে অধিক পরিশ্রম না করাইয়া নিজের কাজ যথাসাধ্য নিজে করেন, তিনি যে কেবল ভৃত্যের নিকট ভক্তিভাজন হয়েন তাহা নহে, নিজেও অনেকদূর পরাধীনতামুক্ত থাকেন। কারণ যে প্রভু যতদূর ভৃত্যের সেবাগ্রহণে ব্যগ্র হয়েন, তিনি ততদূর আপনি ভৃত্যের বশীভূত হইয়া পড়েন।

৯। দাতা-গ্রহীতা সম্বন্ধ ও তাহার নীতি।

৯। দাতাগ্রহীতা সম্বন্ধ ও তাহার নীতি

দাতাগ্রহীতার সম্বন্ধ অতি বিচিত্র। একের অভাব ও অন্যের তাহা পূরণ করিবার ইচ্ছা এই দুয়ের মিলন দ্বারা দাতাগ্রহীতা সম্বন্ধ ও অন্যান্য নানা-প্রকার সম্বন্ধ উথিত হয়। সেই অভাব অর্থাভাবও হইতে পারে সামর্থ্যাভাবও হইতে পারে। বিনা বিনিময়ে অন্যের অভাব পূরণকেই দান বলে, এবং সেইরূপ অভাবপূরণদ্বারাই দাতাগ্রহীতা সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। বিনিময় লইয়া অন্যের অভাব পূরণ হইতে উত্তমর্ণ অধমর্ণ, প্রজাভূম্যধিকারী, ক্রেতাবিক্রেতা, প্রভুভৃত্য, প্রভৃতি নানাবিধ সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়।

দাতাগ্রহীতা উভয়েই বিশেষ ব্যক্তি বা উভয়েই ব্যক্তির সমষ্টি বা সমিতি, অথবা একপক্ষ বিশেষ ব্যক্তি ও অপর পক্ষ ব্যক্তির সমষ্টি বা সমিতি হইতে পারে।

প্রাচীনকালের সমাজে ও বর্ত্তমানকালের প্রাচীন প্রকারের সমাজে, বিশেষ ব্যক্তিকর্ত্তৃক বিশেষ ব্যক্তির অভাব পূরণ হওয়াই প্রচলিত প্রথা। সেরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য কি না এই কথার মীমাংসা অগ্রে আবশ্যক। এক দিকে সকল দেশেই, কি কবি, কি নীতিবেত্তা, সকলেই দানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, এবং এদেশে স্মৃতিশাস্ত্রে দানের বিশেষ প্রশংসাবাদ আছে। হেমাদ্রির চতুর্বর্গ-চিন্তামণির দানখণ্ড এই কথা সপ্রমাণ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন জনসাধারণের দানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত নানাবিধ শ্লোকসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটির এস্থলে উল্লেখ করিব।

> "বোধয়ন্তি ন যাচন্তে ভিক্ষাদ্বারা গৃহে গৃহে।
> দীয়তাম্ দীয়তাম্ নিত্যং অদাতুঃ ফলমীদৃশম্ ॥"
> (মাগিয়া ভিক্ষুক এই উপদেশ দেয়।
> দান কর না করিলে এই দশা হয়॥)

অপর দিকে অর্থতত্ত্ববিৎ ও সমাজ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন[১] অবিবেচনা পূর্ব্বক দান করিলে তাহার ফল অশুভকর হয়। সেরূপ দান লোকের আলস্যের প্রশ্রয় দেয়, এবং যাহারা শ্রম করিয়া নিজের ও সমাজের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন করিতে পারিত, তাহারা বসিয়া খাইয়া অন্যের শ্রমের ফল ভোগ করে, এবং সমাজকে সেই ফলভোগে কিয়ৎপরিমাণে বঞ্চিত করে। অযোগ্য পাত্রে দান অবশ্যই অবৈধ।

> "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।"
> (দরিদ্রকে দেহ অর্থ দিও না ধনীরে।)

এই মহাজনবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে ব্যক্তি অভাবে পড়িয়াছে ও অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া সাহায্য চাহিতেছে, সে নিজের দোষে কষ্ট

---

[১] Sidgwick's *Political Economy* গ্রন্থের শেষ অধ্যায় এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

পাইতেছে বলিয়া তাহাকে দানের অযোগ্য মনে করা, ও তাহার আবেদন একেবারে প্রত্যাখ্যান করা, বোধ হয় কঠিন হৃদয়ের কার্য্য। দানের পরিমাণ প্রার্থীর দোষ গুণ অনুসারে স্থির করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রাণধারণোপযোগী সাহায্য পাইবার নিমিত্ত বোধ হয় কোন অভাবপ্রপীড়িত ব্যক্তিই অযোগ্য নহে।

তারপর কেহ কেহ বলেন, ব্যক্তিবিশেষের দান সাধারণের তত উপকারক হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে, সকলেরই কর্ত্তব্য যাহা দান করিবেন তাহা কোন উপযুক্ত সভা সমিতির হস্তে দিবেন, তাহা হইলে, প্রথমতঃ দান উপযুক্ত পাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা অধিক, এবং দ্বিতীয়তঃ পাঁচজনের দান একত্র হইয়া সাধারণের বিশেষ হিতকর কার্য্যে লাগিতে পারে। একথা সত্য বটে, কিন্তু দানের টাকা সভাসমিতির হস্তে পড়িলে যেমন একদিকে সাধারণের পক্ষে অধিক হিতকর হইবার সম্ভাবনা, তেমনই অন্যদিকে তাহাতে আবার সাধারণের ক্ষতিও আছে। কারণ সকলেই যদি নিজ নিজ দাতব্য টাকা সভাসমিতির হস্তে অর্পণ করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রার্থীকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দানের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, এবং লোকে অভাবপ্রপীড়িতের কাতরোক্তির প্রতি অমনোযোগী হইতে ও প্রার্থীকে বিমুখ করিতে অভ্যস্ত হইবে, আর তাহাতে লোকের কারুণ্য উপচিকীর্ষাদি সাধুপ্রবৃত্তির হ্রাস হইবে। অতএব যদিও সভাসমিতির হস্তে লোকের দাতব্যের কিঞ্চিৎ পরিমাণ অর্পিত হওয়া ভাল, তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বহস্তে যোগ্যপাত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে অনেকগুলি সৎপ্রবৃত্তি কার্য্যাভাবে নিস্তেজ হইয়া যাইবে। তবে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। প্রার্থীর কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্র হইয়া দান করা যেমন দাতার পক্ষে প্রশস্ত ও কর্ত্তব্য, প্রার্থীর ধন্যবাদ ও পার্শ্ববর্ত্তী লোকের প্রশংসাবাদের লোভে দান করা তাঁহার পক্ষে তেমনই অপ্রশস্ত ও অকর্ত্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম

রাজনীতি অতি গহন বিষয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে[১] রাজনীতি অতি গহন বিষয়। অথচ রাজনীতি-বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই আবশ্যক, কারণ রাজা ও প্রজা উভয়েরই রাজ-নীতিসিদ্ধ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং রাজনীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য।

রাজনীতি দুই কারণে অতি দুরূহ বিষয়। প্রথমতঃ রাজনৈতিক তত্ত্ব নিরূপণ করা কঠিন। মানবপ্রকৃতি বিচিত্র, তাহা দেশকাল অবস্থাভেদে নানাভাব ধারণ করে। সুতরাং মনুষ্য কোন্‌রূপ রাজশক্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার কিরূপ প্রয়োগ করিবে, এবং কোন্ প্রণালীতে শাসিত হইলেই বা কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা স্থির করা সহজ নহে। যদিও অনেক প্রকার শাসন-প্রণালীর ফলাফল অতীতের ইতিহাস দর্শাইয়া দিতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত সমাজের অবস্থায় কিরূপ পরিবর্ত্তনের বা সংশোধনের কি ফল হইবে, তাহা অনুমান করিয়া ঠিক বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ রাজনীতিবিষয়ক আলোচনাও যথাযোগ্যরূপে এবং কেবল সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হওয়ার পক্ষে বিঘ্ন আছে। পূর্ব্বসংস্কার ও স্বার্থপরতা প্রযুক্ত অনেকেই হয় রাজার না হয় প্রজার পক্ষপাতী। যাঁহারা নিরপেক্ষ তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে, তাঁহাদের কথায় পাছে রাজা বা প্রজা প্রশ্রয় পান এই ভাবিয়া, অসঙ্কুচিত ভাবে সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হন।

কি কি কথার আলোচনা হইবে।

যখন রাজনীতিবিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই আবশ্যক, তখন রাজনীতি দুরূহ বিষয় হইলেও তাহার সম্বন্ধে কএকটি কথার আলোচনা এ স্থলে না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। সে কএকটি কথা এই—

১। রাজা প্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি, নিবৃত্তি, ও স্থিতি।
২। রাজতন্ত্রের এবং রাজা প্রজা সম্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ব্রিটেন ও ভারতের সম্বন্ধ।
৩। প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য।
৪। রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য।
৫। এক জাতির বা রাজ্যের প্রতি অন্য জাতির বা রাজ্যের কর্ত্তব্য।

---

[১] প্রথমভাগের ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১। রাজাপ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি, নিবৃত্তি ও স্থিতি

১। রাজাপ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি, নিবৃত্তি ও স্থিতি।

রাজাপ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি আদির আলোচনা করিতে হইলে সেই সম্বন্ধ কিরূপ তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে সে সম্বন্ধ নানারূপ। তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। এক্ষণে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ স্থূলতঃ কি প্রকার তাহাই বলা যাইতেছে।

রাজাপ্রজা সম্বন্ধের স্থূল লক্ষণ।

মানবপ্রকৃতিতে দুইটি বিপরীত গুণ আছে। মানুষ আপন ইচ্ছামত চলিতে চাহে এবং অন্য কেহ সেই ইচ্ছার বিরোধী হইলে তাহার সহিত বিবাদ করে, আবার অপর মনুষ্যের সহিত মিলিয়া থাকিতেও চাহে। তবে আদিম অসভ্য অবস্থায় সে মিলন নিজের প্রভুত্বপ্রকাশের, ও অপরের দ্বারা নিজের কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত। এইরূপে একত্র দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে গেলে সেই দলের লোকের মধ্যে অনেক সময় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং কখন কখন অন্য দেশের লোকের সহিতও বিরোধ ঘটে। সেই সকল বিবাদভঞ্জন ও বাহিরের শত্রুদমন নিমিত্ত, দলবদ্ধব্যক্তিগণের মধ্যে বলে বা বুদ্ধিতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করেন, এবং দলকে পরিচালিত করেন। দলের প্রয়োজনীয় কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত দলের উপরে একজনের বা একাধিক ব্যক্তির কর্তৃত্বকরণই রাজাপ্রজা সম্বন্ধের মূল লক্ষণ। যিনি বা যাঁহারা ঐরূপ কর্তৃত্ব করেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে রাজা বা রাজশক্তি বলা যায়, এবং যাঁহাদের উপর সেই কর্তৃত্ব করা হয় তাঁহাদিগকে প্রজা বলে।

রাজাপ্রজা সম্বন্ধ সৃষ্টি বিষয়ে মতভেদ।

রাজাপ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। একটা মত এই যে, যাহাদের মধ্যে এ সম্বন্ধ আছে তাহাদের সকলের ইচ্ছানুসারে সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়।[১] তাহার বিরুদ্ধ মত এই যে, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ লোকে একত্র হইয়া সৃষ্টি করে নাই, তাহা প্রত্যেক স্থলেই ক্রমশঃ জন্মে ও বর্দ্ধিত হয়, এবং অবস্থাভেদে নানাস্থানে নানারূপ ধারণ করে। এই দুইটী মতেই কিঞ্চিৎ সত্য আছে, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে।

প্রথমোক্ত মতে এইটুকু সত্য আছে যে, যাহাদের মধ্যে রাজাপ্রজাসম্বন্ধ যে ভাবে আছে, তাহাদের বা তাহাদের অধিকাংশের সেই সম্বন্ধ সে ভাবে থাকাতে, প্রকাশ্যে না হউক প্রকারান্তরে সম্মতি আছে, অন্ততঃ তাহাতে আপত্তি নাই, কেননা তাহা না হইলে সে সম্বন্ধ কখনই থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সে সম্বন্ধ তাহাদের স্পষ্ট সম্মতি অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে একথা বলা যায় না। যেমন লোকের প্রকাশ্য সম্মতিক্রমে ভাষার প্রথম সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব, কেননা তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে,—কোন্ ভাষায় সেই সম্মতি দেওয়ার কার্য্য সম্পন্ন হইল?—তেমনই লোকের প্রকাশ্য সম্মতিতে রাজাপ্রজা সম্বন্ধের প্রথম সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব, কেননা তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে,—সমাজে রাজাপ্রজা

---

[১] Hobbes' Leviathan, Chap. 18 এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধের প্রথম সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে লোকে কাহার নেতৃত্বে একত্র হইয়া সেই সম্বন্ধের সৃষ্টি করিল ?

দ্বিতীয়োক্ত মতটি এই পর্য্যন্ত সত্য যে, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ কোন একদিন শুভ বা অশুভ লগ্নে লোকের প্রকাশ্য সম্মতিক্রমে সৃষ্ট হয় নাই, মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে ক্রমশঃ মানবসমাজের মধ্যে সেই সম্বন্ধ উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, যাহাদের মধ্যে ঐ সম্বন্ধ উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদের মতামত সে উদ্ভাবনবিষয়ে একেবারে গণনীয় নহে, এ কথা বলা যায় না। এই সম্বন্ধ উৎপত্তির অন্যান্য কারণের মধ্যে, যাহারা তাহাতে আবদ্ধ তাহাদের প্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে প্রদত্ত সম্মতি একটি কারণ বলিয়া ধরিতে হইবে।

রাজাপ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে কিরূপে হইয়াছে তাহা তত্তদ্দেশের তৎকালের ইতিবৃত্তের বিষয়। কিন্তু এই সম্বন্ধের প্রথম সৃষ্টি, ভাষাদি অন্যান্য অনেক বিষয়ের প্রথম সৃষ্টির ন্যায়, ইতিহাসসৃষ্টির পূর্ব্বে হইয়াছে, সুতরাং ইতিহাস সে বিষয়ের আলোচনার বিশেষ সাহায্য করিতে পারে না। তবে সাহিত্য ও প্রাচীন রীতিনীতি যাহার সৃষ্টি ইতিহাসের পূর্ব্বে হইয়াছে তাহাতে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ উৎপত্তির যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা সঙ্কলিত করিয়া পণ্ডিতেরা অনেক তত্ত্বনির্ণয় করিয়াছেন।[১] সে সকল কথা এখানে বাহুল্যে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন ভারতে[২] ও গ্রীসে[৩] রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ ঈশ্বরসংস্থাপিত ও রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এবং মিসর ও পারস্যদেশ সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে।[৪]

রাজাপ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির ত্রিবিধ কারণ, শান্তভাবে রাজতন্ত্র পরিবর্ত্তন, বিপ্লবে পরিবর্ত্তন, ও পরাজয়ে পরিবর্ত্তন।

প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার কথা ছাড়িয়া দিয়া, ঐতিহাসিক কালে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিরূপে ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে তাহার অনুশীলন করিতে গেলে দেখা যায়, ঐ সম্বন্ধ নানাদেশে নানা কারণে, নানা রূপ ধরিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার সূক্ষ্মবিবরণ অনেক কথা। স্থূলতঃ এই বলা যাইতে পারে, প্রধান প্রধান দেশের বর্ত্তমান রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ অর্থাৎ শাসনপ্রণালী, কোথাও বিনা বিপ্লবে পূর্ব্বপ্রণালীসংশোধন দ্বারা, কোথাও রাষ্ট্রবিপ্লবে পূর্ব্বপ্রণালীপরিবর্ত্তনদ্বারা, কোথাও বা যুদ্ধে পরাজয়ের বা সন্ধির ফলে পূর্ব্বরাজতন্ত্রের স্থলে নূতনরাজতন্ত্রস্থাপনদ্বারা, উৎপন্ন হইয়াছে। শান্তভাবে সংশোধন, বিপ্লবে পরিবর্ত্তন, ও পরাজয়ে নূতন রাজতন্ত্রসংস্থাপন, বর্ত্তমানকালের রাজা ও প্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি বা নিবৃত্তির এই ত্রিবিধ কারণ।

---

[১] Maine's Early History of Institutions, Lectures XII, XIII, ও Bluntschli's Theory of the State, Bk. I, Ch. III, দ্রষ্টব্য।

[২] মনু ৭।৩—৮।

[৩] Grote's History of Greece, Pt. I, Ch. XX.

[৪] Bluntschli't Theory of the State, Bk. VI, Ch. VI.

জগতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল, কিছুই স্থির নহে। সেই পরিবর্ত্তনের গতি প্রায়ই উন্নতিমুখী, তবে কখন কখন আপাততঃ অবনতির দিকে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে অধিকাংশস্থলে বুঝিতে পারা যায়, সেই বক্রগতি অল্পকালস্থায়ী, এবং পরিণামে সমস্তগতিই উন্নতির দিকে। সৃষ্টির কোন ভাগ পূর্ণ উন্নতিলাভের পর, পৃথক্ থাকিবে কি অনন্ত ব্রহ্মে লীন হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর অপূর্ণ মানববুদ্ধি দিতে পারে না।

পৃথিবীর রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের পরিণতি কি হইবে তাহা বলা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, গ্রীস্ ও রোমের প্রাচীন সাম্রাজ্য ধ্বংসের যে সকল কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল কারণ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আর নাই। প্রথমতঃ, বাহিরের সেরূপ অবিবেচক অন্ধ বলশালী শত্রু বর্ত্তমান কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে উপস্থিত হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। কারণ, এখন যে সকল জাতি ক্ষমতাশালী তাহারা রোম সাম্রাজ্যের শত্রু গথ্ ও ভ্যাণ্ডালজাতির ন্যায় অবিবেচক ও অন্ধ নহে, তাহারা সকলেই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করে। এবং যে সকল অসভ্যজাতি এখন পৃথিবীতে আছে তাহাদের কর্ত্তৃক কোন সভ্যজাতির পরাজয় সম্ভবপর নহে, বরং তাহাদের নিজেদেরই পরাজিত হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ এখন আর জয় পরাজয় বাহুবলের উৎকর্ষ অপকর্ষের উপর নির্ভর করে না, বুদ্ধিবলের উৎকর্ষাপকর্ষের উপরই নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, ভিতরের শত্রু অর্থাৎ আলস্য, বিলাসিতা, অবিবেচনা, অবিচার, যাহা পতনের পূর্ব্বে রোমকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাও এখনকার কোন বড় জাতিকে আক্রমণ করে নাই। কিন্তু তথাপি যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা নাই এ কথা বলা যায় না। এক সময় জনসাধারণের ও পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল, মনুষ্য অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য অবস্থাতেই রণপ্রিয় ও রাজ্যবিস্তারে রত থাকে, ক্রমে সভ্যতাবৃদ্ধি ও শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার হইলে লোকে শান্তিপ্রিয় হয়। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, শিল্পবৃদ্ধি ও বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রণপ্রিয়তারও বৃদ্ধি হয়, এবং শিল্প ও বাণিজ্যের হাট বজায় রাখিবার চেষ্টা অনেক স্থলে যুদ্ধের কারণ হইয়া উঠে।

রাষ্ট্রবিপ্লবদ্বারা রাজতন্ত্র পরিবর্ত্তন ও নূতন রাজাপ্রজা সম্বন্ধসৃষ্টির দিনও যে গিয়াছে তাহা বলা যায় না। যদিও ফরাসি বিপ্লবের ভীষণ ব্যাপার ও তাহার অশুভ ফল স্মরণ রাখিয়া কোন জাতিই আর সেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে লিপ্ত হইতে চাহিবে না, তথাপি এখনও নানা দেশে রাজতন্ত্র পরিবর্ত্তন নিমিত্ত সামান্য-বিপ্লব চলিতেছে।

দেশের ও সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্র পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। সেই পরিবর্ত্তন বিনা বিপ্লবে শান্ত ভাবে ঘটা উচিত ও তাহা হইলেই মঙ্গল, এবং ইহা পরম সুখের বিষয় যে, অনেক স্থলে সেইরূপ ঘটিতেছে।

রাজাপ্রজা সম্বন্ধ উৎপত্তির কারণের সঙ্গে সঙ্গে যে নিবৃত্তির কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে নিবৃত্তি পূর্ব্ব রাজতন্ত্রপরিবর্ত্তনের ফল। যেখানে পূর্ব্ব

রাজতন্ত্র রাজাপ্রজা উভয় পক্ষের ইচ্ছাতেই পরিবর্ত্তিত হয়,—যথা শান্তভাবে সংশোধনে,—অথবা একপক্ষ বা রাজার অনিচ্ছায় কিন্তু অপর পক্ষ বা প্রজার ইচ্ছায় পরিবর্ত্তিত হয়,—যথা রাষ্ট্রবিপ্লবে,—অথবা উভয় পক্ষেরই অনিচ্ছায় পরিবর্ত্তিত হয়,—যথা অন্য রাজার নিকট পরাজয়ে,—সেখানে পূর্ব্বরাজা বা রাজশক্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই পূর্ব্বকার রাজাপ্রজা সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু তদ্ভিন্ন ঐ সম্বন্ধের আর এক প্রকার নিবৃত্তি সম্ভাব্য। কোন দেশে রাজতন্ত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, অথচ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে কেহ কেহ তদ্দেশের রাজার প্রজা না থাকিয়া দেশান্তরে উঠিয়া গিয়া তথাকার রাজার প্রজা হইবার ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহাতে এই প্রশ্ন উঠে—সেরূপ কার্য্য ন্যায়সঙ্গত কি না, অর্থাৎ কোন প্রজা আপন ইচ্ছায় তাঁহার রাজার সহিত যে সম্বন্ধ আছে তাহা ন্যায়মতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন কি না। যদি তিনি সেই রাজার অধিকারে অবস্থিতি করেন অথচ তাঁহার সহিত রাজাপ্রজা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, সে ইচ্ছা কখন ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। প্রথমতঃ, তিনি সেই রাজার রাজ্যে বাসের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিবেন অথচ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবেন না, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ, যদি এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার এক জন প্রজার থাকে, তবে তাহা দশ জনের আছে, ও শত জনের আছে, ও সহস্র জনের আছে, এবং তাহা হইলে ক্রমে রাজ্যের বহুসংখ্যক প্রজা কেবল আপন ইচ্ছায় স্বাধীন হইয়া যাইতে পারেন। তাহাতে রাজ্যের সুখ ও শান্তির অনেক বিঘ্ন হওয়ার সম্ভাবনা। যে প্রজা রাজার সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে চাহেন, তিনি যদি অন্য রাজার অধিকারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা আপাততঃ অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ স্থলেও প্রজার ইচ্ছামত রাজাপ্রজা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার সকল অবস্থাতেই যে ন্যায়সঙ্গত, একথা বলা যায় না।[১] অনেক সময়ে প্রজার এরূপ কার্য্যে কোন আপত্তির কারণ না থাকিতে পারে। কিন্তু প্রজা যে রাজ্যে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করেন, সে রাজ্যের সহিত তাঁহার রাজার যদি অসদ্ভাব থাকে তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য তাঁহার রাজার ও তাঁহার দেশের পক্ষে ভাবি অনিষ্টের কারণ হইতে পারে।

রাজাপ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তির আলোচনার পরেই, তাহার স্থিতির আলোচনা না করিয়া, তাহার নিবৃত্তির কথা বলার কারণ এই যে, এই সম্বন্ধের একদিকে উৎপত্তি ও অন্যদিকে নিবৃত্তি, অনেক স্থলে একসঙ্গেই ঘটে, সুতরাং উৎপত্তির কথা বলিতে গেলে নিবৃত্তির কথা আপনা হইতেই আইসে। যখন কোন দেশের রাজতন্ত্র শান্তভাবেই হউক, অথবা বিপ্লবদ্বারা বা পরাজয়দ্বারাই হউক পরিবর্ত্তিত হয়, তখন প্রজাদের নূতন রাজা বা রাজশক্তির সহিত রাজাপ্রজা

---

[১] এ সম্বন্ধে Sidgwick's Elements of Politics, Ch. XVIII, p. 295 দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধ উৎপত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব রাজার সহিত সম্বন্ধ নিবৃত্তি পায়। এই জন্য রাজাপ্রজা সম্বন্ধের স্থিতির কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাহার নিবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে।

রাজাপ্রজা সম্বন্ধের স্থিতি।

এক্ষণে রাজাপ্রজা সম্বন্ধের স্থিতির বিষয় কিঞ্চিৎ বলা যাইবে।

রাজাপ্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি যদিও অনেক স্থলে (যথা, বিপ্লবে ও পরাজয়ে) কায়িকবলপ্রয়োগের ফল, কিন্তু তাহার দীর্ঘকাল স্থিতি কখনই কেবল কায়িক-বলের উপর নির্ভর করিতে পারে না। কোন রাজা বা রাজশক্তি বহুসংখ্যক প্রজাপুঞ্জকে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবল কায়িকবলদ্বারা অধিক কাল বাধ্য রাখিতে পারেন না। সেরূপ স্থলে যে প্রকার বলপ্রয়োগ আবশ্যক তাহা এত অধিক ব্যয় ও আয়াস সাধ্য, এবং তাহার প্রতিরোধ করিবার প্রবৃত্তি ক্রমে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, পরিণামে রাজাকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই বল-প্রয়োগে ক্ষান্ত হইতে হয়। সত্য বটে, দেশের, ভিতরের ও বাহিরের শত্রুর কায়িকবলের অত্যাচার হইতে প্রজা রক্ষা করাই রাজার প্রধান কার্য্য, এবং তজ্জন্য রাজার কায়িকবলের প্রয়োজন। কিন্তু প্রজার শাসনার্থে কায়িকবল প্রয়োজনীয় হইলেও তাহা যথেষ্ট নহে, তন্নিমিত্ত প্রজাবর্গের, অন্ততঃ তাহাদের অধিকাংশের, প্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে প্রদত্ত সম্মতি আবশ্যক। সেই সম্মতি ভীতিসম্ভূত বা ভক্তিসম্ভূত হইতে পারে, কিন্তু সে ভয় বা ভক্তি রাজার কায়িকবল অর্থাৎ সৈনিকবলদ্বারা উদ্রিক্ত হয় না, রাজার নৈতিকবল অর্থাৎ তাঁহার ন্যায়-পরতা ও তাঁহার শাসনের উপকারিতা হইতে উদ্ভূত হয়।[১] কায়িকবলের বাধিকাশক্তি দীর্ঘকালব্যাপী হয় না, নৈতিকবলের কার্য্যই স্থায়ী। কি রাজা, কি প্রজা সকলকেই নৈতিকবলের প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। রাজার ও রাজাপ্রজা সম্বন্ধের স্থিতির মূলভিত্তি রাজার নৈতিকবল। একদিকে যেমন প্রজাকে রাজদ্রোহ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার নিমিত্ত রাজার নৈতিকবল আবশ্যক, অন্যদিকে তেমনই রাজাকে প্রজাপীড়ন হইতে নিবৃত্ত রাখিবার নিমিত্ত প্রজার নৈতিকবলের প্রয়োজন। রাজা ন্যায়পরায়ণ ও সুনীতিসম্পন্ন হইলে যেমন প্রজা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইচ্ছা করেন না, তেমনই প্রজাবর্গ ন্যায়-পরায়ণ ও সুনীতিসম্পন্ন হইলে রাজা তাঁহাদের সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি অমনোযোগী হইতে পারেন না। রাজা ন্যায়পরায়ণ না হইলে তাঁহার প্রতি প্রজার প্রকৃত ভক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং অশিষ্ট প্রজাগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াও অসম্ভব নহে, আর তাহার ফলে রাজা প্রজার প্রতি আরও অপ্রসন্ন হইতে থাকেন এবং ক্রমশঃ রাজায় প্রজায় অসদ্ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে। পক্ষান্তরে প্রজা যদি ন্যায়পরায়ণ না হইয়া দুর্ব্বিনীত হয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের

---

১ **Maine's Early History of Institutions, p. 359,** ও **Bluntschli's Theory of the State, p. 265** দ্রষ্টব্য।

শাসনের নিমিত্ত দৃঢ় নিয়ম স্থাপনে চেষ্টিত হয়েন, ও তদ্দ্বারা তাহাদের রাজার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত হয়, এবং ক্রমশঃ রাজায় প্রজায় বিরোধ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং রাজা ও প্রজার মধ্যে কোন এক পক্ষের অন্যায় ব্যবহার উভয় পক্ষেরই অনিষ্টকর হইয়া উঠে। অতএব রাজ্যের শান্তির ও নিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষেরই পরস্পরের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

২। রাজতন্ত্রের ও রাজাপ্রজা সম্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার

২। রাজতন্ত্রের ও রাজাপ্রজা সম্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। পূর্ণ বা স্বাধীন রাজতন্ত্রের লক্ষণ।

রাজতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আলোচনার পূর্ব্বে পূর্ণ বা স্বাধীন রাজতন্ত্রের সাধারণ লক্ষণ কি, তাহা স্থির করা আবশ্যক। পূর্ণ রাজতন্ত্র তাহাকেই বলা যায়, যাহার নিকট তদন্তর্গত সকল ব্যক্তি অধীনতা স্বীকার করে, এবং যাহা নিজে অন্য কাহারও নিকট অধীনতা স্বীকার করে না। অর্থাৎ যে রাজতন্ত্রের প্রজাবর্গ তাহার নিকট সম্পূর্ণ অধীন, এবং যাহার রাজশক্তি নিজে কাহারও অধীন নহে, তাহাকেই পূর্ণ বা স্বাধীন রাজতন্ত্র বলে। এবং সেইরূপ রাজতন্ত্রের শক্তিকে পূর্ণ রাজশক্তি বলা যায়।

একেশ্বরতন্ত্র।

যে শাসনপ্রণালীতে এক ব্যক্তির হস্তে পূর্ণ রাজশক্তি নিহিত, অর্থাৎ যেখানে এক ব্যক্তির ইচ্ছামত সকল কার্য্য চলে, ও তাঁহার নিকট দেশের সকল লোকেই অধীনতা স্বীকার করে, এবং সেই ব্যক্তি কাহারও অধীন নহেন, তাহাকে **একেশ্বরতন্ত্র**[১] বলা যায়, আর সেই একেশ্বরকে রাজা বলা যায়। সেই রাজা আবার পূর্ব্বরাজার উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন অথবা প্রজাগণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতে পারেন।

ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সবল রাজতন্ত্র।

বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্র।

যে শাসনপ্রণালীতে দেশের বিশিষ্ট লোকসমষ্টির, বা তাহাদের কোন বিশেষ বিভাগের হস্তে রাজশক্তি নিহিত, তাহাকে **বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্র**[২] বলা যায়। কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধার্থে এইরূপ বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে একজন সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন।

সাধারণ প্রজাতন্ত্র।

যে শাসনপ্রণালীতে দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের, অথবা তাহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্টলক্ষণযুক্ত প্রজাগণের সমষ্টির হস্তে রাজশক্তি নিহিত, তাহাকে **সাধারণ প্রজাতন্ত্র**[৩] বলা যায়। প্রজার সংখ্যা অধিক হইলে (বর্ত্তমানকালে সকল দেশেই প্রজাসংখ্যা অধিক) প্রজাবর্গ একত্র হইয়া রাষ্ট্রের কার্য্যচালন সম্ভবপর নহে। সুতরাং বর্ত্তমানকালে সাধারণ প্রজাতন্ত্রের রাজকার্য্য

---

১ ইংরাজি Monarchy শব্দের প্রতিশব্দ।

২ ইংরাজী Aristocracy শব্দের প্রতিশব্দ।

৩ ইংরাজী Democracy শব্দের প্রতিশব্দ।

সম্পাদনার্থে প্রজাবর্গ নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্টকালের নিমিত্ত সম্ভবমত নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেন, এবং সেই প্রতিনিধিসমষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালিত হয়। কোন কোন রাজনীতিবেত্তার[১] মতে উপরের বিবিধ শাসনপ্রণালী ছাড়া আর একটি শাসনপ্রণালী আছে অথবা পূর্ব্বকালে ছিল, এবং তাহাকে পুরোহিততন্ত্র বলা যাইতে পারে।

উপরের প্রথমোক্ত তিন প্রকার মূল শাসনপ্রণালীর মধ্যে কোথাও একটি, কোথাও অপরটি প্রচলিত। আবার কোন কোন দেশে এই প্রণালীত্রয়ের বা তন্মধ্যে কোন দুইটির মিশ্রিত শাসনপ্রণালী প্রচলিত। যথা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রাজা, বিশিষ্ট প্রজার সভা, সাধারণ প্রজার সভা, এই তিনের এক অপূর্ব্ব মিলন দৃষ্ট হয়, এবং এই তিনের মিলনে যে সভা গঠিত, তাহাতেই পূর্ণ রাজশক্তি নিহিত।

ভিন্ন ভিন্ন শাসনপ্রণালীর দোষগুণ।

উপরের লিখিত প্রথম তিনটি শাসনপ্রণালীর প্রত্যেকের দোষগুণ আছে। একেশ্বর রাজতন্ত্রের গুণ এই যে, তাহার শক্তি অন্য প্রকার রাষ্ট্রতন্ত্রের শক্তি অপেক্ষা অধিক প্রবল ও অধিক সহজে পরিচালিত হয়। ক্ষমতা এক জনের হস্তে থাকিলে যত সহজে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে, পাঁচ জনের হাতে থাকিলে তাহা কখনই তত সহজে হওয়া সম্ভবপর নহে, কেন না, পাঁচ জনের পরস্পরের মতের সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করিতে অবশ্যই কিঞ্চিৎ সময় লাগে, এবং প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ও উদ্যম অপরের ইচ্ছা ও উদ্যমের সহিত মিলিবার নিমিত্ত অবশ্যই কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। একেশ্বর রাজতন্ত্রের দোষ এই যে, যাঁহার একাধিপত্য, তিনি অসামান্য জ্ঞানী না হইলে তাঁহার শাসনপ্রণালীতে বিচক্ষণতার অভাব থাকিবে, এবং তিনি অসামান্য সাধু না হইলে ক্ষমতার অপব্যবহারে বিরত থাকা তাঁহার পক্ষে কঠিন।

বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্রের গুণ এই যে, তাহাতে রাজশক্তি দেশের শ্রেষ্ঠ লোকসমষ্টির হস্তে থাকায়, রাষ্ট্র শাসনে বিচক্ষণতার অভাব ঘটে না। কিন্তু তাহার দোষ এই যে, তাহার শক্তি এক জন রাজার হস্তে অর্পিত শক্তির ন্যায় প্রবল ও সহজে পরিচালনযোগ্য হয় না, এবং সাধারণ প্রজাবর্গের হিতেও বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্রে ততটা দৃষ্টি থাকা সম্ভবপর নহে। সাধারণ প্রজাতন্ত্রের গুণ এই যে, তাহাতে সাধারণ প্রজাবর্গের হিতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে। তাহার দোষ এই যে, তাহাতে রাজশক্তির প্রবলতার ও সহজ পরিচালনযোগ্যতার হ্রাস হয়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজতন্ত্রে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজতন্ত্রে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করে। একেশ্বর রাজতন্ত্রে রাজা ও প্রজার পার্থক্য ও রাজার নিকট প্রজার অধীনতা অত্যন্ত অধিক। বিশিষ্ট প্রজাতন্ত্রে সম্ভ্রান্ত প্রজাসমষ্টিতে রাজা ব্যষ্টিতে সাধারণ

---

[১] Bluntschli's Theory of the State, Bk. VI, Chs. I and VI দ্রষ্টব্য।

প্রজাবর্গের ন্যায় প্রজা। এবং সাধারণ প্রজাতন্ত্রে প্রজাবর্গ সমষ্টিতে রাজা ও ব্যষ্টিতে প্রজা। এই উভয়বিধ প্রজাতন্ত্রে রাজা ও প্রজার পার্থক্য তত অধিক নহে, এবং প্রজাপুঞ্জের স্বাধীনতাও অল্প নহে।

এক জাতি অপর জাতিকর্তৃক বিজিত হইলে তাহাদের মধ্যে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ কিরূপ ?

এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার রাজাপ্রজা সম্বন্ধের বৈচিত্র্য আছে তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। কোন জাতি অপর জাতিকর্তৃক বিজিত হইলে, বিজেতার অধীনতা স্বীকার করিতে, ও বিজেতা রাজার প্রজা হইতে বাধ্য হয়, অথচ বিজেতৃরাজতন্ত্রে প্রজার যদি কোন কর্তৃত্ব থাকে (যথা, সে রাজতন্ত্র যদি প্রজাতন্ত্র হয়) বিজিত জাতি সে কর্তৃত্বের কোন অংশ পায় না। না পাইবার কারণও আছে। বিজেতৃজাতি বিজিত জাতিকে স্বভাবতঃ সন্দেহের চক্ষে দেখে। বিজিত জাতিও স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যগ্র থাকে ও তাহার সুযোগ অনুসন্ধান করে। সুতরাং বিজিত জাতিকে রাজতন্ত্রের অন্তর্ভূত করিতে বিজেতা সাহস করে না। কখন কখন বিজেতার উদারতা ও বিজিতের শিষ্টতা প্রযুক্ত পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও পরস্পরের অসদ্ভাব ক্রমে কমিয়া যায়, ও তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব জন্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে সদ্ভাব অনেক স্থলে স্থায়ী হয় না। বিজেতৃজাতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, ও তাহাদের স্বাধীনতার আদর্শ দর্শন করিয়া, বিজিত জাতি যদি ক্রমে বিজেতার সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পুনরায় পরস্পরের অসদ্ভাব ঘটে। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের অল্লাধিক দোষ থাকে। বিজিত জাতি যখন বিজেতৃজাতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ও তাহাদের আদর্শ দর্শন করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করে, তখন উভয়ের মধ্যে এক প্রকার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ জন্মে, এবং বিজেতার প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করা বিজিতের অকর্তব্য। আবার পক্ষান্তরে বিজিতের উন্নতি দর্শনে, শিষ্যের উন্নতিতে গুরুর যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দ অনুভব না করিয়া বিরুদ্ধ ভাবকে মনে স্থান দেওয়া বিজেতার অকর্তব্য। এই সকল ক্ষেত্রে পরস্পর সদ্ভাব বর্দ্ধনের আর একটি অন্তরায় কখন কখন দেখা যায়। বিজেতা রাজা বিজিতের সহিত রাজাপ্রজা সম্বন্ধ চিরস্থায়ী করিতে ও বিজিতের নিকট রাজভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বিজেতৃজাতীয় অনেকে জাত্যভিমানে গর্ব্বিত হইয়া বিজিত জাতিকে পরাধীন বলিয়া ঘৃণা করেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের অনেকের মনে রাজভক্তির স্থানে বিদ্বেষ ভাব ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির দুরাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হয়। আর সেই বিদ্বেষ ভাব দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহারা স্বজাতীয়গণের লাভ হউক বা না হউক, বিজেতৃজাতীয় ব্যবসাদারদিগের লাভের হানি করিবার বিপুল ঘোষণা করেন। এবং এইরূপে পরস্পরের অসদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন, এরূপ স্থলে পরস্পরের অসদ্ভাব অনিবার্য্য।

এরূপ অসদ্ভাবের মূল উভয় পক্ষেরই কিঞ্চিৎ ন্যায়পরতার ও সদ্বিবেচনার অভাব। সুতরাং যেখানে উভয়পক্ষই সভ্যজাতি বলিয়া অভিমান করেন, সেখানে সে অসদ্ভাব অনিবার্য্য বলিতে ইচ্ছা হয় না, এবং তাহা বলিতে গেলে

সভ্যতায় ও মানব চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে হয়। কথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

এক জাতি অপর জাতিকর্ত্তৃক বিজিত হইলে, উভয়ে যদি সভ্যতায় তুল্য না হয়, তবে অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি সভ্যতর জাতির নিকটে শিক্ষা লাভ করে। রোমের উন্নত অবস্থায় বিজিত অসভ্যজাতি রোমের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। আবার রোমের অবনত অবস্থায় বিজেতা জর্ম্মানির অরণ্যবাসীরাও সেই রোমেরই নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। এরূপ স্থলে শিক্ষার ও শ্রদ্ধার আদান প্রদানে, এবং সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনে, জিত ও জেতার মধ্যে সদ্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে উভয়ে এক জাতি হইয়া উঠে। কিন্তু যেখানে জিত ও জেতার সভ্যতা তুল্য বা প্রায়তুল্য, এবং তাহাদের সমাজনীতি ও ধর্ম্ম এত পৃথক্ যে, সামাজিক বা পারিবারিক বন্ধনে তাহাদের বদ্ধ হওয়া অসম্ভব, সেখানে তাহাদের এক জাতিতে মিলিত হওয়ার আশা করা যায় না। সুতরাং সে স্থলে তাহাদের সদ্ভাব সংস্থাপনের একমাত্র উপায়, পরস্পরের প্রতি ন্যায়পরতা ও সদ্বিবেচনার সহিত ব্যবহার। এবং সে সদ্ভাবের পরিণাম, বিজেতৃজাতির নিকট প্রাপ্ত উপকারের পরিমাণানুসারে তজ্জাতীয় সাম্রাজ্যের অধীনে বিজিত জাতির অল্লাধিক বাধ্যবাধকতার সহিত মিলিত হইয়া থাকা।

এক জাতি সভ্যতায় তুল্য বা প্রায়তুল্য অপর জাতিকে বলে, কৌশলে বা ঘটনাচক্রের গতিকে পরাজিত করিয়াছে বলিয়াই যে শেষোক্ত জাতি ঘৃণার্হ, ইহা মনে করা অন্যায়। কারণ, রণকুশলতা লাভ করিতে যুদ্ধবিষয়ে যে রূপ অনুরাগ থাকা আবশ্যক তাহা মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির কিঞ্চিৎ বাধাজনক, এবং সেই অনুরাগ ও সেই কুশলতা যে জাতির অল্প, সে জাতি যে সেই জন্যই হীনজাতি ইহা বলা যায় না। আমাদের অপূর্ণ অবস্থায় যখন শিষ্ট মানুষের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট মানুষও থাকিবে, তখন দুষ্টের দমননিমিত্ত প্রত্যেক জাতিরই কায়িকবল আবশ্যক। কিন্তু তাহার ন্যূনাধিক্য, জাতির দোষগুণের পরিচায়ক মনে করা উচিত নহে। এতদ্ব্যতীত বিজেতা প্রকৃত বড় হইলেও বিজিতকে ঘৃণা করিয়া তাহার মনে কষ্ট দেওয়া বড় হওয়ার লক্ষণ নহে। এক জাতি অপর জাতিকে জয় করিতে সমর্থ হওয়া প্রথমোক্ত জাতির যে প্রাধান্যের পরিচায়ক, সে প্রাধান্য বিজিত জাতির অহিতার্থে প্রযুক্ত না হইয়া তাহার উন্নতিবিধানার্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাই বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম। অতএব বিজিত জাতিকে ঘৃণা করা বিজেতার পক্ষে কোন মতে ন্যায়সঙ্গত নহে। পরন্তু তাহা সদ্বিবেচনাসঙ্গতও নহে। বিজেতা একদিকে বিজিতের নিকট রাজভক্তি ও তাহাদের সহিত রাজাপ্রজা সম্বন্ধের স্থায়িত্ব চাহিবেন, কিন্তু অপরদিকে তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের মনে বিদ্বেষ ভাব ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির দুরাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিবেন, ইহা কোন মতেই সদ্বিবেচনার বা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে বিজেতার সুশাসনে যে শান্তি বা শিক্ষা লাভ হয়, তজ্জন্য বিজেতা রাজার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা বিজিত জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলিতে পারেন এ সকল কথা ধর্ম্মক্ষেত্রের কথা, কর্ম্মক্ষেত্রের কথা নহে। কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষ মানুষই থাকিবে, ঋষি হইবে না। এবং উপরি উক্ত স্থলে বিজিত বিজেতার সদ্ভাব হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। সত্য বটে, সকল মনুষ্য সম্পূর্ণ সাধু হইবে এ আশা করা যায় না। কতকগুলি লোক সাধু, কতকগুলি লোক অসাধু, এবং অধিকাংশ লোক এই দুই শ্রেণির মাঝামাঝি থাকিবে। ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণির সংখ্যার বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ের সংখ্যার হ্রাস, ও তৃতীয়ের প্রথম শ্রেণির সহিত পার্থক্যের হ্রাস হইয়া আসিবে, ইহাই মনুষ্যের ক্রমবিকাশের নিয়ম। আত্মরক্ষার্থে পাশববলের বা কৌশলের বৃদ্ধি পশুজগতের ক্রমবিকাশের নিয়ম, কিন্তু নীতিসম্পন্ন মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিই ক্রমবিকাশের প্রধান লক্ষণ। অতএব দুই সভ্যজাতি এক সময়ে বিজেতা ও বিজিত ভাবে মিলিত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা, বা অন্ততঃ তাহাদের উভয় জাতিরই মধ্যে অধিকাংশ লোক, পরস্পরের প্রতি ন্যায় ও সদ্বিবেচনা সঙ্গত ব্যবহার করিতে পারে না, একথা বলিতে গেলে সভ্য মনুষ্যকে কলঙ্কিত করিতে হয়। এবং এই কথা সভ্য শিক্ষিত সমাজে কখন কখন প্রচলিত থাকাই তাহার কার্য্যে পরিণত হওয়ার একটি কারণ। যদি শিক্ষিত সমাজে ইহার বিপরীত কথা প্রচলিত হয়, এবং অধিকাংশ সভ্য লোকে এই কথা বলে যে, দুরূহ হইলেও পরস্পরের প্রতি ন্যায় ও সদ্বিবেচনা সঙ্গত ব্যবহার করা সর্ব্বত্রই সকলের উচিত, এবং স্বার্থপরতা সংযমই প্রকৃত স্বার্থসাধনের উপায়, তাহা হইলে এরূপ কার্য্য অসাধ্য বলিয়া কেহ ইহা হইতে বিরত হইবে না।

এ সম্বন্ধে আরও একটি আপত্তি হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন বিজেতার সহিত সদ্ভাবকামনা ভীরুতার ও আত্মাভিমানশূন্যতার লক্ষণ। যদি কেবল নিজের ইষ্টসাধনের ও অনিষ্টনিবারণের আশায় কেহ বিজেতার শরণাপন্ন হয়, তাহার কার্য্য ভীরুতা ও আত্মাভিমানশূন্যতা ব্যঞ্জক হইতে পারে। কিন্তু যেখানে বিজেতার রাজ্য কিছু কাল চলিয়া আসিতেছে, আর তাহাদের শাসনপ্রণালীতে দোষ থাকিলেও অনেক গুণ আছে, ও মোটের উপর পরাজিত দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা সুচারুতররূপে শান্তি ও ন্যায় বিচারপ্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং বিজেতার সহিত রাজাপ্রজা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হিতকর বা ন্যায়সঙ্গত নহে, সেখানে বিজেতার সহিত সদ্ভাবসংস্থাপনের চেষ্টা, নিন্দনীয় না হইয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সর্ব্বশেষে এই আপত্তি হইতে পারে যে, রাজা ও প্রজা উভয়েরই চেষ্টা স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতিসাধন। কিন্তু যেখানে রাজা ও প্রজা ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়, সেখানে উভয়েরই কার্য্যে পরস্পর কর্ত্তব্যবিরোধ অনিবার্য্য। সুতরাং যদি দুই জাতি এক হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা

হইলে তাহাদের মধ্যে সম্ভাব স্থাপনের চেষ্টা বৃথা। কিন্তু একথাও যথার্থ নহে। একদেশবাসী একজাতীয় রাজা রাজ্যান্তর্গত অন্য দেশের ও অন্য জাতীয় প্রজার উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইতে গেলে যে, তাহাতে কর্ত্তব্যবিরোধ অবশ্যই ঘটিবে, একথা স্বীকার করা যায় না। এরূপ কার্য্য কঠিন, এবং এরূপ স্থলে রাজার ও প্রজার স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি অধিক অনুরাগ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু রাজা ও প্রজা ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক হইলে, উভয় দেশের ও উভয় জাতির স্বার্থের সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করাই সম্ভাবনীয়। এরূপ ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক রাজা ও প্রজার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নহে।

উপরে অনেকগুলি কথা বলিলাম। কিন্তু বোধ হয় তাহার যাথার্থ্য অনেকেই স্বীকার করিবেন না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ওসকল কথা সংসারীর নহে, উদাসীনের কথা, শিক্ষা স্থলে ওসকল কথা সমীচীন হইতে পারে, কিন্তু সংসারে চলিতে গেলে মনুষ্য ওরূপ উচ্চাদর্শের হইবে মনে করা ভ্রান্তি। এ সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত দুইটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ভারতে আর্য্যঋষিগণ সংযম ও তপোবলে, উপরে যাহা বলিয়াছি, সেই শিক্ষা দিয়াছেন। এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার অনেক দিন পরে পাশ্চাত্য দেশে যীশুখৃষ্টও সেই শিক্ষা দিয়াছেন। যদিও পাশ্চাত্য দেশের রীতিনীতি ও আহারব্যবহারের সহিত সংঘর্ষণে আসিয়া সেই শিক্ষা এখনও প্রচুর ফললাভ করে নাই, ভারতের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সেই শিক্ষার উপযোগী হওয়াতে তাহা অনেক দূর ফলপ্রদ হইয়াছে, এবং এত সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক বিপ্লবের পরেও অনেক হিন্দু অকাতরে স্বার্থহানি সহ্য করিয়া বলিতে পারেন—"ইহা ক'দিনের নিমিত্ত যে ইহাতে এত কাতর হইব"। ইহাই হিন্দুর উন্নতি ও গৌরব, যদিও ইহার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অবনতি ও অগৌরব জড়িত আছে। কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া জড়জগতের তত্ত্বানুশীলনে বিরত হওয়ায় হিন্দুর বৈষয়িক অবনতি ঘটিয়াছে, এবং বিজ্ঞানানুশীলনলব্ধ জড়শক্তির প্রভাবে বলীয়ান্ পাশ্চাত্য জাতির নিকট পরাজিত হইতে হইয়াছে। সেই অবনতি ও পরাজয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য জাতিরা আমাদিগকে অবজ্ঞা করেন। সেরূপ অবজ্ঞা করা পাশ্চাত্যদিগের পক্ষে অনুচিত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পার্থিব সম্পত্তি। তাহা থাকিলে ভাল, কিন্তু হিন্দুদের তাহা অনেক দিন হইতেই নাই। এক্ষণে ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুশাসনাধীনে থাকিয়া সে অভাব অধিক অনুভব করিতে হয় না। তবে আর একটি আশঙ্কা আছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের নিকট প্রাপ্ত অমূল্য অপার্থিব সম্পত্তি, সেই আধ্যাত্মিক উন্নতি, বৈষয়িক উন্নতির লোভে কোন্ দিন হারাইব, এবং তাহা হইলে আমরা যথার্থ অবজ্ঞার পাত্র হইব। বিজ্ঞানানুশীলন দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি সাধন, ও সামাজিক রীতি-নীতি সংশোধন দ্বারা শারীরিক উৎকর্ষলাভ ও বৈষয়িক উন্নতিবিধান, যাহাতে হয় সে শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। কিন্তু তন্নিমিত্ত যেন আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে এক পার্শ্বে সরাইয়া ফেলা না হয়। এবং রাজনৈতিক বিষয়ের

আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য কবি গোল্ডস্মিথের নিম্নোক্ত কথাটি যেন মনে রাখা হয়।

মানব হৃদয়, যত দুঃখ সয়,
আসি এ ভব সংসারে,
অল্প মাত্র তার, শাসনে রাজার,
দিতে বা ঘুচাতে পারে।[১]

ব্রিটেন ও ভারতের সম্বন্ধ।

উপরে বিজেতা ও বিজিতের রাজাপ্রজা সম্বন্ধ বিষয়ক সাধারণতঃ যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রিটেন ও ভারত সম্বন্ধে অনেকদূর খাটে। এক্ষণে ব্রিটেন ও ভারতের রাজাপ্রজা সম্বন্ধ বিষয়ক এই দুই একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা যাইবে। তাহা অবশ্যই সসম্ভ্রমে ও সংযতভাবে বলিব। আশা করি সে কথায় কোন পক্ষ অসন্তুষ্ট হইবেন না।

ভারতবর্ষ যখন ইংলণ্ডের অধীনে আইসে, তখন ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ, হিন্দুদিগের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা উত্থানশীল, রাজপুতগণ মন্দ অবস্থায় নহে, শিখেরা পুনরভ্যুত্থাননিমিত্ত উদ্যোগী, এবং ফরাসীরাও ভারত-সাম্রাজ্যের নিমিত্ত ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইলে, প্রাধান্য লাভার্থে নানা প্রতিযোগীর কলহ, ও অরাজকতা-জনিত চোর দস্যুর পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া, এবং ইংরাজের সুশাসনে ও ন্যায়পরতায় আশ্বস্ত হইয়া, অধিকাংশ ভারতবাসী নিরাপত্তিতে সেই সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেন। ব্রিটেন ও ভারতের সেই রাজাপ্রজা সম্বন্ধ সার্দ্ধশতবৎসরকাল চলিয়া আসিতেছে। এবং তাহাতে অনেক সুফলও ফলিয়াছে। তন্মধ্যে দুই চারিটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। যথা,—— নিরাপদে শান্তিতে অপক্ষপাতি বিচারপ্রণালীর অধীনে অবস্থিতি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষালাভ, এবং সর্ব্বত্র পরিচিত ইংরাজি ভাষার সাহায্যে ও বাষ্পযানে সর্ব্বত্র গমনাগমনের সুযোগে সমগ্র ভারতবাসীর মনে এক অভিনব জাতীয় ভাবের উন্মেষ। এই সকল কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিকট ভারতবাসী কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। যদিও সেই সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা পরাধীনতা, কিন্তু উভয়পক্ষ একটু বিবেচনার সহিত চলিলে, সে পরাধীনতা মনুষ্যের যে স্বাধীনতা আবশ্যক তাহার সহিত এত অবিরোধী বা অল্প বিরোধী যে তজ্জন্য কষ্ট বোধ করিবার হেতু নাই। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মূল সূত্র অনুসারে ভারতবাসী যে সেই তন্ত্রের বহির্ভূত থাকিবেন এমত কথা নাই। বরং তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি পর পর

---

১ How small, of all that human hearts endure,
That part which laws or kings can cause or cure.
Goldsmith's *Traveller*.

দুই জন ভারতবাসীকে বড়লাট সাহেবের কার্য্যকরী সভার সভাপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এবং ক্রমশঃ ভারতবাসী দেশের শাসনপ্রণালী পরিচালনে অধিকতর অধিকার পাইবেন সম্পূর্ণ আশা করা যায়। যদিও ইংরাজের সহিত মিলিয়া ভারতবাসীর কখনও একজাতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি অচিরে ভারত-শাসনে যথাযোগ্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা ইংরাজ রাজার সহকারী হইবেন এ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। যাহাতে সেই সম্ভাবনীয় ফল সত্বর ফলে সে বিষয়ে প্রত্যেক দেশহিতৈষীর উদ্‌যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। সেই উদ্যোগের পথে উভয় পক্ষেরই ভ্রমজনিত যে সকল বাধাবিঘ্ন আছে তাহার নিরাকরণ নিতান্ত আবশ্যক। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের মধ্যে কাহার কাহার এই একটি ভ্রম আছে যে, প্রাচ্যজাতি আড়ম্বর ও জাঁকজমক ভালবাসে, আদর করিলে প্রশ্রয় পায়, এবং ভয় দেখাইলে বশীভূত হয়, অতএব তাহাদের শাসননিমিত্ত রাজার সৌম্যমূর্ত্তি অপেক্ষা উগ্রমূর্ত্তি প্রদর্শন অধিকতর প্রয়োজনীয়। অন্য প্রাচ্যজাতির কথা বলিতেছি না, কিন্তু হিন্দুজাতির সম্বন্ধে এসংস্কার যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক একথা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের বিদিত হওয়া অতি আবশ্যক, কেন না এই ভ্রম অনেক সময় তাঁহাদের সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেয় না। জড়জগতের ও বৈষয়িকসুখের অনিত্যতায় যে জাতির ধ্রুব বিশ্বাস, সে জাতি কখনই আড়ম্বর-প্রিয় হইতে পারে না। যে জাতির আদর্শ রাজা রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনার্থে আপন প্রিয়তমা মহিষীকে বনবাসে পাঠাইয়া প্রজাবৎসলতার প্রমাণ দিয়াছিলেন, সে জাতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ভীতি অপেক্ষা প্রীতি প্রদর্শন যে বহুগুণে অধিকতর ফলদায়ক, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। হিন্দুরা জানেন "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" মুনিদিগেরও ভুল হয়। হিন্দুদিগের নিকট রাজা ভয়ের পাত্র নহেন, ভক্তির পাত্র। এবং ইংরাজ রাজার বাহুবল অপেক্ষা তাঁহার ন্যায়পরতা হিন্দুর চক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয়। সুতরাং ভ্রমস্বীকারে বা অনবধানতাকৃত অবিহিতকার্য্যসংশোধনে হিন্দুর নিকট ইংরাজ-রাজপুরুষের গৌরবের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে আবার অনেকের সংস্কার আছে যে ইংরাজ বলদৃপ্ত জাতি, সুতরাং ইংরাজের নিকট ন্যায় অপেক্ষা বলের গৌরব অধিক। এবং ইংরাজ স্পষ্টবাদী, সুতরাং ইংরাজ রাজপুরুষদিগের দোষ স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দেওয়াতে ক্ষতি নাই। এরূপ মনে করা আমাদের ভ্রম। দৈহিকবলের যত গৌরব করুন না কেন, ইংরাজ নৈতিকবলের শ্রেষ্ঠতা মানেন। যিনি নৈতিকবলে বলীয়ান্ কাহারও নিকট তাঁহার পরাভব স্বীকার করিতে হইবে না। অতএব আমরা নৈতিকবলে বলীয়ান্ হইলে ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ অবশ্যই আমাদের সম্মান করিবেন। আর স্পষ্টবাদিতাগুণের সম্বন্ধে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি পদমর্য্যাদায় যেরূপ সম্মান পাইবার যোগ্য, তাঁহার কার্য্যের আলোচনা সেইরূপ সম্মান সহকারে হওয়া উচিত। তাহা না হইলে সেই আলোচনা দোষ বা ভ্রম সংশোধনে কৃতকার্য্য হয় না, বরং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ উৎপন্ন করে।

ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে রাজাপ্রজা সম্বন্ধস্থাপন ঈশ্বরের ইচ্ছায় উভয়ের মঙ্গলার্থে ঘটিয়াছে। আমাদের মঙ্গল এই যে, আমরা একটি প্রবল পরাক্রান্ত অথচ ন্যায়পরায়ণ জাতির সুশাসনে শান্তি ও নানারূপ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছি, এবং ইংরাজদিগের সহিত মিলনে বহুদিনের উপেক্ষিত জড়জগতের প্রতি আমাদের যথাযোগ্য আস্থা জন্মিয়াছে, ও জড়বিজ্ঞানানুশীলনদ্বারা বৈষয়িক উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে। ইংরাজ ও সাধারণতঃ পাশ্চাত্য জাতির মঙ্গল এই যে, হিন্দুজাতির সহিত সংস্রবে আসিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলনে ও সংযম অভ্যাসে তাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মিতেছে, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের অপূরণীয় বিষয়-বাসনা ও তজ্জনিত বিরোধ ও অশান্তি নিবারিত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

পাশ্চাত্য জাতির সহিত সংস্রবে আসিয়া হিন্দু যতশীঘ্র তাঁহাদের জড়-বিজ্ঞানানুশীলনের এত অনুরাগী হইয়াছেন, হিন্দুর সহিত সংস্রবে আসিয়া পাশ্চাত্যেরা যে তত শীঘ্র হিন্দুর আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলনে সেইমত অনুরাগী হইবেন এ আশা করা যায় না। কিন্তু সেই সংস্রবের যে কোন ফল হইবে না এরূপ নৈরাশ্যেরও কারণ নাই। হিন্দু যদি ঠিক থাকিতে পারেন, এবং পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ না হইয়া, আধ্যাত্মিকভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনাসক্ত-রূপে বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করেন, তবে এমন দিন অবশ্যই আসিবে যখন হিন্দুর শান্ত ও সংযতভাবের দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য জগতের ঐকান্তিক জলন্ত বিষয়-বাসনাকে প্রশমিত করিবে।

৩। প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য।

৩। প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য। অন্যের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা।

রাজা ও প্রজা উভয়েরই পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। যখন রাজার নিমিত্ত প্রজা নহে, বরং প্রজার নিমিত্তই রাজা, তখন প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য কি তাহারই আলোচনা অগ্রে হওয়া সঙ্গত।

রাজার প্রথম কর্ত্তব্য, প্রজাকে বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা। সেই কর্ত্তব্য পালনার্থ সৈন্য সংস্থাপন আবশ্যক। যদিও এক্ষণে পৃথিবীতে অসভ্যজাতির বল ও সংখ্যা অধিক নহে, এবং সভ্যজাতির মধ্যে কেহ অপরকে অকারণে আক্রমণ করিবার আশঙ্কা অল্প, তথাপি সকল সভ্যজাতিই যথেষ্ট সৈন্য রাখিবার জন্য ব্যস্ত, এবং যদিও তাহাতে প্রভূত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, সকলেই সেই ব্যয়ভার অকাতরে বহন করিতেছেন। যদি পৃথিবীর সকল সভ্যজাতি মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্থির করেন যে, প্রত্যেকেই অসভ্যজাতির অন্যায় আক্রমণের আশঙ্কানিবারণ এবং অপর প্রয়োজনীয়কার্য্যসাধন নিমিত্ত সম্ভবমত সৈন্য রাখিয়া বাকি সৈন্য বিদায় দিবেন, তাহা হইলে অনেক লোক ও অনেক অর্থ, যাহা ভাবি অশুভনিবারণ

উদ্দেশ্যে এখন আবদ্ধ রহিয়াছে, নানাবিধ বর্ত্তমান শুভকার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে। তাহা কি হইবার নহে ?

রাজ্যের শান্তি রক্ষা।

রাজার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, প্রজাকে রাজ্যের ভিতরের শত্রুর অত্যাচার হইতে, অর্থাৎ দস্যু, চোর, ও অন্যান্য প্রকার দুষ্ট লোকের অন্যায় আচরণ হইতে রক্ষা করা। তদুদ্দেশ্যে দেশশাসনার্থ সুনিয়ম ব্যবস্থাপন, সেই সকল নিয়ম-লঙ্ঘনকারীদিগের দোষনির্ণয় ও দণ্ডবিধান নিমিত্ত উপযুক্ত বিচারালয় সংস্থাপন, এবং সেই বিচারালয়ের আদেশপালন ও সাধারণতঃ শান্তিসংরক্ষণ নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মচারীর নিয়োগ আবশ্যক। আইন বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপকসভা সংস্থাপন করা, এবং সেই সভায় যথাসম্ভব সাধারণ প্রজাবর্গের প্রতিনিধিগণকে সভ্যরূপে নিযুক্ত করা প্রয়োজনীয়। কারণ তাহা হইলেই প্রজাবর্গের প্রকৃত অভাবপূরণের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইতে পারে।

রাজার এই দ্বিতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু তৎসমুদয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

এস্থলে কেবল একটি কথা বলিব। এই দ্বিতীয় কর্ত্তব্যপালনে সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষের অমঙ্গল করিতে বা দণ্ডবিধান করিতে রাজাকে বাধ্য হইতে হয়। সেই আংশিক অমঙ্গল এক প্রকার অনিবার্য্য। কিন্তু তাহার পরিমাণ কমাইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করা রাজার কর্ত্তব্য। দণ্ডিতের দণ্ডবিধান এমনভাবে করা উচিত যে, তদ্দ্বারা তাহার শাসন ও সংশোধন সঙ্গে সঙ্গে চলে। এবং প্রাণদণ্ড একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রজার প্রকৃতি জানা ও তাহাদের অভাব নিরূপণ।

রাজার তৃতীয় কর্ত্তব্য প্রজার অভাব নিরূপণ করা, এবং তন্নিমিত্ত প্রজা-বর্গের রীতি-নীতি ও প্রকৃতি বিশেষরূপে অবগত হওয়া। প্রজার প্রকৃত অভাব কি, তাহারা কি চাহে, ও তাহা দেওয়া রাজার পক্ষে কতদূর সাধ্য ও সঙ্গত, এ সকল বিষয় না জানিলে রাজা শাসনপ্রণালী প্রজার সুখকর করিতে পারেন না। এবং তাহা জানিবার নিমিত্ত প্রজার রীতি-নীতি ও প্রকৃতি ভাল রূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। যেখানে রাজা ও প্রজা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সেখানে এই সকল বিষয় বিশেষরূপে জানিবার প্রয়োজন অধিকতর। কারণ, অনেক সময়ে প্রজার প্রকৃতিসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত রাজার সদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যেমন রোগীর প্রকৃতি না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহাতে সম্যক্ উপকার হয় না, তেমনই প্রজার প্রকৃতি না জানিয়া তাহার হিতার্থে কোন কার্য্য করিতে গেলেও সে কার্য্য সফল হয় না। প্রজার প্রকৃতি বিশেষ-রূপে জানিবার নিমিত্ত প্রজার ভাষা, সাহিত্য, ও ধর্ম্মের স্থূলতত্ত্ব জানা বিজাতীয় রাজার ও রাজপুরুষগণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

প্রজার স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা।

রাজার চতুর্থ কর্ত্তব্য, প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দবৃদ্ধির নিমিত্ত সমুচিত বিধান সংস্থাপন। সকল সুখের মূল স্বাস্থ্য, অতএব প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা রাজার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সত্য বটে, সকলেরই নিজ নিজ

স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা নিজে করা উচিত। বাসস্থান যাহাতে স্বাস্থ্যকর হয় ও খাদ্য যাহাতে পুষ্টিকর হয়, তদ্বিষয়ে প্রজাদিগের নিজের কার্য্য নিজেই করা কর্ত্তব্য, রাজা তাহা করিতে পারেন না। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত অনেক কার্য্য আছে যাহা প্রজার সাধ্যাতীত, এবং রাজার সাহায্য ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। যথা, নদীর গর্ভ পুরিয়া গিয়া স্রোত বন্ধ হইয়া অথবা দেশের জল বাহির হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া যদি বহুবিস্তীর্ণ দেশ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে, অথবা ব্যবসায়ীরা লাভের লোভে যদি খাদ্যদ্রব্যে গোপনভাবে অনিষ্টকর বস্তু মিশ্রিত করে, সে সকল স্থলে রাজার সাহায্য ব্যতীত অনিষ্ট নিবারণ সম্ভবপর হয় না। তদ্ভিন্ন দরিদ্রের চিকিৎসার্থ দাতব্য চিকিৎসালয়-স্থাপনও রাজার কর্ত্তব্য।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমনের সুবিধা করা।

রাজ্যের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লোকের গমনাগমনের ও দ্রব্যাদি প্রেরণের সুবিধার নিমিত্ত ভাল পথ, ঘাট, সেতু, বন্দর প্রভৃতি প্রস্তুত করা রাজার কর্ত্তব্য। এ কার্য্য প্রজারাও করিতে পারে, কিন্তু এ সকল কার্য্যে অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন, সুতরাং বহুসংখ্যক প্রজা একত্র না হইলে প্রজারা সে ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না। এখন অনেক রেলপথ প্রজাবর্গ একত্র হইয়া প্রস্তুত করিতেছে ও চালাইতেছে। তবে তাহাতেও রাজার সাহায্য আবশ্যক, প্রথমতঃ ভূমি অধিকার করণার্থে, দ্বিতীয়তঃ নিরাপদে লোকের গমনাগমনের বিধান করিবার নিমিত্ত।

প্রজার শিক্ষা-বিধান।

প্রজাবর্গের সুশিক্ষা বিধান করা রাজার আর একটি বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কতদূর শিক্ষা দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন প্রজারা যাহাতে একেবারে নিরক্ষর না থাকে সেইরূপ শিক্ষা, অর্থাৎ কেবল লিখন-পঠন শিক্ষা দেওয়াই রাজার পক্ষে যথেষ্ট, তবে সে শিক্ষা প্রজার বিনাব্যয়ে পাওয়া উচিত। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এত অল্পে রাজার কর্ত্তব্য পালন হয় না, প্রজাকে আর কিঞ্চিৎ অধিক শিক্ষা দেওয়ার বিধান করা রাজার কর্ত্তব্য। তবে সে শিক্ষা কত উচ্চ হওয়া উচিত, তাহা দেশের ও সভ্য জগতের অবস্থার উপর নির্ভর করে। উচ্চশিক্ষিত সমাজের জ্ঞানের পরিসর যেমন বিস্তারিত হইতেছে, সাধারণের শিক্ষার সীমা তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত হওয়া বিধেয়। শিক্ষা সম্বন্ধে রাজার কর্ত্তব্য, প্রথমতঃ দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত ছাত্রের বয়সের নিম্ন ও উচ্চ সীমা স্থির করা, দ্বিতীয়তঃ সেই বয়সের সকল বালকের শিক্ষার নিমিত্ত যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োজনমত বিদ্যালয় স্থাপন করা, এবং তৃতীয়তঃ এইরূপ নিয়ম করা যে, নির্দ্ধারিত বয়সের সকল বালকই যেন কোন না কোন বিদ্যালয়ে যায়। তারপর রাজার আরও কর্ত্তব্য, উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত স্থানে স্থানে দুই একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা। এতদ্ভিন্ন প্রজাগণের নীতিশিক্ষার নিমিত্ত রাজার বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সকলেই স্বীকার করিবেন দেশের শান্তিরক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। তাহা হইলে

শান্তিভঙ্গের মূল কারণ যে দুর্নীতি তাহা নিবারণ করা, অর্থাৎ প্রজাবর্গকে সুনীতি শিক্ষা দেওয়া, রাজার কর্ত্তব্যের মধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলেন আইনদ্বারা লোককে নীতিমান্ করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া নীতিশিক্ষা নিষ্ফল সুতরাং নিষ্প্রয়োজন, একথা সপ্রমাণ হয় না।

প্রজার ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মপালন-বিষয়ে রাজার কর্ত্তব্য।

প্রজার ধর্ম্মশিক্ষার বিধান করা রাজার কতদূর কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। যেখানে রাজাপ্রজা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সেখানে ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে রাজার নির্লিপ্ত থাকা উচিত, এবং যাহাতে সকল সম্প্রদায় নির্বিঘ্নে আপন আপন ধর্ম্ম পালন করিতে পারে সেইরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য। সময়ে সময়ে এ বিষয়ে কর্ত্তব্যসঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। যেখানে এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম পশুহনন আদেশ করে এবং অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম তাহা নিষেধ করে, সেখানে উভয়েই ইচ্ছামত স্বধর্ম্ম পালন করিতে গেলে বিরোধ অনিবার্য্য। সে স্থলে রাজার এরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য যে, কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের অন্যায় কষ্টের কারণ না হইয়া উভয়েই সংযতভাবে স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করিতে পারে।

যেমন কতকগুলি বিষয়ে প্রজার হিতার্থে রাজার হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, তেমনই অধিকাংশ বিষয়ে প্রজার স্বাধীনতারক্ষার্থে রাজার হস্তক্ষেপণে বিরত থাকা কর্ত্তব্য। প্রজাবর্গ আপন ইচ্ছায় সুনিয়মে চলিতে শিক্ষা করিলেই রাজার ও প্রজার প্রকৃত মঙ্গল। আর স্বাধীনভাবে চলিতে দিলেই প্রজা সেই শিক্ষালাভ করিতে পারে। অন্যান্য প্রকার শিক্ষার মধ্যে ইহাই প্রজার সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা, এবং এই শিক্ষায় প্রজাকে উপদিষ্ট করা রাজার একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

প্রজার মতামত-প্রকাশের স্বাধীনতা-স্থাপন।

প্রজা আপন মতামত স্বাধীন ও নিঃশঙ্কভাবে লেখায় ও কথায় ব্যক্ত করার পক্ষে কোন নিষেধ থাকা উচিত নহে। তবে কোন প্রজাকে রাজার বা অন্য প্রজার অপবাদ ঘোষণা করিতে বা কাহাকেও কোন গর্হিত কার্য্যে উৎসাহিত করিতে দেওয়া অনুচিত। ফলতঃ স্বাধীনতায় সকলেরই অধিকার আছে, এবং সেইজন্যই স্বাধীনতার অপব্যবহারে, অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারে কাহারও অধিকার নাই। তাহা হইলে একের স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতার নাশক হইয়া উঠে।

কর-সংস্থাপন।

রাজা শাসনের ব্যয়সঙ্কুলনার্থ প্রজার নিকট করগ্রহণের অধিকারী। রাজকর এইরূপে সংস্থাপিত হওয়া উচিত যে, তাহার পরিমাণ কাহারও পক্ষে পীড়াদায়ক না হয়, এবং তাহা সংগ্রহের প্রণালী কাহারও অসুবিধাজনক না হয়।

স্বদেশী শিল্পের উন্নতিসাধন।

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যের উপর রাজকরের পরিমাণের ন্যূনাধিক্য-দ্বারা স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধন কর-সংস্থাপনের একটি উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত। সেই উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু তাহা সাধনের এই উপায় কতদূর

ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতপক্ষে হিতকর, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে অনেক সভ্যদেশেই সে উপায় অবলম্বিত হইতেছে।[১]

মাদকদ্রব্য-সেবন নিবারণের চেষ্টা।

মাদকদ্রব্যের উপর কর-সংস্থাপনদ্বারা রাজার আয়বৃদ্ধি করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত এ প্রশ্নও এইখানে উঠিতে পারে। মাদকদ্রব্য-সেবন সর্ব্বত্রই অনিষ্টকর, এবং উষ্ণপ্রধান দেশে তাহা সেবনের কোন প্রয়োজন নাই। যে দ্রব্যসেবন নানা রোগের ও অশান্তির মূল, ও যাহার অতিরিক্ত সেবনে মনুষ্যের পশুত্বপ্রাপ্তি হয়, তাহার, ঔষধার্থে ভিন্ন অন্য কারণে, ক্রয়-বিক্রয় অন্ততঃ উষ্ণপ্রধান দেশে রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে একেবারে স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ না হইয়া ক্রমশঃ প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ, এই কথা অনেকে বলেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যতদিন লোকের মাদকদ্রব্য-সেবনের প্রবৃত্তি প্রবল থাকিবে, ততদিন তাহার ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধ নিষ্ফল, ও তাহা গোপনে প্রস্তুত ও বিক্রীত হইবে। কিন্তু এক দিকে সুশিক্ষাদ্বারা, ও অপর দিকে কর-সংস্থানপূর্ব্বক মাদকদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিদ্বারা, সে প্রবৃত্তির যখন ক্রমশঃ হ্রাস হইবে, তখন বিনা নিষেধেও নিষেধের ফল পাওয়া যাইবে। যদি সেই আশায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে রাজার এইরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য যে, রাজ-কর্ম্মচারীরা মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় যাহাতে কম হয় ও তাহা ব্যবহারের পরিমাণ যাহাতে কমিয়া যায়, তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান্ হয়েন।

৪। রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য। ভক্তিপ্রদর্শন।

৪। রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য

রাজার প্রতি প্রজার প্রথম কর্ত্তব্য ভক্তিপ্রদর্শন। মনু কহিয়াছেন—

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति।[২]

(মহতী দেবতা রাজা নররূপধারী।)

রাজাকে দেবতাতুল্য সম্মানার্হ বলার কারণ এই যে, রাজা না থাকিলে দেশ অরাজক হইয়া সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। ফলতঃ দেশরক্ষার নিমিত্ত রাজার সৃষ্টি হইয়াছে।[৩] রাজা যদি ভক্তির যোগ্য না হন, কিরূপে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হইবে?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, রাজভক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশে নহে, তাহা রাজপদের উদ্দেশে। সে পদ সর্ব্বদাই ভক্তির যোগ্য। যিনি সে পদে অধিষ্ঠিত তিনি যদি নিজগুণে ভক্তির যোগ্য হয়েন, তাহা হইলে প্রজার পরমসৌভাগ্যের বিষয়। রাজাকে যে প্রজার ভক্তি করা কর্ত্তব্য, তাহা কেবল

---

১ এ সম্বন্ধে Mill's *Principles of Political Economy*, Bk. V, Ch. X ও Sidgwick's *Principles of Political Economy*, Bk. III, Ch V দ্রষ্টব্য।

২ মনু, ৭।৮।

৩ মনু, ৭।৩।

রাজার হিতার্থে নহে, প্রজার হিতার্থেও বটে। কারণ, রাজার প্রতি প্রজার ভক্তি না থাকিলে প্রজা রাজাজ্ঞাপালনে তৎপর হইবে না, সুতরাং রাজার রাজ্যশাসন দুরূহ হইবে, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, এবং রাজ্যের শান্তিরক্ষা ও প্রজাবর্গের সুখস্বচ্ছন্দতাসাধন সম্ভাবনীয় হইবে না।

রাজাজ্ঞা পালনীয়।

রাজা যদি কোন অন্যায় আদেশ করেন তাহা হইলে প্রজা কি করিবে ?— এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, সেই আদেশ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ হইলে প্রজা তাহা পালন করিতে বাধ্য হইবে না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেরূপ কর্ত্তব্যসঙ্কট প্রায় ঘটে না। অধিকাংশ স্থলে অন্যায় আদেশের অর্থ অহিতকর আদেশ। প্রজা যখন রাজার শাসনাধীনে থাকিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়, তখন কদাচিৎ একটা অহিতকর আদেশের জন্য রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রজার কর্ত্তব্য নহে। তবে সেই আদেশ পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত যথানিয়মে ন্যায়ানুসারে চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু যতদিন সে আদেশ পরিবর্ত্তিত না হয় ততদিন তাহা পালনীয়, এবং তাহা অমান্য করা কর্ত্তব্য নহে।

রাজার কার্য্যের সমালোচনা সম্মানপূর্ব্বক করা উচিত।

রাজার বা রাজকর্ম্মচারীর কার্য্য সমালোচনা করিতে হইলে তাহা যথোচিত সম্মানের সহিত করা কর্ত্তব্য। রাজার বা রাজকর্ম্মচারীর কার্য্যে দোষ লক্ষিত হইলে তাহা দেখাইয়া দেওয়াতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই উপকার হয়, কিন্তু তাহা সরল, বিনীত ও সম্মানসূচক ভাবে দেখান উচিত। তাহা না হইলে তাহাতে কোন সুফল না হইয়া কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। কারণ, অসম্মানের সহিত কাহারও দোষ দেখাইতে গেলে স্বভাবতঃ সে বিরক্ত হইবে, ও দোষ থাকিলেও তাহা স্থিরভাবে দেখিতে চাহিবে না। সুতরাং সে দোষের ত সংশোধন হইবেই না, অধিকন্তু সেই বিরক্তির ফলে সেইব্যক্তি কর্তৃক অন্য দোষও ঘটিতে পারে। আবার অসম্মানের সহিত রাজকর্ম্মচারীর দোষ দেখাইতে গেলে তাঁহার প্রতি অন্য প্রজার শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে পারে, ও তাহার ফলে রাজা-প্রজা পরস্পরের অসদ্ভাব জন্মিতে পারে, এবং তাহা রাজা ও প্রজা উভয়েরই পক্ষে অশুভকর।

৫। এক জাতির বা রাজ্যের অন্য জাতির বা রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্য

৫। এক জাতির বা রাজ্যের অন্য জাতির বা রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্য।

সকল সভ্য জাতির ও সভ্য রাজ্যেরই পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে থাকা কর্ত্তব্য।

সভ্য মনুষ্যগণের পরস্পর ব্যবহার যেরূপ ন্যায়সঙ্গত হওয়া উচিত, সভ্য জাতিসমূহের পরস্পর ব্যবহার তদপেক্ষা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত হইবে আশা করা যায়। কারণ, একজন মনুষ্য সভ্য, বুদ্ধিমান্ ও ন্যায়পরায়ণ হইলেও তাঁহার ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু একটা সমগ্র সভ্য জাতির,

যাহার মধ্যে অনেক বুদ্ধিমান্ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আছেন, সকলেরই ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ সভ্য জাতির মধ্যেও কখন কখন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। তাহার কারণ বোধ হয় অসংযত বৈষয়িক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা। বৈষয়িক উন্নতি বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু তাহা মনুষ্য-জীবনের, কি জাতীয় জীবনের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নহে, আধ্যাত্মিক উন্নতিই মানবের চরম লক্ষ্য।

অসভ্য জাতির প্রতি সভ্য জাতির কর্ত্তব্য।

সভ্য জাতির পরস্পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার উচিত, অসভ্য জাতির সহিত সভ্য জাতির ব্যবহার তদপেক্ষা আরও উদারভাবের হওয়া বিধেয়। কি সংখ্যায়, কি বলে, পৃথিবীতে এখন আর এরূপ কোন অসভ্য জাতিই নাই যাহাকে ভয় করিয়া সভ্য জাতিকে চলিতে হইবে। অসভ্য জাতিকে ক্রমশঃ শিক্ষিত ও সভ্য করা সভ্য জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহাতে যে আয়াস ও অর্থ লাগিবে, তাহাদের সহিত বাণিজ্যের আদান প্রদানে তদপেক্ষা অধিক লাভ হইবে। পরন্তু অসভ্য জাতিকে শিক্ষিত ও সভ্য করাতে শিক্ষাদাতার যে জাতীয় গৌরব আছে তাহাও অল্প মূল্যের নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম।

ধর্ম্মের মূলসূত্র ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস।

ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম কি তাহা সকলেই জানেন, এবং ইহাও সকলেই জানেন যে ধর্ম্মের মূলসূত্র ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য জাতিরই ধর্ম্ম সেই বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। ঈশ্বর না মানিয়া কেবল পরকাল মানিলে সে বিশ্বাসকে ধর্ম্ম বলা যায় না। জীবের সে পরকাল জড়ের এক অবস্থার পর অবস্থান্তরের ন্যায় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আবার, পরকাল না মানিয়া কেবল ঈশ্বর মানিলেও সে বিশ্বাস ধর্ম্ম নহে, কারণ, সে স্থলে ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ তাঁহার সহিত জড়ের সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন বলা যাইতে পারে না। আর ঈশ্বর ও পরকাল উভয়েরই অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, (যদিও নীতি থাকিতে পারে,) এ কথা কেহই বোধ হয় সন্দেহ করেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাস, এই দুই বিশ্বাসের মিলনকেই ধর্ম্ম বলা যায়। আমি অনন্তকাল থাকিব এবং অনন্ত-চৈতন্যশক্তি-দ্বারা চালিত হইব এই বিশ্বাস থাকিলেই, মানুষ জড়জগৎ ছাড়াইয়া উঠিতে ও সংসারের সুখদুঃখ তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারে, এবং সুখে দুঃখে সমভাবে বলিতে পারে, যখন অনন্তকাল আমার সম্মুখে এবং অনন্ত-চৈতন্যশক্তি আমার সহায়, তখন অল্প দিনের সুখদুঃখ কিছুই নহে, এবং পরিণামে অনন্ত সুখ আমার প্রাপ্য।

ঈশ্বর ও পরকাল বোধ হয় জ্ঞানের বিষয় নহে, বিশ্বাসের বিষয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও পরকালে বিশ্বাস যুক্তিসিদ্ধ কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে, সমগ্র বিশ্বের চৈতন্যশক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া মানা কোন যুক্তির বিরুদ্ধ নহে, এবং দেহাবসানেও আমি থাকিব, আত্মার এই উক্তি আত্মজ্ঞানের ফল, ও তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্মের বিভাগ।

ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্মের আলোচনা করিতে গেলে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—

১। ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।
২। মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১। ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম

১। ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত পালনীয়।

ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এই দ্বিবিধ কর্ত্তব্যের মধ্যে দুইটি বিশেষ প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ, মনুষ্যের কর্ত্তব্য পালিত হইলে কেবল কর্ত্তব্যপালনকারীর মঙ্গল হয় এমত নহে, যাহার অনুকূলে সেই কর্ত্তব্য পালিত হইল তাহারও হিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য পালিত

সাধারণতঃ মানবের সকল কর্ত্তব্যই ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যের অন্তর্গত।

হইলে তাঁহার হিত হইল এ কথা হিত শব্দের প্রচলিত অর্থে বলা যায় না। কারণ, তাঁহার কোন অপূর্ণতা বা অভাব নাই, সুতরাং তাঁহার হিত কে করিতে পারে? তবে তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্যপালনে তৎপালনকারীর মঙ্গল হওয়াতে তাঁহার সৃষ্টির হিত হয়, এবং তিনি তাহাতে প্রীত হয়েন, এ কথা বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। এক ব্যক্তি-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য অন্য ব্যক্তিসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য হইতে পৃথক্। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য মানবের সমস্ত কর্ত্তব্যের সমষ্টি। মানুষের এমন কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই যাহা ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, আমাদের সকল কর্ত্তব্যই ঈশ্বরের নিয়মের উপর সংস্থাপিত, এবং তাঁহার নিয়ম পালনার্থেই সকল কর্ত্তব্য পালিত হয়। মানবের সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মই ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দেশ্যে করণীয়। ইহাই

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥"[১]

(কর্ম্ম বা ভোজন তব, দান বা যজন,
কিম্বা তপ, কর সব, আমাতে অর্পণ।)

এই গীতাবাক্যের অর্থ। এবং এই অর্থেই জাতকর্ম্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত হিন্দুর জীবনের সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত, ও ধর্ম্মকার্য্য স্বরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দেহরক্ষা, দারপরিগ্রহ, স্ত্রীপুত্রাদিপালন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম এইমত ধর্ম্মকার্য্য মনে করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই, তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার ও তাহাতে কোন পাপস্পর্শ না হইবার সম্ভাবনা। জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনা, ইহাই কেবল ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাই কেবল ধর্ম্মকার্য্য, এবং আমাদের অপর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেবল মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য, ও তাহা কেবল লৌকিক বা বৈষয়িক কার্য্য, এবং ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সহিত তাহার সংস্রব নাই, এরূপ মনে করা ভ্রম। যাঁহারা ঈশ্বর ও পরকাল মানেন, তাঁহাদের পক্ষে কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরোদ্দেশে ধর্ম্মকার্য্য মনে করিয়া সম্পন্ন করা উচিত। কারণ, সকল কার্য্যেরই আধ্যাত্মিক ফলাফল আছে, সকল কার্য্যেরই ফলাফল ইহলোকে ও পরলোকে ভোগ করিতে হয়। একটি সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথা বিশদভাবে দেখা যাইবে। আহার ত অতি সামান্য কার্য্য। কিন্তু সেই আহার পরিমিত ও সাত্ত্বিক ভাবে হইলে, তদ্দ্বারা দেহের সুস্থতা, মনের শান্তি, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি, ও অসৎকর্ম্মে নিবৃত্তি, এবং তাহার ফলে ইহলোকে

---

[১] গীতা, ৯। ২৭।

প্রকৃত সুখ ও পরলোকের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধি, এই সকল লাভ হয়। আবার আহার অপরিমিত ও রাজসিক ভাবে হইলে, তাহাতে দেহের অসুস্থতা, মনের উগ্রতা, সৎকর্ম্মে বিরাগ, ও অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি, এবং তাহার ফলে ইহলোকে দুঃখ ও পরলোকের নিমিত্ত চিত্তবিকার, এই সমস্ত অশুভ ঘটে। অতএব আহারও ধর্ম্মকার্য্য মনে করিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া পবিত্রভাবে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। সেইরূপ যথাসম্ভব জ্ঞানার্জন এবং ধনোপার্জনও ধর্ম্মকার্য্য, কেন-না, তাহা নিজের ও অন্যের বৈষয়িক উন্নতির, ও প্রকারান্তরে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায়, এই মনে করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, এবং তাহা হইলে সে কার্য্য পবিত্রভাবে সম্পন্ন হইবে। অতএব সামান্যতঃ আমাদের সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মই ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ কর্ত্তব্য: তাঁহাকে ভক্তি করা।

কিন্তু আমাদের কএকটি বিশেষ কার্য্য আছে যাহা কেবল ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে ঈশ্বরকে ভক্তি করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

এই স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি করি কেন? তিনি তাহাতে প্রীত হইবেন ও প্রীত হইয়া আমাদের ভাল করিবেন এই নিমিত্ত, কি তাঁহার সৃষ্টির নিয়মানুসারে আমাদের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়, এবং সেই ভক্তি সৃষ্টির নিয়মানুসারে আমাদের শুভকর হয়, এইজন্য? যাঁহারা ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবে দেখেন, এবং বলেন, ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর না মানিয়া জগতের শক্তিসমষ্টিকে ঈশ্বর বলিলে সে ঈশ্বরবাদ নিরীশ্বরবাদ হইতে ভিন্ন নহে, তাঁহাদের মতে আমরা যেমন কেহ ভক্তি করিলে তাহার উপর তুষ্ট হই ও তাহার উপকার করিতে উদ্যত হই, ঈশ্বরও সেইরূপ তাঁহার প্রতি কেহ ভক্তি করিলে সেই ভক্তের প্রতি তুষ্ট হন ও তাহার ভাল করেন। আর যাঁহারা ঈশ্বরকে ব্রহ্ম বলিয়া মানেন, এবং ঈশ্বর হইতে জগৎ পৃথক্ মনে করেন না, অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ণাদ্বৈতবাদী এবং ঈশ্বরে ব্যক্তিভাব আরোপ করা যাঁহারা অসঙ্গত মনে করেন, তাঁহাদের মতে ঈশ্বরকে ভক্তি করা জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম এবং সেই ভক্তি করাতে ভক্তের মঙ্গল হওয়া ঈশ্বরের সৃষ্টির নিয়ম।

লোকে সহজেই জগৎকে নিজের মত দেখে ('আত্মবৎ মন্যতে জগৎ') এবং ঈশ্বরেতেও নিজের প্রকৃতি ও দোষগুণ আরোপ করে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। "নেতি নেতি" "এমত নয় এমত নয়" এই বলিয়াই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করি।[1] ঈশ্বরের স্বরূপ জানা মানবের শক্তির অতীত এই বলিয়া এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা জানিবার নিষ্ফল চেষ্টা হইতে আমাদিগকে বিরত থাকিতে বলেন। কিন্তু যদিও ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারিব না, তথাপি তাহা জানিবার চেষ্টা হইতে আমরা ক্ষান্ত থাকিতেও পারি না। তিনি কিরূপ জানিতে চাহি, এই

---

[1] বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।২।৪।

বলিয়া ব্যগ্রতার সহিত কেহ বা জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করিয়া "তত্ত্বমসি"[১] "তুমিই তাহা" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কেহ বা জ্ঞানমার্গ দুরূহ, ঈশ্বর কিরূপ ঠিক জানিতে পারি আর না পারি তাঁহার সহিত মিলিতে চাহি, এই বলিয়া ভক্তিমার্গে তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার সহিত তন্ময়তা লাভ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ মনে করেন।[২] কিন্তু ভক্ত এবং জ্ঞানী উভয়েই ঈশ্বরের সহিত মিলনলাভের ইচ্ছা করেন, এবং সেই মিলনলাভের ইচ্ছাকেই প্রকৃতভক্তি বলা যায়।

ঈশ্বর ব্যক্তিভাবাপন্নই হউন আর বিশ্বরূপ ও বিশ্বের অনন্তশক্তিই হউন, তাঁহার সহিত মানবের এই মিলনের ইচ্ছার কারণ এই যে, মানব নিজের অপূর্ণতা ও অভাব এবং সেই অভাব পূরণে অসমর্থতার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল, আর বিশ্বের মূল যে অনন্তশক্তি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণে অপূর্ণতা পূরণ ও অভাব মোচন হইবে এই অস্ফুট জ্ঞান বা বিশ্বাসদ্বারা প্রণোদিত, সুতরাং মানব সেই অনন্তশক্তির সহিত মিলনের ইচ্ছা করে। অতএব ঈশ্বরে ভক্তি মানবের স্বভাবসিদ্ধ। তবে কুশিক্ষা বা কুসংস্কারদ্বারা ঈশ্বরে বিশ্বাস নষ্ট হইলেই আমাদের সেই ভক্তির লোপ হয়।

ঈশ্বরে ভক্তি যে মানবের পক্ষে শুভকর ও কর্ত্তব্য, তাহার কারণ এই যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকিলে জগতের অনন্তশক্তি নিরন্তর আমাদের সহায় ও আমাদের কার্য্যপরিদর্শক রহিয়াছেন, এই বিশ্বাস আমাদের সর্ব্বপ্রকার নৈরাশ্য নিবারণ করে, ও সৎকর্ম্ম দুরূহ হইলেও তাহাতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে, এবং অসৎকর্ম্ম সহজ বা আপাততঃ সুখকর হইলেও তাহা হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত করে। ঈশ্বরে ভক্তি মানবের মঙ্গলকর হইবার আর একটি কারণ আছে। ঈশ্বর পূর্ণ, পবিত্র, ও মহান্; তাঁহাতে ভক্তি অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলনের ইচ্ছা সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকিলে, যাহা পূর্ণ, পবিত্র ও মহান্, তাহাতেই মানবের মন অনুরক্ত, এবং যাহা অপূর্ণ, অপবিত্র ও ক্ষুদ্র, তাহার প্রতি বিরক্ত হয়। এই সকল কারণে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি মানবের স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তব্য ও মঙ্গলকর। এই পর্য্যন্ত এবিষয় আমাদের বোধগম্য। তদ্ভিন্ন, ঈশ্বরকে ভক্তি করিলে তিনি তাহাতে প্রীত হন কি না, এবং প্রীত হইয়া আমাদের মঙ্গল করেন কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। যদি আমাদের প্রকৃতি তাঁহার প্রকৃতির অনুরূপ হয়, তাহা হইলে সে কথা সম্ভাব্য বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি যে আমাদের ন্যায় অপূর্ণ জীবের প্রকৃতির মত একথাও নিশ্চিত বলিতে পারা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, আমাদের ভালমন্দ জ্ঞান তাঁহার অনন্তজ্ঞানের অস্ফুট আভাস, সুতরাং তাহা একেবারে অলীক নহে।

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।৮—১৬।

২ গীতা, ১২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরের নিত্য উপাসনা তাঁহার প্রতি মানবের দ্বিতীয় বিশেষ কর্ত্তব্য। দেহের অভাবপূরণ ও বিষয়বাসনাতৃপ্তির নিমিত্ত আমরা নিরন্তর এতই ব্যাপৃত থাকি যে, আধ্যাত্মিক চিন্তায় মন দিবার অবসর সহজে পাই না। এই জন্য প্রতিদিন দিনের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এবং সমাপ্ত করিবার পরে, অন্ততঃ এই দুইবার ঈশ্বরোপাসনার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। তাহা হইলে প্রথমে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দিনের মধ্যে দুইবার আধ্যাত্মিক চিন্তায় মন যাইবে, এবং ক্রমশঃ অভ্যাস হইলে নিত্য উপাসনায় আপনা হইতে মন আকৃষ্ট হইবে। ঈশ্বরে ভক্তি কেন মানবের মঙ্গলকর হয়, তাহার যে যে কারণ উপরে বলা হইয়াছে, ঠিক সেই সেই কারণেই নিত্য ঈশ্বরোপাসনাও আমাদের মঙ্গলকর। উপাসনায় ঈশ্বরের সামীপ্যবোধ জন্মে, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনন্তশক্তি আমাকে কর্ম্মে চালিত করিতেছে, এবং তাঁহার পূর্ণতা ও পবিত্রতার ছায়ায় আমি রহিয়াছি, মনে এই ভাবের উদয় হয়। ইহা হইতে আধ্যাত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ উপায় আর কি আছে?

নিত্য উপাসনা।

ইহা চাহি তাহা চাহি বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা অকর্ত্তব্য। আমরা যাহা চাহিব তাহাই যে পাইব তাহার স্থিরতা নাই, তবে এ কথা নিশ্চিত, আমরা কোন অন্যায় প্রার্থনা করিলে তাহার পূরণ হইবে না। আমাদের যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহাই যেন পাই, তাহাই যেন হয়,—এই পর্য্যন্ত প্রার্থনাই বিধিসিদ্ধ। একাগ্রতার সহিত এই প্রার্থনা করিলে, আমাদের একাগ্রতা সেই ফল আনিয়া দিবে। উপাসনাকালে নিজের ইচ্ছামত প্রার্থনা না করিয়া ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণদিগের সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্রে আছে। আপোদেবতাকে অর্থাৎ জীবের বাহ্যাভ্যন্তর শুচিকরী ত্রৈণী শক্তিকে উপাসক বলিতেছেন "যোবঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ"[১] "তোমাদের যে সকল শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকর রস, সন্তানের হিত-কামনাপূর্ণ মাতার ন্যায় আমাদিগকে সেই সকল রসের ভাগী কর" অর্থাৎ মাতা যেমন সন্তানের যাহাতে ভাল হইবে, সন্তান তাহা জানুক আর নাই জানুক, তাহাই দিবেন, তেমনই ঈশ্বরও যেন উপাসককে যাহাতে তাহার ভাল হয়, সে তাহা জানুক আর না জানুক, তাহাই দেন।

উপাসনা, যে জাতির যেরূপ প্রাচীন পদ্ধতি আছে, যথাযোগ্যরূপে তদনুসারে হইলেই ভাল হয়। মন্ত্রের কোন দৈবশক্তির কথা বলিতেছি না, কিন্তু তাহার আশ্চর্য্য রচনাসৌন্দর্য্য, এবং এতকাল আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকর্ত্তৃক তাহার প্রয়োগ, মনে করিতে গেলে, তাহার অসামান্য ভাবোদ্দীপনী শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সত্য বটে প্রকৃত উপাসনা মনের বিষয়, তাহা বচনাতীত। কিন্তু যদি উপাসনায় ভাষা প্রয়োগ করিতে হয়, তবে প্রাচীন পদ্ধতিই প্রশস্ত।

---

[১] ঋগ্‌বেদ্ ১০ম মণ্ডল, ৯ সূক্ত, ১—৩।

কাম্য উপাসনা।

স্থলবিশেষে এবং সময়বিশেষে কাম্য উপাসনা ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের আর একটি কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঈশ্বরের নিকট ইহা চাহি তাহা চাহি বলিয়া প্রার্থনা করা অকর্ত্তব্য, তবে কাম্য উপাসনা কিরূপে কর্ত্তব্য হইতে পারে?—এ কথার উত্তর এই যে, যখন আমরা কোন বিপদে পড়ি বা কোন কঠিন কর্ত্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হই, তখন যাঁহার অসীম শক্তি আমাদের সকল কর্ম্মের পরিচালক তাঁহাকে একাগ্রতার সহিত স্মরণ করিলে, আমাদের অসমর্থতাবোধ দূরীভূত হইয়া মনে অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্যমের সঞ্চার হয়।

মূর্ত্তিপূজা ও দেবদেবীর পূজা।

কেহ কেহ বলেন মূর্ত্তিপূজা ও দেবদেবীপূজা নিবারণ করাও ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, কারণ ঈশ্বর নিরাকার অনন্ত, এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহাকে সাকার সসীম মূর্ত্তিবিশিষ্ট মনে করাতে, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নানা দেবদেবীর পূজা করাতে, তাঁহার অবমাননা করা হয়। যদি কেহ ঈশ্বরের পূর্ণতা ও সর্ব্বব্যাপিত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার কেবল মূর্ত্তিবিশেষে স্থিতি এই কথা বলে, অথবা তাঁহার সমান ও তাঁহা হইতে পৃথক্ মনে করিয়া অন্য দেবদেবীর পূজা করে, তাহার কার্য্য অবশ্যই গর্হিত। কিন্তু সেরূপ কার্য্য অতি অল্প লোকই করে। যাঁহারা মূর্ত্তিপূজা বা নানা-দেবদেবীপূজা করেন তাঁহারা এই কথা বলেন যে, নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ করা কঠিন, এবং তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী তখন তিনি মূর্ত্তিবিশেষেও আছেন, এই মনে করিয়া সেই মূর্ত্তিতে তাঁহারই পূজা করা হয়, আর দেবদেবী তাঁহারই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রতিরূপ এই মনে করিয়া দেবদেবীতে সেই অনন্তশক্তির পূজা করা হয়। এরূপ কার্য্য নির্দ্দোষ না হইলেও গর্হিত বলা যায় না, বিশেষতঃ যখন দেখা যায়, যাঁহারা মূর্ত্তিপূজার বিরোধী তাঁহাদের মধ্যেই অনেকে ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাববিশিষ্ট মনে করেন।

২। মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ত্তব্য : পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

২। মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম

মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ প্রথম কর্ত্তব্য, পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধাপ্রদর্শন।

লোকে আপন ধর্ম্মই প্রকৃতধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং সকলেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী হউক বলিয়া ইচ্ছা করে, কিন্তু সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী হইবে আশা করা অসঙ্গত। মানব জাতির অনেক বিষয়ে একতা হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ আরও অনেক বিষয়ে একতা হইবে। কিন্তু সকল বিষয়ে যে কখন একতা হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। কারণ, পূর্ব্বসংস্কার, পূর্ব্বশিক্ষা, দেশের নৈসর্গিক অবস্থা ও রীতিনীতি, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির এত বিভিন্ন যে, তাহাদের মধ্যে তজ্জনিত পার্থক্য অবশ্যই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধেও যদিও স্থূল কথা—যথা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস—লইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে পার্থক্য না থাকিতে পারে, সূক্ষ্ম কথা লইয়া পরস্পরের পার্থক্য

অনিবার্য্য। এ অবস্থায় সকল মনুষ্যকে একধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা নিষ্ফল। যখন পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম থাকিবে, এবং সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন কাহার কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বা পরিহাস করা কর্ত্তব্য নহে। যদি কাহার মতে কোন ধর্ম্ম নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বা তাহার কোন অনুষ্ঠান অমঙ্গলকর বলিয়া বোধ হয়, এবং তত্তদ্বিষয় সংশোধনার্থে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়, তবে ধীর ও সংযত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত সে সকল বিষয়ের আলোচনা কর্ত্তব্য। তদন্যথায় কেবল নিজ ধর্ম্মের প্রাধান্যস্থাপন বা তর্কে পরধর্ম্মাবলম্বীর পরাভবকরণ-মানসে কার্য্য করিতে গেলে ধর্ম্মসংশোধনের উদ্দেশ্য ত সফল হইবে না, পরন্ত সেই ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি হইবে।

সাধারণ ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

সাধারণ ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি কোন দেশে কোন কারণে (যথা ভারতে রাজা ও প্রজা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া) রাজা প্রজার ধর্ম্মশিক্ষার ভার গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে সে দেশে আপনাদের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত ব্যবস্থা করার ভার প্রজার উপর গুরুতর ভাবে বর্ত্তে।

যদি লোকের হিতসাধন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে লোকের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা মানবের অতি প্রধান কর্ত্তব্য, কারণ, লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের অধিকতর হিতকর কার্য্য আর কিছুই নাই। ধর্ম্মশিক্ষা পাইলেই লোকে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে পারে। প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা কেবল পরকালের নিমিত্ত নহে, কারণ সেই শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে বলিয়া দেয়, ইহলোকের ভিতর দিয়াই পরলোকে যাইবার পথ, এবং ইহলোকের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না করিলে পরলোকে সদ্গতি হয় না। এইজন্য ধর্ম্মশিক্ষাকে সকল শিক্ষার মূল বলা যায়। প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা পাইলে লোকে আপনা হইতে ব্যগ্রতার সহিত ইহকালের কর্ত্তব্য পালনোপযোগী শিক্ষালাভে যত্নবান্ হয়, এবং সাধুতার সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কৃতসংকল্প হয়।

ধর্ম্মশিক্ষা যেমন লোকের ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের নিমিত্ত মঙ্গলকর, এবং লোকের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য, প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াও তেমনই কঠিন কার্য্য। প্রথমতঃ, ধর্ম্মসম্বন্ধে এত মতভেদ যে, কে কাহাকে কিরূপ শিক্ষা দিবে ইহা স্থির করা দুরূহ। এবং দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মশিক্ষা কেবল ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই সম্পন্ন হয় না, সেই জ্ঞান যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মনীতিসিদ্ধ কর্ম্ম করিতে যাহাতে অভ্যাস হয়, তাহার বিধান করাও ধর্ম্মশিক্ষার অঙ্গ, আর সেইরূপ বিধান করা কোন ক্রমে সহজ নহে।

ধর্ম্মশিক্ষা সর্ব্বাগ্রে পিতামাতার নিকট পাওয়াই বাঞ্ছনীয়। সে শিক্ষা সাধারণ ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম উভয়বিধ ধর্ম্ম সম্বন্ধেই হইতে পারে। এবং

পিতামাতাপ্রদত্ত ধর্ম্মশিক্ষায় ধর্ম্মনীতিতে জ্ঞানলাভ ও ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানে অভ্যাস জন্মান এই উভয় বিষয়েরই প্রতি তুল্য দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে। পিতামাতার নিকট পুত্রকন্যার ধর্ম্মশিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে প্রতিদিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে এক দিন, ধর্ম্মকথা আলোচনার্থে কিঞ্চিৎ সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। এবং প্রতিদিনই সুযোগমত পরিবারস্থ বালকবালিকা-দিগকে কোন না কোন বিশেষ ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

রাজকীয় বিদ্যালয়ে থাকুক আর না থাকুক, প্রজার স্থাপিত প্রত্যেক বিদ্যালয়েই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে সে শিক্ষা সাধারণ ধর্ম্ম ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সম্বন্ধে হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ, বিদ্যালয়ে নানাধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ছাত্র একত্র সমবেত হইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মকথা আলোচনার নিমিত্ত সভাসমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এদেশে কথকতার যে প্রণালী ছিল এবং এখনও কিয়ৎপরিমাণে আছে, তাহা সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এবং তাহা অধিকতর প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কথকতা যেরূপ ভাষায় হইয়া থাকে, তাহা আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেরই বোধগম্য। এবং কথকের বক্তৃতাশক্তি ও সঙ্গীত-শক্তির প্রয়োগে কথকতা যুগপৎ জ্ঞান ও আনন্দ প্রদান করিয়া সহজেই সকল শ্রেণির শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।

ধর্ম্মসংশোধন। ধর্ম্মসংশোধন করা মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ধর্ম্মবিষয়ক তৃতীয় কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম সনাতন পদার্থ, কোনকালেই তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কিন্তু জগৎ নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল, এবং মনুষ্যের প্রকৃতি আর জ্ঞানও পরিবর্ত্তন-শীল। সুতরাং মনুষ্য যাহা ধর্ম্ম বলিয়া মানে, মনুষ্যের প্রকৃতি ও জ্ঞানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবর্ত্তন হয়।

এইজন্যই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের কথা গীতায়[১] বলা হইয়াছে, এবং এইজন্য মনু কহিয়াছেন—

"अन्ये कृतयुगे धर्म्मास्त्रेतायां द्वापरे परे ।
अन्ये कलियुगे नृणां युगह्रासानुरूपतः ॥"[২]

(ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সত্য ত্রেতায় দ্বাপরে।
কলিযুগে ভিন্ন ধর্ম্ম মানবে আচরে॥)

অনেকেই বলেন যদিও সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল ও ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সেই জ্ঞানলব্ধতত্ত্বেরও অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, কিন্তু জগতের ধর্ম্মপ্রণেতারা সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না, এবং অসাধারণ-জ্ঞানলব্ধতত্ত্বসকল যাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তাহা সর্ব্বকালেই গ্রাহ্য, এবং তাহার সংশোধন অনাবশ্যক ও অসম্ভব।

---

[১] গীতা ৪।৭।

[২] মনু ১।৮৫।

হিন্দুরা বলেন বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত, খৃষ্টানেরা বলেন বাইবেল্ সেইরূপ, এবং মুসলমানেরা বলেন কোরান্ ও তদ্রূপ। এ সকল কথার শাস্ত্রমূলক বিচারে এস্থানে প্রবৃত্ত হইতেছি না, তবে যুক্তিমূলক আলোচনা করিতে গেলে বলা যাইতে পারে, পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রণেতারা ঈশ্বরের অবতার ও অভ্রান্ত বলিয়া যে সম্মানিত হইয়াছেন তাহা এই অর্থে সঙ্গত যে, তাঁহাদের অসাধারণ মনোনিবেশের ফলে তাঁহাদের আত্মায় অনন্ত চৈতন্যের অলৌকিক বিকাশ হওয়াতে, তাঁহারা আধ্যাত্মিকতত্ত্বসকল জনসাধারণ অপেক্ষা অধিকতর বিশদভাবে জানিতে ও অপরকে জানাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সেই সকল তত্ত্বের মধ্যে কতকগুলি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়, এবং কতকগুলি তাঁহারা যে যে দেশে যে যে কালে আবির্ভূত হন, সেই সেই দেশের ও সেই সেই কালের বিশেষ উপযোগী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মনীষীরা দেশধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মপ্রণেতারা আপন আপন ধর্ম্ম যে ভাবে প্রথম প্রচারিত করেন, সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বীরা নিজদোষে কালক্রমে সে ভাবে আচরণ করিতে না পারায়, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। এই সকল কারণে ধর্ম্মের মূল অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও ধর্ম্মসংশোধনের প্রয়োজন হয়।

ধর্ম্মসংশোধন আবশ্যক হইলেও মনে রাখিতে হইবে তাহা অতি দুরূহ কার্য্য, এবং সাবধানে ও শ্রদ্ধার সহিত করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মসংশোধন করিতে গেলেই প্রচলিত ধর্ম্মের দোষকীর্ত্তন করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি লোকের কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা জন্মাইতে হয়। ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মান যত সহজ তাহাতে শ্রদ্ধা পুনঃসংস্থাপন তত সহজ নহে। সুতরাং অসাবধানে লোকের ধর্ম্মসংশোধন করিতে গেলে তাহাদের ধর্ম্ম লোপ করিয়া দিবার আশঙ্কা থাকে। আবার ধর্ম্মে যাহাদের অন্ধ বিশ্বাস, তর্কে সে বিশ্বাস যাইবার নহে, এবং তাহাদের প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার সহিত কথা কহিতে গেলে, তাহাদের মর্ম্মান্তিক বেদনা দেওয়া হয়। এইজন্য ধর্ম্মসংস্কারকের কার্য্য উদ্ধতভাবে বা অনাস্থার সহিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

হিন্দুধর্ম্ম সংশোধন।

অন্য ধর্ম্ম সংশোধনের কথা আমার বলা অবিধি। হিন্দুধর্ম্ম সংশোধন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। কালক্রমে ইহাতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এবং ইহার সংশোধনের প্রয়োজন নাই একথাও বলা যায় না। তবে অধিকাংশ সংস্কারক যে সকল সংশোধন অতি আবশ্যক মনে করেন তাহা সমস্তই যে তত প্রয়োজনীয় এবং নিশ্চিত হিতকর তাহাও বলা যায় না। যে সকল সংশোধনের আন্দোলন চলিতেছে বা হইয়াছে, তাহার সম্যক্ আলোচনা এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে সম্ভবপর নহে। তন্মধ্যে—(১) মূর্ত্তিপূজা নিবারণ, (২) পূজায় পশুবলিদান নিবারণ, (৩) বাল্যবিবাহ নিবারণ, (৪) বিধবাবিবাহ প্রচলন, (৫) জাতিভেদ নিরাকরণ, (৬) কায়স্থের উপনয়ন, (৭) বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ, এই কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে এস্থলে দুই এক কথা বলিব।

১। মূর্ত্তি পূজা নিবারণ।

১। মূর্ত্তি পূজা নিবারণ।

মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যদি কেহ মূর্ত্তিই ঈশ্বর মনে করে তাহা নিতান্ত ভ্রম। কিন্তু যদি কেহ নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ কঠিন বলিয়া তাঁহাকে সাকার মূর্ত্তিতে আবির্ভূত ভাবিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহার কার্য্য গর্হিত বলা যায় না। হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা যে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা, ও শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই যে তাহা সেই ভাবে বুঝেন, হিন্দু পূজা প্রণালীতেই তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। হিন্দু যখন যে মূর্ত্তির পূজা করেন তখন সেই মূর্ত্তিই অনাদি অনন্ত বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের মূর্ত্তি মনে করেন। অসংখ্য হিন্দুর নিত্যপঠিত মহিম্নঃ স্তোত্রের একটি শ্লোক এই—

"त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति ।
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ॥
रुचीनां वैचित्र्यादृजु कुटिल नानापथजुषां ।
नृणामेकोगम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥"

ত্রয়ী, সাংখ্য, যোগ, পশুপতিমত, বৈষ্ণবমত ইত্যাদির মধ্যে এইটি শ্রেষ্ঠ পথ, ঐটি শ্রেষ্ঠ পথ, রুচি বৈচিত্র্য জন্য এইরূপ ঋজু কুটিল নানাপথগামী মনুষ্য-দিগের তুমিই এক গম্যস্থান, যথা নদী সকলের সমুদ্রই এক গম্য স্থান।"

এবং সকল হিন্দুর পূজ্যগ্রন্থ গীতাতেও—

"येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्ब्बकम् ॥"[১]

(ভক্তি ভাবে যে অন্য দেবতা পূজা করে,
অবৈধ যদিও কিন্তু পূজে সে আমারে)।

এই ভগবদ্বাক্য ঐ কথাই সপ্রমাণ করিতেছে।

হিন্দুর সাকার উপাসনা যে প্রকৃত নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা, তৎসম্বন্ধে ব্যাসের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ একটি সুন্দর শ্লোক আছে।

"रूपं रूपविवर्जितस्य भवतो ध्यानेन यद्वर्णितम् ।
स्तुत्यानिर्व्वचनीयताखिल गुरो दूरीकृता यन्मया ॥
व्यापित्वञ्च निराकृतं भगवतो यत्तीर्थयात्रादिना ।
क्षन्तव्यं जगदीश तद्विकलतादोषत्रयं मत्कृतम् ॥"[২]

রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার,
ধ্যানে কিন্তু বলিয়াছি আকার তোমার।

---

[১] গীতা ৯।২৩।

[২] এই শ্লোক ও তাহার অনুবাদ পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের "পঞ্চামৃত" হইতে গৃহীত।

বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব সীমা,
স্তবে কিন্তু বলিয়াছি তোমার মহিমা।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তুমি আছ সমভাবে,
অমান্য করেছি তাহা তীর্থের প্রস্তাবে।
করেছি এ তিন দোষ আমি মূঢ়মতি
ক্ষমাকর জগদীশ অখিলের পতি।"

অতএব হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা বা বহু ঈশ্বরবাদ দোষে দূষিত বলা উচিত নহে।

পূজায় পশুবলি-দান নিবারণ।

২। পূজায় পশু বলিদান নিবারণ।

দেবোদ্দেশে বলিদানের প্রথা দুই কারণে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে।

প্রথমতঃ দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আপনার উৎকৃষ্ট দ্রব্য মমতাত্যাগপূর্ব্বক প্রদান করিবার ইচ্ছা মনুষ্যের আদিম অবস্থার স্বভাবসিদ্ধ। ঈশ্বর মনুষ্য হইতে বড় কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি আমাদের প্রকৃতির ন্যায়, সুতরাং আমাদের উৎকৃষ্ট দ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করিলে তিনি তুষ্ট হইবেন, এইভাবে ভক্তির প্রথম বিকাশ হয়। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রে নরবলি, নিজ পুত্র বলি, ও পশুবলির বৃত্তান্ত অনেক পাওয়া যায়। যথা শুনঃশেপের উপাখ্যান,[১] দাতা-কর্ণের উপাখ্যান, এব্রাহীমের উপাখ্যান।[২] ঈশ্বর কিছু চাহেন না, তাঁহার নিয়ম পালনই পরমভক্তি, এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে বলিদান অনাবশ্যক, এভাব আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে ক্রমে মানবের মনে উদিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রবৃত্তিপরতন্ত্র মনুষ্যের মাংসভোজনের প্রবল প্রবৃত্তিকে কিয়ৎ পরিমাণে সংযত ও নিবৃত্তিমুখী করিবার নিমিত্ত, পূজায় দেবোদ্দেশে পশুহনন বিধিসিদ্ধ। অন্যত্র তাহা নিষিদ্ধ, এইরূপ ব্যবস্থা ধর্ম্মপ্রণেতাদিগের কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে।

কিন্তু যে কারণেই পশুবলিদান প্রথার সৃষ্টি হউক না কেন, তাহার নিবারণ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে জীবহিংসা প্রয়োজনীয় একথা যুক্তির সহিত মিলাইতে পারা যায় না। সাত্ত্বিক পূজায় যে পশুবলিদানের প্রয়োজন নাই একথার প্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রে যথেষ্ট আছে।[৩]

---

[১] ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল ২৪ সূক্ত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সপ্তম্ পঞ্চিকা, রামায়ণ, বালকাণ্ড ৬১।৬২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[২] Genesis, XXII দ্রষ্টব্য।

[৩] শব্দকল্পদ্রুমে বলিঃ শব্দ দ্রষ্টব্য।

বাল্যবিবাহ নিবারণ।

৩। বাল্যবিবাহ নিবারণ।

পুরুষের বাল্যবিবাহের কোন বিধিই হিন্দুশাস্ত্রে নাই, বরং প্রকারান্তরে তাহার নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়[১]। তবে স্ত্রীর পক্ষে প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বে অথবা দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইবার পূর্ব্বে বিবাহের বিধি[২] থাকায় বাল্য বিবাহ হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বলিতে হইবে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥[৩]"
(ঋতুমতি হইয়াও থাক্ কন্যা ঘরে।
তথাপি দিবেনা তারে গুণহীন বরে॥)

শাস্ত্রের এই বচনের প্রতি এবং হিন্দু সমাজের এখনকার প্রচলিত প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বুঝা যায়, দ্বাদশ বর্ষাপেক্ষা অধিক বয়সে ও প্রথম রজোদর্শনের পরে কন্যার বিবাহ হওয়া একেবারে হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া লোকে মনে করে না, তবে প্রথম রজোদর্শনের পর বিবাহ অপ্রশস্ত ও নিন্দনীয়। সুতরাং বাল্য-বিবাহনিবারণার্থে হিন্দুধর্ম্মসংশোধনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। অল্প বয়সে অর্থাৎ কন্যার ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ও পুত্রের ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ বর্ষে বিবাহ যে প্রচলিত আছে, তাহা সামাজিক ব্যাপার, ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় নহে, এবং তাহার প্রতিকূলে যেমন অনেক কথা আছে, অনুকূলেও দুই এক কথা আছে। সে সকল কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা এই ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

বিধবা বিবাহ প্রচলন।

৪। বিধবা বিবাহ প্রচলন।

বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে, ব্রহ্মচর্য্য ও চিরবৈধব্যপালন হিন্দু ধর্ম্মানুসারে বিধবার কর্ত্তব্য। বিধবাবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রে একেবারে নিষিদ্ধ কি না, এ কথার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে, তবে তাহার বিচার এখন নিষ্প্রয়োজন। কারণ বিধবাবিবাহ এক্ষণে আইন সিদ্ধ[৪], এবং যাঁহারা বিধবা-বিবাহ সংসৃষ্ট, যদিও তাঁহারা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে সমাজে চলিত নহেন, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে অহিন্দু বা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বলেন না। হিন্দুসমাজ

---

[১] মনু ৩। ১—৪।
[২] মনু ৯। ৮৯, ৯৪।
[৩] মনু ৯। ৮৯।
[৪] এ সম্বন্ধে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ১৫ আইন দ্রষ্টব্য।

এই কথা বলেন, যে বিধবা চিরবৈধব্য ব্রতপালনে অক্ষম তিনি বিবাহ করুন, তাঁহার বিবাহ আইনসিদ্ধ ও তাহাতে কাহারও আপত্তি চলিবে না, তবে তাঁহার কার্য্য উচ্চাদর্শের নহে। যিনি চিরবৈধব্য ব্রতপালনে সমর্থ তাঁহার কার্য্য উচ্চাদর্শের। হিন্দুসমাজ প্রথমোক্ত শ্রেণির বিধবাকে মানবী ও দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণির বিধবাকে দেবী বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহেন। এ কথা অসঙ্গত বলা যায় না। যে বিধবা ইহকালের সুখবাসনা বিসর্জন দিয়া পরকালের মঙ্গলকামনায় মৃতপতির স্মৃতি পূজাপূর্ব্বক পরিবারবর্গের, প্রতিবেশিবর্গের ও জনসাধারণের হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহার জীবন যে উচ্চাদর্শের, এবং তাঁহার সহিত তুলনায় যে বিধবা ইহকালের সুখকামনায় পত্যন্তর গ্রহণ করেন তাঁহার জীবন যে তত উচ্চাদর্শের নহে, এ কথা কি হেতুতে অস্বীকার করা যাইতে পারে ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

কোন বিধবার অভিভাবক তাঁহার বিবাহ দেওয়া শ্রেয়ঃ স্থির করিলে তিনি অনায়াসেই তাঁহার বিবাহ দিতে পারেন, এবং আইন অনুসারে সে বিবাহ সিদ্ধ। তবে হিন্দুসমাজ বিধবার বিবাহ অপেক্ষা চিরবৈধব্য পালন উচ্চাদর্শের কার্য্য মনে করেন। এ অবস্থায় বিধবাবিবাহ প্রচলনের চেষ্টা সেই মত পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক তদ্বিপরীত মত সংস্থাপনের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহা কি সমাজের পক্ষে হিতকর? জীবনের আদর্শ যত উচ্চ থাকে ততই কি সমাজের মঙ্গল নহে? যদি কেহ বলেন সমাজের এই মত যাঁহারা বিধবা-বিবাহে সংসৃষ্ট তাঁহাদের পক্ষে স্পষ্টরূপে না হউক প্রকারান্তরে অনিষ্টকর, সে কথার উত্তর আছে। সমাজকর্ত্তৃক বিধবাবিবাহসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের যে অনিষ্ট ঘটে তাহার অনেকটা তাঁহাদের নিজ কার্য্যের ফল। তাঁহারা যদি বিধবার বিবাহ চিরবৈধব্য পালন অপেক্ষা ভাল কার্য্য এবং বিধবাবিবাহ সমাজের ও দেশের মঙ্গল নিমিত্ত প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য, ইত্যাদি কথা বলিয়া চিরবৈধব্য-পালনের প্রতি হিন্দুসমাজের যে শ্রদ্ধা আছে তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে অনেকেই তাঁহাদের বিরোধী হইতে ক্ষান্ত থাকিবে।

৫। জাতিভেদ নিরাকরণ।

৫। জাতিভেদ নিরাকরণ।

জাতিভেদ বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের একটি বিশেষ বিধান। প্রাচীন বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল কি না এবং ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত[১] (যাহাতে জাতিভেদের প্রমাণ আছে) প্রক্ষিপ্ত কি না এ সকল প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা, এক্ষণে জাতিভেদ রহিত হওয়া উচিত কি না, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। অনেকের মতে তাহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত, কারণ তাহা নানাবিধ অনিষ্টের মূল।

---

[১] ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত। ১২।

জাতিভেদপ্রথা হিন্দুদিগের মধ্যে একতাসংস্থাপনের পক্ষে বাধাজনক। এবং তাহা কোন কোন স্থলে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি করে। তবে জাতিভেদপ্রথা যে কেবল দোষের এবং তাহার কোন গুণ নাই, একথাও বলা যায় না। হিন্দুর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই জন্মগত জাতিভেদ, পাশ্চাত্য সভ্যতার ধনী ও দরিদ্র এই অর্থগত জাতিভেদকে হিন্দুসমাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ করিতে দেয় নাই। অর্থগত জাতিভেদ যতদূর মর্ম্মবেদনার কারণ হয়, জন্মগত জাতিভেদ ততদূর হয় না। পাশ্চাত্য সমাজে ধনী ও নির্ধনের যতটা পার্থক্য, হিন্দুসমাজে ততটা নহে। হিন্দুদিগের মধ্যে একজাতীয় হইলে, কি ধনী কি দরিদ্র, সামাজিক বিষয়ে সকলেই সমান। এবং সেই জন্য ধনের মর্য্যাদা তত অধিক না হওয়ায় অর্থলালসা কিঞ্চিৎ প্রশমিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে ভাব আর অধিক দিন থাকা সম্ভাব্য নহে।

হিন্দুর জাতিভেদ অনিষ্টের কারণ হইলেও তাহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া অসম্ভব। বিবাহ ও আহার সম্বন্ধে জাতিভেদ হিন্দুকে অবশ্যই মানিতে হইবে। তাহার কারণ কি তাহা এই ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, সে কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে বিবাহ ও আহার এই দুই বিষয় বাদ রাখিয়া অপর সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর সদ্ভাবসংস্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং একজাতির অপর জাতিকে ঘৃণা বা অনাদর করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য।

৬। কায়স্থের উপনয়ন।

৬। কায়স্থের উপনয়ন।

একদিকে যেমন কতকগুলি সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম্মসংস্কারক জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টিত, অন্য দিকে আবার তেমনই আর কতকগুলি ঐ ঐ শ্রেণির সংস্কারক কায়স্থদিগকে অপর শূদ্রজাতি হইতে পৃথক্ করণ ও তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়োচিত যজ্ঞোপবীতগ্রহণ নিমিত্ত চেষ্টিত।

কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত তাহার কিঞ্চিৎ পৌরাণিক[1] প্রমাণ আছে। এবং তাঁহারা যে অনার্য্য শূদ্র নহেন একথা তাঁহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু বহুকাল যাবৎ শূদ্রের মত আচরণ করায় আদালতের বিচারে[2] তাঁহারা শূদ্র বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন। এক্ষণে কায়স্থেরা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া যদি ক্ষত্রিয়দিগের পুত্রকন্যার সহিত তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহ দেন, সে বিবাহ আদালতের বিচারে সিদ্ধ হইবে কি অসবর্ণ বিবাহ বলিয়া

---

[1] পদ্মপুরাণ দ্রষ্টব্য।

[2] Indian Law Reports, Vol. X, Calcutta Series, p. 688 দ্রষ্টব্য।

অসিদ্ধ হইবে, এবং কোন কায়স্থকর্ত্তৃক যদি ভাগিনেয় (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ পাত্র) দত্তক বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, সে দত্তক আইন অনুসারে সিদ্ধ কি অসিদ্ধ হইবে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে, এবং উপনয়ন বিষয়ে উদ্‌যোগী কায়স্থমহাশয়দিগের একথার প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

৭। বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ

৭। বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গ্রহণ।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং বর্ত্তমানকালে লোকের যেরূপ নানাবিধ প্রয়োজন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিলে অনায়াসে দেখা যায় হিন্দুর বিলাতে ও অন্যান্য দূরদেশে গমন এক্ষণে আবশ্যক। সুতরাং বিলাত বা সেইরূপ অন্য কোন দূরদেশ হইতে প্রত্যাগত হিন্দুকে সমাজে গ্রহণ না করিলে হিন্দুসমাজ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িবে। একথা সকলেই বুঝিতেছেন। আর তাহা বুঝিয়া অনেকেই বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিকে অবাধে সমাজে লইতে প্রস্তুত আছেন, এবং আবশ্যক হইলে লইতেছেন। কেহ বা সমাজের মর্য্যাদা রক্ষার্থে তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গৃহে লইতেছেন। তবে অনেকেই আবার হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা করিতে সম্মত হয়েন না। বাস্তবিক অভক্ষ্যভক্ষণে হিন্দুধর্ম্মানুসারে লোকে পতিত হয়, সুতরাং সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহাদের বিদেশে অবস্থিতিকালে সেই সকল অভক্ষ্যভক্ষণে নিবৃত্ত থাকা আবশ্যক। যদি তাহা সহজ ও সঙ্গত হয়, তবে যে সকল হিন্দু-বিলাতযাত্রী হিন্দু থাকিতে ও হিন্দুসমাজে চলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের সেই নিয়মে চলাই কর্ত্তব্য, এবং তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়। অতএব তাহা সহজ ও সঙ্গত কিনা এই কথা অগ্রে বিবেচ্য।

অনুমান পোনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে এ বিষয়ের একবার আন্দোলন হয়, এবং তাহাতে হিন্দুসমাজেরও বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কএকজন মান্যগণ্য লোক উৎসাহী ছিলেন। সেই সময় দুই একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে ও বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গিয়াছিল, বিলাতে সম্ভবমত ব্যয়ে ছোট খাট হিন্দুআশ্রম স্থাপিত হইতে পারে, এবং তথায় হিন্দুর উচিতমত আচরণ করিয়া, ও ইচ্ছা করিলে একেবারে নিরামিষভোজী হইয়া, লোকে অনায়াসে থাকিতে পারে। হিন্দু অধ্যাপক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গিয়াছিল, হিন্দুর উচিত আচরণ করিয়া কেহ বিলাতে থাকিলে তাহাকে হিন্দুসমাজে গ্রহণের কোন বিশেষ বাধা নাই। কিন্তু এই প্রস্তাবের উদ্যোগী-দিগের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তবে এখনও মধ্যে মধ্যে একথা উঠে, এবং কালক্রমে বিলাতে হিন্দুআশ্রম স্থাপিত হইতে পারে এ আশা দুরাশা বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। যাঁহারা

ব্যারিষ্টার শ্রেণির ব্যবহারাজীব হইবার নিমিত্ত বিলাত যাত্রা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই আপত্তি হইতে পারে, তাঁহাদের শিক্ষার্থে স্থাপিত 'ইন্' নামক বিদ্যা-মন্দিরসকলের নিয়মানুসারে সকল ছাত্রকে একত্র হইয়া নিয়মিতসংখ্যক ভোজে যোগ দিতে হয়, সুতরাং তাঁহাদের হিন্দুআশ্রমে থাকা চলিবে না। কিন্তু এ আপত্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুসমাজ হইতে উপযুক্তরূপে আবেদন হইলে, ইনের কর্ত্তৃপক্ষেরা হিন্দুছাত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রচলিত নিয়মের যে একটু ব্যতিক্রম করিতে সম্মত হইবেন না, এরূপ আশঙ্কা হয় না।

বিলাতে গিয়াও হিন্দু বিদ্যার্থী ইংরাজের সহিত সম্পূর্ণ রূপে না মিশিয়া যে হিন্দুআশ্রমে পৃথক্‌ভাবে থাকিবে, ইহা অনেকে অসঙ্গত মনে করেন। তাঁহারা বলেন এটা হিন্দুয়ানির অন্যায় আব্‌দার। কিন্তু হিন্দুয়ানির পক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুর ইংলণ্ডে গিয়াও নিষিদ্ধ মাংস ভোজন স্বাস্থ্যের অহিতকর ভিন্ন হিতকর নহে। এবং যথা তথা যাহার তাহার হস্তে অন্নগ্রহণ করাও তদ্রূপ। আর একত্র আহার না করিলে যে মিশামিশি হয় না একথাও তত প্রবল বলিয়া মনে হয় না। সদালাপে মনের মিলনই উৎকৃষ্ট মিলন। ভোজে একসঙ্গে মিলন তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।

এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডে হিন্দুআশ্রম স্থাপন এবং তথায় হিন্দু আচারে হিন্দু-দিগের অবস্থিতি, হিন্দুজাতির গৌরব ভিন্ন লাঘবের কারণ নহে।

বিলাতযাত্রীর পক্ষে হিন্দু আচারে চলা কিঞ্চিৎ কষ্টসাধ্য হইতে পারে, অসাধ্য নহে।

ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মনে রাখা আবশ্যক যে, ধর্ম্মপরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মসংশোধন দুটি পৃথক্ ব্যাপার। যদি হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অন্য ধর্ম্ম স্থাপন করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা ভিন্ন কথা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বজায় রাখিয়া তাহার কেবল সংশোধন করিতে গেলে, তাহার কোন উৎকৃষ্ট অংশ, যথা সাত্ত্বিক ও সংযত আহারের নিয়ম সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।

সপ্তম অধ্যায়

কর্ম্মের উদ্দেশ্য

কর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে কর্ম্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করা যাইবে। কর্ম্মের উদ্দেশ্য

আমাদের অভাব ও অপূর্ণতা প্রযুক্ত আমাদিগকে নানা দুঃখভোগ করিতে হয়। সেই অভাব ও অপূর্ণতা পূরণদ্বারা দুঃখনিবারণের ও সুখলাভের নিমিত্ত আমরা নিরন্তর কর্ম্মে ব্যাপৃত। কিন্তু তাহাই যদি হইল, তবে যে কর্ম্ম সুখকর তাহা না করিয়া, কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা জানিবার ও তাহাই করিবার নিমিত্ত আমরা চেষ্টিত হই কেন? সুখলাভ কি তবে কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য নহে? ইহার উত্তরে সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে, কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য সুখলাভ বটে, কিন্তু সে সুখ ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখ নহে, তাহা চিরস্থায়ী পরমসুখ, এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেই সেই সুখলাভ হয়। যে অপূর্ণতা আমাদের দুঃখের কারণ, সেই অপূর্ণতাই দূরস্থ চিরস্থায়ী পরমসুখ কি তাহা দেখিতে দেয় না, এবং নিকটের ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখের নিমিত্তই আমাদিগকে সচেষ্ট রাখে। পূর্ণজ্ঞান লাভ হইলে, যাহা পরমসুখ কেবল তাহাই সুখ বলিয়া জানিব, এবং যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেবল তাহাই করিব, যাহা শ্রেয়ঃ কেবল তাহাই প্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হইবে। কিন্ত সেই জ্ঞান জন্মিলে এবং পূর্ণতালাভ হইলে, আর দুঃখ থাকিবে না, এবং কর্ম্ম করিবার অধিক চেষ্টা থাকিবে না। জ্ঞানের যখন এত ক্ষমতা, তখন

> "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
> তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥"[১]
> (কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ যদি জনার্দ্দন,
> তবে কেন কর্ম্মে মোরে কর নিয়োজন?)

অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন সকলের মনে উঠিবে। কিন্তু তাহার উত্তর গীতাতে ভগবদ্বাক্যেই পাওয়া যায়—

> "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"[২]
> (কর্ম্ম অনুষ্ঠান বিনা নৈষ্কর্ম্ম্য না মিলে।
> সিদ্ধি লভ্য নহে শুধু সন্ন্যাস লইলে॥)

নৈষ্কর্ম্ম্যলাভের নিমিত্তই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন।

---

১ গীতা, ৩।১। ২ গীতা, ৩।৪।

প্রথমে কর্ম্মে প্রবৃত্তি, ও পরিণামে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি লাভ।

কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তিলাভই কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য, একথাটি শুনিতে আপাততঃ যদিও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ইহা প্রকৃত তত্ত্বকথা। কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা ও শক্তি বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু সেই চিকীর্ষা ও কর্ম্মকুশলতা কর্ম্মানুষ্ঠানের নিকটলক্ষ্য ও প্রথম উদ্দেশ্য, তাহার দূরলক্ষ্য বা চরম উদ্দেশ্য নহে। আমাদের অনিবার্য্য অভাব-পূরণ ও জ্ঞানপিপাসা তৃপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা সমাধা হইলে কথঞ্চিৎ অভাবপূরণ ও জ্ঞানলাভ প্রযুক্ত ক্রমশঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যগ্রতার হ্রাস হইয়া জীব নিবৃত্তিমার্গের পথিক হয়। কর্ম্মে অভ্যাসদ্বারা যে যত শীঘ্র আবশ্যক কর্ম্মগুলি সমাপ্ত করিতে পারে, সে তত শীঘ্র নৈষ্কর্ম্ম্য বা মুক্তিলাভের চিন্তা করিতে সময় পায়। কিন্তু মানবজীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি না করিয়া, মানবহৃদয়ের কামনা তৃপ্ত না করিয়া, নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণে (বুদ্ধ চৈতন্যের কথা বলিতেছি না) সাধারণ মনুষ্য কখনই সমর্থ হইতে পারে না। মানবজীবনের কোন কার্য্যই করিলাম না, এই মর্ম্মপীড়ক চিন্তা, এবং অতৃপ্ত-বাসনাপূর্ণ হৃদয়, মুক্তিপথচিন্তার সম্পূর্ণ বাধাজনক। এই কারণেই গৃহস্থাশ্রম গ্রহণের ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রের বিধি।

জীবনের প্রারম্ভে যেমন কর্ম্মে প্রবৃত্তি অনিবার্য্য, জীবনের শেষভাগে তেমনই কর্ম্মে নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। তবে যথাসম্ভব কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন ও হৃদয়ের বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়া মুক্তিচিন্তার সময় থাকিতে থাকিতে যিনি নিবৃত্তিমার্গগামী হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী, এবং তাঁহারই কর্ম্ম, কর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কর্ম্মে নিবৃত্তিলাভ, সাধিত করে।

কর্ম্মের উদ্দেশ্য আলোচনায় দেখা গেল, সেই উদ্দেশ্য প্রথমে কর্ম্মফলের কামনা ও পরিণামে সেই কামনার নিবৃত্তি। অতএব তদনুসারে কর্ম্মীকে সকাম ও নিষ্কাম এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে। সকামকর্ম্মীর কর্ম্মের উদ্দেশ্য কর্ম্মফল লাভ, এবং তাঁহার কর্ম্মে নিবৃত্তি যদিও পরিণামে অবশ্যম্ভাবী, তথাপি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে ঘটে না, তাঁহার কর্ম্ম করিবার শক্তিহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আইসে। কেবল নিষ্কামকর্ম্মীর কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কর্ম্মে নিবৃত্তি। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, তবে ত সকামকর্ম্মীই শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাঁহার কর্ম্মে নিবৃত্তি নাই, এবং তাঁহার দ্বারাই পৃথিবী অধিক উপকৃত হইতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে এ কথা ঠিক নহে।

নিষ্কাম কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।

সকামকর্ম্মীর কর্ম্মে পৃথিবীর হিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা মূলে স্বার্থপ্রণোদিত, এবং কর্ম্মীর স্বার্থের নিমিত্ত যতদূর তাহা অন্যের হিতকর হওয়া আবশ্যক, কেবল ততদূর মাত্র পৃথিবীর হিতকর হইবে। সকামকর্ম্মী যদি দেখেন নিভৃতে পৃথিবীর কোন বিশেষ হিতসাধনে যশোলাভের সম্ভাবনা অল্প, কিন্তু প্রকাশ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প হিতকর কার্য্যে প্রচুর যশ, তাহা হইলে তিনি প্রথমোক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত কার্য্যেই নিযুক্ত হইবেন।

অনুষ্ঠিত কার্য্যসাধনপক্ষে নিষ্কাম অপেক্ষা সকামকর্ম্মী অধিকতর দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন, কিন্তু কার্য্যসাধনের উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে নিষ্কামকর্ম্মী যতদূর হিতাহিত বিবেচনা করিবেন, সকামকর্ম্মীর তাহা করা সম্ভবপর নহে। তিনি কার্য্যসাধনদ্বারা যে ফল হইবে তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ এতই ব্যগ্র থাকেন যে, কার্য্যসাধনের উপায়ের দোষগুণের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। নিষ্কামকর্ম্মী কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, সুতরাং অসদুপায় অবলম্বনের প্রবৃত্তি তাঁহার কখনই থাকিতে পারে না। অসদুপায়ে সৎকর্ম্ম সাধনের প্রবৃত্তি সকামকর্ম্মীর অনেক স্থলে হইবার সম্ভাবনা, নিষ্কামকর্ম্মীর পক্ষে তাহা কখনই ঘটিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন সকামকর্ম্মীর কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে অকর্ম্মও ঘটিতে পারে। নিষ্কামকর্ম্মী সময়ে সময়ে নিষ্কর্ম্মা হইতে পারেন, কিন্তু কখনই অকর্ম্ম করিতে পারেন না। সুতরাং সকামকর্ম্মীর কর্ম্ম দৃশ্যতঃ দৃঢ়তা ও অত্যুদ্যম পূর্ণ হইলেও, তাহা যে পরিণামে নিষ্কামকর্ম্মীর ঔদ্ধত্য ও আড়ম্বরশূন্য কর্ম্মাপেক্ষা পৃথিবীর অধিক হিতকর, এ কথা স্বীকার করা যায় না। সকামকর্ম্মীর আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাবাত ও মেঘগর্জন সমন্বিত বৃষ্টির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এবং নিষ্কামকর্ম্মীর সমারোহশূন্য কর্ম্ম মৃদুমন্দসমীরণ ও ধীরে ধারাবর্ষণের সহিত তুলনীয়। একের দ্বারা পৃথিবীর হিতাহিত উভয়ই ঘটে, অপরের দ্বারা হিত ভিন্ন অহিতের সম্ভাবনা নাই।

তাহার পর নিষ্কামকর্ম্মীর দৃষ্টান্ত, সংসারে কেবল শুভকর নহে, অতি আবশ্যক বটে। মনুষ্য স্বভাবতঃ এত স্বার্থপর যে, মধ্যে মধ্যে নিষ্কামকর্ম্মীর নিঃস্বার্থপর কর্ম্মানুষ্ঠানের উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক দৃষ্টান্ত না থাকিলে, সকামকর্ম্মীদিগের স্বার্থসংঘর্ষণে সংসার বিষম সঙ্কটস্থল হইয়া পড়িত।

সকামকর্ম্ম ও নিষ্কামকর্ম্মের মধ্যে আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। সকামকর্ম্মী ফলকামনায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সেই ফলের বাধাজনক সমস্ত শক্তিকে শত্রুজ্ঞান করিয়া স্বার্থসমুত্তেজিত তীব্রতার সহিত তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে রত হয়েন। সত্য বটে, জড়জগতের স্পষ্টপ্রতীয়মান অপ্রতিহত শক্তির সহিত সেরূপ আচরণ চলে না, এবং কৌশলে সে সকল শক্তির গতি ফিরাইয়া তাহাদিগকে স্বকার্য্যসাধনোপযোগী করিতে হয়। কিন্তু চৈতন্যজগতের নিভৃত শক্তিসমুদয়কে কর্ম্মফললাভের উদ্দাম উত্তেজনায় উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সহিত সকামকর্ম্মী সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং তাহাতে বাঞ্ছিত ফললাভ না হইয়া অনেক স্থলে কুফল ফলে। এইরূপে সকামকর্ম্মীরা সঙ্কল্পিতকার্য্যসাধনে ব্যগ্র হইয়া অন্যের সুখদুঃখ বা হিতাহিতের প্রতি, কি অন্যের সম্ভাবনীয় শত্রুতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হয়েন, এবং নিজের ইষ্টসিদ্ধি হউক আর না হউক, অনেক সময়ে অন্যের অশেষ অনিষ্ট করেন। সকামকর্ম্ম এইপ্রকারে অনেক স্থলে কর্ম্মীকে মোহান্ধ করিয়া জগতের নিভৃত শক্তির সহিত বৃথা সংগ্রামে ব্যাপৃত করে। নিষ্কামকর্ম্মীও কর্ত্তব্যসাধনে সচেষ্ট হয়েন বটে, কিন্তু তিনি জড় বা চৈতন্যজগতের কোন শক্তিকেই উপেক্ষা করেন না, বরং

জগতের সমগ্রশক্তির সহায়তা গ্রহণে কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হয়েন। অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে, সকামকর্ম্মের উদ্দেশ্য অনেকস্থলে জগতের অপ্রত্যক্ষ শক্তির সহিত সংগ্রামদ্বারা কার্য্যসাধন, নিষ্কামকর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই শক্তির সাহায্যে কর্ত্তব্যপালন।

কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভের অর্থ কি?

উপরে বলা হইয়াছে কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভ। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে তাহা কিরূপে সম্ভাব্য? গতিমাত্রই কর্ম্ম। জগৎ একমুহূর্ত্তও স্থির নহে, নিরন্তর গতিশীল, অর্থাৎ কর্ম্মশীল। সুতরাং ব্রহ্মের পূর্ণ নিখিলতা অপরিবর্ত্তনশীল ও নিষ্ক্রিয় হইলেও, তাঁহার ব্যক্তাংশ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, কর্ম্মশীল। অতএব কর্ম্মের বিরাম কিরূপে হইবে? একথার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন জীব, আমি ঐ কর্ম্ম করিলাম, আমি এই কার্য্য করিতেছি, এই অহংজ্ঞান হইতে, ব্রহ্মের সহিত মিলনদ্বারা, নিষ্কৃতি লাভ করিবে। এবং তাহার পর ব্রহ্মের ব্যক্তশক্তি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও ব্রহ্মে বিলীন জীব আর আপনাকে কর্ম্মে নিযুক্ত বোধ করিবে না।

জগতে কর্ম্মের গতি সুপথমুখী, তাহা ধীর হইলেও ধ্রুব।

কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ সাধনের নিমিত্ত প্রথম হইতেই সংযত ও সাধুভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। জগতের অনন্ত শক্তিনিচয়ের সহিত নিজের ক্ষুদ্রশক্তির বিরোধ বাধাইয়া তাহাদের উপর আপন প্রাধান্যসংস্থাপনের বৃথা চেষ্টা না করিয়া, তাহাদের সহিত সখ্যসংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের সাহায্যে কর্ত্তব্যপালনের চেষ্টা করা কর্ম্মীর একমাত্র সদুপায়। কিন্তু সেই সদুপায় অতি অল্প লোককেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তবে কি সৃষ্টি বিড়ম্বনামূলক এবং মানবের কর্ম্মানুষ্ঠান পরমার্থলাভের বিরোধী? একথাও বলিতে পারা যায় না, কেন-না, তাহা বলিতে গেলে বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মের প্রতি অনাস্থা দেখান হয়। প্রকৃত কথা এই যে, সংসারে কর্ম্মের ও কর্ম্মীর গতি ক্রমশঃ অতি ধীরে ধীরে সুপথের দিকে, কিন্তু ধীরে ধীরে হইলেও তাহা ধ্রুব সুপথমুখী।

বর্ণমালানুক্রম সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

———